তারিখ-ই-ফিরুজশাহী
জিয়াউদ্দিন বারানী

জিয়াউদ্দিন বারানী বিরচিত

তারিখ-ই-ফিরুজশাহী

গোলাম সামদানী কোরায়শী

অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৮৯
[জুন, ১৯৮২]

বাএ : ১২৩৮
মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০

পাণ্ডুলিপি
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

প্রকাশনায়
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে
মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার

মুদ্রণে
বিভূতিরঞ্জন সাহা
বর্ণযোজন
৫২ লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা—১

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুর রোউফ

মূল্য : বায়ান্ন টাকা মাত্র

Bengali translation of the TARIKH-I-FEROZSHAHI of Zia-al-Din Barni, edited by Saiyid Ahmed Khan under the Superintendence of Captain W. Nassan Lees L.L.D and Mowlavi Kabir-al-Din and Published by the Asiatic Society of Bengal in 1862.

Bengali translation by Ghulam Samdani Quraishy. Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh, June 1982. Price Taka Fifty two only. $ 5·50

নিবেদন

প্রায় এক যুগ পূর্বে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর এই অনুবাদটি শেষ করিয়াছিলাম। ১৯৬৯ সনে ইহা মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেওয়া হয়। কিন্তু পঁচিশ ফর্মার মত মুদ্রণের পর একাত্তুরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ সহ মুদ্রিত সমুদয় কাগজপত্র নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি এই বিপর্যস্ত পাণ্ডুলিপিটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি একাডেমীর কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া প্রেস কপি প্রস্তুত করিয়া দিবার সুযোগ লাভ করি। সেইজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

গোলাম সামদানী কোরায়শী

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির্ রহ্‌মানির্ রহিম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার জন্য, যিনি ওহীর সাহায্যে নবী-রসুল ও রাজা-বাদশাহ্‌দের কাহিনী তাঁহার বান্দাদিগকে জানাইয়াছেন। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যাঁহারা সৎ ছিলেন, তাঁহাদের স্বভাবচরিত্র এবং অসৎ ব্যক্তিদের দোষত্রুটি উম্মতে মুহম্মদীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এইভাবে তিনি এই জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং কোরানের ভাষায় বলিয়াছেন, 'আমরা লিখি তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে ও তাহাদের কীর্তিগুলি।' অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমরা বর্ণনা করি তোমার নিকট সুন্দরতম কাহিনী।'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং প্রশংসা করি একমাত্র সেই প্রভুর, যিনি তাঁহার বুদ্ধিমান সংযত বান্দাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম উপলব্ধির ক্ষমতা অর্পণ এবং তাহাদের চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতা বিধান করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা পূর্ববর্তীদের কীর্তিকাহিনী, দোষ-গুণ, সদাচার ও কদাচার, আনুগত্য ও বিদ্রোহ, মোক্ষ লাভ ও ধ্বংসপ্রাপ্তির যথার্থ পরিচয় উদ্ধার করিতে পারেন; যাহাতে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রিয়দিগকে সৌভাগ্যবান এবং অপ্রিয়দিগকে দুর্ভাগা বলিয়া গণ্য করেন; সৌভাগ্যবানকে ভাগ্যহীন হইতে, নৈকট্যলাভকারীকে দূরবর্তী হইতে, সন্তুষ্টিকামীকে বিরাগভাজন হইতে, সুপথপ্রাপ্তকে বিপথগামী হইতে এবং বন্ধুকে শত্রু হইতে চিনিয়া লইতে পারেন; যাহাতে তাহারা গুণকে দোষ হইতে এবং ভালকে মন্দ হইতে পৃথক করিয়া বুঝিতে পারেন; যেন তাহারা ইসলামের (আনুগত্যের) সৌন্দর্য ও অবাধ্যতার কুফল এবং সু-র সুন্দরতা ও কু-র বন্ধুরতাকে স্বচ্ছ দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করেন এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় ও ঈপ্সিত বান্দাদের কার্যকলাপ ও স্বভাবচরিত্রকে অনুসরণ করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া ভাবেন; পথভ্রষ্টদের দোষত্রুটি ও চরিত্রহীনতা এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদিগের কদাচার হইতে নিজদেরকে দূরে রাখেন; ভাগ্যবানদের অনুসরণ এবং ভাগ্যহীনদের নিকট হইতে দূরে গমনকে সমস্ত ধর্ম-কর্মের সার বলিয়া জানেন।

এইভাবে সৎ ও পুণ্যাত্মাদের কাজকর্মের অনুসরণ এবং অসৎ ও দুষ্ট লোকদের পাপাচার হইতে দূরে গমনের ফলে তাঁহারা অন্তিমে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন এবং মহান আল্লাহ্ তা'লার স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পাইবেন; পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ভালমন্দ ও পাপপুণ্যের সংবাদ প্রদানকে আপামর মুসলিম জনসাধারণের জন্য

এক মহান অবদান বলিয়া গণ্য করিবেন। তাঁহারা ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্যোগী হইবেন এবং পূর্বসূরীদের ইতিহাসকে খোদার দান বলিয়া ভাবিবেন। এই প্রকার সর্বসুফলের সার—'ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন আর আল্লাহ্ মহান কল্যাণের অধিকারী'—বলিয়া জানিবেন।

আল্লাহ্, নবী, ফেরেশতা, ওলীআল্লাহ্, পুণ্যাত্মা, পূর্ববর্তী সকল সৎ এবং পরবর্তী সকল শ্রেণীর মানুষের তরফ হইতে হজরত মুহম্মদ মুস্তফার উপর অনন্ত দরুদ ও সালাম। যাঁহার প্রশংসা ও গুণাবলীর কথা পূর্বের আসমানী কিতাব-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহার অমূল্য বাণী ও অনন্য কীর্তিকাহিনী হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যাঁহার এই সকল কথা ও কাজের উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ব-পশ্চিমের সর্বত্র শরিয়তী বিধান প্রবর্তিত এবং ইহার অনুসরণ সৌভাগ্য লাভের উপায় ও মুক্তি লাভের পন্থা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইসলাম ধর্মের অনুরাগী ও পোষক রাজা-বাদশাহ্‌গণ তাঁহার—প্রবর্তিত বিধিবিধান অনুসরণ করিয়াছেন।

আল্লাহ্, রসুল, ওলীআল্লাহ্, পুণ্যবান ও উম্মতে মুহম্মদীর বিশিষ্ট লোক ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বলিতেছি, হজরতের চারি আসহাব, তাঁহার পরিবার পরিজন এবং বিপদের বন্ধু সকল সাহাবীর উপর অনন্ত রহমত বর্ষিত হউক। তাঁহারা জাতির গৌরব; আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের গুণের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কোরানে তাঁহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পূর্বগামী ও পূর্বসূরীগণ এবং যাহারা সততার সহিত তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন,—আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।' কোন লেখকের পক্ষে তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করা কি সম্ভব? যাঁহাদের কথা কোরানে এইভাবে বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ্‌ই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাকে অনুসরণ করিয়াছে।' বিশেষ করিয়া হজরতের চারি আসহাবের গুণাবলীর বর্ণনা; তাঁহারা ইসলাম-সৌধের চারি স্তম্ভস্বরূপ। ধর্মের প্রসার ও ধর্মীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে তাঁহারা চারিটি স্তরবিশেষ। রাজ্য-শাসনেও তাঁহারা অতুলনীয়।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর তাঁহারা দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন এবং জমশেদ ও খসরুর সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। অচিরেই তাঁহারা পৃথিবীর এক-চতুর্থ জনপদের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। হজরত

মুহম্মদ (সঃ)-এর বাণী ও কার্যের যথার্থ অনুসরণ দ্বারা সাধারণের হিত ও জগতের কল্যাণ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার ফলে তাঁহারা অতি দীন-দরিদ্র অবস্থায় থাকিয়া এবং শাহী পোশাকের পরিবর্তে কম্বল সম্বল করিয়াও পৃথিবীর এক-চতুর্থ জনমণ্ডলীকে শাসন করিয়াছেন। সরল জীবন-যাপনকে এক অত্যুচ্চ মর্যাদায় বিভূষিত করিয়া তাঁহারা ইসলামের বিজয় পতাকা পূর্ব-পশ্চিমের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মীয় জীবন-প্রণালীকে সমুদয় পৃথিবীর বুকে প্রবর্তিত করিয়াছেন।

হজরত আবুবকর সিদ্দিকের সময় হইতেই রাজ্য-শাসনের বিধিনিয়মের আরম্ভ। মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার ও ধর্মদ্রোহীদিগকে তিনিই শায়েস্তা করেন। তিনিই সিরিয়া ও ইরাকের বুকে সৈন্যদল পাঠান, যাহাতে বিধর্মী বাদশাহ্‌দেরকে সৎপথে আনা যায়। হজরত আবুবকরের খেলাফত কাল ত্রিশ মাস তথা আড়াই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই যথাসম্ভব সকল বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং মিথ্যা নবুয়তের দাবীদাররা তাহাদের সকল অনুগামীসহ ধ্বংস হইয়া যায়। আরবের বিভিন্ন গোত্রে লোক পুনরায় ইসলামের পুণ্যাশ্রয়ে ফিরিয়া আসে। নবুয়তের সময়কার স্বিরীকৃত সদকা, জাকাত, জিজিয়া এবং শস্যের জাকাতের হার তাহারা মানিয়া লয়। কোন কারণেই নির্দিষ্ট হার হইতে উট বাঁধিবার একটি দড়ি কম দেওয়ার সুযোগও তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার-দিগকে হত্যা করিবার পর তাহাদের পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদকে ইসলামী সৈন্য-দলের জন্য গনিমতের মাল হিসাবে গণ্য করা হয়।

হজরত আবুবকরের খেলাফতের সময় ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। তাঁহার গাম্ভীর্য, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার ফলে সাহাবীদের মধ্যে একতার শক্তি দৃঢ় হয় এবং সর্বপ্রকার বিরোধ ও মতানৈক্য দূরীভূত হইয়া যায়।

হযরত আবুবকরের পরবর্তী কালে তাঁহার মনোনয়ন ও সাহাবীদের সর্ব-সম্মতিক্রমে হযরত উমর খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার খেলা-ফত কাল দশ বৎসর নয় মাস। এই সময়ে হজরতের চিরস্থায়ী অলৌকিকত্বের নিদর্শন স্বরূপ পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ জনপদ খেলাফতের আয়ত্তাধীনে আসে। ইসলামী শরিয়তের বিধিনিষেধ সর্বত্র প্রচারিত হয় এবং উহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইসলামী পতাকা পূর্ব পশ্চিমের সর্বত্র আন্দোলিত হয়। আরবের সকল গোত্রের লোক; হেজাজ, ইয়ামেন, বাহরাইন, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, খুরাসানের অধিকাংশ, মাওরায়ান্নাহার এবং রোমের কতকাংশ ইসলামী খেলাফতের অধীনে আসে। হজরতের পুণ্য খেদমতে শিক্ষাপ্রাপ্ত দরিদ্র সাহাবীগণ অপার

শক্তির বলে কায়সর, খসরু ও অন্যান্য সুলতানদের রাজধানী অধিকার করেন। ইরাক ও অন্যান্য দল হইতে অধর্ম, পৌত্তলিকতা, অগ্নিপূজা ইত্যাদি দূর হয়। মগ ও মজুসীদের ধর্মকর্মের বিনাশ ঘটে। কুফা ও বসরাকে ইসলামী শহর হিসাবে গড়িয়া তুলেন এবং এইগুলি ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

হজরত আদমের পরবর্তী সাত হাজার বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষার গুণে চৌদ্দ তালির জামা গায়ে দিয়াও হজরত উমর দুনিয়ার বুকে সুলায়মান ও সেকান্দারের সমান বাদশাহী করিয়া গেলেন। তাঁহার কোড়ার ভয়ে নাফরমান আর বিদ্রোহীরা অনুগত-বাধ্য হইয়া পড়িল এবং সকল প্রকার খেরাজ, খাজনা ও জিজিয়া প্রদানে আগাইয়া আসিল। যে কায়সর ও খসরু তাহাদের সম্পদের দেমাগে খোদার নাফরমানি—এমন কি নিজেদেরকে খোদার সমকক্ষ বলিয়া দাবী করিতেছিল, তাহাদের সেই হাজার বৎসরের পুরাতন ধনভাণ্ডার ইসলামের বিজয়ী সৈন্যদলের হাতে আসিল এবং তাহা মসজিদে নব্বীর আশে-পাশের আর মদিনার চার-দিকের আপামর জনসাধারণের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে ইসলামের মর্যাদা এবং অধর্মের অপমান সকল বুদ্ধিমানের নিকট উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

অথচ হজরত উমর স্বয়ং এই সকল ধনরত্নে হাত লাগান নাই। বাঁটিয়া দেওয়ার পর তিনি খালি হাতে ঘরে ফিরিয়াছিলেন। তিনি নিজের জন্য প্রাপ্য সামান্য বৃত্তি হইতেই নিজের ও পরিবারের সকলের খরচ চালাইতেন। ইহার ফলেই সাহাবীদের নিকট হজরত উমরের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়া যায় এবং তাঁহার আদেশ পালনে তাঁহারা আরও বেশী তৎপর হইয়া উঠেন।

হজরতের পুণ্য সাহচর্যের ফলেই হজরত উমরের সময়ে খেলাফতের বায়তুল মালে বার হাজার তাজী ঘোড়া মজুদ ছিল; অথচ তখনও জুম্মার দিনে হজরত উমর ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়া খোতবা পাঠ করিতেন। হাদীস বর্ণনাকারী ও ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই প্রকার ছেঁড়া কাপড় পরিয়াও সুশাসন আর সরল জীবন যাপনের দ্বারা হজরত উমর যে কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কোন খসরু বা কায়কোবাদ শত অত্যাচার, অবিচার, শাসন ও শোষণের দ্বারাও করিতে সমর্থ হয় নাই। সাত হাজার বৎসরের মধ্যে নবী রসুলগণ ব্যতীত তাঁহার ন্যায় সুশাসক আর দেখা যায় নাই। যাহারা হজরত উমরের ন্যায়পরায়ণতা ও দানশীলতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাদের মতে তিনি নওশেরোয়াঁ অপেক্ষাও শতগুণ বেশী ন্যায়পরায়ণ এবং হাতেমতাই অপেক্ষাও

হাজারগুণ বেশী দানশীল ছিলেন। এক দিকে ছেঁড়া জামা গায়ে দেওয়া আর অন্য দিকে এক বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করা—ফকিরী আর জমশেদীর এই মহামিলন কোন সুশাসক বাদশাহের জীবনে ঘটে নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিবে কিনা সন্দেহ।

হজরত উমরই প্রথম খলিফা, যাহাকে 'আমীরুল মোমেনীন' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তিনিই সর্বপ্রথম বয়তুল মাল হইতে সৈন্যদের ভাতা প্রদান, মুসলমানদের জন্য শহর নির্মাণ, ভাতার ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগকরণ, মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে খাজনা আদায়, প্রতিটি শহরে বিচারের জন্য কাজী নিয়োগ প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করেন। তিনি নিজ হাতে কোড়া লইয়া মুসলমানদিগকে শাসন করিতেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম তাহাদের জন্য শহীদ হইলেন।

হজরত উমরের পরে হজরত উসমান খলিফা হন। মোহাজের ও আনসার সকলেই তাঁহার হাতে 'বায়আত' করেন। তাঁহার লজ্জা, সহ্যগুণ ও দানশীলতা সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থাদিতে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সাহাবীদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি কোরানকে একটি সংস্করণে সীমাবদ্ধ করেন। হজরতের সময়ে যুদ্ধাদির ব্যাপারে তিনি স্বীয় সম্পদ দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁহার দান অনেক। তিনি ওহীর লেখক ও কোরানের হাফেজ ছিলেন। হজরতের দুই কন্যাকে বিবাহ করিবার ফলে তাঁহাকে 'যুন্নুরাইন' বলা হইত। হজরত উমরের সময় তিনি খলিফার পাঠক এবং তাঁহার পক্ষ হইতে বিভিন্ন শাসকের নিকট গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ও ফরমানাদি লিখিতেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ), আবুবকর ও উমর—সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হজরত উসমানের সময় পূর্ববর্তী খলিফাদের অধিকৃত দেশগুলিসহ সম্পূর্ণ খোরাসান ও মাওরায়ান্নাহারের উপর প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। তাঁহার খেলাফত কাল সর্বমোট বার বৎসর।

হজরত উসমানের পরে হজরত আলী খলিফা হন। সর্বসম্মতিক্রমে হজরত মুহম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর পরে তিনি সমগ্র জগতে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন। বীরত্বের ব্যাপারে হজরত হামজার পরেই তাঁহার স্থান। এই জন্যই হজরত তাঁহাকে 'আসাদুল্লাহ্' উপাধি দান করেন।

সাহাবীদের মধ্যে নানান দিক দিয়া হজরত আলীর বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি হজরতের চাচাতো ভাই ও বনি হাশেমের লোক। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পিতামাতার তত্ত্বাবধানে হজরত লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ

তিনি হজরতের নয়নমণি হাসান-হোসেনের পিতা ছিলেন। চতুর্থত: হজরত তাঁহাকে অতি সাধু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি সাহাবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সাধুতার অধিকারী ছিলেন। পঞ্চমত: জ্ঞানের গভীরতার দিক হইতে সাহাবীদের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। ষষ্ঠত: ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য অধর্ম বা মূর্তিপূজার ছায়া মাড়ান নাই। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, হজরত আলী মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁহার মাতা মূর্তিকে সেজদা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তখন পেটে এমন ব্যাথা অনুভব করেন যে, তিনি তাহা করিতে সক্ষম হন নাই। সপ্তমত: হজরত আলীর দানশীলতা সম্পর্কে বিশেষভাবে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

হজরত আলীর পূর্বে হজরত আবুবকর ও উমর ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। খেলাফতের ব্যাপারে ধন ও জন উৎসর্গ করিয়া এবং ধর্মীয় ব্যাপারে নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া তাঁহারা পূর্বসূরী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। হজরত উসমানের পরে হজরত আলী খলিফা হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে তৎকালে নিযুক্ত হজরত উসমানের ভাই-বন্ধু শাসকরা নানা প্রকার অপকর্ম শুরু করিয়াছেন। হজরতের সুন্নত এবং তাঁহার পরবর্তী দুই খলিফার অনুসৃত সুন্নতের পরিবর্তে তাহারা নূতন নূতন বিষয় ও কার্যপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। হজরত আলী এই সকল 'বেদাত' দূর হইয়া যাহাতে হজরতের সুন্নত পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যাহা সত্য, তাহা সর্বত্র অনুসৃত হয়, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হজরত মাবিয়া ও হজরত উসমানের অন্যান্য ভাইগণ ইহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশে শাসক নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহারা হজরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইলেন। খলিফার প্রাপ্য আনুগত্য তাঁহারা অস্বীকার করিয়া বসিলেন। ইহাতে প্রথম দুই খলিফার সময়ে সাহাবীদের মধ্যে যে ঐক্য ও সংহতি বিরাজমান ছিল, তাহা আর অবশিষ্ট রহিল না। অন্যদিকে সাহাবীদের অনেকেই বিভিন্ন যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন এবং মহামারীতে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। হজরত আলী এই সকল বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য ইরাকে গেলেন এবং কুফায় বসবাস করিতে মনস্থ করিলেন। সাহাবী ও অন্যান্য লোকের সহায়তায় তিনি তাঁহার খেলাফত কালের চারি বৎসর চারিমাস ব্যাপী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার নিজ দল ও বিরোধী দলের বহু সাহাবী শহীদ হন এবং তিনি নিজেও 'ইবনে মুলজিম' নামীয় এক আততায়ীর হাতে শাহাদত বরণ করেন।

এইভাবে খেলাফতের সময় কাল শেষ হয়। হজরত মুহম্মদ বলিয়াছিলেন, 'আমার পরে ত্রিশ বৎসর কাল খেলাফত থাকিবে এবং ইহার পরে উহা সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে।' হজরত আলীর শাহাদতের সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের কাল আরম্ভ হইয়াছিল।

আমি হজরতের খাস সাহাবী চারিজনের কথা পুণ্যার্থে এই ভূমিকায় বর্ণনা করিলাম। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রসুলের প্রতি দরুদের পর তারিখে ফিরুজশাহীর এই ভূমিকাকে বিশিষ্ট শাসকদের কিছু বিবরণের দ্বারা সাজাইয়া দিলাম।

আল্লাহ্‌র দয়ার ভিখারী আমি পাপী জিয়া বারানী বলিতেছি—আমি জীবনের অধিকাংশ সময় গ্রন্থপাঠ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নির্বিশেষে সকলের সর্ববিধ রচনার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছি। বস্তুত: তফসীর, হাদীস, ফেকাহ্‌ ও তাসাউফের পরে তারিখের ন্যায় উপকারী কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ পাই নাই। নবী, খলীফা, বাদশাহ এবং দীন ও দুনিয়ার কীর্তিমান লোকদিগের জীবন ও কর্মের সংবাদই এই তারিখ বা ইতিহাস। যাহারা জনসমাজে সম্মানিত এবং ধর্মকর্মে পূর্ণতার অধিকারী, ইতিহাস পাঠ ও আলোচনা তাহাদেরই বৈশিষ্ট্য। নীচ ও হেয় চরিত্রের অধিকারী তথা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সহিত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই এবং ইহা তাহাদের কার্যও নহে। ইহা দ্বারা তাহাদের কোন উপকার হয় না; ইহা কোথাও তাহাদের কোন কাজে আসে না। কারণ ইতিহাস হইতেছে পুণ্যবানদের কীর্তি-কাহিনী ও গুণপনার বর্ণনা। ইহাতে নীচ লোকদের হীনমন্যতার কথা লিখা হয় না; তাহা হইলে তাহারা সেই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবে। সুতরাং অনুরূপ কোন কিছু নাই বলিয়াই ইতিহাসের প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণ নাই। বরং এই বিদ্যা তাহাদের মগজে ঢুকিলে উপকার হইতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। ইহারা ইতিহাসের মর্যাদার কী জানে যে, এই বিষয়টির প্রতি তাহাদের আসক্তি জন্মাইবে? তদুপরি ইতিহাস উহাদের কুকাজের কোন প্রকার সহায়তাই করিবে না এবং উহাদের মুখ হইতে সৎলোকের গুণগানের আশাও করা যায় না। নীচ শ্রেণীর লোকেরা অনেক বিষয় ও ব্যাপারে জড়িত হইয়া প্রচুর উপকার লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু ইতিহাসের বেলায় তাহা হয় না।

অবশ্য যাহারা বংশে ও জ্ঞানে সম্ভ্রান্ত এবং সম্ভ্রান্ত জনের সন্তান, তাহাদের দৃষ্টি সর্বদাই সৎপথ ও সুকীর্তির দিকে আকৃষ্ট হয়। এই জন্যই ইতিহাস জানা ও শোনার দিকে তাহাদের মধ্যে অতিমাত্রায় আসক্তি বিদ্যমান; যেন এই বিষয় না জানিতে পারিলে তাহাদের জীবনই বৃথা হইয়া যাইবে। যথার্থই

তাঁহারা ঐতিহাসিকদিগকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর মনে করেন এবং তাঁহাদের পদ-ধূলিকে পবিত্র বলিয়া ভাবেন। কারণ তাঁহাদের দ্বারাই সৎজীবন ও সুকীর্তি অমরত্ব লাভ করে এবং জগতের সম্মুখে তাহা চিরস্থায়ী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা 'এলমে তারিখ'---ইতিহাস শাস্ত্রের বহুগুণ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ কোরান ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে পূর্ববর্তী নবীরসুলদের জীবন-কাহিনী এবং রাজা-বাদশাহদের সুকীর্তি ও কুকীর্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসেও সেই ধারা অনুসরণ করিয়া অনুরূপ সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বর্ণনার মধ্যে তাঁহাদের চিন্তার আহার্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসে হজরতের জীবনীর উপকরণ ও অমূল্য বাণী রক্ষিত হইয়াছে। মর্যাদার দিক হইতে তফসীরের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীসে বর্ণিত বিষয়বস্তু যথার্থতা বিচার, বর্ণনাকারীর পরিচয়, উহার উৎসকাল, যুদ্ধাদির প্রকৃত সময়, বিবিধ বিধান প্রচলন ও রহিতকরণের পর্যায়ক্রম ইত্যাদির আলোচনা সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদীস শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়াছেন, 'হাদীস ও ইতিহাস যমজ স্বরূপ।' কোন হাদীসবিদ যদি ঐতিহাসিক না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে হজরত ও সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলীর প্রকৃত তথ্য বিচার সম্ভব নহে। তদুপরি হাদীস বর্ণনাকারীর প্রকৃত পরিচয় এবং এই ক্ষেত্রে সাহাবীদের সততা ও আন্তরিকতার তারতম্য অনুধাবন করাও অনুরূপভাবে অসম্ভব। এই জন্যই ইতিহাস-অনভিজ্ঞ হাদীসশাস্ত্রবিদদের বর্ণিত ঘটনাবলী প্রামাণ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কারণ তিনি প্রকৃত তথ্য বিচার করিয়া কোন হাদীসই বর্ণনা করেন না। সুতরাং সাহাবীদের সমকালীন ঘটনাবলী এবং পরবর্তী কালের অন্যান্য বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ একমাত্র ইতিহাসের মাধ্যমেই সম্ভব হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা মার্জিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অন্য জনমণ্ডলীর বিবিধ অভিজ্ঞতা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ এবং বিভিন্ন ঘটনার তথ্য ও তত্ত্ব বিচার করায় নিজেদের মতামত সম্পর্কে দৃঢ়তা জন্মে। এ্যারিস্টটল ও বুরযচমেহের বলিয়াছেন, ইতিহাস পাঠে ন্যায়বিচারের ক্ষমতা লাভ ঘটে। কারণ পূর্বসূরীদের ন্যায়বিচারের আদর্শ উত্তরসূরীদের জন্য অনুসরণীয় হইতে পারে।

চতুর্থতঃ ইতিহাস জানা থাকিলে শাসক ও শাসিত কাহাকেও নিত্য নূতন ঘটনার সম্মুখীন হইয়া বিব্রত হইতে হয় না। পূর্ববর্তীদের সম্মুখে সব পর্যায়ের

ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে ; তাহারা কী উপায়ে ইহার মোকাবিলা করিয়াছেন, তাহা জানা থাকিলে দৃঢ়তার সঙ্গে মহামারী বা অন্যবিধ দৈব-দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া যায়। এই ব্যাপারে নিজের অনুমান আর ঝাপসা ধারণার দ্বারা কোন কিছু করিয়া উঠার জন্য হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় না। কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার পূর্বেই ইহার বিভিন্ন লক্ষণ দৃষ্টে প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং এই সকল বিষয় দেশ ও জাতির জন্য একান্তই উপকারী।

পঞ্চমত: নবীরসূলদের জীবনে যে সকল বিপদ-আপদ আসিয়াছে, তাঁহারা কিরূপ ধৈর্য ও তিতিক্ষার সহিত এই সকল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহা জানা থাকিলে ইতিহাস পাঠকের পক্ষে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ইহাতে শুধু ধৈর্য ও সংযমই নহে, পরিণামে তাঁহারা যেভাবে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, তাহা ইতিহাস জানা সকলের মনে নূতন আশা জাগাইয়া তোলে। তদুপরি নবীরসূলদের ন্যায় পুণ্যাত্মাদের জীবনেও যে নানা ধরনের বিপদপাত ঘটিয়াছে, এই সংবাদটি নি:সন্দেহে বিপদগ্রস্ত লোকদের জন্য মহা উপকারী। ইহার ফলে তাহারা কোন বিপদেই ধৈর্যহারা হইবে না ; সাহস লাভ করিবে।

ষষ্ঠত: ন্যায়-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা ও সৎলোকের জীবন-কথা, তাঁহাদের কীর্তি-কাহিনী সকল মানুষের মনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করে এবং অসৎ লোকদের কুকীর্তি ও পরিণামে তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি মানুষকে ভয়গ্রস্ত করিয়া তোলে। খলিফা, বাদশাহ ও উজির-নাজিরদের জন্য এই সকল সংবাদ আরও উপকারী। সৎকাজের সুফল আর অসৎ কাজের কুফল দৃষ্টে তাঁহারা সতর্ক হইয়া উঠিতে পারেন। ফলে যাহাতে কল্যাণ ও সুখ্যাতি বিদ্যমান, তাহার অনুসরণ করা এবং যাহাতে অকল্যাণ ও অখ্যাতি বর্তমান, তাহা হইতে দূরে থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। ইহার ফলে মুসলমান বাদশাহের সম্মুখে আল্লাহ্‌র ভয় আর প্রজাপালনের গুরুদায়িত্ব পরিস্ফুট হয় এবং তাঁহারা সৎভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া আল্লাহ্ ও মানুষের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারেন।

সপ্তমত: ইতিহাসের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ও আধুনিক কালের সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই হজরত ইব্রাহীম আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিয়াছিলেন, 'পরবর্তী জনসমাজে আমার সত্য ভাষণ প্রতিষ্ঠিত করিও।' মিথ্যা লিপিবদ্ধকারীদের প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া আল্লাহ্ বলিয়াছেন, 'যথাস্থান হইতে বাক্যগুলি তাহারা অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যায়।' তদুপরি মিথ্যা ও মিথ্যা দোষারোপকে তিনি ধ্বংসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এইজন্য যাঁহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়, জ্ঞানবান, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ, বস্তুতঃ তাঁহারাই ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে পূর্ববর্তী জনসমাজের ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ, উচিত, অনুচিত, পাপপুণ্য, দোষগুণ প্রভৃতি বর্ণিত হয়। যেন পরবর্তী কালের পাঠকরা ইহা হইতে সংসারের লাভ-ক্ষতি এবং রাজ্যের শুভাশুভ সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। ইহার ফলে তাহারা অবশ্যই সৎ কাজের অনুসরণ এবং অসৎ কাজের প্রতি ঘৃণা করিতে শিখিবে। যদি কোন মিথ্যাবাদী গর্হিত অভিপ্রায়ের বশবর্তী হইয়া পূর্বসূরীদের সম্পর্কে অনুচিত ঘটনাবলী বর্ণনা করে এবং নিজের মনগড়া মিথ্যা সত্যের মত করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বলিতে সচেষ্ট হয়; যদি দুনিয়ার অখ্যাতি ও কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের ভয় তাহার না থাকে এবং ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল বলিবার ব্যাপারে বিবেক তাহাকে বাধা না দেয়, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়! আল্লাহ্ তাহাকে রক্ষা করুন।

যেহেতু ইতিহাসের ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া সংবাদপ্রাপ্তির সূত্র পরম্পরা উল্লেখ করা হয় না এবং সাধারণভাবে জ্ঞানী ও কীর্তিমান ব্যক্তিদের কথাই ইহাতে বর্ণনা করা হয়; এইজন্য ইতিহাস লেখককে অবশ্যই সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হইতে হইবে। যেন তাঁহার বর্ণিত সূত্রবিহীন ঘটনাবলীতে পাঠক দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করিতে পারে এবং তাহা বিশ্বস্ত লোকদের নিকট গৃহীত বলিয়া বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ বিশ্বস্ত জ্ঞানীদের নিকট তেমন লোকের কথাই গ্রহণযোগ্য হয়, যাহার মধ্যে সততা ও সুদৃষ্টি বিদ্যমান। এইজন্য দেখা যায়, আরব-অনারব নির্বিশেষে সমুদয় আরবী, ফারসী ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির লেখকগণ তাঁহাদের সময়ে সৎ ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

'সিয়ারুন্নবী' ও 'আসারে সাহাবা' গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসহাক জনৈক সাহাবীর সন্তান ও হাদীস শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। 'মগাজী'র লেখক ইমাম ওয়াকেদীও সাহাবীর সন্তান এবং হাদীস শাস্ত্রবিদ হিসাবে সুপরিচিত। অন্যান্য বিশ্বস্ত লেখকদের নিকট তাঁহাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইমাম আসমাই এলমে কেরাত, এলমে বালাগত ইত্যাদিতে খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। ইমাম বোখারী ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের দিকপাল। ইতিহাস, হাদীস বর্ণনা ও সমালোচনায় তাঁহার সমকক্ষ গুণী নাই বলিলেও চলে। ইমাম সালাবী, ইমাম মুকাদ্দসী, ইমাম দায়নুরী, ইমাম হজম, ইমাম তাবারী প্রমুখ জ্ঞানীগণ সকলেই ঐতিহাসিক ও তফসীরকার হিসাবে সুপরিচিত।

অনারব ঐতিহাসিকরাও তাহাদের সমসাময়িক কালের সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক ছিলেন। যেমন ফেরদৌসী, বায়হকী, 'তারিখে আইন' প্রণেতা, 'তারিখে

কিসরাবী'র লেখক এবং 'তারিখে ইয়ামেনী' ও 'উতবী'র রচয়িতা নিজ নিজ সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জ্ঞানী ছিলেন।

রাজধানী দিল্লীর ঐতিহাসিকগণও তৎকালীন জনসমাজে জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। 'তাজুল মাআসির' প্রণেতা খাজা সদর নিযামী; 'জামেউল হেকায়েত' রচয়িতা মওলানা সদরুদ্দীন আউফী; 'তবকাতে নাসিরী'র লেখক কাজী সদরে জাহান মিনহাজ জুরজানী এবং 'ফতহেনামায়ে সুলতান আলাউদ্দীন' রচনাকারী কবিরউদ্দিন ইবনে তাজউদ্দিন ইরাকী প্রমুখ চারিজনই অদ্ভুতকর্মা ঐতিহাসিক। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত এবং মহৎ গুণগ্রামের অধিকারী বলিয়া সর্বত্র সুপরিচিত।

এইজন্যই দেখা যায়, বিশ্বস্ত গুণী ব্যক্তিরা যে সমস্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার সমুদয়ই জ্ঞানী সমাজে গৃহীত হইয়াছে। অন্যদিকে অনভিজ্ঞ ও অখ্যাত লেখকদের রচনা সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। আজগুবী ঘটনার খনি এই সকল ইতিহাস পুস্তকের দোকানে পোকায় কাটিয়াছে এবং বাজে কাগজ বিক্রেতাদের নিকট ওজন দরে বিক্রয় করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিকের জন্য সদ্বংশজাত ও বিশ্বস্ত হওয়া ছাড়াও ধর্মীয় মতামতের বিশুদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। নতুবা কুপন্থী ধর্মান্ধ ঐতিহাসিকদের দ্বারা হিংসা ও বিদ্বেষের প্রসার লাভ ঘটিতে পারে। যেমন চরমপন্থী শিয়া রাফেজী ও খারেজীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। তাহারা সাহাবীদের সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী রটনা করিয়াছে, পূর্ববর্তী ধর্মান্ধদের অনেক ধ্যান-ধারণা এবং সত্য ও মিথ্যা বর্ণনা নির্বিচারে তাহাদের লিখিত ইতিহাসগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

ইতিহাস পাঠকগণ যদি ঐতিহাসিকদের ধর্মমত, বিশ্বাস ও সংস্কার সম্পর্কে অবহিত না হন, তাহা হইলে পূর্বসূরী হিসাবে তাহাদের সকল বর্ণনাকেই সত্য বলিয়া মনে করিবেন। অনেকেই অসৎপন্থী ও অধর্মচারীদের প্রতারণা সম্পর্কে অবগত নহেন। তাঁহারা জানেন না যে, ইহারা সুন্নীদের মতামত, বিশুদ্ধ ঘটনা ও প্রকৃত সংবাদের সহিত তাহাদের কুঅভিপ্রায়জনিত মিথ্যা ধারণা ও ধর্মবিশ্বাসকে মিশাইয়া ফেলে। ইহার ফলে যাঁহারা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বিশেষ কোন জ্ঞান রাখেন না, তাঁহারা অতি সহজেই ইহাদের প্রতারণার জালে ধরা পড়েন। দীন ও দুনিয়া সম্পর্কে তাঁহাদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে এই সকল অপপ্রচার ও মিথ্যার অনুপ্রবেশের ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গণ্য করেন।

এইজন্য ইতিহাস পাঠের একটি মহৎ উপকার এই যে, ইহার ফলে সুপথ ও কুপথ, সত্য ও মিথ্যা, সৎ ও অসৎ, গুজব ও প্রকৃত ঘটনার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সত্য ও ন্যায়ের পথ, যাহাকে সুন্নত ও জমাতের লোকেরা সকল প্রকার অধর্ম হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন, তাহা দৃঢ় হয়।

সুতরাং ইতিহাস রচনার অন্যতম শর্ত হিসাবে ঐতিহাসিককে যে কোন বাদশাহের সদাচার ও সুকীর্তিসমূহের বর্ণনা দান করিতে হইবে ; অবশ্য তাঁহার দোষত্রুটিও যেন লুক্কায়িত না থাকে। শুধু লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন এইসব লিখিত না হয়। যদি উপযুক্ত মনে হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্যে, নতুবা ইঙ্গিতে বুদ্ধিমানের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করা উচিত। অবশ্য সমসাময়িক কাহারও ত্রুটির উল্লেখ যদি ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে উহা না করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যাঁহারা গত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে গিয়া ঐতিহাসিক যেন সত্যকেই প্রাধান্য দেন। যদি কোন সময় কোন বাদশাহ কিংবা উজিরের নিকট হইতে ঐতিহাসিক কোন আঘাত পাইয়া থাকেন অথবা কেহ যদি তাহাকে অযাচিত সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইতিহাস রচনার সময় এই সকল বিষয় মনের মধ্যে জাগরূক রাখা উচিত হইবে না। কারণ ইহাতে কাহারও প্রতি অবিচার এবং কাহারও প্রতি অন্যায় পক্ষ-পাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে। অথচ ঐতিহাসিককে সর্বদাই ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ সত্যকে অনুসরণ করিতে হয়। এই প্রকার সত্যানুসরণ শুধু ইহকালে নহে, পরকালেও তাহার কাজে লাগিবে।

ঐতিহাসিককে অতিরঞ্জনপ্রিয় মিথ্যাবাদীদের স্বভাব সর্বপ্রকারে ত্যাগ করা উচিত। কারণ ইহারা 'মুগা' পাথরকে মরকতমণি এবং সাধারণ পাথর কিংবা স্ফটিকের খণ্ডকে হীরক বলিয়া বর্ণনা করিতে অভ্যস্ত। ইহাদের এই প্রকার সকল অতিরঞ্জনই মিথ্যার নামান্তর মাত্র। যদি কোন ঐতিহাসিক এই প্রকার মিথ্যা লিখিয়া থাকে এবং জনসমাজে তাহার এই মিথ্যা সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মিথ্যা ভাষণ তাহার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ্‌র নিকট বিবেচিত হইবে এবং কিয়ামতের শেষ বিচারে সে অতিশয় কঠিন শাস্তির বেড়াজালে আটকাইয়া পড়িবে।

সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও হিতকরী বিষয়। ইতিহাস রচনা সেই জন্য যে কোন ব্যক্তির মহত্বের পরিচায়ক। ইহার দ্বারা কীর্তিমানদের কীর্তি-কাহিনী অমরত্ব লাভ করে এবং তাহা সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই সকল সুকীর্তির বিবরণ পাঠ করিয়া অন্যান্য সকলে উপকৃত হয়।

এই কারণেই ইতিহাস রচয়িতার দায়িত্ব হইল, বিশিষ্ট লোকদের জীবন ও কীর্তিকে সততার সহিত জনসমক্ষে প্রকাশ করা ; যাহাতে সত্যের জয় বিঘোষিত হয়। যদি আলোচিত ব্যক্তিবর্গ জীবদ্দশায় বিদ্যমান হন, তাহা হইলে ইহার দ্বারা তাঁহাদের বন্ধুত্ব ও প্রীতি লাভ ঘটিবে এবং তাঁহাদের সুখ্যাতিও মানুষের মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে। যদি তাঁহারা বিগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় জীবন লাভ করিবেন এবং সুকীর্তির জন্য সকলের দোয়ার ভাগী হইবেন। অন্যদিকে পাঠকের নিকটও ঐতিহাসিকের কিছু দাবী করিবার আছে। কারণ তাঁহার রচনা ও সততার ফলেই পাঠকবৃন্দ এমন একটি উপকার লাভ করিলেন।

ইমাম সালাবী তাঁহার 'গুররুর সিয়র' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'আব্বাসী খেলাফতের প্রথম দিককার খলিফা, জ্ঞানী, মানী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সকলেই ইতিহাসের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ছিলেন। আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা হারুনুর রশীদ এই বিষয়ে অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাঁহার এই প্রকার শ্রদ্ধার ফলেই কাজী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ শায়বানীকে ইতিহাস রচনাতেও আত্মনিয়োগ করিতে হয়। তাঁহারা ইমাম ওয়াকেদীর নিকট হজরতের জীবনকাহিনী, যুদ্ধবিগ্রহ ও সাহাবীদের নানান দিক সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন।

খলিফা ও বাদশাহদের মধ্যে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত ও সদ্বংশীয় ছিলেন, তাঁহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের জন্যই ইতিহাসের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। ইহার ফলে সেই সকল সমৃদ্ধির যুগে খলিফা, বাদশাহ ও উজির-নাজিরগণ সর্বদাই ইতিহাস পাঠ করিতেন, শুনিতেন এবং ইহার বিচিত্র বিবরণ হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতেন। তাঁহাদের এই প্রকার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ফলেই ইতিহাস জানা ও রচনার ধারা প্রচলিত হয়। ঐতিহাসিকগণ সুখ-শান্তির মধ্যে সসম্মানে বসবাস করিবার অধিকার লাভ করেন। খলিফা, বাদশা ও উজিরদের নিকট হইতে তাঁহারা যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধন-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেন। কিন্তু এই সকল ইতিহাসপ্রিয়, উন্নতমনা ও সম্ভ্রান্ত লোক গত হওয়ার পর ইতিহাসের সেই পূর্ব সম্মান আর অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। পরবর্তী খলিফা ও বাদশাহগণ যৌবনের রঙ্গীন নেশায় মশগুল হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা বিলাসব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে পর্যবসিত হয়। পূর্বের উন্নত দৃষ্টি এখন নীচকার্যে ব্যয়িত হইতে থাকে। যে সকল পূর্বসূরীর সুকীর্তি কিয়ামত অবধি সজীব থাকিবে, তাঁহাদের কথা এই সকল হীনমনা ব্যক্তি

সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন। বাদশাহ ও উজির-নাজিরদের যোগ্যতার মাপ-কাঠি ছিল সুশাসন, তাহাও বর্জিত হইল। বাদশাহরা বাদশাহী লাভ করিতেন বাহুবলে এবং উজিররা উজারতি করিতেন শুধু কৌশলে; সুবুদ্ধি ও সৎচিন্তার সেখানে স্থান ছিল না। ফলে ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে ঐতিহাসিকদের সম্মানও বিলুপ্ত হইয়া গেল। এক সময় ছিল, যখন সুশাসকের অনুরাগের ফলে ইতিহাসের সম্মান ও ইতিহাস রচনার সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল; ইহার পরে অন্য এক সময় উপস্থিত হইল, যখন বিরাগের ফলে ইতিহাস গেল এবং সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক-রাও সাধারণ লোকের পর্যায়ে নামিয়া আসিলেন।

অথচ আরবের বাহিরের বাদশাহদের বেলায় ভিন্নরূপ লক্ষ্য করা যায়। এই-খানেও বাদশাহের ছেলে বাদশাহ, উজিরের ছেলে উজির এবং স্বাধীন হইলেই সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইত; কিন্তু কিউমরচ হইতে খসরু পারভেজ পর্যন্ত সকলের সময়েই ঐতিহাসিকদের মর্যাদা ও বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা ঐতিহাসিক-দিগকে ধর্মীয় নেতাদের সমান মর্যাদাবান বলিয়া মনে করিতেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমাম সালাবী তাঁহার 'তারিখে আরায়েশী' নামক গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন যে, খলিফা, বাদশাহ ও উজিরদের পক্ষে ঐতিহাসিকদের সম্মান দেখাইবার, তাঁহাদের কথা শুনিবার ও জানিবার সময় ও সুযোগ কোথায়। তাঁহাদের চারিপার্শ্বে সর্বদা বয়স্য, চাটুকার, কবি ও রহস্যপ্রিয়দের ভীড় জমিয়া থাকে। তাহারা মিথ্যা, কুকথা ও অতিরঞ্জনে সর্বক্ষণ তাঁহাদের দুই কান ভরিয়া রাখে। যত অদ্ভুত আর আজগুবী কথা বলিয়া এই সকল রহস্যপ্রিয় উজির-বাদশাহদের ধনসম্পদ লুট করিবার ব্যবস্থা করে। তাহাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তনে কবিতা, প্রবন্ধ, এমন কি বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলে। ইহার পরে যখন বাদশাহের বাদশাহী থাকে না, উজিরের উজারতি চলিয়া যায়, তখন অতিরঞ্জক আর মিথ্যাবাদীদের এই মহান রচনা সম্ভার তাহাদের মতই নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। কেহ উহাদের নাম স্মরণ করে না, কেহ পড়িয়া দেখে না — উহারা কেবলমাত্র পুস্তকের দোকানে পড়িয়া পড়িয়া পচিতে থাকে।

অথচ ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়ায় বাদশাহ ও উজিরদের গুণকীর্তন করে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মহৎ ব্যক্তিদের সহিত মিলাইয়া তাঁহাদের গুণের তারতম্য বিচার করে, একের সহিত অন্যের সামঞ্জস্য ও পার্থক্য বর্ণনা করে, সময়ের ব্যাপারে বৎসর-মাস-দিন-ক্ষণের যথার্থতা রক্ষা করে, সমসাময়িকতার সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং সকল বিষয় যথাযথভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে। এই কারণেই তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা কিয়ামত পর্যন্ত ফলবতী

থাকে। উন্নতমনা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট তাঁহাদের রচনা জানিবার ও শুনিবার গুরুত্ব কখনও লোপ পায় না।

এমন কোন সম্পদের কথা মানুষ কল্পনা করিতে পারে, যাহা মৃত্যুর পরও তাহাকে রক্ষা করিবে? যখন তাহার রাজ্যপাট, দাসদাসী, ইয়ারবন্ধু, হাতী-ঘোড়া, ধনসম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন প্রভৃতির কোন চিহ্নই থাকিবে না; অথচ ইতিহাসে তাহার সুখ্যাতি ও যশ বাঁচিয়া থাকিবে। অন্যান্য কীর্তিমান অমর লোকদের সহিত তাহার একত্রে স্থান লাভ ঘটিবে এবং প্রতিদিন তাহার সুখ্যাতি বাদশাহ-উজির হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বশ্রেণীর মানুষের দ্বারা কীর্তিত হইবে। এক দেশ হইতে অন্য দেশে, এক যুগ হইতে অন্য যুগে তাহা প্রসার লাভ করিবে। বাদশাহ ও উজিররা তাহা পড়িবে, শুনিবে ও বলিবে, 'আল্লাহর রহমত হউক; তাহার কীর্তি চিরস্থায়ী হউক।' জ্ঞানী-মানীরা বলিবেন, 'অতি উত্তম, এমনই হওয়া উচিত।' অন্যান্যরা বলিবে, 'আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশতে স্থান দিউন।' সকলেই বলিবে, সে যেভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছে, যেভাবে সরল জীবনযাপন করিয়া প্রজার কল্যাণ কামনা করিয়াছে; তাহাতে তাহার কথা ও কাজ, ন্যায় ও দয়া সকলের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।' চতুর্দিক হইতে তাহার প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হইবে এবং সকলের মনে তাহার সুকীর্তি চির জাগরূক হইয়া থাকিবে। ইহার পর হজরত যেমন বলিয়াছেন, 'মুসলমানরা যাহার নাম ভক্তি সহকারে স্মরণ করে এবং যাহার প্রশংসা করে, তাহার স্থান চিরকালের জন্য বেহেশতে অবধারিত হইয়া আছে।'

তারিখে ফিরুজশাহীর রচয়িতা আমি জিয়া বারানী অত্র গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসের উপকারিতা, সততা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এই ব্যাপারে আমি ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাসগুলির মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছি। ফলে এই সকল কথা অনেকটা দীর্ঘ করিয়া বলিতে হইয়াছে। ইহাতে আমি এই কথাও বুঝাইতে চাহিয়াছি যে, ইতিহাসের এবংবিধ উপকারিতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই আমি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি।

আমার ইচ্ছা ছিল হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার দুই পুত্র হজরত শীশ, যিনি সকল নবী রসুলের পিতা এবং কিউমরচ, যিনি সকল রাজা-বাদশাহের পিতা—তাহাদের কথা লিখিয়া ক্রমশঃ যুগ পরম্পরায় সকল নবী-রসুল ও বাদশাহ-উজিরের জীবন ও কীর্তি বর্ণনা করিব। ইহার পর একদিকে শেষ নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং অন্যদিকে কিউমরচের শেষ বংশধর খসরু পারভেজের কথা বলিব। পরে ইসলামের খলিফা ও বাদশাহদের কথা বলিয়া

বর্তমান ইতিহাসের নামকরণ যে বাদশাহের মহান নামের দ্বারা হইয়াছে, তাঁহার জীবন ও কীর্তি উল্লেখ করিব।

এইরূপ ধারণা মনে মনে পোষণ করিবার পর সদরে জাহান মিনহাজ উদ্দিন জুরজানীর 'তবাকাতে নাসিরী' নামক আশ্চর্য ইতিহাস গ্রন্থটির কথা আমার স্মরণ পথে উদিত হয়। এই গ্রন্থটি তিনি দিল্লীতে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে নবীরসুল ও রাজা-বাদশাহদের বিবরণ তেইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। হজরত আদম ও তঁাহার দুই পুত্র—হজরত শীশ ও কিউমরচ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন যুগের নবীরসুল ও রাজা-বাদশাহদের কাহিনীর বর্ণনাসহ সুলতান শামসউদ্দিন আলতামশের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিনের জীবনের বিবরণ দিয়া শেষ করা হইয়াছে। আমার মনে হইল, আমিও যদি উক্ত পুণ্যাত্মা ঐতিহাসিকের ন্যায় এই সকল বিবরণ দিয়া আমার ইতিহাস আরম্ভ করি, তাহা হইলে তাঁহার ইতিহাস পাঠ করিবার পর আমার ইতিহাস পাঠ করায় পাঠকদের চর্বিত চর্বনই সার হইবে। তদুপরি আমি যদি উক্ত তবাকাতে নাসিরীর বিরোধী কোন বক্তব্য উপস্থিত করি, তাহা হইলে উহা বেয়াদবী বলিয়া গণ্য হইবে। অন্যদিকে উক্ত গ্রন্থ ও আমার গ্রন্থের বিবরণের মধ্যে তারতম্য দেখা দিলে—বিবরণের যথার্থতা সম্পর্কে পাঠকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবে।

সুতরাং এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া শেষ পর্যন্ত স্থির করিলাম যে, 'তবাকাতে নাসিরী' গ্রন্থে মিনহাজ উদ্দিন যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন এবং যে সকল জীবন ও কীর্তির বর্ণনা তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা আমার গ্রন্থে আমি উল্লেখ করিব না। বরং দিল্লীর যে সকল বাদশাহ ও উজিরের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহাদের কথাই আমি লিখিব। অন্যান্য বিষয়ে তবাকাতে নাসিরীর বর্ণনাকেই মানিয়া লইব। কারণ আমি যদি আমার এই ক্ষুদ্র কলেবর ইতিহাস রচনায় সততা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারি, তাহা হইলে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহা হইতেই অনেক কিছু বুঝিয়া লইতে পারিবেন এবং আমার যাহা প্রাপ্য, তাহা দিতে দ্বিধা করিবেন না।

এই ধারণা অনুসারে অনুসন্ধান করিবার পর দেখা গেল, তবাকাতে নাসিরী রচিত হইবার পর পঁচানব্বই বৎসর গত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আটজন বাদশাহ ও অন্য তিন ব্যক্তি তিন চারি মাস করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আমি বর্তমান ইতিহাসে এই আটজন বাদশাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের জীবন কাল হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য তবাকাতে নাসিরীতে তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের

পূর্বকালীন জীবনের বর্ণনা বিদ্যমান। তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে আমি যে আটজন বাদশাহের বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছি, তাঁহারা হইতেছেন :

১। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন—রাজত্বকাল বিশ বৎসর।

২। সুলতান মুইয উদ্দিন কায়কোবাদ—রাজত্বকাল তিন বৎসর।

৩। সুলতান জালালউদ্দিন ফিরুজ খিলজী—রাজত্বকাল সাত বৎসর।

৪। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী—রাজত্বকাল বিশ বৎসর।

৫। সুলতান কুতুব উদ্দিন (সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্র)—রাজত্বকাল চারি বৎসর চারি মাস।

৬। সুলতান গাজী গিয়াস উদ্দিন তোগলক শাহ—রাজত্বকাল চারি বৎসর কয়েক মাস।

৭। সুলতান মুহম্মদ ইবনে তোগলক শাহ—রাজত্বকাল সাতাইশ বৎসর।

৮। সুলতান ফিরুজ শাহ—বর্তমানে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন এবং বেশ কয়েক বৎসর যাবত অতীব যোগ্যতার সহিত সাম্রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী আমি জিয়া বারানী উক্ত আটজন বাদশাহের জীবন ও কীর্তি আমার ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছি এবং গ্রন্থের শেষে বর্ণিত ও বর্তমান বাদশাহের নামানুসারে ইহার নাম রাখিয়াছি 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'।

মহামান্য সুলতান ফিরুজ শাহের (আল্লাহ্ তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন) ছয় বৎসর কালীন রাজত্বে যে সকল ঘটনা ও সুকীর্তি আমি লক্ষ্য করিয়াছি, অতি সংক্ষেপে উহার বিবরণ এই গ্রন্থে তুলিয়া ধরিয়াছি। আশা করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে মহামান্য সুলতান যতদিন দিল্লীর সিংহাসন অলংকৃত করিয়া থাকিবেন, ততদিনের বিবরণ গ্রন্থের শেষ অংশে বর্ণনা করিব। আর যদি ইতিমধ্যেই আমার পরকালের ডাক আসিয়া পেঁছায়, তাহা হইলে যিনি এই রাজ্যের গৌরবময় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষী হইবেন, তাঁহাকেই এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করিতে হইবে।

আমি এই ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া পুণ্যের আশা করিয়াছি অনেক এবং ন্যায় বিচারকদের নিকট আমি উহার প্রত্যাশাও করি। কারণ এই গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হইলেও তাৎপর্যাদির দিক হইতে অতিশয় ব্যাপক ও গভীর। তাঁহারা যদি ইহাতে ইতিহাস খুঁজেন, তাহা হইলে রাজা বাদশাহদের মনোজ্ঞ বিবরণ দেখিতে পাইবেন। রাজ্য শাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের বিষয় অনুসন্ধান করিলে, তাহাও যথেষ্ট পাইবেন। আর রাজ্য ও শাসন-ব্যবস্থার উত্থান-পতনের ধারা

অনুসরণ করিয়া উপদেশ লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলেও অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা বর্তমান গ্রন্থে উহা পরিমাণে বেশী বলিয়াই বোধ হইবে।

এই ইতিহাস গ্রন্থে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা অতীব সত্য ও যথার্থ। যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা একান্তই গ্রহণযোগ্য এবং ইহার বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও অপরের অনুসরণযোগ্য। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রশংসায় আমি বলিতে পারি যে,

"যদি বলি, এই জগতে আমার ইতিহাসের ন্যায় অন্য কোন গ্রন্থ নাই;
তাহা হইলে, যেহেতু এই বিদ্যায় পারদর্শী কেহ নাই, সুতরাং আমার
এই কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

৭৫৮ হিজরীতে আমি এই গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছি। প্রার্থনা করি, অ'ল্লাহ্ যেন এই যুগের জ্ঞানীগুণীদের হৃদয় তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর দিকে আকৃষ্ট করেন এবং গ্রন্থ রচয়িতার জন্য তাঁহাদের নেক দোয়াকে সুলভ করিয়া দেন।

বর্তমান মহামান্য সুলতান আরও দীর্ঘকাল রাজ্যের সিংহাসন অলংকৃত করিয়া থাকুন এবং রাজ্যের সুশাসন ও সুখশান্তি ভোগ করুন।

"আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওস্সালাতু
ওস্সালামু আলা রসুলিহি মুহম্মদিও ওআলিহি—
আজমাঈন ও সাল্লাম তসলীমান কাসীরান কাসীরা
বেরহমতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।"

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন

কাজী সদরে জাহান ফখর উদ্দিন—নাকিলা ; খান শহীদ—সুলতান বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; বগরা খান—সুলতান বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র ; আদল খান শামসী ; কায় খসরু—খান শহীদের পুত্র ; কায়কোবাদ—বগরা খানের পুত্র ; তমর খান শামসী ; ইমাদুল মুলক—রাওতে আরয ; খাজা হোসাইন বসরী—উজির ; মালীক আলাউদ্দিন কশলী খান—বারবেক ; মালীক নিযাম উদ্দিন বুযগালা—উকিলে দর ; মালীক এক্তিয়ার উদ্দিন বক্তিরস—সুলতানী বারবেক ; আমীন খান আপতগীন মুয়ে দরাজ ; মালীক আমীর আলী—সের জানদার ; হজরত খান—আখোর বেক—মায়সরা ; মালীক বুতু—সের জানদার ; মালীক মুহম্মদ সরদার ; মালীক সুজ—সের জানদার ; মালীক আব্বাজী—আখোর বেক—মায়মনা ; মালীক তুরগী—সের সেলাহদার মায়সরা ; মালীক এক্তিয়ার উদ্দিন কিতমিরানী ; মালীক তাশমন্দ —আখোর বেক মায়সরা ; উমদাতুল মুলক খাজা—আলা দবীর ; মালীক কেওয়াম উদ্দিন—এলাকা দবীর ; মালীক তুরগী—সের সেলাহদার মায়মনা ; মালীক তুগদর—তুগরিল কুশ ; মালীক শিহাব উদ্দিন খিলজী ; মালীক জামাল উদ্দিন খিলজী ; আমীর জামাল—নায়েবে দাদবেক ; মালীক নাসির উদ্দিন কুজী—দাদবেক ; মালীক তাজউদ্দিন —কুৎলগ খানের পুত্র ; মালীক নাসির উদ্দিন দানা—শাহনকে পীল মায়মনা ; মালীক আআয উদ্দিন—শাহনকে পীল মায়সরা ; খাজা শরফ উদ্দিন রশিদী—মুস্তাওয়াফী ; খাজা খাতির উদ্দিন—নায়েবে উজির ; মালীক আলাউদ্দিন—শানক ; মালীক ফখর উদ্দিন—নায়েবে উজির আয়মন সরখা ; মালীক নাসির উদ্দিন বরকী ; মালীক এক্তিয়ার উদ্দিন ; মালীক জামাল উদ্দিন আয়াতগীন—বারীদে মুমালেক।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওল আকিবাতুলিল
মুত্তাকীন ; ওস্সালাতু আলা রসুলিহি মুহম্মদিও ওআলিহি
আজমাঈন ও সাল্লাম তসলীমান কাসীরান কাসীরা।

সকল মুসলমানের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়া এই অক্ষম আমি জিয়া বারানী সুলতান গিয়াস উদ্দিনের জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে যে বিবরণ বর্তমান ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহা আমার পিতামহদের নিকট শুনিয়াছি। তদুপরি সুলতানের সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হইতেও তাঁহার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন সুলতান শামসউদ্দিনের মুক্তিপ্রাপ্ত চল্লিশ জন তুর্কী গোলামের অন্যতম ছিলেন। তিনি ৬৬২ হিজরীতে* সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পূর্বসূরী বাদশাহদের রাজ্য শাসনপ্রণালী এবং তাঁহাদের দরবারী জাঁকজমকের অনুসারী হন। রাজ্যের খ্যাতনামা ও গুণী ব্যক্তিদিগকে তাঁহার

---

* শুদ্ধ ৬৬৪ হিজরী।

হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহায়ক করিয়া তোলেন। গুরুত্বপূর্ণ সকল দায়িত্ব নিজ পুত্র এবং অন্যান্য মালীক-সরদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিনের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে এবং সুলতান শামস উদ্দিনের তিরোধানের পর তাঁহার পুত্রগণ ত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। সুলতান শামস উদ্দিন (আলতামশ) মিশর, ইরাক, খোরাসান ও খোয়ারজমের বাদশাহদের সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্ররা যৌবনকালের নেশায় ও আলস্যে গা ভাসাইয়া দিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিনের অতিরিক্ত সহ্যগুণ ও নিঃস্বতার সুযোগে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। রাজধানীর ধনভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল। সুলতান শামস উদ্দিনের গোলামরা খান উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়া লইল এবং তন্মধ্যে অনেকেই নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে প্রদেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিল।

এইভাবে সুলতান শামস উদ্দিনের মৃত্যুর পর দশ বৎসর সময়ের মধ্যে তাঁহার অল্পবয়স্ক ও অক্ষম চারি পুত্র সিংহাসনে বসিবার ফলে চল্লিশ গোলামের সকলেই গুরুত্বপূর্ণ পদাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তাহারা সুলতান শামস উদ্দিনের দরবারের গণ্যমান্য সকল লোককে দূরে সরাইয়া দেয়। তাহাদের তত্ত্বাবধানে চারিপুত্রের দশ বৎসর কালীন রাজত্ব শেষ হওয়ার পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিনকে সিংহাসনে বসায়। এই সুলতানের নাম অনুসারেই 'তবাকাতে নাসিরী' ইতিহাস গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে।

সুলতান নাসির উদ্দিন ধৈর্যশীল, সৎ ও ধর্মভীরু ছিলেন। কোরআনের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া তিনি তাঁহার অধিকাংশ ব্যক্তিগত ব্যয়ের সংকুলান করিতেন। তাঁহার বিশ বৎসরকালীন রাজত্বের শাসন পরিচালনার ভার ছিল সুলতান বলবনের উপর। তখন সুলতান বলবনকে 'উলুগ খান' বলা হইত। সুলতান নাসির উদ্দিনকে সম্মুখে রাখিয়া বলবনই সমস্ত রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। সেই সময়েও বলবন রাজছত্র, রাজগৃহ ও রাজহস্তীর অধিকারী ছিলেন। এই অবস্থা হইতেই আমি সুলতান বলবনের জীবন ও কীর্তির বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছি।

ইতিপূর্বে সুলতান শামস উদ্দিনের রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি। এইস্থলে সেই বিশৃঙ্খলার কিছুটা বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। সুলতান শামস উদ্দিনের সময়েই চেঙ্গিস খানীদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে ভীত হইয়া অনেক রাজরাজড়া ও উজিরনাজির সুলতানী দরবার ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যান। বস্তুতঃ তাঁহারা শুধু এই দরবারের নহে, তৎকালীন দেশ ও সমাজেরও বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। তাঁহার দরবারে এমন অনেক

উজির ছিলেন, যাঁহাদের গুণ গরিমায় সুলতানের দরবার সুলতান মাহমুদ ও সঞ্জরের দরবারের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।

অন্যদিকে সুলতান শামস উদ্দিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই চল্লিশ গোলামের অনেকেই তাহাদের চক্রান্তে সার্থক হইয়াছিল এবং সুলতানের পুত্ররা নবুয়তের পরেই যে বাদশাহীর স্থান, উহার দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছিল। ইহার ফলে তাহাদের শাসনকালে গোলামদের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে সকল বিশিষ্ট নাগরিক এবং দরবারের বংশানুক্রমিক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা নানা অজুহাতে ধ্বংসের মুখে পতিত হন। গোলামেরাই সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়ায় এবং খান উপাধি গ্রহণ করে। তাহাদের প্রত্যেকের জন্যই গৃহ, দরবার, জাঁকজমক ও চালচলনের ধারা সৃষ্টি হয়। তাহাদের এই প্রকার আচার-আচরণের মধ্যে তৎকালীন জনসমাজ, জমশেদ হইতে বর্ণিত সেই কথারই প্রত্যক্ষ রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, জঙ্গল হইতে যদি সিংহ চলিয়া না যায়, তাহা হইলে হরিণ গোষ্ঠী নির্ভয়ে চলাফেরা করিতে পারে না এবং বাজপাখী যদি তাহার বাসায় স্থির হইয়া না বসে, তাহা হইলে হাঁস ইত্যাদি পাখীদের উড়িয়া বেড়ানো সম্ভব হয় না। গুণী ব্যক্তিগণ ও নেতৃবৃন্দ যতক্ষণ না তাঁহাদের গুণপনা ও নেতৃত্ব হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ান, ততক্ষণ বাচাল ও গোলামেরা উপরে স্থান পায় না এবং সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে না।

সুলতান শামস উদ্দিনের গোলামদের সকলেই 'খাজায়ে তাশ' ছিল। তাহারা এক সঙ্গে প্রতিপত্তি লাভ করিবার ফলে কেহ কাহারও কথা শুনিত না এবং কেহ কাহারও পরোয়া করিত না। সম্মান, প্রতিপত্তি ও জাঁকজমকের ব্যাপারেও তাহারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত এবং একে অন্যকে বলিত, তুমি কে হে ? তোমার অপেক্ষা আমি কম কিসে ? বস্তুত: এই প্রকার আচার আচরণ ও চালচলনের দ্বারা তাহারা সুলতানের মহান দরবারের সকল মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছিল।

এমনি অবস্থায় রাজ্য শাসনে অভিজ্ঞ ও গুণী সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন মালীক হইতে খান এবং খান হইতে বাদশাহের পদে অভিষিক্ত হইলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি তাঁহার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে দরবারের সকল সৌন্দর্য ও জাঁকজমক ফিরাইয়া আনিলেন। রাজ্যের শাসন ও শৃঙ্খলায় পুনরায় নূতন জীবন ফিরিয়া আসিল। অন্যান্য সর্বপ্রকার অব্যবস্থিত কাজকর্মে শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব দেখা দিল। বাদশাহের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। সুচিন্তিত ও যথার্থ মতামত ব্যক্ত করিয়া তিনি রাজ্যের সকল লোকের আনুগত্যকে

তাঁহার শাসনের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইলেন এবং তাহাদের অন্তরে সুলতানের প্রতি ভয় ও সম্ভ্রম জাগ্রত হইল। ন্যায় বিচার ও প্রচুর দয়া দাক্ষিণ্যের দ্বারা সকল হিন্দু প্রজাকে দরবারের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। যে সকল লোক সুলতান শামস উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের ত্রিশ বৎসর কালীন কুশাসন ও গোলামদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া রাজানুগত্যের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারাও সুলতান বলবনের সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুগত ও বাধ্য হইয়া পড়িল। তাহাদের সকল প্রকার বিদ্রোহী মনোভাব ও স্বার্থপরতা বিদূরিত হইল।

সুলতান বলবন তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার ফলে শাহী তখতে আরোহণের পরই রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ শৃঙ্খলাবিধানকে প্রাধান্য দিলেন। নবীন ও প্রবীণ সকল প্রকার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যকে তাহাদের অভিজ্ঞতা ও মর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য স্থানে নিয়োগ করিলেন। তাহাদের মধ্যে অন্যূন কয়েক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, যাহাদের বংশানুক্রমিক অশ্বারোহণের মর্যাদা বিদ্যমান এবং যাহারা কখনও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে পূর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা ও বেতনদানের ব্যবস্থা করিলেন।

সুলতান বলবন সেই সকল লোককে তাঁহার রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহায়ক করিয়া তুলিলেন, যাহাদের মর্যাদা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না। তাঁহার দরবারেও সেই শ্রেণীর লোকেরাই ঠাঁই পাইলেন, যাহারা চরিত্রে, সম্ভ্রমে, বীরত্বে ও উদারতায় তৎকালে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কোন নীচমনা, গুণহীন ও অসম্ভ্রান্তকে তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেন নাই। নিজের আত্মীয় স্বজন ও দাসদাসীদের মধ্য হইতেও যাহাদিগকে উচ্চ মর্যাদায় তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহারাও সুশাসন ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য তৎকালে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিলেন। হেয় প্রকৃতির বাচালদিগকে তিনি তাঁহার সমুদয় রাজত্ব কালেই কোন প্রকার পদমর্যাদায় নিযুক্ত করেন নাই। এমন কি তাঁহার দরবারের আশেপাশেও তাহাদিগকে ঘেঁষিতে দেন নাই। যতক্ষণ না কোন লোকের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতেন, ততক্ষণ তাহাকে চাকুরীতে নিয়োগ করিতেন না কিংবা কোন দায়িত্বের ভার অর্পণ করিতেন না। মিথ্যাবাদী ও নীচ প্রবৃত্তির লোকের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল।

সিংহাসনে আরোহণের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরেই সুলতান বলবন দরবার, শাহীমহল ও শাহীসোয়ারীর জাঁকজমক বৃদ্ধি করিয়া নূতন সম্মানের প্রতিষ্ঠা করেন। ষাইট সত্তর জন করিয়া হাজার 'চীতল' মাহিনার এমন সব শীস্তানী পাহলোয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যাহারা খোলা তলোয়ার লইয়া শাহী সোয়ারীর

সঙ্গে থাকিত। শাহী সোয়ারীর গমন কালে উহার সৌষ্ঠবের চাকচিক্য, তাহাদের চেহারার জৌলুশ, তলোয়ারের দীপ্তি এবং ইহাদের সূর্যের কিরণ পড়িয়া দর্শকদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিত। তাহারা শাহী সোয়ারীর প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিত।

উপস্থিত দর্শকদের সম্মুখে 'দরবার-ই-আম'-এ সেলাহদার, জানদার, সহমুল হশমঁা, তাহাদের নায়েব, চাঁআওশাঁ, নকিব ও পাহালোয়ানরা এমনভাবে সুসজ্জিত হইয়া থাকিত; হাতী ঘোড়া ডাইনে বামে এমনভাবে স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইত এবং সুলতান সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা, কর্পূরের ন্যায় শুভ্র দাড়ি লইয়া বিশেষ মর্যাদার সহিত সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন যে, ইহার জাঁক-জমক মানুষের মনে কম্পনের সৃষ্টি করিত। সেই সময়ে বিশিষ্ট পরিষদবৃন্দ সিংহাসনের পিছনে এবং তাহাদের পরে সহনকে পীল, সের জানদার, সের সেলাহদার, আখোরবেক, আমীরের গেলমান ডাহিন ও বাম, তাহাদের নায়েব-গণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান থাকিত। সহমুল হশমাঁ ও চা আওশাঁদের হাঁকডাক এবং নকিবদের চীৎকার এত জোরে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িত যে, কোটি লোকের মধ্যেও তাহা শোনা যাইত ও সকলেই মনে মনে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। এই পরিবেশে যদি দূর দেশের রাজা, রাজপুত্র ও রাজদূতগণ উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারাও নতশিরে ভূমিচুম্বন করিতেন এবং দরবারের জাঁকজমক দর্শনে হতবাক্ হইয়া পড়িতেন।

বিসমিল্লাহ্‌র আওয়াজ শোনা মাত্রই শত সহস্র মুসলমান ও হিন্দু শাহী সোয়ারী ও দরবারের সৌষ্ঠব ও জাঁকজমক দেখিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিত এবং তদ্দর্শনে হতভম্ভ হইয়া পড়িত। সুলতানী দরবারের এহেন গাম্ভীর্য ও জাঁকজমকের কথা শুনিয়া দূরদূরান্তের বিদ্রোহীরা স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইতিপূর্বে সুলতান বলবনের প্রভু সুলতান শামস উদ্দীনও পরিষদ, ধনভাণ্ডার, হাতীঘোড়া ও জাঁকজমকের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সত্য বলিতে কি বলবনী দরবারের গাম্ভীর্য ও বলবনী সোয়ারীর জাঁকজমক দিল্লীর অন্য কোন সুলতানের ছিল না। তাঁহার দরবার-ই-আম-এ এমনই এক ভীতির সঞ্চার হইত যে, তাহা বহুদিন পর্যন্ত দর্শকদের মনে জাগরুক থাকিত।

সুলতান বলবন অনেক সময়ই বলিয়াছেন যে, তিনি মালীক আআয উদ্দিন সালারী, মালীক কুতুব উদ্দীন হাসান ঘোরী এবং তাঁহার প্রভু সুলতান শামস উদ্দিনের পূর্বেকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহারা সুলতানের দরবারে প্রায়শঃ এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন ও বলিতেন, 'যে বাদশাহ নিজের গৌরব, দরবারের জাকজমক উঠাবসা ও চলাফেরার বিশেষ

মর্যাদা জগৎবরণ্যে শাসকদের প্রথা অনুসারে রক্ষা করেন না ; যাহার সর্ববিধ অবস্থা ব্যবস্থা, কথাবার্তা ও আদান-প্রদানে বাদশাহীসুলভ মর্যাদাবোধ পরিলক্ষিত হয় না, তাঁহার ভয় যেমন শত্রুদের মনে প্রবেশ করে না, তেমনই তাঁহার শাসন ও তাঁহার প্রতিনিধিদের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধার ভাব প্রজাদের মনে উদিত হয় না। অন্যদিকে যে সকল বাদশাহ শুধু বাদশাহী মর্যাদা, সোয়ারী ও দরবারের গাম্ভীর্য ও জাঁকজমকের ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু সেই অনুপাতে সুশাসন ও দয়া দাক্ষিণ্যের দ্বারা প্রজাদের মনোরঞ্জন করেন না ; তাঁহাদের প্রতিও জনসাধারণ এবং দূর ও নিকটের জন সমাজের কোন প্রকার সম্ভ্রম ও ভীতি দেখা যায় না। ফলে তাহাদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধানের বিষয় যথাযোগ্যভাবে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে। অন্যদিকে যে বাদশাহ শুধু নিজ সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন ও রাজ্য শাসনের বিশেষ মর্যাদার কথা ভুলিয়া যান এবং নিকট ও দূরের সকলকে শুধু তাঁহার ভীতির দ্বারা অনুগত রাখিতে সচেষ্ট হন, তাঁহার রাজকীয় কার্যাবলীতে অচিরেই ক্রটি দেখা দেয় ও প্রজারা বেপরোয়া হইয়া উঠে। পরিণামে প্রজাদের এই প্রকার সুপ্ত বেপরোয়া মনোভাব হইতেই রাজ্যে দূর্বলতার সূত্রপাত হয়।

সুলতান বলবন, সুলতান সঞ্জর ও সুলতান মুহম্মদ খোয়ারজম শাহ— যাহাকে দ্বিতীয় সেকান্দর বলা হইত, তাঁহাদের ন্যায় জাঁকজমকের সহিত উৎসবাদির ব্যবস্থা করিতেন। উপরোক্ত সুলতানগণ সুলতান শামস উদ্দিনের সমপর্যায়ের লোক ছিলেন। সুলতান বলবন সুলতান শামস উদ্দিনের নিকটেই তাঁহাদের কথা শুনিতেন এবং স্মরণ রাখিতেন। সেই অনুসারে তিনি তাঁহার উৎসবগুলিকে সুচিত্রিত বস্ত্রাদি, রঙ্গীন পোষাক পরিচ্ছদ, সোনারূপার বাসনপত্র, রেশমী পর্দা, নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য পান সুপারীর দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি নিজে উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সম্মুখে খান, মালীক, উজির, আমীর প্রমুখ ব্যক্তিদের খেদমতের কথা উল্লেখ করা হইত। খেদমতের মান অনুসারে সুলতানের দরবারে প্রত্যেকের জন্যই বিশেষ মর্যাদা নির্দিষ্ট ছিল। ইহাকে 'ফসলে মুশাব্বা' বলা হইত। এই মর্যাদার অধিকারী সকলেই তাঁহাদের সময়ের বিশিষ্ট লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

উৎসবে গান হইত। কবিরা প্রশংসামূলক গাথা পাঠ করিতেন। এইরূপ উৎসবের কথা মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত বলাবলি করিত এবং স্মরণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইত।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি আমার নানা, যিনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সুলতান বলবনের দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁহার নিকট

শুনিয়াছি—তিনি অনেক সময়েই তাঁহার মজলিসে আলোচনা করিয়াছেন যে, সময় যেন সুলতান বলবনের গায়ে বাদশাহী জামা পরাইয়াই তাঁহাকে জন্ম দিয়াছিল। তিনি আচার-ব্যবহার ও ঘরে বাহিরে যেরূপ জাঁকজমক ও সৌষ্ঠবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তেমনই রাজ্যের সুশাসন ও বিশেষ মর্যাদার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতেন। তৎকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের সকলেই বলিতেন, বাদশাহ এই কাজটি যথোচিত করিয়াছেন; অনুরূপভাবে অন্য কেহ ইহা করিতে পারেন নাই। সুলতান বলবনের জাঁকজমক ও সদাচার সম্পর্কীয় সকল কথা লিখিতে গেলে একটি পুস্তকেও কুলাইবে না।

মোটকথা এই যে, সুলতান বলবন তাঁহার বিশ বৎসরকালীন রাজত্বে বাদশাহীর জাঁকজমক ও নিয়ম শৃঙ্খলাকে এমন সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেন, যাহার বাহিরে অতিরিক্ত অন্য কোন কিছু কল্পনা করা যায় না। বলা বাহুল্য, তিনি শাহী নিয়মের প্রতি এত নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত দাসদাসী তথা ফরাশ ও চিলুমচী বরদার, হারেমের খোজা এবং অন্য সকল খেদমতগার, যাহারা সবদা তাঁহার খেদমতে উপস্থিত থাকিত, তাহারাও তাঁহাকে টুপি ও মোজা ছাড়া কখনও খালি গায়ে দেখিতে পায় নাই। তাঁহার খানসাহেবী ও বাদশাহী জীবনের চল্লিশ বৎসরকালের মধ্যে তিনি নীচমনা রহস্যপ্রিয়, বাজারী ও বাজে লোকের সঙ্গে কোন প্রকার বাক্যালাপ করেন নাই। আপন পর নির্বিশেষে সকলের নিকট তাঁহার এমন কোন কথা বা আচরণ প্রকাশ পায় নাই, যাহা শাহী মর্যাদার খেলাফ বলিয়া মনে হইতে পারে। শাহী জীবনে তিনি কাহারও সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন নাই এবং অন্যরাও তাঁহার সহিত অনুরূপ আচরণে লিপ্ত হইতে সাহস করিত না। তিনি দরবারে কখনও উচ্চ হাসি করিতেন না এবং অপর সকলেই তাঁহার সম্মুখে অনুরূপ উচ্চ হাস্য হইতে সর্বদা বিরত থাকিত।

সুলতান বলবনের সময়ে বিশেষ খ্যাতিমান জনৈক রইসের নাম ছিল ফখর বাউনী। সে বাদশাহের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কোন সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার ফলে সে খেদমতের উপযোগী নানা ধরনের উপঢৌকনসহ সুলতানের বয়স্যদের নিকট উপস্থিত হয়। তাঁহারা এই ব্যক্তির বহুদিনের আশা এবং তাহার নানা প্রকার খেদমতের অজুহাতে তাহাকে বাদশাহের দরবারে হাজির হইবার অনুমতি দানের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু সুলতান তাঁহাদের এই আবেদনও মঞ্জুর করেন নাই এবং কোনক্রমেই এই রইস ব্যক্তিটির সহিত আলাপ করিতে স্বীকৃত হন নাই। বরং তিনি ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, বাদশাহীর অর্থ হইতেছে জাঁকজমক, সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি। বাদশাহ যদি ইহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যত্রতত্র গমন

করেন এবং যথাযোগ্য মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবান না হন, তাহা হইলে প্রজা হইতে রাজার পার্থক্য সংরক্ষিত হইবে না। রইস মূলত বাজারী লোকজনের সর্দার ; বাদশাহ কেমন করিয়া তাহার সহিত কথা বলিতে কিংবা তাহাকে বাদশাহের সম্মুখে জবান খুলিতে আদেশ দিতে পারেন। বাদশাহ যদি নীচমনা, হীনচেতা, রসিক ও বাজে লোকদের সহিত আড্ডা জমান এবং স্বীয় দরবারের প্রয়োজনীয় লোক ব্যতীত বাহিরের লোককে সেখানে স্থান দেন, তাহা হইলে বাদশাহীর গৌরব ও শাসনের ভয়কে নিজের হাতে ধ্বংস করিবেন। ইহাতে প্রজাদের আস্পর্ধা বাড়িয়া যাইবে এবং বাদশাহী দাপটের কোন মর্যাদা থাকিবে না। বাদশাহ যদি প্রজাদের চোখে সামান্য লোকের ন্যায় দৃষ্ট হন, তাহা হইলে রাজ্য শাসনে বিড়ম্বনা দেখা দিবে এবং বাদশাহ যত উন্নত ধরনের কাজেই হাত দেন না কেন, যে কোন ব্যক্তি উহাতে লোভকে প্রশ্রয় দিয়া ক্ষতি সাধন করিবে।

মোটকথা বাদশাহীর কাজ বাদশাহের সম্ভ্রম ও সম্মানের সহিত সংযুক্ত। এই জন্যই শাহী দাপটের দ্বারা বাদশাহীর বীজ প্রজাদের মনে অংকুরিত হয় এবং শাসনের দ্বারা তাহা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রজাদের সম্মুখে এই দাপট আর জাঁকজমক যদি নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাহা হইলে বাদশাহীই অবশিষ্ট থাকে না এবং ত্রাসের সঞ্চার না করিতে পারিলে শাসন হইতেও হাত ধুইয়া ফেলিতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাদশাহীর কাজ হইল আল্লাহতালার প্রতিনিধিত্ব করা এবং এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ কখনও অসম্মানের মধ্যে ও অবিমৃষ্যকারিতার দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। যদি কোন বাদশাহের পুরুষানুক্রমে বাদশাহী করিবার বংশমর্যাদা থাকে এবং কৌলীন্য ও শিক্ষা উহার যোগ্য হয়, তাহা হইলে প্রজাদের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা স্বতোস্ফূর্তভাবেই জাগরিত হয়। তিনি কঠোর শাসন ও ভীতি প্রদর্শন করুন বা না করুন, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইতে দেরী হয় না। কিন্তু যদি কোন বাদশাহের পিতা-পিতামহ বাদশাহ না হন, বাদশাহের উপযুক্ত গুণাবলীও তাঁহার মধ্যে না থাকে এবং শাহী দাপট ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা আপন ও পর, বিশেষ ও নির্বিশেষ, ঘর ও বাহির, দূর ও নিকট—সর্বত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে প্রজাদের অন্তরে তাঁহার কোন স্থান নাই। সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিহীন এই লোক বাদশাহই নহে ; তিনি মীর হাজারী, মীর তামান্না বা বিলাতী শাসকের সমকক্ষ মাত্র। এমন বাদশাহের সময়েই লোকে অধর্মাচরণ করে, চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়, হিন্দুরা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং মুসলমানরা হাজার ধরনের পাপ ও অকাজ-কুকাজে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

এই শ্রেণীর বাদশাহ, যাহার না আছে বংশানুক্রমিক শাহী মর্যাদা, না আছে শাহী দাপটের ক্ষমতা, তাহার দ্বারা ধর্মের কোন খেদমত সম্ভব হয় না। এই সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিহীন বাদশাহ যতদিন শাহী তখতে থাকিবে, ততদিন ধর্মের ক্ষতি, অধর্মের প্রসার এবং অন্যান্য মুসলমানী কাজে এমন সব অন্যায় অবিচার ঘটিতে থাকিবে, যাহা বিধর্মীদের দেশেও সুলভ নহে। এইরূপ বাদশাহ থাকা অপেক্ষা না থাকাই মঙ্গল।

রাজ্য শাসনের মূলধন তুল্য এই সকল উপকারী কথা আলোচনা করিবার পর সুলতান বলবন তদীয় বারবেক মালীক আলাউদ্দিন কশলী খানকে বলিলেন, 'আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা আমার প্রভু সুলতান শামস উদ্দিনের দরবারের জ্ঞানীগুণীদের মুখে শুনিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা নহে যে, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কোন রইসের আবেদন লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। কারণ আমি বাদশাহীর নিয়ম অনুসারেই এই প্রকার আবেদন মঞ্জুর করিতে সক্ষম নহি।'

বর্তমান গ্রন্থকার, আমি জনৈক সম্ভ্রান্ত খাজা তাজউদ্দিন মাকরানী, যিনি সুলতান বলবনের দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁহার নিকট শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, সুলতান বলবন সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি আমরোহা অঞ্চলটি মালীক আমীর আলী সের জানদারকে অর্পণ করেন। তাঁহার দরবারের কর্মচারীদিগকে নির্দেশ দেন, তাহারা যেন সৎ ও সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তিকে উক্ত আমরোহা অঞ্চলের মুতসরিফ নিয়োগের জন্য শাহী দরবারে হাজির করে। এই সময় মালীক আলাউদ্দিন কশলী খান আমীর হাজেব এবং মালীক নিজামউদ্দিন বুখগালাহ উকিলে দর ছিলেন। তাঁহারা কামাল মহীয়ার নামে এক ব্যক্তি পছন্দ করিয়া আমরোহা অঞ্চলের খাজা হিসাবে দরবারে উপস্থিত করেন। কামাল মহীয়ার সুলতানের দরবারে ভূমিচুম্বন করিবার সময় সুলতান দরবারের কর্মীদিগকে বলিলেন, 'তোমরা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, মহীয়ার শব্দটি কী এবং ইহার দ্বারা কী অর্থ বুঝায়? সে উত্তরে বলিল, মহীয়ার আমার পিতার নাম এবং তিনি হিন্দুর গোলাম ছিলেন। সুলতান এই কথা শোনা মাত্রই দরবার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার খাস দরবার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুলতানের হাবভাব দেখিয়া দরবারীগণ বুঝিতে পারিলেন যে, সুলতান ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। ইহার পর না জানি কী করেন'—এই কথা ভাবিয়া তাঁহাদের হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে আদল খান শামসী আজমী, তমর খান, মালীকুল উমারা, ফখরুদ্দিন কতোয়াল এবং ইমাদুল মুলক রাওতে আরজ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের খাস দরবারে ডাক পড়িল। তাঁহাদের পর সুলতান, মালীক আলাউদ্দিন কশলী খান,

মালীক নিজাম উদ্দিনবুঘগালাহ্, নায়েব আমীর হাজের, নায়েব উকিলে দর এবং খান হাজেব এবং ইসামী প্রমুখ পাঁচজনকে খাস দরবারে ডাকিয়া নিলেন এবং বসিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তাহাদের ও পূর্ববর্তী চারিজনের সম্মুখে বলিলেন, 'আমি আজ আমার এই ভাতিজা হাজেব এবং এই উকিলে দর নিজাম উদ্দিন বুঘগালাহ্র নিকট হইতে এমন এক বিষয় সহ্য করিয়াছি, যাহা আমার পিতার নিকট হইতে আসিলেও সহ্য করিতাম না। তাহারা এক দাসী পুত্র, যাহার না আছে কোন বংশ গৌরব এবং না আছে কোন গুণ, তাহাকে পছন্দ করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া বলিয়াছে, আমরোহার খাজা পদ তাহাকে দান করুন, সে খুবই বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ কর্মী।'

উপরোক্ত আলোচনার পর সুলতান বলবন আদল খান ও তমর খানকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়েই আমার সম্ভ্রান্ত বন্ধু ও খাজায়েতাশ। তোমরা ভালভাবেই শুনিয়াছ ও বিচার করিয়া দেখিয়াছ যে, আমি আফ্রিসিয়াবের বংশধর। আমার বাপদাদাদের বংশ ধারা বাদশাহ আফ্রিসিয়াব পর্যন্ত পৌঁছায়। আমি জানি, আল্লাহতালা আমার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন, যদ্দরুন আমি কোন নীচমনা, হীনচেতা ও কমিন কম জাতকে আমার রাজ্যের কোন কাজ বা পদ দান করিতে পারি না। এই শ্রেণীর লোকের চেহারা দেখা মাত্রই আমার পায়ের রক্ত মাথায় উঠিতে থাকে এবং এমন একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, যাহা তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে পারিব না। আল্লাহ্তালা আমাকে যে নেয়ামত দান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি কি কোন নীচ ও হীন জাতির লোককে শরীক করিতে পারি। কিংবা কোন অঞ্চলের কর্তৃত্ব ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিতে পারি!

আজ আমি এই কর্মচারীর নিকট হইতে এমন একটি বিষয় সহ্য করিলাম; কিন্তু তোমাদের চারিজনকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, ভবিষ্যতে যদি তাহারা অন্য কোন নীচ ও হেয় লোককে কোন প্রকার কাজ, পদ বা দায়িত্ব প্রদান করিবার আবেদন লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে এমন উচিত শিক্ষা দিব, যাহা সমস্ত জগতের জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

অতঃপর সুলতান দরবারীদিগকে বিদায় লইতে বলিলেন এবং তাঁহারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিলেন। সুলতান বলবন যতদিন জীবিত ছিলেন, কোন দরবারী কর্মী বা বয়স্যের পক্ষেই নীচ ও হেয় লোকদের জন্য তাঁহার সম্মুখে কোন প্রকার কাজ বা পদ প্রদানের আবেদন জানাইবার সাহস কাহারও হয় নাই।

অন্য এক মজলিসে সুলতান বলবন, আদল খান ও তমর খানকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের কি মনে পড়ে না, সুলতান শহীদ শামস উদ্দিন আমাদের প্রভু থাকা কালে কনৌজের শাসনভার তদীয় পুত্র নাসির উদ্দিনকে প্রদান করেন এবং শাহজাদার প্রতিনিধিরূপে উজির বাহরুযের পুত্র খাজা আজিজ নিযুক্ত হন। নিজামুল মুলক জুনায়দী কনৌজের খাজা পদে টাঁকশালের কর্মচারী জামাল মারযুককে নিযুক্ত করিয়া শাহী দরবারে উপস্থিত করেন। নায়েব ও খাজাকে শাহী পোশাক দেওয়ার পর তাঁহাদিগকে কদমবুসি করিবার সময় খাজা আজিজ সুলতানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিম্নের পয়ারটি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করেন,—

"নীচলোকের হাতে কোন দায়িত্বভার দিও না ; কারণ সে যদি সুযোগ পায় তবে কাবার কাল পাথরটিকে কুলুখ বানাইয়া ছাড়িবে।"

এবং জামাল মারযুকের প্রতি বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুলতানও বুঝিতে পারেন যে খাজা আজিজ এই পয়ারটি জামাল মারযুকের নীচতার প্রতি ইঙ্গিত করিতেই পাঠ করিয়াছেন। তখনই তিনি উজির নিজামুল মুলক জুনায়দীকে ডাকিয়া পাঠান। জামাল মারযুকের বংশ পরিচয় লইয়া জানা যায় যে, সে নীচ বংশের লোক। উজির তাহার ন্যায় নীচ বংশীয়কে নিযুক্ত করিবার কৈফিয়ত স্বরূপ বলেন যে, সে সুপুরুষ ও লেখাপড়ার কাজে খুবই অভিজ্ঞ। সুলতান ইহাতে উজিরের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে, বুদ্ধির দোহাই দিয়া তুমি নীচ লোকদিগকে শাহী কাজে নিযুক্ত করিয়া দরবারের অসম্মান করিয়াছ। এই দিন সুলতান শামস উদ্দিন এত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত দিন তিনি অন্য কোন কাজে হাত দিতে সক্ষম হন নাই।

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার রাজ্যে বিভিন্ন পদে কতজন নীচ বংশীয় লোক কার্যরত আছে, উহার সংখ্যা নিরূপণ করিতে আদেশ দিলেন। অনুসন্ধান ও বিচারের পর দেখা গেল, এই শ্রেণীর তেত্রিশ জন লোক বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের নাম ধাম ও পারিবারিক ইতিহাস সুলতানের সম্মুখে পেশ করা হইল। তিনি এক ফরমানেই সকলের পদচ্যুতির নির্দেশ দিলেন। এই ঘটনার সময় মালীক আতাম উদ্দিন সালাবী বারবেক এবং মালীক কুতুব উদ্দিন হাসান ঘোরী উকিলে দর ছিলেন। তাঁহারা সুলতানের নিকট আবেদন জানাইলেন যে, শাহী ফরমান অনুসারে নীচ লোকদের অনুসন্ধানে কর্মচারীরা সফল হইয়াছে এবং বিচারে দোষী ব্যক্তিদের পদচ্যুতি ঘটিয়াছে। ইহার পর সুলতানের উচিত উজিরের বংশ মর্যাদা অনুসন্ধান করিয়া দেখা। কারণ তিনি স্বয়ং নীচ বংশীয় না হইলে, এইভাবে নীচ বংশীয়দিগকে রাজ কার্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন না। কারণ সম্ভ্রান্ত ও সদ্বংশীয়দের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা

খেদমতগার হিসাবেও নীচ বংশীয় লোককে সহ্য করিতে পারেন না ; রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কাজে ও পদে তাহাদের নিযুক্তির কথাও কল্পনার বাহিরে। এই কথা অনুসারে উজিরের বংশ মর্যাদার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখা গেল তাহারা জাতে জোলা। শুধু অনুপযুক্ত ও হীন জাতের লোককে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য এমন একজন মালীক অসম্মানিত হইলেন এবং জোলা বলিয়া তাহার অখ্যাতি ঘটিল। কাজেই আমি যে ক্ষেত্রে নিজকে আফ্রিসিয়াবের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেছি, সেখানে যদি হীন জাতি ও হেয় বংশের লোককে দায়িত্বপূর্ণ কাজ বা পদ অর্পণ করি, তাহা হইলে আমি নিজেই নিজের হীন জাতিত্বের কথা প্রমাণ করিব।

বাপ দাদা ও অন্যান্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি যাহারা সুলতান বলবনের গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, দিল্লীর অন্যান্য সুলতানদের তুলনায় সুলতান বলবনের চরিত্রে পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর সংমিশ্রণ বেশী মাত্রায় ছিল। তাঁহার চরিত্রের ক্রোধ ও দয়া, সহনশীলতা ও অবৈধ এবং বিনয় ও অহংকার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রকাশ পাইত। বিদ্রোহী, না ফরমান ও অন্যায়-কারীদের বেলায় তিনি ক্রোধ, কঠোরতা ও কড়া মেজাজের দ্বারা কাজ লইতেন এবং বাধ্য, অনুগত ও পুণ্যবানদের জন্য দয়ামায়া, সহ্য ধৈর্য ও ক্ষমা মার্জনা ব্যবহার করিতেন। মেজাজ শান্ত থাকা কালে তিনি অনেক অনুপযুক্ত লোকের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ক্রোধের সময় বাধ্য ও অনুগতদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করেন নাই। ন্যায়বিচারের সময় তিনি নিজের ভ্রাতা, পুত্রবয়স্য ও বিশিষ্ট লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। যদি নিজের ঘনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিত, তবে ইহার সুবিচার এবং উৎ-পীড়িতের সন্তুষ্টি বিধান না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। এই সকল ঘটনার বিচার করিবার সময় তিনি এই কথা মনে করিতেন না যে, এই অত্যাচার আমারই ঘনিষ্ঠ ও বিশিষ্ট লোকদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে এবং রাজ্য শাসনের প্রয়োজনেই এই ধরনের কাজের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত ; বরং ন্যায় বিচারের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য থাকিত এবং সেই অনুসারে মজলুম ও অত্যা-চারিতের প্রতি তিনি পিতা-মাতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইহার ফলে সুলতানদের ন্যায় বিচারের কথা তাঁহার পুত্র-কন্যা, পাত্র-মিত্র, প্রতিনিধি ও অন্যান্য কর্মচারীদের মনে সর্বদাই জাগরুক থাকিত এবং তাঁহারা নিজ সৈন্য ও দাস-দাসীদের প্রতিও দুর্ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন না।

মালীক কীরাবেগ সুলতান বলবনের অনুগত দাস, সের জানদার এবং ঘনিষ্ঠ দরবারী ছিলেন। তাঁহার পিতা মালীক বকবককে সুলতান চারি হাজার অশ্বা-

রোহী ও বাদাউন অঞ্চলটি জায়গীর রূপে দান করেন। তিনি বাদাউনে মত্ত অবস্থায় তাহার এক ফরাশকে কোড়া মারিয়া হত্যা করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে সুলতান বলবন বাদাউন গমন করিলে নিহত ফরাশের স্ত্রী সুলতানের নিকট উপরোক্ত অন্যায়ের সুবিচার প্রার্থনা করে। সুলতান তখনই ফরাশের স্ত্রীর সম্মুখে বাদাউনের জায়গীরদার মালীক বকবককে কোড়া মারিয়া হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন এবং বাদাউনের বারীদ, যে উক্ত অঞ্চলের সংবাদ সরবরাহ করিত, কর্তব্য কর্মে অবহেলার জন্য তাহার লাশটি শহরের দরজায় লটকাইয়া দিতে বলিলেন।

মালীক কিরান আলাঈ সুলতান বলবনের দাস ও কীরাবেগ ছিলেন। তাঁহার পিতা হযরত খানকে সুলতান আওধের জায়গীর দান করেন। তিনিও এক ব্যক্তিকে মত্তাবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা সুলতানের নিকট উহার বিচার প্রার্থনা করিলে সুলতান শাস্তি হিসাবে তাহাকে পাঁচশত কোড়া মারিতে আদেশ দেন এবং নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট দোষী ব্যক্তিকে সোপর্দ করেন। স্ত্রীলোকটিকে তিনি বলেন, 'এই অত্যাচারী আমার দাস, ইহাকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি ইহাকে নিজের হাতে হত্যা কর।' কিন্তু হজরত খান বহু লোককে মধ্যস্থ হিসাবে ধরিলেন এবং বহুতর কাকুতি-মিনতি করিয়া ও স্ত্রীলোকটিকে বিশ হাজার মুদ্রা দিয়া নিজকে খুনের দায় হইতে মুক্ত করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত হজরত খান লজ্জায় লোক-সমাজে নিজের মুখ দেখান নাই।

আমার নানা সিপাহসালার হিশাম উদ্দিন, যিনি সুলতান বলবনের উকিলে দর বারবেক ছিলেন, তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, সুলতান খান দরবারে নিজ পুত্র ও পাত্র-মিত্রদের নিকট অনেক সময়েই বলিয়াছেন, 'আমি দুইবার সৈয়দ নুর উদ্দিন মুবারক গজনবীর মুখে শুনিয়াছি তিনি সুলতান শহীদ শামস উদ্দিনের দরবারে ওয়াজ করিতেন এবং বলিতেন, সুলতানগণ নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতে গিয়া যে সকল নিয়ম-কানুন পালন করেন; যেভাবে তাঁহারা পানাহার, উঠাবসা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আরোহণ-অবতরণ করেন; যে নিয়মে সিংহাসনে বসিয়া লোকজনকে নিজের সম্মুখে বসান ও সেজদা করান; যে রূপ নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ্‌র না ফরমান সুলতান ও বাদশাহদের রীতিনীতি পালন করেন এবং যে সকল উপায়ে জনসাধারণ হইতে নিজেদেরকে দূরে রাখেন; তাহা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স:) প্রবর্তিত নিয়ম-কানুনের সম্পূর্ণ খেলাফ। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল রীতি-নীতি খোদাই দাবীর সম পর্যায়ভুক্ত শেরেক গুণাহের উৎস এবং পরকালে তজ্জনিত কঠিন শাস্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্ত

ব্যাপার, যাহা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে এবং হযরতের পুণ্য সুন্নতের বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইতে সুলতানগণের মুক্তি লাভের উপায় চারি প্রকার ধর্ম রক্ষার কাজে বিদ্যমান।

প্রথমতঃ আন্তরিক বিশ্বাস ও ইসলাম ধর্মের যথার্থ সহায়তার মানসে ধর্মীয় বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণে বাদশাহ মনোনিবেশ করিবেন। শাহী জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি, যাহা আল্লাহ্‌তাআলার নেক বান্দাদের স্বভাবের পরিপন্থী, তাহা সত্যকে তুলিয়া ধরিতে এবং ইসলামী নিয়ম-কানুন জারী করিতে প্রয়োগ করিবেন। যতদিন কুফুরী, পৌত্তলিকতা ও অধর্মের সমূলে বিনাশ না ঘটে, ততদিন ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও অধর্মের উৎপাদনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। যদি কাফের ও মুশরেক হিন্দুদিগকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা না যায়, তাহা হইলেও এতটুকু করিতে হইবে, যাহাতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলের এই সকল জঘন্য শত্রু অসম্মান ও অভাবের মধ্যে জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হয়। বাদশাহদের ধর্মভীরুতার লক্ষণ এই যে, যখনই তাঁহাদের দৃষ্টি এই হিন্দুদের উপর পড়িবে, তখন ক্রোধে মুখমণ্ডল অগ্নি বর্ণ ধারণ করিবে এবং ইহাদিগকে জেন্দা গোর দিবার কথা বারংবার মনে উদয় হইবে। বিশেষ করিয়া এই সকল কাফেরের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। কারণ ইহাদের দ্বারাই অধর্ম ও কুফুরীর প্রসার লাভ ঘটিয়া থাকে। ইসলাম তথা সত্য ধর্মের ইজ্জত রক্ষার জন্যই কোন মুশরেক বা কাফেরকে এমন কোন সুযোগ দেওয়া যাইবে না, যাহাতে সে সসম্মানে জীবন-যাপন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারে এবং নানাবিধ সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। কোন রাজকীয় পদ বা দায়িত্বপূর্ণ কাজেও ইহাদিগকে বহাল করা যাইবে না। বস্তুতঃ ইহাদিগকে আরাম আয়েশে থাকা, এমন কি নির্ভয়ে সুনিদ্রা ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়াও মুসলমান বাদশাহদের উচিত কার্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ বাদশাহগণকে এমন সমস্ত ধর্মীয় কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা তদ্দ্বারা পরকালে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। তাহা হইল মুসলমানদের মধ্যে সর্ববিধ পাপ ও অন্যায়ের প্রসার ঘটিতে না দেওয়া এবং রাজ্যের সর্বত্র যাহা কিছু বিদ্যমান,—তৎসমুদয় সমূলে বিনাশ করিবার ব্যবস্থা করা। এই প্রসঙ্গে এমন সব কঠিন ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে এই সকল পাপকর্ম বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। যে সকল লোক ইসলামের পুণ্য বিধিবিধান অবহেলা করিয়া কুকাজ ও হারামের জঘন্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের জীবন ও জগৎ তাহাদের জন্য এমন সংকীর্ণ করিয়া তোলা প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা এবংবিধ পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া

অন্য পেশা গ্রহণ করে। ইহাতেও যদি পাপের ব্যবসায়ীরা পাপকর্ম ত্যাগ না করে, তাহা হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে উহা যেন প্রকাশ্যে সংঘটিত না হয়। অতীব অপমান ও দুঃখের সহিত তাহাদের এই প্রকার ব্যবসা যেন গোপনেই সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য বেশ্যাদের বেলায় এই প্রকার কড়াকড়ি না করাই উচিত। কারণ ইহারা না থাকিলে অনেক দুষ্কৃতিকারী গৃহস্থ ঘরেই উৎপাত আরম্ভ করিবে।

তৃতীয়তঃ কর্তব্য হইল ধর্মীয় বিধিবিধানের কার্যে বাদশাহ খোদাভীরু ও নেক্কার লোকদিগকে নিয়োগ করিবেন। আল্লাহ্‌র না-ফরমান, লোভী ও কপট লোকদের হাতে শরিয়তের হুকুম আহকাম ও ফতোয়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিবেন না। যুক্তিবাদী ও দার্শনিক এবং যাহারা তাহাদের যুক্তি প্রদানে অটুট বিশ্বাস পোষণ করে, বাদশাহ তেমন লোকজনকে স্বরাজ্যে বসবাস করিতে দিবেন না। যে কোন প্রকারেই হউক দর্শনাদির শিক্ষাব্যবস্থা যাহাতে চালু না হয়, তৎপ্রতি তাঁহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে। কুমজহাব ও উহাতে বিশ্বাসী লোকদিগকে এবং যাহারা সুন্নত ও জমাতের বিরোধী মতামত পোষণ করে, তেমন লোকজনকে অসম্মান ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে। বাদশাহ কোন প্রকারেই কোন গর্হিত মতবাদ ও প্রথাকে রাজ্যের ভিতরে স্থান দিবেন না।

চতুর্থতঃ ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও বাদশাহের মুক্তির পথ হইল ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করা। যতক্ষণ না বাদশাহ স্বয়ং ন্যায় বিচার করিতে উদ্যোগী হইবেন, ততক্ষণ তাহার রাজ্য হইতে অন্যায় অবিচার দূর হইবে না। বাদশাহ নিজ ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া অত্যাচারীর পথে বাধা সৃষ্টি না করিলে ন্যায় বিচারের পরিপূর্ণ দায়িত্ব কখনও পালন করা সম্ভব হয় না এবং অত্যাচার অবিচারও দূর হয় না।

যদি কোন বাদশাহ এই চারি প্রকার কর্তব্য সমাপণ করিয়া আল্লাহ্‌র ধর্ম ও সত্যের জয় ঘোষণা করিতে পারেন, তাহা হইলে কামনার দ্বারা তাঁহার নিজ আত্মা কলুষিত হইলেও এবং স্বয়ং বাদশাহীর জাঁকজমক ও নিয়ম কানুনে লিপ্ত থাকিলেও ধর্মরক্ষার পুণ্যে তিনি ধার্মিক ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার পাত্র ও নবী আও-লিয়াদের সঙ্গে হাশরের মাঠে স্থান লাভ করিবেন। অন্য দিকে কোন বাদশাহ যদি প্রতিদিন হাজার রাকাত নামাজ পড়েন, সারা জীবন রোজা রাখেন, কোন পাপ না করেন, ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেন ; কিন্তু যদি ধর্মরক্ষা করিতে, নিজ শক্তি ও ক্ষমতার দ্বারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলের শত্রুদের প্রভাব ধ্বংস করিতে, ধর্মীয় বিধানের সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতে, সৎকার্যে আদেশ ও অসৎ

৩—

কার্যে নিষেধ সম্পর্কে নিজ রাজ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এবং সর্বোপরি ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের প্রতি দৃষ্টি দিতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্থান দোজখ ভিন্ন অন্য কোথাও হইবে না।

সুলতান বলবন এই সকল উপদেশ, যাহা তিনি সৈয়দ মুবারক গজনীর মুখে ও সুলতান শামস উদ্দিনের দরবারে শুনিয়াছিলেন, তাহা বারংবার তদীয় পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পাত্রমিত্রদের নিকট বর্ণনা করিতেন এবং খুবই কাঁদিতেন। তাহাদিগকে বলিতেন, 'আমি ধর্ম রক্ষার কোন কাজই করিতে পারিলাম না। অবশ্য আমার মূল্যই বা কী যে, আমি এমন এক মহান আশা পোষণ করিতে পারি, যাহার ফলে আল্লাহ্তালা আমার দ্বারা ধর্ম রক্ষার ব্যবস্থা করাইবেন। তবুও যতটুক সম্ভব আমি ন্যায়বিচারের চেষ্টা করি এবং অত্যাচারিতদের পক্ষাবলম্বন করিতে গিয়া আমি জগতের কোন কিছুকেই বড় বলিয়া মনে করি না। তোমরা, যাহারা আমার পুত্র ও পাত্রমিত্র, তোমাদের এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ যদি কোন দিন কোন দুর্বলের উপর তোমাদের অত্যাচারের কথা আমার কানে আসে, তাহা হইলে তোমাদিগকেও যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব। কোন হত্যাকারীকে আমি জীবিত ছাড়িব না এবং তাহা করিতে গিয়া আত্মীয়তার বন্ধন ও খেদমতের কোন সনদ আমার পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না।'

ন্যায় বিচার ও ইনসাফের প্রতি সুলতান বলবনের এই প্রকার সুদৃষ্টি থাকায় তাঁহার রাজ্যের সর্বত্র তিনি উপযুক্ত লোক 'বারিদ'-এর পদে নিযুক্ত করিতেন। বিশেষ করিয়া বড় শহর ও দূরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে নিজের দরবারী-দের মধ্য হইতেই বারিদ নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিতেন না। কোন বারিদ যদি তাহার কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিত, তাহা হইলে তাহার কোন মার্জনা ছিল না এবং তাহার শাস্তির ক্ষেত্রে জগতের কোন কিছুই সুলতানের ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইত না। এইজন্য তাঁহার পুত্র, পাত্রমিত্র, আঞ্চলিক শাসক, প্রতিনিধি, কর্মচারী ও চাকর নফরদের কাহারও পক্ষে দুর্বলের উপর কোন প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপের সাহস হয় নাই। যদি কোন ওয়ালী বা অপর কোন শাসকের দ্বারা কাহারও উপর অত্যাচার সংঘটিত হইত, তাহা হইলে তাহারা যেভাবেই হউক মজলুমের সন্তুষ্টি বিধান করিতেন। কারণ, সুলতানের নিকট ইহার ফরিয়াদ উপস্থিত হইলে, তাহাতে মার্জনার কোন অবকাশ ছিল না।

সুলতান বলবনের একটি অভ্যাস ছিল এই যে, শাহী লস্কর কোথাও অগ্রসর হইবার কালে নদী, খাল, পুল ও কর্দমাক্ত স্থানগুলিতে নিজে উপস্থিত থাকিয়া খোঁড়া, আঁতুর ও দুর্বলদিগকে পার করাইতেন। পাত্রমিত্রদিগকেও তিনি অনুরূপ আদেশ করিতেন ; ফলে তাহারাও লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্ত্রীলোক, শিশু, আতুর ও দুর্বল পশুগুলিকে পার করাইতে সাহায্য করিতেন। যেখানে গভীর পানি থাকিত ও পারাপারের কোন সুব্যবস্থা থাকিত না, সেখানে তিনি দশ বার দিন অবস্থান করিতেন ; যাহাতে সমস্ত লোকজন স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত পার হইতে পারে এবং যাহাতে কাহারও কোন দ্রব্য নষ্ট ও কাহারও কোন প্রকার কষ্ট না হয়। তিনি শাহী সোয়ারীর সমুদয় হাতীকে পারাপারের কাজে ব্যবহার করিতেন।

খান ও মালীক উভয় অবস্থাতেই সুলতান বলবন প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, দুর্বলের সহায়তা এবং উজাড় স্থান আবাদ করিবার ব্যাপারে সুলতান শামস-উদ্দিনের গোলামদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। ফলে উপরোক্ত দুই অবস্থায় তাঁহার দায়িত্বে যে কোন স্থান অর্পিত হইয়াছে, তাহাই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

খান মালীক থাকা অবস্থায় তিনি মদ্যপান ও জলসাদি অনুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সপ্তাহে দুই তিন দিন উৎসব করিতেন ; অন্যান্য খান, মালীক, বৃহৎ ও মহৎ লোককে দাওয়াত দিতেন, জুয়া খেলিতেন, জুয়ার সকল টাকা লুট করাইতেন এবং দান করিয়া দিতেন। মানী লোকদিগকে তবরিজী রেশমী পোশাক ও অশ্ব এবং অন্যান্য সাথীদিগকে খাট পোশাক ও অনুরূপ ঘোড়া দান করিতেন। জলসা করিবার জন্য সর্বদাই সুকণ্ঠ বয়স্য, পাঠক, গায়ক ও বাদ্যকরকে বেতন দিয়া রাখিতেন এবং প্রতিপালন করিতেন।

কিন্তু বাদশাহ হইবার পর তাঁহার এই সমস্ত অভ্যাস বদলাইয়া গেল। সকল প্রকার মাদক দ্রব্য হইতে তৌবা করিলেন ; মদের আড্ডায় যাইতেন না, এমন কি কোন মদখোরের নাম পর্যন্ত মুখে আনিতেন না। নামাজ, রোজা ও অন্য সকল সৎকার্যে অতিমাত্রায় মনোনিবেশ করিলেন। জুম্মা ও জামাতে নামাজ পড়া ছাড়াও এশরাক, চাশ্‌ত, আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নামাজ আদায় করিতেন। সময় ও সুযোগে সারারাত্রি জাগরিত থাকিয়া নামাজ পড়িতেন। মহলে কিংবা সফরে কোথাও অজিফা পাঠ কামাই করিতেন না। সর্বদা অজু-সহ থাকিতেন। আলেম উলামা সঙ্গে না লইয়া খানা খাইতেন না। আহারের সময় আলেমদের নিকট ধর্মীয় মশলা মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং জ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলাপ আলোচনা চালাইতেন। পীর ও ওলী

দরবেশদিগকে খুবই সম্মান দেখাইতেন এবং তাঁহাদের দর্শন লাভের জন্য খানকাহ ও যথাস্থানে উপস্থিত হইতেন।

জুম্মার নামাজের পর সুলতান বলবন জাঁকজমকের সহিত মওলানা বুরহান উদ্দিন বলখীর আবাসে উপস্থিত হইতেন এবং এই দরবেশ প্রকৃতির আলেমের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এতদ্ব্যতীত কাজী শরফ উদ্দিন ওয়াল-ওয়ালজী, মওলানা সিরাজ উদ্দিন সঞ্জরী, মওলানা নজম উদ্দিন দামেশকী প্রমুখ দরবেশ শ্রেণীর আলেমদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতেন। প্রত্যেক জুম্মার নামাজের পর বুজর্গ ব্যক্তিদের কবর জিয়ারত করিতে যাইতেন। শহরের কোন মানী ও গুণী আলেম দরবেশ ইন্তেকাল ফরমাইলে জানাজার নামাজে উপস্থিত হইতেন এবং যথারীতি নামাজ আদায় করিতেন। তিন দিনের ফাতেহা পাঠ ও কবর জিয়ারত করিতেও তিনি ভুল করিতেন না। মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়ে ও ভাইবোনকে কাপড়, খানাপিনা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন। পিতার নামে বরাদ্দকৃত অজিফা পুত্র ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীর নামে চালু রাখিতে আদেশ দিতেন।

বিপুল জাঁকজমকের সহিত পথচলা সত্ত্বেও যদি দেখিতে পাইতেন যে, কোন মসজিদে লোকজন জমায়েত হইয়াছে এবং ওয়ায়েজরা ওয়াজ করিতেছেন, তাহা হইলে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বসিয়া ওয়াজ শুনিতেন। ভাল ভাল কথা শুনিলে কাঁদিয়া অস্থির হইতেন।

লস্করী কাজীদিগকে 'বহরমান' বলা হইত। সুলতান তাঁহাদিগকে খুবই সম্মান করিতেন। তাঁহারাও ধার্মিক হিসাবে খ্যাতনামা ছিলেন। তাঁহারা সুলতানের নিকট যে সকল বিষয়ে সুপারিশ করিতেন, তাহা কবুল হইত।

আমি সুলতান বলবনের জীবন ও কীর্তিমালা বর্ণনাকারীদের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এহেন দয়া-দাক্ষিণ্য, সুবিচার ও নামাজরোজা সত্ত্বেও বিদ্রোহ দমনে এবং রাজ্য-শাসনে তিনি নিতান্ত কঠোরতার সহিত অগ্রসর হইতেন। বিদ্রোহী-দের প্রতি তাঁহার কোন ক্ষমা ছিল না এবং এই কারণে পুরা একটি লস্কর বা আস্ত একটি শহর বিনাশ করিয়া ফেলিতেও তিনি দ্বিধা করিতেন না। এই সকল ব্যাপারে তিনি সর্বপ্রকার জবরদস্তিকে প্রশ্রয় দিতেন। দাপট দেখাইবার ও প্রভাব বিস্তার করিবার কালে আল্লাহ্‌র ভয় তাঁহার মনে থাকিত না এবং বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া কোন ধর্মনীতি বা উপকারের কথা তিনি স্মরণ করিতেন না। রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাহা দরকার, তাহা ধর্মের অন্তর্গত হউক বা না হউক, তিনি করিতে ছাড়িতেন না এবং এই ব্যাপারে রাজ্য প্রেমই তাঁহার সারা অন্তর জুড়িয়া বিরাজ করিত ; অন্য কোন কিছুর সেখানে স্থান হইত না।

যে সকল খান ও মালীককে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন, তাহাদিগকে প্রকাশ্যে হত্যা করিতেন না বটে; কারণ তাহাতে সুনামের ক্ষতি ও লোকের মনে অবিশ্বাসের উদ্রেক হইতে পারে; কিন্তু এই শ্রেণীর লোককে মদে ও শরবতে বিষ মিশাইয়া শেষ করিয়া দিতেন। রাজ্য প্রেমের আতিশয্যের ফলে তাঁহার মনে এই কথা আদৌ স্থান পাইত না যে,—মুসলমানদিগকে তলোয়ার, বিষ, অনাহার, তৃষ্ণা ইত্যাদিতে কাতর করিয়া, উচ্চস্থান হইতে নিক্ষেপ করিয়া, জলে ডুবাইয়া, আগুনে পোড়াইয়া, লাথি মারিয়া, লাঠির দ্বারা আঘাত করিয়া, ধোঁকা দিয়া, গোপনে বা প্রকাশ্যে—যেকোন উপায়েই হত্যা করা হউক না কেন, কাল কিয়ামতের বিচারে তাহারা সকলেই খুনের দাবী লইয়া উপস্থিত হইবে। নিহত মোমেনদের পক্ষে দাঁড়াইবেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তালা এবং ধোঁকা দিয়া হত্যা করিবার জন্য ধোঁকা ও খুন উভয়ের শাস্তি তিনি বিধান করিবেন। দুনিয়ার রক্ষী ফেরেশতারা বিষ দ্বারা হত্যা করাকে স্বেচ্ছাকৃত খুনের পর্যায়ে ফেলিয়া থাকেন।

বর্তমানে যে সময়ে আমি তারিখ-ই-ফিরুজশাহী লিখিতেছি, সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় এক শতাব্দী পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; এই সময় তাঁহার পরিবারবর্গ, দাসদাসী ও পাত্রমিত্রদের মধ্যে তেমন বেশী কেহ জীবিত নাই। অন্যদিকে এক অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ইতিহাস জানা ও রচনার অভাব এবং তাহা গ্রহণ করিবার অনাগ্রহ চরম সীমায় পেঁাছিয়াছে। কোন জ্ঞানী, গুণী ও বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে এই কথা মনে করিবার উপায় নাই যে, সুলতান বলবনের রাজ্য শাসনের কীর্তিমালা তাঁহাদের জানা আছে; কিংবা সুলতান বলবনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দিল্লীর তখতধারীদের সম্পর্কে কোন কিছু জানিবার আগ্রহ তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান। তদুপরি দুনিয়া জাহানের খলিফা ও রাজা বাদশাহদের জীবন কাহিনীর কথাত বলাই বাহুল্য। অথচ আল্লাহ্‌তালা পবিত্র ভাষায় বলিয়াছেন 'হে চক্ষুষ্মানগণ, বিবেচনা কর।' অর্থাৎ অতীত জনসমাজের ভালমন্দ দর্শনে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। তাঁহারা যদি অতীত জীবন সম্পর্কে কোন সংবাদই না রাখেন, তাহা হইলে তদ্দর্শনে উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পালন করিবে কী উপায়ে।

এই সকল ইতিহাস অনভিজ্ঞ লোকদের ব্যাপারে আরও একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা যে শহরে জন্মগ্রহণ করে, সারা জীবন সেখানে থাকিয়াই বৃদ্ধ হয়; অথচ তাহারা জানে না যে, এই শহর কখন আবাদ হইয়াছে, কত

বৎসর ধরিয়া কে বা কাহারা ইহা শাসন করিয়াছে, তাহারা লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিত, তাহারা নিজেরাই বা কিরূপ ছিল, তাহারা কী করিত, কি প্রকারে এই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, জামানাই বা তাহাদের সহিত ও তাহাদের পুত্র পরিজন পাত্রমিত্রদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকে সময় স্থান দিয়াছে এবং কাহার কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই।

যদি নীচমনা, হীনচেতা ও বাজে লোকের মধ্যে ইতিহাস জানিবার কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের মধ্যেও এই বিষয়ে কোন প্রকার আসক্তি দেখা যায় না। অবস্থা যদি এই হয়, তাহা হইলে আমার এই ইতিহাস জানায় এবং ইহার জন্য কষ্ট স্বীকার করায় লাভ কি। যুগ ও সমাজের ইতিহাসের প্রতি এহেন উপেক্ষা যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করিত, তাহা হইলে আমার মনোগত ইচ্ছা অনুসারে হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান বাদশা পর্যন্ত নবী রসুল ও বাদশাহ উজিরদের জীবন ও কীর্তি এবং তাঁহাদের রাজ্য-শাসন প্রণালী ও স্বভাবচরিত্র ধারাবাবাহিকভাবে বর্ণনা করিতাম।

তথাপি, সংক্ষিপ্তভাবে হইলেও ইতিহাসের উদ্দেশ্য, ইহার বিধিনিয়ম প্রভৃতি আমি আমার স্বল্প পরিধির ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছি। ইতিহাস জ্ঞান ও তজ্জনিত অভিজ্ঞতাকে কার্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টায় বাদশাহ উজির ও জ্ঞানী-মানীদের মুক্তি লাভের ব্যবস্থা ইহাতে বিদ্যমান। পাঠকগণ ইহাতে উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ই পাইবেন এবং আমি আশা করি, কাজে লাগাইতে সচেষ্ট হইবেন।

আমি পুনরায় সুলতান বলবনের রাজত্বের কথায় ফিরিয়া আসিতেছি। অর্থসম্পদ আর হস্তী, অশ্ব, যাহা বলিতে গেলে বাদশাহী সামর্থের মূল, তাহা সুলতান বলবন বিভিন্ন শাসনাধীন রাজ্য হইতে লাভ করিতেন। কর্মচারীদের বেতন, পুরস্কার ইত্যাদি এবং বিশটি অঞ্চলের আমীর ও মালীকদের প্রাপ্য ও তাহাদের কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের পর অবশিষ্ট খাজানা, কারখানার উপর ধার্য কর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ বাদ দিয়া শাহী খাজনাখানায় সঞ্চিত হইত। কিন্তু সুলতান বলবনের উন্নত হৃদয় শাহী খাজনাখানার এই প্রচুর সম্পদেও তৃপ্তিলাভ করিত না। তিনি সুলতান মাহমুদের রীতিনীতি ও সুলতান সঞ্জরের জাঁকজমক রপ্ত এবং খোরাসান ও মাওরায়ান্নাহার রাজ্য জয় করিতে চাহিতেন। অনেকবারই আদল খান, তমর খান প্রমুখের ন্যায় খাজায়ে তাশ সুলতান শামস উদ্দিনের অন্যান্য পুরাতন ও জীবনব্যাপী বিশ্বস্ত খেদমতগার, যাহারা সুলতান বলবনের শীর্ষস্থানীয় সহায়ক ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে

বলিয়াছেন, 'বর্তমান সুলতান কেন কুতুব উদ্দিন আইবক ও সুলতান শামস উদ্দিনের ন্যায় ঝাবন, মালোয়া, উজ্জয়িনী, গুজরাট প্রভৃতি দূরদূরান্তের রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাদের নিকট হইতে হাতী, ঘোড়া ও ধনসম্পদ ছিনাইয়া আনেন না। এমন সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যদল থাকা সত্ত্বেও কেন দূরে যাইবার ইচ্ছা এবং নিজ রাজ্যের বাহিরে গমন করিয়া অন্যান্য রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে বাসনা করেন না।'

সুলতান বলবন ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, বাদশাহীর কর্তব্য সম্পর্কে তোমরা যাহা কিছু বলিয়াছ, আমার অন্তরে তদপেক্ষা অতিরিক্ত অন্য কিছু বিদ্যমান। তোমরা কি শুন নাই যে, আমার রাজ্যের আশেপাশে মোঙ্গল চেঙ্গিজ খানের সৈন্যরা শিশু, নারী ও আতুর নির্বিশেষে সকলের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে এবং গজনী, তিরমিজ, মাওরারান্নাহার প্রভৃতি রাজ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করিতেছে! চেঙ্গিজ খানের নাতি হালাকু খান বিরাট মোঙ্গল বাহিনীসহ কুফা অধিকার করিয়াছে এবং বাগদাদের বুকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অভিশপ্ত সৈন্যরা হিন্দুস্তানের অফুরন্ত ধন-সম্পদের কথা শুনিয়াছে এবং এই দেশ লুণ্ঠনের ইচ্ছাও তাহাদের আছে। আমাদের রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত লাহোরের অবস্থা ইহাদের হাতে খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পুনরায় বৎসর না যাইতেই যে ইহারা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিবে এবং চারিপার্শ্বের রাজ্য-গুলি লুণ্ঠন করিবে, এমন আশংকা অমূলক বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, ইহারা শুধু সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। যখনই শুনিবে আমি সৈন্যদল লইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছি এবং অন্য রাজ্য লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখনই উহারা শহরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিবে এবং দোয়াবের সমুদয় অঞ্চল লুট করিতে দ্বিধা করিবে না। দিল্লী লুট করিবার কথা এমনিতেই শোনা যাইতেছে।

এই কারণেই আমি রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে যথাসম্ভব সুসজ্জিত রাখিয়াছি। আমিও ইহাদের আক্রমণের অপেক্ষা করিতেছি। ইহার ফলেই আমার পক্ষে রাজ্যের বাহিরে দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব নহে। আমাদের পূর্ববর্তী সুলতানদের সময়ে মোঙ্গলরা এই দেশ আক্রমণ করে নাই। এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে দূর দূরান্তের রাজ্যগুলি আক্রমণ করিয়া হিন্দুদের ধনসম্পদ, হাতীঘোড়া ইত্যাদি লুট করিয়া আনা সম্ভব ছিল। এই উদ্দেশ্যে এই দুই বৎসর রাজধানীর বাহিরে থাকিতেও তাঁহারা দ্বিধা করিতেন না। আমার উপরে যদি মুসলমান ও মুসলমানদের শহরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব না থাকিত, তাহা হইলে একদিনও রাজধানীর আশেপাশে কাটাইতাম না; বরং সৈন্যদল লইয়া দূরদূরান্তের হিন্দুরাজ্যগুলি লুণ্ঠন করিয়া ফিরিতাম

এবং রাজা-মহারাজাদের হস্তী, অশ্ব আর ধনসম্পদ দিয়া শাহী খাজানাখানা ভরিয়া ফেলিতাম।

আমি কর্মচারীদিগকে এই জন্যই সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি, যাহাতে ধর্মের দুশমনদিগকে সমূলে উৎপাটন করিতে পারি ; কিন্তু হিন্দুদের রাজ্যগুলি আমার শাসনের আয়ত্তাধীনে আনিতে চাহি না। কারণ যে কোন রাজ্য ও দেশ নিজের শাসনাধীনে আনিতে গেলে নিজ রাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা কিছুটা ব্যাহত করিতে হয়।

পররাজ্য অধিকার করিয়া নিজ শাসনাধীনে আনিবার পথে বাধা হিসাবে বলবন যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন, উহার মর্মার্থ এই যে, আমি যদি কোন অরাজক রাজ্যকে নিজ অধিকারে আনিয়া শাসন করিতে চাহি, তাহা হইলে আমার বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ কোন লোককে তথায় নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে সেই শ্রেণীর প্রচুর কর্মচারী, আমীর, মুতাসরিফ, চাকর নফর প্রভৃতিকে তথায় পাঠাইতে হইবে। সেখানে বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত তাহাদের পরিবার-পরিজনকেও তথায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যদি এই ধরনের বহু সংখ্যক অভিজ্ঞ ও মনোনীত লোককে সেখানে পাঠাই, কেবলমাত্র তাহা হইলেই সেই রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। এইভাবে সেই রাজ্যের ওয়ালী, আমীর, আমলা, কারকুন, সোয়ারী, পিয়াদা প্রভৃতির অনুগত স্বজনসহ প্রায় লক্ষ লোক সেখানে গিয়া পৌঁছিবে এবং বসবাস করিতে বাধ্য হইবে। অথচ ইহাতে আমার কী লাভ যে, আমি নিজ রাজ্যের বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ এত লোককে পররাজ্য শাসনের জন্য পাঠাইয়া দিব এবং দূরে অবস্থিত হওয়ার ফলে যে রাজ্যের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা খুবই কম, তেমন একটি স্থানে লোক পাঠাইয়া আমার অনুগত ও বাধ্য লোকের সংখ্যা হ্রাস করিব। অন্যদিকে যদি সেখানে নিজের অনুগত অধিক সংখ্যক লোক না পাঠাই, তাহা হইলে দূরত্ব ও অন্য নানাবিধ কারণে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং আমার নিজের লোকই সুযোগে আমার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। সেই পরিস্থিতিতে আমার নিজের সৈন্যদের বিরুদ্ধেই আমাকে সৈন্য পরিচালনা করিতে হইবে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধব, দাসদাসীদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করাইতে হইবে। যদি তাহাদের উপর জয়লাভও করি, তথাপি অবশিষ্ট লোককে শাসন-শৃঙ্খলার খাতিরে হত্যা করিতে হইবে। ইহার ফলে মুসলমানদের রক্তে নদীর সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নহে।

আর যদি অবাধ্য, নীচ ও কমিন কমজাত লোকের দ্বারা দূরদূরান্তের এই সকল রাজ্য শাসন করাই, তাহা হইলে তাহাদের অপকীর্তি আমার অপকীর্তি

মনে করিয়া সকল বুদ্ধিমান লোকই উচ্চহাস্য করিবে এবং সেখানে কোনদিনই শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে না।

যদি মোঙ্গল সৈন্যদের আক্রমণের ভয় বাধা সৃষ্টি না করিত, তাহা শাহী দাপট দেখাইতে পারিতাম এবং গুজরাট, সোমনাথ, সাওয়াহেল, ঝাবন, মালোয়া, উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্য আমার হাত এড়াইয়া কোথায় থাকিত! আমি খুব ভাল করিয়াই জানি যে, দিল্লীর সৈন্য দলের সম্মুখে এই সকল হিন্দু রাজ্য ত দূরের কথা, কোন বাদশাহের পক্ষেও টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে। ইহাদের অন্যবিধ ক্ষমতা ছাড়াও এক লক্ষ পদাতিক ও ধানুকীও যদি থাকে, তথাপি আমার সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে না। বস্তুতঃ ইহাদিগকে লুটতরাজ করিবার জন্য দিল্লীর ছয় সাত হাজার সৈন্যই যথেষ্ট।

আমি বিশ্বস্ত লোকদের নিকট শুনিয়াছি যে, সুলতান বলবন শতাব্দী কালের পূর্ণ শাহী অভিজ্ঞতা রাখিতেন। তিনি অনেক বারই তাঁহার পাত্রমিত্রদের নিকট বলিয়াছেন যে, হিন্দুস্তান শাসন করিতে হইলে হাতী ও ঘোড়ার প্রয়োজন। এখানে একটি হাতী পাঁচশত অশ্বারোহীর কাজ দেয়। তিনি সিন্ধু অঞ্চলটি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শাসনাধীনে এই জন্যই দিয়াছিলেন, যাহাতে সে সেই স্থান হইতে তাতারী ও বহরজী অশ্ব রাজধানীতে পাঠাইতে পারে। সোয়ালক রাজ্য, সালম, সামানা, ভাটেণ্ডা, ভাটনীর, বোখরদের দেশ, চটবান, মান্দারান প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট হিন্দুস্তানী অশ্ব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল স্থান হইতে রাজধানীতে সৈন্যদলের জন্য যে পরিমাণ অশ্ব আসে তাহাই যথেষ্ট। মোঙ্গলদের দেশ হইতে তজ্জন্য অশ্ব আনাইবার কোন প্রয়োজন হয় না।

সুলতান বলবন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষণাবতী ও বাঙ্গালা অঞ্চলদ্বয়ের শাসন-ভার দিয়াছিলেন। বহু বৎসর যাবত তাঁহার অধীনে তথাকার শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে; ফলে এই সকল অঞ্চল হইতে শাহী পীলখানায় প্রচুর হাতী আসিত। এইভাবে রাজধানী দিল্লী হাতী, ঘোড়ার দ্বারা সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হইত।

সুলতান বলবন আরও বলিতেন, 'আমার পূর্বেকার বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ সকল বাদশাহই বলিয়াছেন—নিজের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার দায়িত্ব যথাযথ পালন করা, পরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্যকে দুর্বল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা ভাল।' বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, সুলতান বলবনের এই সকল বক্তব্যের বিশেষ কয়েকটি দিক রহিয়াছে।

৬৬২ হিজরীতে* সুলতান বলবনের সিংহাসন আরোহণের বৎসরে আরসালান খানের পুত্র তাতার খান কর্তৃক লক্ষণাবতী হইতে প্রেরিত তেষট্টিটি শৃঙ্খলাবদ্ধ হাতী রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছে। ইহার ফলে সুলতান বলবনের সিংহাসনে বসিবার এই প্রাথমিক কাল হইতেই রাজ্যের স্থায়িত্বের লক্ষণ দেখা দেয়। এই উপলক্ষে শহরে বহু গম্বুজ তৈরী এবং নানাবিধ উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। সুলতান বলবন নাসিরী চত্বরে বাদাউনী দরজামুখী ময়দানের সম্মুখে দরবার-ই-আমের বন্দোবস্ত করেন। সেখানে মালীক, আমীর, বিখ্যাত মানী ও গুণী বহু লোকের উপস্থিতিতে বাদশাহকে মোবারকবাদ জানান হয়। উপস্থিত জ্ঞানীগুণীরা নানা প্রকার খেদমত ও অশ্বলাভ করেন। মালীক ও খানদিগকে সন্তোষজনক পুরস্কার দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এইভাবে সুলতান বলবন এমনি এক দরবার-ই-আমের ব্যবস্থা করেন যে, ইহার মধ্য দিয়া সুলতান শামস উদ্দিনের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে পুনরায় শাহী জাঁকজমকের সূত্রপাত ঘটে। ইহার সৌষ্ঠব প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত মানুষের মনে জাগরুক ছিল। এই দরবারের ব্যবস্থাপনায় সুলতান বলবনের প্রভাব প্রতিপত্তির যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেমন বিশেষ লোকদের মনে দাগ কাটিয়াছিল; তেমনই ইহার মাধ্যমে শাহী দাপটের ভীতি জনসাধারণের মনেও প্রবেশ করিয়াছিল।

সুলতান বলবন শাহী কাজকর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও শিকার করার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ছিলেন। তাঁহার এই প্রিয় শিকার করার কাজে গমনের জন্য শীত কালকে তিনি উপযুক্ত সময় মনে করিতেন এবং তজ্জন্য লালায়িত থাকিতেন। শহরের আশেপাশে বিশ ক্রোশ পর্যন্ত শিকারের স্থান এবং পাখীদের বিচরণ স্থলগুলিকে সংরক্ষণ করিবার জন্য তিনি কঠোর নির্দেশ জারী করিতেন; যেন কেহ ঐ সকল স্থানে উৎপাত করিয়া শিকার ও পাখীদেরকে তাড়াইয়া না দেয়। সুলতান বলবনের খানী ও শাহী উভয় অবস্থাতেই তাঁহার অধীনস্থ 'আমীর শিকার'-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। শিকারী বাজ ইত্যাদি পাখী পালকদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ মর্যাদা ভোগ করিত এবং তাহাদের আয়-উন্নতিও বেশ ভাল ছিল। শাহী শিকারী পাখী রাখার স্থানে দক্ষ ও নিপুণ বহু শিকারী পাখী প্রতিপালিত হইত। তিনি বহু শিকারী পাখী পালক ও শিকারীকে চাকর হিসাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

সুলতান বলবন শীতকালে ভোররাত্রে শাহী মহল ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে প্রতিদিন 'রওয়াড়ী' ও ইহা হইতে দূরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেন, শিকার

---

* শুদ্ধ ৬৬৪ হিজরী।

করিতেন, শিকারী বাজ পাখী উড়াইতেন এবং প্রহরেক রাত্রির সময় ঢাকঢোল পিটাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতেন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কেল্লার সকল দরজা খোলা থাকিত। শীতকালে তিনি এইরূপ শিকারে গমন পারতপক্ষে ত্যাগ করিতেন না ; অথচ বাহিরে রাত্রিযাপনও করিতেন না। বরং রাত্রির প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর—যখনই হউক না কেন শহরে ফিরিয়া আসিতেন। এই সকল শিকারে তাঁহার সহিত পরিচিত ও বিশ্বস্ত অশ্বারোহী এবং বিশ্বস্ত দাসদের এক হাজার পদাতিক তীরন্দাজ সর্বদা ছায়ার ন্যায় থাকিত। তাহাদের আহার ও আরাম সুলতানের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

সুলতান বলবনের এহেন অধিক ও নিয়মিত শিকার গমনের কথা বাগদাদে হালাকু খানের নিকট পৌঁছিলে তিনি আগ্রহের সহিত মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সুলতান বলবন বাদশাহ হিসাবে যে অতিশয় বিচক্ষণ ও যোগ্য, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিমাণও অনেক বেশী। ইহার কারণ তিনি নিয়মিত শিকারে গমন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা তাঁহার অধীনস্থ আমীর, মালীক, খান ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে নিয়মিত অশ্বারোহণ ও অশ্বচালনায় অভ্যস্ত করা এবং অশ্বগুলিকে তদনুযায়ী গড়িয়া তোলা ; যাহাতে যুদ্ধের ময়দানে আলস্য ও অনভ্যাসের সম্মুখীন হইতে না হয়। কারণ সৈন্যদল যদি অশ্ব চালনায় পটু এবং অশ্বগুলি যদি তদনুযায়ী অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে শত্রুর পক্ষে জয়লাভ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই সুলতান বলবন যদি শিকারে নিয়মিত অভ্যস্ত না হইতেন, তাহার সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িত।

হালাকু খানের এই মন্তব্য সুলতান বলবনের নিকট পৌঁছিলে, তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, 'যে বহু রাজ্য জয় করিয়াছে ও রাজ্য শাসন করিতেছে, রাজ্যের কল্যাণ সম্পর্কে তাঁহার অপেক্ষা অধিক আর কে জানিবে ! যাহারা নূতন, তাহারাই অভিজ্ঞ লোকের কথা বুঝিতে পারে না।'

আমি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের নিকট শুনিয়াছি, সুলতান বলবন সিংহাসনে আরোহণের বৎসরের শেষের দিকে দিল্লীর আশেপাশে জঙ্গল ধ্বংস এবং 'মেউ' জাতির বিনাশ সাধনে তৎপর হন। সুলতান শহরের বাহিরে আসিয়া সেনানিবাস স্থাপন করেন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় কার্যের মধ্যে 'মেউ'দের বিনাশ সাধনকে অগ্রাধিকার দান করেন। সুলতান শামস উদ্দিনের মৃত্যুর পর যথাযোগ্য প্রতিরোধের অভাবে এই মেউদের অত্যাচার বাড়িয়া গিয়াছিল। মৃত সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্রদের উদাসীনতা এবং কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিনের বিশ বৎসর কালীন রাজ্য-শাসনের দুর্বলতার সুযোগে ইহারা সর্বপ্রকার

অপকর্মে লিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিল। সংখ্যায় বেশী ও কিছুটা ক্ষমতাশালী হওয়ার দরুন ইহারা রাত্রিকালে শহরে প্রবেশ করিয়া মানুষের ঘরে সিঁদ কাটিত এবং নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি করিত। ইহাদের এই প্রকার উৎপীড়নের ভয়ে শহরবাসীদের সুনিদ্রা হইত না। শহরের বাহিরের সকল সরাইখানা ইহারা নির্বিবাদে লুণ্ঠন করিয়া ফিরিত।

সুলতান শামস উদ্দিনের পুত্রদের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার ফলে রাজ্যের সকল কার্যেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। কোন প্রকার ফরমান কার্যকরী হইত না এবং প্রজারা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। এই সুযোগে মেউরাও শহরের আশেপাশে সংখ্যায় বাড়িয়া উঠে ও বেপরোয়া হইয়া দাঁড়ায়। অবহেলা আর উপেক্ষায় বর্ধিত শহরের সন্নিহিত জঙ্গলসমূহে ইহাদের সহিত দোয়াব ও হিন্দুস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের সর্বপ্রকার দুষ্কৃতিকারী আসিয়া একত্র মিলিত হয়। ইহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া যত্রতত্র ডাকাতি করিয়া বেড়াইতে থাকে। ইহার ফলে চতুর্দিকের রাস্তাঘাট বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। সওদাগররা ইহাদের ভয়ে যাতায়াত করিতে সাহস করিত না। অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, মেউদের অত্যাচারের ভয়ে শহরের চতুষ্পার্শ্বের লোক নামাজের সময়ও ঘরের দরজা বন্ধ রাখিত। নামাজের পর কোন বুজর্গ ব্যক্তির মাজার জিয়ারত কিংবা সুলতানী হাউজের কিনারায় বেড়াইতে যাইতেও কাহারও সাহস হইত না। কারণ, অনেক সময়ই মেউরা নামাজের সুযোগে হাউজের কাছে চলিয়া আসিত এবং ভিস্তী ও পানি সংগ্রহকারী দাসদাসীদের উপর অত্যাচার করিত। উহাদের পরনের কাপড় পর্যন্ত ছিনাইয়া লইয়া যাইত। বস্তুতঃ ইহাদের এই প্রকার হঠকারিতার জন্য শহরে লোকের সমাগম কমিয়া গিয়াছিল।

এই জন্যই সুলতান বলবন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মেউদিগকে বিনাশ করিতে মনস্থ করেন এবং পূর্ণ এক বৎসর তিনি শহরের আশেপাশের জঙ্গল ধ্বংস ও মেউদিগের বিনাশ সাধনে নিয়োজিত থাকেন। ইহার ফলে জঙ্গল যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি মেউদের অধিকাংশও নিহত হয়। সুলতান এই উদ্দেশ্যে গোপালগীরে একটি কেল্লা তৈরী করেন এবং শহরের পার্শ্বে কয়েক স্থানে থানা বসান। এই সকল স্থানের সবগুলিতেই আফগান সৈন্যদিগকে মোতায়েন করেন।

মেউদের সহিত সংঘর্ষের ফলে এক লাখী লস্করের মধ্য হইতে সুলতান বলবনের বহু বিশিষ্ট দাস নিহত হয়। সুলতান নিজেও তরবারী হাতে বহু লোককে মেউদের এই প্রকার অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। ফলে এই সময় হইতে শুধু বাহিরের লোক নহে, শহরের অধিবাসীরা ইহাদের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করে।

এইভাবে মেউদিগের বিনাশ সাধন ও শহরের আশেপাশের বনজঙ্গল ধ্বংস করিবার পর সুলতান বলবন দোয়ারের গ্রামাঞ্চলগুলিতে সম্পদশালী 'কেতাদার' নিযুক্ত করেন। তাহাদিগকে আদেশ দেন যে, তাহারা যেন দুষ্কৃতিকারীদের গ্রামগুলি লুণ্ঠন, উহাদিগকে হত্যা এবং উহাদের ধনসম্পত্তি ও পুত্র-পরিজনকে গনিমতের মাল বলিয়া নির্ধারিত করে। ইহাদের আবাসভূমি জঙ্গলসমূহের ধ্বংস সাধন এবং সর্বপ্রকার দুষ্কৃতির মূলোৎপাটনে তৎপর হয়। সুলতানের আমীর-ওমরাহ ও পাত্রমিত্রদের মধ্যে অনেকেই এই বিরাট কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সদলবলে সকল দুষ্কৃতিকারীর মূলোচ্ছেদ, বন-জঙ্গলের বিনাশ সাধন এবং দোয়াবের সর্বশ্রেণীর প্রজাদিগকে অনুগত করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়।

মেউদের সৃষ্ট এই সংকট দূর করিবার পর সুলতান বলবন হিন্দুস্তানের পথ-ঘাট নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে দুইবার শহরের বাহিরে গমন করেন। কন্‌পল ও পাতিয়ালা সীমান্তে তাঁহাকে অভিযান পরিচালনা করিতে হয় এবং ইহার প্রত্যেকটিতে পাঁচ ছয় মাস কাল অবস্থান করিয়া সকল প্রকার দুষ্কৃতিকারীর মূলোৎপাটন করেন এবং হিন্দুস্তানের পথঘাট আপদমুক্ত করেন। ইহার ফলে সওদাগরদের যাতায়াতের পথ নিরাপদ হয়। তদুপরি এই সকল অঞ্চল লুণ্ঠনের ফলে প্রচুর গনিমতের মাল দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছায়। পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবজন্তুর মূল্য সুলভ হইয়া দাঁড়ায়।

ডাকাত ও লুঠেরাদের অত্যাচারে জর্জরিত কন্‌পল, পাতিয়ালা ও ভোজপুরে সুলতান বলবন সুদৃঢ় কেল্লা এবং বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন। এই তিনটি দুর্গই সুলতান আফগান সৈন্যদের হাতে তুলিয়া দেন এবং এই সকল কেল্লার অধীন কর্ষণযোগ্য সমুদয় জমি পৃথকভাবে বন্দোবস্ত করেন। এমনিভাবে আফগান ও মুসলমান সৈন্যদের অবস্থানের ফলে উক্ত তিনটি অঞ্চল এমন সুশৃঙ্খল এবং ডাকাত ও লুঠেরাদের কবলমুক্ত হয় যে, তখন হইতে প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু এখনও হিন্দুস্তানের রাস্তাঘাট অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তার সহিত মুক্ত রহিয়াছে। ডাকাত দলের চিহ্ন কোথাও নাই।

সুলতান বলবন এই সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণের সময় জালালীতে একটি কেল্লা নির্মাণ করেন এবং তাহাও যথারীতি আফগান সৈন্যদের হাতে তুলিয়া দেন। এই কেল্লার অন্তর্গত কৃষির যোগ্য ভূমিও তিনি পৃথকভাবে বন্দোবস্ত করেন। চোর ডাকাতদের সকল আস্তানাকে তিনি থানায় পরিণত করেন। ইহার ফলে যে জালালী এক সময়ে দস্যুদের আড্ডা ছিল এবং যেখানে বহু লোকের ধনসম্পদ

লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা মুসলমানদের বাসস্থান ও রক্ষীদের আবাসে পরিণত হয়। বর্তমানকালেও তাহা অনুরূপভাবে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত রহিয়াছে।

সুলতান বলবন যখন হিন্দুস্তানের পথে অবস্থিত এই সকল থানা এবং দুর্গাদি প্রতিষ্ঠার কার্যে ব্যাপৃত, এমন সময় কাথিয়াড় হইতে সংবাদ আসিল যে, তথাকার দুষ্কৃতিকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা প্রজাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিতেছে এবং আমরোহা ও বাদাউন অঞ্চলের শাসনকার্যে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। উক্ত অঞ্চলেও তাহারা নানাবিধ দুষ্কর্মে রত রহিয়াছে এবং এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরোহা ও বাদাউন অঞ্চলের লোকজন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলের শাসকরা তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

সুলতান বলবন কনপল হইতে শহরে ফিরিয়া আসিলেন। গম্বুজ তৈয়ারী করাইয়া উৎসব উদযাপন করিলেন। কাথিয়াড় অঞ্চলের দুষ্কৃতিকারীদের অন্যায় অবিচার বন্ধ করিবার জন্য বিশিষ্ট পাত্রমিত্রদিগকে প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিলেন। যেহেতু সুলতানের খাস দরবার এবং একান্ত নিজস্ব লোকজন শহরের বাহিরে যাইতেছে, এই কারণে তিনি তাঁহার এই বহির্গমনের উদ্দেশ্য বাহিরের কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। সাধারণ লোক জানিতে পারিল, সুলতান পাহাড়ী অঞ্চলে শিকার করিতে যাইতেছেন। এইভাবে তিনি বিশিষ্ট পাত্রমিত্রসহ দুই রাত্রি ও তিন দিন ঘোড়া ছুটাইয়া কাথিয়াড়ের গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলেন এবং অতর্কিতে কাথিয়াড়ে গিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে যে পাঁচ হাজার তীরন্দাজ সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে কাথিয়াড় লুণ্ঠন এবং শিশু ও স্ত্রীলোক ব্যতীত সকল পুরুষকে হত্যা করিতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা এই প্রকার নির্দেশের বশবর্তী হইয়া আট নয় বৎসরের বালকদিগকেও হত্যা করিয়াছিল। সুলতান কাথিয়াড়ে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া এই প্রকার হত্যা কার্য পরিচালনা করেন। ইহার ফলে দুষ্কৃতিকারীদের রক্তে নদী প্রবাহিত হয় এবং গ্রাম, জঙ্গল, শস্যক্ষেত্র সর্বত্র লাশের স্তূপ জমিয়া উঠে। এই সকল লাশের বিকট দুর্গন্ধ গঙ্গার ধার পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছিল। ইহাদিগকে এইভাবে হত্যা করিবার ফলে উক্ত অঞ্চলের অবশিষ্ট দুষ্কৃতিকারীদের অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে এবং তাহাদের অধিকাংশই আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কাথিয়াড়ের সমুদয় গ্রামাঞ্চল লুণ্ঠিত হয় এবং সকল ধনসম্পদ গনিমতের মাল হিসাবে সৈন্যদলের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। এই গনিমতের মাল এত প্রচুর ছিল যে, সুলতানী সৈন্যদলের অধিকাংশই ধনী হইয়া পড়ে। বাদাউনের লোকেরাও ইহার দ্বারা উপকৃত হয়।

ইহার ফলে সৈন্যদলের কুঠারী ও বাদাউনের লোকেরা মিলিয়া কুঠারের আঘাতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা তৈয়ার করিয়া ফেলে এবং ইহার মধ্য দিয়া

সৈন্য দল প্রেরণ করিয়া সুলতান বলবন হিন্দুদের বিনাশ সাধন করেন। এইভাবে এক কালে সর্বপ্রকার দুষ্কৃতিকারীর মূলোচ্ছেদ হওয়ায় জালালী যুগের শেষ পর্যন্ত কাথিয়াড়ে কোন প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হয় নাই এবং বাদাউন, আমরোহা, সম্বল, কানুরী প্রভৃতি অঞ্চল কাথিয়াড়ী গুণ্ডাদের অত্যাচার হইতে মুক্ত থাকে।

এইভাবে শক্তিশালী ও ত্রাসসৃষ্টিকারী দুষ্কৃতিকারীদের মূলোৎপাটন করিবার পর সুলতান বলবন বিজয়ীর বেশে শহরে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে কিছু-কাল বিশ্রাম করেন। বস্তুত: সুলতান বলবনের সিংহাসন আরোহণের পরবর্তী কয়েক বৎসর এইভাবে বিদ্রোহী দমন এবং চারিদিগের রাস্তাঘাট ডাকাত, লুটেরা মুক্ত করিতে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তিনি যোধ পাহাড়েও অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি যথারীতি সৈন্যদলসহ উক্ত অঞ্চলে গমন করিয়া পাহাড় এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করেন। পাহাড়ী সৈন্যদের নিকট হইতে প্রচুর অশ্ব সুলতানী সৈন্যদের হস্তগত হয়। গনিমতের মাল হিসাবে এইভাবে বেশী সংখ্যায় অশ্ব লাভের ফলে একটি অশ্বের মূল্য ত্রিশ চল্লিশ তঙ্কায় নামিয়া আসে।

যোধ পাহাড়ে সৈন্য পরিচালনা কালে সুলতান বলবন অনেকবারই শুনিয়াছিলেন যে, সুলতান শামস উদ্দিনের বিশিষ্ট পাত্রমিত্রদের মধ্যে কেতাদার হিসাবে অনেকেই বৃদ্ধ ও অথর্ব হইয়া পড়িয়াছেন ; তাঁহারা সৈন্যদলে যোগদান করিতে পারেন না। অন্যদিকে যাহারা সামর্থবান, তাহারাও 'দেওয়ানে আরজ' -এর লোকদিগকে ঘুষ দিয়া ঘরেই বসিয়া থাকেন এবং গ্রামাঞ্চলের সকল আয় অনর্থক ভোগ করেন।

সুলতান বলবন এই অভিযান হইতে বিজয়ীর বেশে ফিরিয়া আসিবার পর গম্বুজ তৈয়ার করাইলেন এবং যথারীতি উৎসব উদযাপন করিলেন। সুলতান যে কোন অভিযান হইতে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিলে শহরের উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য সকল লোক তিন মঞ্জিল অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতেন। শহরের নানা স্থানে গম্বুজ তৈয়ারী হইত, উৎসবের আয়োজন হইত এবং সেই উৎসব সমস্ত অঞ্চলেই পরিব্যাপ্তি লাভ করিত।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি স্বীয় পিতা-পিতামহের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, সুলতান বলবন যখন কোথাও সৈন্য পরিচালনার ইচ্ছা করিতেন, তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথারীতি নির্দেশ প্রদানের পূর্বে গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেন। যখন এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত স্থিরতা লাভ করিত এবং তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিতেন যে, এই অভিযানে তাঁহার লাভ

ভিন্ন ক্ষতি হইবে না, কেবল তখনই সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। এইভাবে যেকোন অভিযান পরিচালনা করিবার পূর্বে তিনি 'দেওয়ানে উজির' ও 'দেওয়ানে আরজ'-এ খবর পাঠাইতেন যে, আমি এই বৎসর এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরাদি যাহাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজনের প্রস্তুতি শেষ করিয়া রাখিতে পারে তজ্জন্য যথাবিহিত নির্দেশ প্রদান করিতেন। যাহাতে অভিযানের গন্তব্য ও সময় সম্পর্কে বাহিরের কেহ অবহিত হইতে না পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তৎপর হইতেন। অভিযান পরিচালনার পূর্ব রাত্রে উচ্চ পদস্থ খান ও মালীকদিগকে ডাকাইয়া বলিতেন, 'আমি অমুক স্থানে সৈন্য পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক এবং আগামী কল্যই যাত্রা করিব।' বস্তুত: এই সময়েই সুলতানের অনুরূপ মনোগত বাসনা সকলে জানিতে পারিত।

আমি আমার মাতামহ, যিনি উকিলেদর বারবেক বখতেরস সুলতানী ছিলেন, তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, মালীক বখতেরস আমীর হাজেব অপেক্ষা সুলতানের অধিকতর নিকট ও অন্তরঙ্গ অন্য কেহ ছিলেন না; কিন্তু তিনিও সুলতানের গোপন ইচ্ছার সংবাদ জানিতে পারিতেন না।

যোধ পাহাড়ের অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিবার দুই বৎসর পর সুলতান বলবন লাহোর গমন করেন। সেখানে যে সকল কেল্লা সুলতান শামস উদ্দিনের পুত্রদের সময় মোঙ্গলরা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈয়ার করান এবং ঐ অঞ্চলের যে সকল গঞ্জ ও গ্রাম মোঙ্গলদের আক্রমণে উজাড় ও পানিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, সেইগুলিকে পুনরায় আবাদ করান। সর্বত্র প্রয়োজনমত মিস্ত্রী ও কর্মচারী নিয়োগ করেন।

এই সময়ও সুলতান জানিতে পারেন যে, সুলতান শামস উদ্দিনের নিযুক্ত কেতাদার রায়গণের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা লস্করে যোগদান করেন না; বরং আরজের লেখকদের সহযোগিতায় গ্রামাঞ্চলের সম্পূর্ণ স্বত্ব ভোগ করেন এবং নিজের ঘরে বসিয়াই আমোদ স্ফূর্তি করিয়া সময় কাটান।

সুতরাং এইভাবে বারংবার সংবাদ পাইয়া এই সুলতান বলবন লাহোর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই দেওয়ানে আরজকে শামসী কেত'দারদের দপ্তর উপস্থিত, তাহাদের সম্পর্কে যথারীতি অনুসন্ধান এবং করণীয় সম্বন্ধে শাহী নির্দেশ সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই ছিল যে, দোয়াব ও পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলিতে সুলতান শামস উদ্দিন আনুমানিক দুই হাজার সোয়ারীসহ বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত

করেন। তাঁহার পুত্রদের শাসনকালে এই সোয়ারী নষ্ট হইয়া যায়। শুধু কেতাদার হিসাবে যাহারা উক্ত অঞ্চল লাভ করিয়াছিল, তাহারাই অবশিষ্ট থাকে। সুলতান শামস উদ্দিনের দ্বারা নিযুক্ত এই সকল কর্মচারীকে সাধারণ-ভাবে 'কেতাদার' ও 'সোয়ারী কলব' বলা হইত।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কিংবা ইহা অপেক্ষা অধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে এই সকল কর্মচারী যখন অকর্মণ্য হইয়া পড়িল, অধিকাংশ সোয়ারী বৃদ্ধ ও অকেজো হইয়া দাঁড়াইল এবং অনেকেই মরিয়া গেল, তখন তাহাদের সন্তানগণ পৈত্রিক উত্তরাধিকার হিসাবে এই সকল গ্রাম দখল করিয়া দেওয়ানে আরজ-এ তাহাদের নাম লিখাইয়া লইল। যেমন পুত্র পিতার গোলামকে নিজের গোলাম বলিয়া দাবী করে, তেমনই কেতাদারদের পুত্ররাও এই সকল গ্রামকে নিজেদের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিল। তাহারা বলিত যে, সুলতান শামস উদ্দিন তাহাদিগকে এই সকল গ্রাম পুরস্কার হিসাবে দিয়া গিয়াছিলেন।

সুলতান শামস উদ্দিন ও তাঁহার পুত্রদের শাসন আমলে এই সকল কেতা-দারের নিকট হইতে কোথাও এক অশ্বারোহী, কোথাও দুই অশ্বারোহী এবং কোথাও তিন অশ্বারোহী ও বর্মাদি দেওয়ানে আরজ-এ পাঠাইবার জন্য চাওয়া হইত। ইহার পর যদি কেহ অক্ষমতার দরুন অশ্বারোহী পাঠাইতে না পারিত এবং লস্করে নাম লিখাইতেও অক্ষম হইত, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে গ্রামগুলি ফেরৎ না লইয়া শুধু মাত্র তাহাদের এই প্রকার অক্ষমতার কারণ দেওয়ানে আরজে লিখিয়া রাখা হইত। অর্ধ শতাব্দী কাল পর্যন্ত এইভাবে গ্রামগুলি তাহাদের অধিকারে ছিল। পরে প্রথা এই হইয়া দাঁড়ায় যে, কিছু সংখ্যক কেতাদার সামান্য আসবাবপত্র লইয়া লস্করে যোগদান করিত এবং অবশিষ্টরা অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া নিজ নিজ গৃহেই বসিয়া থাকিত। তাহারা নায়েব আরজে মুমালেক ও সাহেবে উহদাদারকে যোগ্যতা অনুসারে মদ, ছাগল, মুরগী, কবুতর, তৈল ও শস্য নিজ নিজ অঞ্চল হইতে পাঠাইত। নায়েবে আরজ হইতে দেওয়ানে আরজ, সহমূল হশমা, নকীব প্রমুখ ব্যক্তিরাও কেতাদারদের দ্বারা উপকৃত হইত। সুলতান শামস উদ্দিনের পুত্রদের সময়ে যেহেতু রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার তেমন একটা স্থিতিস্থাপকতা ছিল না, সেইজন্য কেতাদারদের বিষয়টি কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই।

সুলতান বলবনের রাজ্য শাসনে স্থায়িত্ব আসিবার পর যে বৎসর তিনি লাহোর হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময় সুলতান শামস উদ্দিনের কেতাদার-দের বিষয়টি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাহাদের সম্পর্কে তিন প্রকার আদেশ প্রদান করেন।

প্রথম প্রকারে— যে সকল কেতাদার বৃদ্ধ ও অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং যুদ্ধাদির কাজে সম্পূর্ণ অপারগ, তাহাদের জন্য চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ তঙ্কা করিয়া একটি অজিফা নির্ধারণ করা হইল এবং গ্রামগুলি তাহাদের অধিকার হইতে সম্পূর্ণ ফেরৎ লওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। দ্বিতীয় প্রকারে—যাহারা যুবক ও সক্ষম ছিল, তাহাদের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন নির্দিষ্ট করিয়া তাহাদের গ্রামগুলির আয় হইতে উক্ত বেতন বাদ দিবার পর অবশিষ্ট আয় যথারীতি দেওয়ানে আরজে পাঠাইবার তাগিদ দেওয়া হইল এবং গ্রামগুলি পূর্বের ন্যায় তাহাদের অধীনে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল। তৃতীয় প্রকারে— যে সকল কেতাদারের এতিম সন্তান ও বেওয়া স্ত্রীরা মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের মধ্যে অল্প বয়স্ক বালকদিগকে যোগ্যতা অনুসারে অস্ত্র ও অশ্বসহ দেওয়ানে আরজে পাঠাইবার নির্দেশ দেওয়া হইল এবং অন্যান্য এতিম ও বেওয়াদের খরচাদি বাদ দিবার পর গ্রামগুলির অবশিষ্ট আয় যথারীতি দেওয়ানে আরজে জমা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। অবশ্য গ্রামগুলির কর্তৃত্বভার তাহাদের উপর ন্যস্ত রহিল না।

সুলতান বলবনের এই প্রকার ফরমান জারী করায় সুলতান শামস উদ্দিনের আমলে নিয়োজিত বহু সংখ্যক কেতাদার বিপদের সম্মুখীন হন। শহরের প্রত্যেক মহল্লায় একটা গোলমাল ও হৈ চৈ বাধিয়া যায়। বৃদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় কেতাদাররা একত্র হইয়া কয়েকটি দস্তা ও কয়েক থালা মিষ্টান্ন মালীকুল উমরা ফখর উদ্দিন কোতোয়ালের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাহারা কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহার নিকট বলিলেন যে, শামসী আমল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় ষাইট বৎসর ধরিয়া দোয়াব ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ আমাদের জায়গীর হিসাবে চলিয়া আসিয়াছে। আমরা এই গ্রামগুলি সুলতান শামস উদ্দিনের নিকট হইতে পুরস্কার হিসাবে পাইয়াছি বলিয়া জানিতাম। এইগুলির আয়ের দ্বারা আমরা পরিবারবর্গ পালন করিতাম এবং আমাদের সাধ্যানুসারে অশ্ব, অস্ত্র ও অন্যান্য লস্করী সামান দেওয়ানে আরজে পাঠাইতাম। আমরা যথাসম্ভব বাদশাহের খেদমত করিতাম এবং আমাদের মধ্যে যাহার পক্ষে সম্ভব হইত, সে সৈন্যদলের রসদ যোগাইত ও নিজে সৈন্য দলে যোগদান করিত। কিন্তু আমরা কখনও জানিতাম না যে, এই বৃদ্ধ বয়সে উহা আমাদের নিকট হইতে ফেরত চাওয়া হইবে, সিপাহসালার ও বন্ধু-বান্ধবদের বেওয়া এতিম পরিবারের জন্য বিশ তঙ্কার মাসোহারা নির্ধারণ করা হইবে এবং যুবক ও অল্প বয়স্কদের নিকট হইতে পাইকারী হারে অস্ত্র, অশ্ব ও সৈন্য দলের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ করিতে বলা হইবে। তদুপরি এইভাবে প্রায় ষাইট বৎসর পরে সুলতান শামস

উদ্দিন প্রদত্ত গ্রামগুলি ফেরৎ লওয়া হইবে এবং আমরা, যাহারা উহার উপর নির্ভর করিতাম, তাহারা নিরুপায় হইয়া রাস্তায় নামিয়া যাইব।'

তাহারা এইভাবে মালীকুল উমরার নিকট নিজেদের আবেদন পেশ করিলেন। মালীকুল উমরাও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত এবং কেতাদারদের পূর্ব খেদমত স্মরণ করিয়া অভিভূত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি যদি তোমাদের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করি, তাহা হইলে বাদশাহের সম্মুখে আমার কোন সুপারিশেরই কোন প্রভাব থাকিবে না।' মালীকুল উমরা এইরূপ বিগলিত চিত্ত অবস্থাতেই কাপড় পরিলেন এবং সবাইর দিকে অগ্রসর হইলেন। শাহী মহলে পৌঁছিয়া একান্ত বিষন্ন মুখে বাদশাহের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। সুলতান তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, নিশ্চয় কোন দুর্ভাবনার কারণ ঘটিয়াছে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, মালীকুল উমরাকে কি চিন্তাযুক্ত মনে হইতেছে? তদুত্তরে মালীকুল উমরা বলিলেন, শুনিতে পাইলাম সমস্ত বৃদ্ধ লোকের সহায়-সম্পদ ও রুজির উপায় দেওয়ানে আরজে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। ইহার ফলে আমার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কিয়ামতের বিচারে যদি বৃদ্ধদেরকে এইভাবে ফিরাইয়া দেওয়া এবং তাহারা বেহেশতে স্থান লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইবে আমার ন্যায় অকর্মণ্য ও বৃদ্ধের অবস্থা কি দাঁড়াইবে।

সুলতান বলবন তাঁহার এই উক্তিতেই বুঝিতে পারিলেন যে, মালীকুল উমরা কেতাদারদের সম্পর্কে সুপারিশ করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার এই প্রকার আবেগপূর্ণ কথায় সুলতান খুবই অভিভূত হইলেন ও কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেওয়ানে আরজের কর্মচারীদিগকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া আনিয়া কেতাদারদের অধীনস্থ গ্রামগুলিকে পুনরায় যথারীতি তাহাদের মধ্যে ফিরাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। কেতাদারদের সম্পর্কে পূর্বে যে তিন প্রকার আদেশ জারী করা হইয়াছিল, উহার মধ্যে বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ কেতাদারদের বিষয়টি পরিবর্তন করিয়া পূর্বেকার অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দান করিলেন। বর্তমান ইতিহাসের লেখক—আমার মনে আছে, এই সকল কেতাদারের অনেকেই জালালী শাসন আমলের শেষ পর্যন্ত তাহাদের এই অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা সুলতান জালাল উদ্দিনের দরবার-ই-আম-এ উপস্থিত হইতেন এবং সুলতান বলবন ও মালীকুল উমরা কোতোয়াল ফখর উদ্দিনের জন্য দোয়া করিতেন।

সুলতান বলবনের সিংহাসনে বসিবার চারি পাঁচ বৎসর পরে তাহার চাচাতো ভাই শের খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি খান হিসাবে অতিশয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সুলতান শামস উদ্দিনের মৃত্যুর পর ত্রিশ বৎসর কাল তিনি

মোঙ্গল অভিযাত্রীদের সম্মুখে ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। আমি বিশ্বস্ত লোকদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি কখনও দিল্লীতে আসেন নাই। সুলতান বলবন তাঁহার অগোচরে শরাবের পাত্রে বিষ প্রদান করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। ভাটনীরের উচ্চ গম্বুজ এবং ভাটেণ্ডা ও ভাটনীরের দুর্গ প্রতিষ্ঠাতা এই শের খান সুলতান শামস উদ্দিনের মর্যাদাশালী চল্লিশ জন দাসের অন্যতম ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককেই খান বলিয়া ডাকা হইত এবং তাঁহারা সকলেই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নাসিরী আমল হইতে শের খান বারেসান্নাম, লাহোর, দানিয়ালপুর প্রভৃতি মোঙ্গল আক্রমণের পথে অবস্থিত অঞ্চলগুলির শাসক ছিলেন। তাঁহার কয়েক হাজার সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত সৈন্য ছিল। ইহাদের সহায়তায় কয়েকবারই মোঙ্গলদের উপর প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া জয়ী হইয়াছিলেন এবং উহাদের বহু সৈন্যও বিনষ্ট করিয়া-ছিলেন। তিনি সুলতান নাসির উদ্দিনের নামে গজনীতে খোতবা পাঠ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারা সতর্ক পাহারা, বীরত্ব ও লোক লস্করের প্রাচুর্যহেতু মোঙ্গলদের পক্ষে হিন্দুস্থানের সীমান্তে আগমন সহজ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু শের খান সুলতান শামস উদ্দিনের অন্যান্য দাসদের প্রতারিত হইয়া বিনাস প্রাপ্ত হওয়ায় ভয় পাইয়া দিল্লীতে আসেন নাই। এমন কি সুলতান বলবনের সময়ও তাঁহার দিল্লীতে আগমন সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি শের খান সুলতান বলবনের চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহার অগোচরে শরাবের মধ্যে বিষ প্রদান করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর সামানা ও সান্নাম সুলতান শামস উদ্দিনের চল্লিশ দাসের অন্যতম তমর খানকে দান করেন। অন্যান্য অঞ্চলও অন্য লোকদের মধ্যে বাঁটিয়া দেন। শের খান জাট, খোকর, ভট্টী, ময়নী, মন্দাহির এবং অন্য আরও কয়েকটি জনগোষ্ঠীকে তাঁহার আয়ত্তাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার ফলেই তিনি ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ তথা মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অন্য আমীর ও কেতাদারদের পক্ষে তাহা লাভ করা সহজ হয় নাই। উপরোক্ত কারণে সুলতান বলবনের শাসক নিযুক্তির পর হইতে উক্ত অঞ্চলসমূহে মোঙ্গলদের আক্রমণ ত্বরান্বিত হয় এবং সমূহ বিপদ ঘনাইয়া আসে। শের খান যাহা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় অর্জন করিয়াছিলেন, অন্য কোন কেতাদারের জন্য তাহা আর সুলভ হইয়া উঠে নাই।

সুলতান বলবন রাজ্যের শহরসমূহকে নিজ আয়ত্তাধীনে আনয়ন, রাজ্যের শত্রু ও বিদ্রোহীদিগকে দমন এবং শের খানের স্থলে নিজের অনুগত মালীক-দিগকে নিয়োগ দান করিবার পর 'খান শহীদ' নামে খ্যাত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিয়া তাহাকে 'ছত্র' প্রদান করেন। সিন্ধু ও

তৎ পার্শ্বস্থ সমগ্র এলাকার শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন এবং বহু বিশিষ্ট খ্যাতিমান ও যোগ্য আমীর মালীকসহ তাহাকে মুলতানে প্রেরণ করেন। তৎকালে এই শাহজাদাকে 'মুহম্মদ সুলতান' বলা হইত এবং স্বয়ং সুলতান বলবন তাঁহার এই পুত্রকে 'কাআনে মুলক' খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন। সুলতান বলবনের সিংহাসনে বসিবার পর প্রথম কয়েক খান হিসাবে তাঁহার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র 'কোল' ও তৎপার্শ্বস্থ এলাকার কেতাদার ছিলেন। তিনি অতিশয় জাঁকজমক ও সাজ-সজ্জার সহিত এবং রাজ্যশাসনের যোগ্যতা ও ক্ষমতার চিহ্ন তাঁহার কপালে শোভা পাইত।

সুলতান শামস উদ্দিনের দাসদের মধ্যে অনেকেই, যাহারা খান হিসাবে বিশিষ্ট পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাহারা পুত্রদের নাম রাখেন 'মুহম্মদ'। এই সকল মুহম্মদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে জনসমাজে খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন। যেমন মুহম্মদ কশলু খান তীরন্দাজিতে সমগ্র হিন্দুস্থান ও খোরাসানে অদ্বিতীয় ছিলেন। মুহম্মদ কসীস খান, যাহাকে মালীক আলাউদ্দিন বলা হইত, তিনি দান ধ্যানে দ্বিতীয় 'হাতেম তাই' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। মুহম্মদ আরসালান খান, যাহাকে তাতার খান বলা হইত এবং লক্ষণাবতীতে অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত বসবাস করিতেন, তিনিও দানে, ত্যাগে ও বীরত্বে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মুহম্মদ সুলতান, সুলতান বলবনের পুত্র, অন্যান্য মুহম্মদ অপেক্ষা অধিকতর বিনয়ী ও মার্জিত ছিলেন। সুলতান বলবন তাঁহার এই পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। মুহম্মদ সুলতানের দরবার জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহার বয়স্যরা শাহনামা, দিওয়ানে সানাঈ, দিওয়ানে খাকানী, খামসা-এ শায়খ নিযামী পাঠ করিতেন এবং উপরোক্ত মহান ব্যক্তিদের কবিতা সম্পর্কে তাঁহার দরবারে আলোচনা করিতেন। আমীর খসরু ও আমীর হাসান তাঁহার দরবারে বেতনভোগী ছিলেন। মুলতানে তাঁহারা পাঁচ বৎসর কাল উক্ত শাহজাদার খেদমত করিয়াছেন এবং তাঁহার বয়স্য হিসাবে সম্মান, বেতন ও পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। শাহজাদার বিচক্ষণতা কতিপয় বৈঠকেই উপরোক্ত কবিদের গুণগরিমা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং ইহার ফলে তিনি তাঁহার সকল বয়স্যের মধ্যে তাঁহাদের মর্যাদা বাড়াইয়া দেন। তাঁহাদের গদ্য-পদ্য সর্বপ্রকার রচনা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তিনি যথার্থই তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ বান্ধব হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি অন্য সকল সহচর অপেক্ষা তাঁহাদের প্রতি অতিরিক্ত দয়া প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পোশাক-পরিচ্ছদ ও পুরস্কারাদি প্রদান করেন।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক, আমি আমীর খসরু ও আমীর হাসানের নিকট বহুবারই শুনিয়াছি, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এমন বিনয়ী ও গুণী শাহজাদা তাঁহারা খুব কমই দেখিয়াছেন। সারা দিন রাত্রি সিংহাসনে ও দরবারে বসিয়া থাকিলেও বিনয়ের উপবেশন ত্যাগ করিতেন না এবং কখনও জাঁকজমকের সঙ্গেও তাঁহাকে বসিতে দেখা যায় নাই। শরাব কিংবা অন্য যে কোন জলসাতে তাঁহার মুখ হইতে ঠাট্টা ও কুকথা কেহ কখনও শুনে নাই। শরাব তিনি এত অল্প পরিমাণে পান করিতেন যে, নেশাগ্রস্ত বা মাতাল হইতেন না এবং তাঁহার সকল প্রকার অঙ্গীকারই সত্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

শায়খ উসমান, যিনি একজন বুজর্গ ব্যক্তির মুরিদ ছিলেন, তিনি মুলতানে উপস্থিত হইলে খান শহীদ তাঁহার সহিত পরিচয় এবং তাঁহার প্রতি ভক্তির জন্য খুবই বিনয়ের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত শায়খকে যথেষ্ট দান দক্ষিণা প্রদান করেন। তাঁহাকে মুলতানে রাখিবার জন্য খান শহীদ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য তাঁহার জন্য একটি খানকাহ তৈয়ার করান এবং উহার খরচ পত্রের জন্য কয়েকটি গ্রামও দান করেন। কিন্তু শায়খ উসমান থাকিতে সম্মত হন নাই। একদিন খান শহীদ উক্ত শায়খ ও শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার পুত্র শায়খ কদোয়াকে তাঁহার দরবারে দাওয়াত করিয়া আনেন। তাঁহাদের মুখে কয় আরবী গজল শুনেন এবং উক্ত শায়খগণ ও অন্যান্য দরবেশরা আল্লাহর প্রেমে মত্ত হইয়া তাঁহার দরবারেই নাচিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই প্রকার নাচ ও গজল চলাকালীন সর্বক্ষণ খান শহীদ জোড় হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

খান শহীদের দরবারে বয়স্যদের মধ্যে যদি কেহ প্রাচীন কোন কবির উপদেশ মূলক কবিতা আবৃত্তি করিত তবে তিনি অন্য প্রয়োজনীয় কাজ ত্যাগ করিয়া খুবই আগ্রহের সহিত উহা শুনিতেন এবং আবেগে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেন। ইহার ফলে উপস্থিত সকলে তাঁহারা জ্ঞানের গভীরতা ও অন্তরের কোমলতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও হতবাক্ হইতেন। খান শহীদ তাঁহার এই প্রকার জ্ঞানীসুলভ আগ্রহের আতিশয্য কয়েকবারই শেখ সাদীর জন্য সিরাজ নগরে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে মুলতানে আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, শেখ মুলতানে আসিলে তাঁহার জন্য একটি খানকাও প্রস্তুত করাইবেন এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করিবেন। কিন্তু খাজা সাদী বৃদ্ধ হইয়া পড়ার জন্য আসিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁহার না আসিতে পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজ হাতে লিখিত গজল পাঠাইয়াছিলেন।

খান শহীদ সম্পর্কে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তিনি নিজে জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন, সেই জন্য জ্ঞানী ও গুণীদের সমাদর করিতে জানিতেন। যাহাদের মধ্যে জ্ঞান ও গুণের কোন পরিচয় নাই, এই কারণেই তাহারা খান শাহীদের নিকট অন্য কোন সম্মান বা বংশ মর্যাদার দাবী লইয়া উপস্থিত হইতে পারিত না। জ্ঞানের মাপকাঠিতে ও গুণের কষ্টিপাথরে তিনি সকলকে যাচাই করিয়া দেখিতেন। কবি বলিয়াছেন :—

"জ্ঞান যাহার সাথী হয় নাই, তাহার নিকট বনের সিংহ
এবং মরীচিকার সিংহ একই মূল্য বহন করে।"

আমীর খসরু ও আমীর হাসানের নিকট আমি বহুবারই শুনিয়াছি, তাঁহারা সময়ের নির্দয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলিতেন, যদি আমাদের ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইত, তাহা হইলে খান শহীদ জীবিত থাকিতেন এবং সুলতান বলবনের উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। আমাদিগকে এবং অন্যান্য জ্ঞানী ও গুণীদিগকে ধনসম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে রাখিতেন।' কিন্তু জ্ঞানীদের ভাগ্য মন্দ ছিল এবং সময়ও তাঁহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করে নাই। বস্তুত: জ্ঞানী গুণীদের সম্পদ ও শান্তি সময় কখনই দেখিতে পারে না। আর এই প্রতারক ও নীচের প্রতিপালক আকাশইবা এত সৎসাহস কোথায় পাইবে যে, এ হেন সৎ ও গুণীপালক বাদশাহকে শাহী তখতে বসাইবে এবং জ্ঞানীদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবে। প্রকৃতপক্ষে আকাশের কার্যধারা উট বিড়ালের সেই কাহিনী ছাড়া অন্য কিছু নহে। সে অসাধারণ ও অতুলনীয়-দিগকে গরীব, পরমুখাপেক্ষী, অকিঞ্চিৎকর ও অজ্ঞাত করিয়া রাখে এবং অখ্যাত অবজ্ঞাত ও হতভাগ্যদিগকে, যাহাদের ভাগ্যে ক্ষুদের ঝাউ জুটিবার কথা নহে, তাহাদিগকে অগণিত ধন সম্পদের মালীক বানায়। শূকর ও ভল্লুকের গায়ে শোভা পায় জরির পোশাক এবং কোকিল ও বুলবুলের ভাগ্যে জুটে গঞ্জনা, অনাহার, দারিদ্র্য ও পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবার গ্লানি। বিশেষ করিয়া বর্তমান ইতিহাস লেখকের সহিত সময় সময় যে প্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা যদি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে দুই খণ্ডেও সমাপ্ত হইবে না। কাজেই আকাশের অন্যায় অবিচারের কথা এই স্থলেই শেষ করিতেছি এবং উহার বিরুদ্ধে বৃথা অভিযোগ উত্থাপন না করিয়া সুলতান বলবনের কথায় ফিরিয়া আসিতেছি।

সুলতান বলবনের রাজত্ব কিছুটা স্থায়িত্ব লাভের পর খান শহীদ প্রত্যেক বৎসরেই মুলতান হইতে ধনসম্পদ ও সেবকসহ পিতার খেদমতে উপস্থিত হইতেন এবং কিছুদিন পিতার সন্নিধানে নানাবিধ আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে কাটাইতেন।

পিতা-পুত্রের মধ্যে এই প্রকার শেষ মিলনের বৎসরে খান শহীদ পিতার খেদমতে যথারীতি উপস্থিত থাকিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করিলে একদিনে সুলতান নির্জনে পুত্র খান শহীদকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে আমার পুত্র, আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। তুমি জান যে, আমি খান, মালীক ও বাদশাহ অবস্থায় ষাইট বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছি এবং এই দীর্ঘ সময়ে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। আজ আমার ইচ্ছা, আমার উত্তরাধিকারী হিসাবে তোমাকে কিছু অছিয়ত করিয়া যাই। এই প্রকার অছিয়তের নিয়ম রহিয়াছে। আমার ইচ্ছা, এইগুলি তোমার দ্বারা লিখাইয়া রাখি। যাহাতে তুমি তখতে বসিবার পর এই-গুলিকে পিতার অছিয়ত হিসাবে গ্রহণ করিতে পার এবং তদনুযায়ী কার্যাদি করিতে উদ্যোগী হও।'

এই সকল কথা বলিবার পর সুলতান বলবন কাগজ কলম আনাইলেন এবং তাহা খান শহীদের হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে পুত্র, জানিয়া লও, তোমার প্রতি আমার সমুদয় অছিয়ত দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারে সেই সকল অছিয়ত রহিয়াছে, যাহা আমি সুলতান শামস উদ্দিনের দরবারে জ্ঞানী-গুণীদের মুখে শুনিয়াছিলাম। তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞানীগুণী আমি আর দেখি নাই। আমি জানি যে, এই সকল অছিয়ত অনুসারে কাজ করিবার সাধ্য তোমার আমার কাহারও নাই। তথাপি যেহেতু এইগুলিতে রাজ্যের সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের মূল নিহিত রহিয়াছে, সেইজন্য পিতা হিসাবে আমি এই সকল মূল্যবান অছিয়ত তোমাকে দান করিয়া যাইতেছি। দ্বিতীয় প্রকারে এমন সব অছিয়ত রহিয়াছে যাহা আমাদের ও আমাদের তুল্য অন্যান্য লোকদের একান্ত যোগ্য। এই সকল অছিয়ত পালন না করিলে রাজ্যে যেমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তেমনি আমারও ইহার অভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে বিপদের সম্মুখীন হই।

প্রথম প্রকারের অছিয়ত, যাহা পূর্ববর্তী মুসলমান বাদশাহগণ পরবর্তী বাদশাহ-দের প্রতি করিয়া গিয়াছিলেন এবং সুলতান বলবন তৎপুত্র খান শহীদের লিখাইয়া লইয়া পড়িতে বলিয়াছিলেন, তাহা এই : 'হে পুত্র, আমি তোমাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিলাম। তুমি যখন বাদশাহ হিসাবে তখতে আরোহণ করিবে, তখন রাজ্য শাসনের কাজটিকে তুচ্ছ ও সহজ মনে করিও না। কারণ বাদশাহের অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিস্থল ; ইহাকে অত্যন্ত বড় মনে করিও। ইহার সহিত অন্যান্য লোক ও জনসাধারণের অন্তঃকরণের কোন তুলনা হয় না। কারণ আল্লাহ্ যদি বাদশাহের অন্তকরণের দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিতেন এবং জন মণ্ডলীকে শাসন করিবার উপযুক্ত আদেশ নিষেধ ইহার দ্বারা সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে বাদশাহের ইচ্ছা ও বাক্যের যোগ্যতা লাভ কখনই ঘটিত না।

কেননা সর্বশ্রেণীর মানুষের কাজকর্ম বাদশাহের নির্দেশেই সম্পন্ন হয় এবং সকলের প্রয়োজন একমাত্র বাদশাহই বুঝিতে সক্ষম হন। বাদশাহের অন্তঃকরণ যদি আল্লাহ্তালার দৃষ্টিস্থল না হইত, তাহা হইলে সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য তাঁহার মুখ হইতে সত্য মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ পাইত না। বস্তুতঃ বাদশাহ যদি রাজ্য শাসনের কাজটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করেন; সে গুরু দায়িত্ব আল্লাহ এক বিশেষ নিয়মে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন, উহার মূল্য না বুঝেন; যদি বিশেষ ও সাধারণ নির্বিশেষে সকল মানুষের তাঁহার মুখাপেক্ষী হওয়ার তাৎপর্য এবং তাঁহার ন্যায় বিচারের প্রতি তাহাদের একান্ত আগ্রহের মূল্য অনুধাবন না করেন; যদি তাঁহার নিজ সত্তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তুলনীয় অন্যান্য গুণাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত না করিতে পারেন; যদি তাঁহাকে এমন সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী না ভাবেন, যাহার প্রভাবে তাঁহার সমুদয় কদভ্যাস ও কুনীতি অতি সহজেই সদাচার ও সৎকাজে রূপান্তরিত হইয়া যায়; যদি রাজ্য শাসনের এমন পবিত্র দায়িত্ব ভার নীচ, কমজাত ও বিধর্মীর হাতে তুলিয়া দেন এবং যাহাকে আল্লাহ্ দুঃশীল ও দুর্ভাগা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহার পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিতে সুযোগ প্রদান করেন; তাহা হইলে তিনি আল্লাহ্‌তালার পবিত্র দানের প্রতি অবহেলা করিবেন এবং তাঁহার পবিত্র রাজ্যে অন্যায় হস্তক্ষেপের দ্বারা নিন্দিত হইবেন।

সুতরাং হে পুত্র, তুমি মনোযোগপূর্বক এবং উত্তমরূপে শ্রবণ কর; যে বাদশাহ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর অনুগ্রহের ছায়ায় স্থান পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার অশেষ দয়া ও অনুগ্রহের জন্য সর্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তাঁহাকেই তোমার অনুসরণ করিতে হইবে এবং জানিয়া লইতে হইবে। কারণ তিনি সর্বদাই প্রকাশ্যে ও গোপনে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন এবং আল্লাহতায়ালার যথার্থ মর্যাদাকে তিনি বুঝিতে সক্ষম হইবেন। সুতরাং বাদশাহ হিসাবে তাঁহার যাহা কর্তব্য, তাহা তিনি যথাযথ পালন করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং এত বেশী পরিমাণে হইবেন যে, তাঁহার চালচলন, কথাবার্তা মুসলিম জাহানের স্মরণীয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিনি নিজে পূর্ববর্তী বাদশাহদিগকে অনুসরণ করিবেন; ফলে তাঁহার কথা ও কাজ আল্লাহ্‌তালার পছন্দনীয় এবং মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে মান্য হইবে। রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় প্রতিটি কাজ তিনি এমনভাবে সম্পন্ন করিবেন, যাহাতে সকল লোক তাঁহার চালচলন, কথাবার্তা ও কাজকর্মকে শরিয়তের অঙ্গ ও জীবনের বিধান বলিয়া গ্রহণ করে এবং সর্বপ্রকার পাপকার্য ত্যাগ করিয়া পুণ্য উপার্জনে ও সৎকার্য

সাধনে তৎপর হয়। ইহার ফলে তাহারা বিশেষভাবে দুনিয়ায় আল্লাহ্তালার অনুগ্রহ এবং পরকালে মোক্ষ লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শাহী কর্তব্য তিনি এমনভাবে পালন করিবেন, যাহাতে আল্লাহ্তালা কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার শক্তি ও সম্পদ অধর্ম ও বিধর্মী উৎখাতে এবং অন্যায়, পাপ ও বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত হয়। আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের দুশমন এবং ধর্মদ্রোহীদিগকে তিনি সমূলে উৎপাটিত করিবেন। যদি এতটুক করিতে সাধ্যে না কুলায়, তথাপি তাহাদিগকে অসম্মান ও অবজ্ঞার মধ্যে রাখিবেন এবং কখনও তাহাদিগকে ধনসম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হইতে দিবেন না। অন্যায় ও পাপও যদি সমূলে উৎখাত করা সম্ভব না হয়, তবু এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে অন্যায়কারী ও পাপাচারী তাহাদের কার্যাবলীকে বিষতুল্য মনে করে। কখনও পাপের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ও অধর্মের ঘোষণাকে ক্ষমা করিবেন না। শাহী কর্তব্য তিনি এমনভাবে পালন করিবেন, যাহাতে তাহার জানা মতে ও সম্মতিক্রমে কোন বিধর্মী কোন বিষয়ে মুসলমানদের উপর কোন প্রকার প্রভুত্ব অর্জন করিতে না পারে এবং অসম্মান ও অমর্যাদার বেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া আসিবার কোন সুযোগ না পায়। অধর্মের অনুষ্ঠান ও পাপের ঘোষণা যেন প্রকাশ্যে না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।

রাজ্য শাসনের কর্তব্য তিনি এমনভাবে পালন করিবেন, যাহাতে তাঁহার রাজত্বকালে অধর্মী, বিধর্মী আর পাপাচারীরা অসহায়, অসম্মান এবং অতি জঘন্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হয়। তিনি রাজ্যের কর্তব্যকর্ম এমনভাবে পালন করিবেন, যাহাতে তাঁহার নিজের আচরণে এবং কর্মচারী ও পারিষদবর্গের আচার ব্যবহারে ন্যায় ও ইনসাফের যথার্থ স্বরূপ জগতের বুকে প্রকাশ পায়। তাঁহার রাজ্য হইতে অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ও বিবেকহীনতার মূলোৎপাটন ঘটে। তিনি রাজ্যের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করিবেন, যাহাতে তাঁহার পুণ্য স্বভাব ও তাঁহার কর্মচারী ও পারিষদবর্গের সচ্চরিত্র হইতে দেশের সাধারণ মানুষ আদর্শ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া যাহাতে তাহারা কুস্বভাব ও কদাচার হইতে বিরত থাকিয়া সৎকার্যের অনুষ্ঠানে উৎসাহী হইয়া উঠে। রাজ্যের বিচিত্র দায়িত্ব তাঁহার দ্বারা এমনভাবে প্রতিপালিত হইবে, যাহাতে ন্যায়ানুরাগী, সুবিচারক ও ধার্মিক লোক বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন এবং শরিয়তের বিধিবিধান যেন সমভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হয়। তদ্দরুন যাহাতে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ রূপ ইসলামী বিধান সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে।

রাজ্যের দায়িত্ব তিনি এমনভাবে পালন করিবেন, যাহাতে তাঁহার ও তাঁহার পারিষদ ও কর্মচারীদের ন্যায়নিষ্ঠা ও ধার্মিকতা দর্শনে রাজ্য হইতে সর্বপ্রকার প্রতারণা ও হঠকারিতা, রাজদ্রোহিতা ও ধর্মবিদ্বেষ দূরীভূত হয় এবং সাধারণ ও বিশেষ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ও পুণ্যোপার্জনের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। বাদশাহ রাজ্যের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করিবেন, যাহাতে 'বাদশাহের ধর্মই রায়তের ধর্ম'—এই প্রবাদ বাক্যটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। যেন সকলেই জানিতে পারে যে, বাদশাহ যদি ধার্মিক ও ন্যায়ানুরাগী হন এবং তাঁহার পারিষদবর্গ ও কর্মচারীবৃন্দ যদি সত্যপ্রিয় ও সদাচারী হয়, তাহা হইলে রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সদাচার ও ধার্মিকতাকে তাহাদের স্বভাবে পরিণত করিবে। কিন্তু ইহার বিপরীতে যদি বাদশাহসহ তাঁহার কর্মচারী ও পারিষদবর্গ অকাজ-কুকাজ, অন্যায়-অবিচার ও অধর্ম-কুকর্মে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে দেশের লোকও তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া সর্ব-প্রকার পাপাচারকে নিজেদের চরিত্রে রূপান্তরিত করিবে এবং পাপ ও অধর্মের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া থাকিবে।

হে পুত্র, বাদশাহের বাদশাহ ছিলেন জমশেদ; তিনি প্রায়শ: বলিতেন, 'রায়ত সর্বদাই বাদশাহের আদেশ পালন ও তাহার স্বভাব চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে এবং যাহা কিছুতে বাদশাহের উৎসাহ ও আসক্তি লক্ষ্য করে, তাহা পুণ্য হউক, পাপ হউক, ভাল হউক বা মন্দ হউক—দ্বিধাহীন চিত্তে তাহাই গ্রহণ করে।' সুতরাং বাদশাহ রাজ্যের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করিবেন, যাহাতে দেহের সমৃদ্ধি অপেক্ষা অন্তরের সৌন্দর্য অধিকতর বৃদ্ধি পায়। কারণ তাঁহার জানা উচিত যে, অন্তরের সৌন্দর্যের উপরই পরকালের সুখ ভোগ ও সম্মান নির্ভর করিতেছে। বাহ্যিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সধর্মী অধর্মী, হিন্দু মুসলমান, বাদশাহ ফকির আর ধনী নির্ধন সকলেই সমান। কাজেই বাদশাহের উচিত অন্তরের সুষমা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য তাঁহার অধীনস্থ সকল ব্যক্তির সমবায়ে যথাসাধ্য যত্ন করা। কারণ কেবলমাত্র ইহার মাধ্যমেই তিনি রাজ্যের গুরুদায়িত্ব অধিকতর যোগ্যতার সহিত পালন করিতে সমর্থ হইবেন।

হে আমার প্রিয়, পুত্র, এই সমুদয় বিষয় হইতে ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, বাদশাহীর সাফল্য দায়িত্ব পালনের গুরুভার বহন একমাত্র হজরত উমর ও উমর ইবনে আবদুল আজিজের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব ছিল। আমাদের ন্যায় দাসানুদাস নগণ্যদের সেই শক্তি কোথায়, যদ্বারা এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকারের অছিয়তগুলি আমাদের ন্যায় দাস ও দাসানুদাসদের জন্যই একান্ত উপযুক্ত বিষয়। হজরত মুহম্মদ মোস্তফা (দ:)-র উম্মত পূণ্যবান বাদশাহগণ, যাঁহারা কথায় ও কাজে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন এবং ইসলামের পতাকাকে সর্বত্র আকাশচুম্বী করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের অনুপাতে আমাদের জন্য এই দ্বিতীয় প্রকারের অছিয়ত অধিকতর উপযোগী। অতএব এই প্রকারের অছিয়ত হিসাবে যাহা তোমার দ্বারা শিখাইতে যাইতেছি, তাহা হইল এই :

হে পুত্র, ঘরে ও বাহিরে, দরবারে ও হারেমে সর্বদা শাহী জাঁকজমকের সহিত অবস্থান করিবে। বাদশাহ হইলেন আল্লাহর প্রতিনিধি—এই কথার মূল্য বুঝিতে যত্ন করিবে এবং শাহী আচার-আচরণ, আদব-কায়দা ও ইজ্জত সম্মান রক্ষা করিতে কখনও অবহেলা করিবে না। নিজের স্ত্রী-পুত্র, চাকর-চাকরানী, পারিষদ, বয়স্য তথা কাহারও সম্মুখে নিজকে হালকা করিয়া প্রকাশ করিবে না। কারণ এই কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ যে, যে ব্যক্তি নিজ গৃহে দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে না, সে বাহিরেও তাহাতে অধিকতর অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তোমার উঠা বসা, চলাফেরা ও মেলামেশা যেন সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য, খ্যাতিমান, পুন্যবান, বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ ও সদাচারী ব্যক্তিবর্গের সহিত হয় এবং তোমার সম্মান প্রদর্শন ও অর্থপ্রদান যেন তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। ইহার ফলে ধর্ম ও রাজ্য শাসনে তোমার যোগ্যতা প্রতিপন্ন হইবে এবং এই শ্রেণীর মহৎ লোকদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য দুনিয়াতে খ্যাতি ও আখেরাতে মুক্তিলাভ ঘটিবে! সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিমানদের প্রতি অনুগ্রহের ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে কোনপ্রকার লজ্জা পাইতে হইবে না। হাজার বার, হাজার হাজার বার সাবধান করিয়া বলিতেছি, বোকা, মূর্খ, নীচ, অকৃতজ্ঞ, অনাচারী, অবিনয়ী, নিষ্ঠুর পরস্বাপহরণকারী, অধর্মী ও ধর্মহীনদিগকে নিজের আশেপাশে স্থান লাভ করিতে দিও না। ইহাদের প্রতি সম্মান প্রদশন এবং ইহাদের কোন প্রার্থনা যেন তোমার দরবারে গৃহীত না হয়। এইরূপ কোন কিছু ঘটিলেই এই প্রকার নীচ ও অধর্মচারীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং ইহাদের সহিত মেলামেশার জন্য তোমাকে এই দুনিয়ায় অখ্যাতি ও কাল আখেরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। সাবধান, ইহাদের সুখশান্তি বিধানের মাধ্যমে যেন তোমার নিজের জীবন বিপন্ন না হইয়া পড়ে।

হে আমার প্রিয় পুত্র, ইহা নিশ্চিত জানিও, ইহা নিশ্চিত জানিও, ইহা নিশ্চিত জানিও যে, নীচ, মিথ্যাচারী, অধর্মী ও ধনগর্বীদিগকে কোন কাজে নিযুক্ত করা একান্তই অনুচিত এবং তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাহাদের

মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণ করা নিজের লজ্জা ও অসম্মান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যদি কোন নীচ ও অধর্মী কর্তৃক অতীতে তুমি উপকৃত হইয়া থাক, তবে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পার ; কিন্তু সাবধান, তাহাকে তোমার পরিষদ কিংবা বয়স্য হিসাবে কখনও গ্রহণ করিও না। এই শ্রেণীর লোকদিগকে রাজ্যের সম্মানিত আসনে স্থান দিলে তজ্জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। সাবধান যদি তুমি সাম্রাজ্যের সম্মান ও নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হও, তাহা হইলে নীচ কুলজাত, অধর্মচারী ও হীনমনাদিগকে কোনপ্রকার দায়িত্ব অর্পণ এবং তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কখনই তোমার জন্য উচিত হইবে না ; বরং ইহাদিগকে বিতাড়িত ও বিনাশ করাই তোমার রাজ্যের জন্য মঙ্গল। ইহকালের সম্মান ও পরকালের মুক্তির বিন্দুমাত্র আশা থাকিলেও ইহাদিগকে সর্বদা দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

হে পুত্র, দ্বিতীয়তঃ এই কথা জানিও যে, রাজত্ব ও সৎসাহস একটি অপরটির পরিপূরক ; এমন কি সৎসাহসকেই রাজত্ব বলা যাইতে পারে। কাজেই রাজত্ব করিতে গেলে সৎসাহস থাকা অতীব প্রয়োজনীয় ; যাহাতে সৎসাহসই বাদশাহ হইতে পারে এবং বাদশাহ প্রয়োজনীয় সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারে। যদি দান ধ্যান, মহত্ব ও মহানুভবতার দিক হইতে বাদশাহ এবং প্রজা তথা অন্যান্য সাধারণ লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে ; যদি তাঁহার শাসন ক্ষমতার বিশেষ মর্যাদা না থাকে ; তাহা হইলে এই শ্রেণীর বাদশাহ কর্তৃক দায়িত্বভার বহনের যোগ্যতা অর্জন করা একান্তই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বাদশাহের বিশেষ বিশেষ গুণের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতা, বীরত্ব ও মহত্ব থাকিবেই এবং তাহাকে প্রজাদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে। সর্বপ্রকার কার্য এমনভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে তাহার কাজকর্ম, কথাবার্তা, চলাফেরা, উঠাবসা—সর্বত্র উন্নত মনের পরিচয় প্রকাশ পায়। কারণ উন্নত হৃদয়ের অধিকারী ব্যতীত কেহ যথার্থ বাদশাহ হইতে পারে না। কারণ রাজ্য চালনায় এই সকল গুণের একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্বে আসা সম্ভব নহে।

হে আমার পুত্র, জানিয়া রাখ যে, রাজত্ব কতিপয় বিষয়ের কল্যাণে স্থায়িত্ব লাভ করে। যদি এই সকল বিষয়ে গোলযোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে রাজত্বের বিশৃঙ্খলা ও বিনষ্টি অনিবার্য হইয়া পড়ে। বিষয়গুলি এই : ন্যায়নিষ্ঠা ও দয়া, ধনসম্পদ ও জনবল, রায়তের ভক্তি ও বিশ্বাস এবং মহত্বের অধিকারী পরিষদ ও বয়স্য। যদি বাদশাহের ন্যায় নিষ্ঠা ও দয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার রাজত্বের অন্যায় অবিচার দেখা দিবে ; ইহার রাজ্যের স্থায়িত্ব বিনষ্ট হইবে।

ধনসম্পদ ও জনবলকে বাদশাহের দুইটি হাত বলা যায় ; ইহাদিগের যে কোন একটির অভাবেও বাদশাহী টিকিতে পারে না। যদি প্রজাদের মধ্যে বাদশাহের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে তাহারা বাদশাহের কাজ ও কথার বিরূপ সমালোচনা করিতে তৎপর হয় এবং পরস্পর অনৈক্যের মধ্যে জড়াইয়া পড়ে ; ইহার ফলে রাজত্বসমূহ বিপদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়। পারিষদ ও বয়স্য ছাড়াও বাদশাহ সঠিকভাবে রাজ্য শাসন করিতে সক্ষম হন না। তদুপরি যদি এই সকল লোক নীচ প্রকৃতির ও অধর্মাচারী হয়, তাহা হইলে তাহাদের অন্যায় অবিচার ইহ জগতেই বাদশাহকে লজ্জিত ও দুর্বল করিয়া ফেলে।

হে পুত্র, যদি প্রথমেই চিন্তা কর, যোগ্য ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তাহার বংশ মর্যাদা সঠিক বিচার কর, কেবলমাত্র তাহা হইলেই তাহাকে গুরুপূর্ণ পদের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পার। মনে রাখিও একবার কাহাকেও ঐরূপ পদ দান করিলে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিতে তাহা হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া যাইবে না এবং কোন অপরাধের দরুন তাহাকে শাস্তি দিতে হইলেও তাহার পদমর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন নিষ্ঠাবান লোভী পারিষদকে অত্যাচার অবিচারের দ্বারা তোমার শত্রু ও অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিও না। গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিতে গিয়া কখনই তাড়াতাড়ি করিও না। কারণ যে রাজ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শাস্তি পায় এবং তাহাদের দৈহিক বা আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোন চেষ্টা করা হয় না, সেখানে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হাতেই রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। সাবধান, তোমার দরবারে যেন কোন পরচর্চাকারী বা নিন্দুকের স্থান না থাকে। ইহাদিগকে তোমার আশে-পাশে আসিতে দিলে অনুগত পারিষদ ও বয়স্যদের অনেকেই তোমার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিবে এবং তাহাদের অন্তর হইতে নিরাপত্তার ভাব চলিয়া যাইবে। যে সকল লাভজনক কার্য করিতে ইচ্ছুক হও তৎসম্পর্কে পূর্বাহ্নেই চিন্তা করিয়া দেখিবে। কারণ ক্ষতিকর কোন কার্যের ফলে লোকের অন্তর হইতে তাহার কার্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দূরীভূত হইবে। অথচ এই শ্রদ্ধার ভাবই বাদশাহীর মূল শক্তি। ইহা ব্যতীত পরিচালনা কখনই সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

সাবধান হাজার বার সাবধান হও যাহার কথায় ও কাজে সম্মানের অভাব তাহার নিকট যাইও না। তুমি আক্রান্ত না হইলে কোন নীচ বা হেয় জনপদের উপর সৈন্য পরিচালনা করিও না। যেসকল কাজ অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, তেমন কাজে তুমি নিজে যাইও না। যদি সম্ভব হয়, নিজের মত আগে প্রকাশ করিও না এবং মন্ত্রণাদাতাদের সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যের

পরিকল্পনা গ্রহণ করিও না। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তিকে নিষ্ঠাবান অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও আপন বলিয়া মনে হয়, ততক্ষণ তাহাকে রাজ্যের মন্ত্রণাদাতা এবং রাজ্যশাসন রহস্যের অংশীদার করিয়া লইও না। নিজের পুত্র, ভাই, পারিষদ, সাহায্যকারী, কেতাদার, ওলী, কারকুন, আমলা, চাকর-নফর ও প্রজাদের সম্পর্কে উদাসীন ও অমনোযোগী থাকিও না। লোকের স্বভাবের ভালমন্দ জানাকে রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক বলিয়া মনে করিও। কারণ তোমার অগোচরে সংঘটিত কার্যাবলীর উপরই তোমার রাজ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ভরশীল।

হে পুত্র, রাজ্যের সকলপ্রকার আয়-ব্যয় সম্পর্কে তোমাকে অবহিত থাকিতে হইবে। আয়ের অর্ধেক ব্যয় করিবে এবং বাকী অর্ধেক সঞ্চয় করিবে; যাহাতে প্রয়োজনের সময় তাহা কাজে লাগিতে পারে। প্রয়োজনীয় খরচই করিবে; অপব্যয় করিবে না। কারণ 'আল্লাহ্ অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।' আদায়পত্রের ব্যাপারে যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। যখনই কোন অতিরিক্ত সম্পদ বা রাজ্য হস্তগত হয়, তখন যথাবিহিতভাবে সৈন্যদল, প্রজাবৃন্দ ও ব্যবসায়ীদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। পথের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে অবশ্যকরণীয় বলিয়া জানিবে এবং শরিয়তের আদেশ নিষেধ প্রবর্তন করাকে একান্ত জরুরী বলিয়া বিবেচনা করিবে। সৈন্য, প্রজা, কর্মচারী তথা সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে যাহারা পূত চরিত্র, দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ, একমাত্র তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, নিজেকে তাহাদের একজন বলিয়া ভাবিবে এবং সকলপ্রকার আচার-আচরণে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করিবে। তাহাদের প্রতি যথাসম্ভব ক্রোধ বা উষ্মা প্রকাশ ও দুর্ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকিবে। কারণ ইহার ফলে সকলের মনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। অন্যদিকে খুব সাধারণ, সহজ, বিলাসী ও কোমল স্বভাবেরও পরিচয় দিবে না। কারণ ইহার ফলে একান্ত অনুগত ব্যক্তিও বিদ্রোহ করিতে সাহস পাইবে এবং অধর্ম ও অকাজ মানুষের স্বভাবে পরিণত হইবে। পরিণামে রাজ্যের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধর্মহীনতার আবির্ভাব ঘটিবে। আমাদের পূর্বসূরী জ্ঞানীগণ বলিয়া গিয়াছেন 'শাসনকর্তার এইরূপ মিষ্ট হওয়া উচিত নহে, যাহাতে পিপীলিকার আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়।' তাহারা আরও বলিয়াছেন, 'তাহাকে এইরূপ মিষ্ট হইলে চলিবে না, যদ্দরুন যে কেহই গিলিয়া খাইতে উদ্যোগী হয় এবং অনুরূপভাবে এমন তিক্ত হইলে চলিবে না, যাহাতে সকলেই থুথু করিয়া ফেলিয়া দেয়। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সহিত নিজকে সুশোভিত করিবে এবং হঠকারিতা ও অস্থিরতাকে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কদাচ স্থান দিবে না।'

হে পুত্র, সর্বদা নিজেকে রক্ষা করিবে। যে সকল লোক অপরিণামদর্শিতার কারণে, লোভ ও লালসার প্ররোচনায় নিজেদেরকে অগাধ জলে কিংবা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না, তেমন লোকের নিকট হইতে যথা-সাধ্য দূরে থাকিবে। নিজের দরবার নিষ্ঠাবান রক্ষী ও সুযোগ্য পারিষদবর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ ও সুশোভিত করিয়া রাখিবে। নিজ রাজ্যকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে করিবে। এই অসামান্য ধনসম্পদ ও সুপ্রচুর শক্তির মধ্যে নিজেকে অতিশয় যত্নে আখেরাতের আজাব হইতে মুক্তিলাভের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিলে নিজের ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে সদয় থাকিবে এবং কোন লোকের কুপরামর্শে তাহার প্রতি বিরূপ হইবে না। তাহাকে নিজের দক্ষিণ হস্ত বলিয়া ভাবিবে এবং যে রাজ্য আমি তাহাকে দিয়া যাইতেছি, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। তুমি জান যে, তোমাদের দুইজন ব্যতীত আমার অন্য কোন সন্তান নাই ; কাজেই তোমাকে তোমার ভাইয়ের সহিত এমনভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, যাহাতে আমার বংশ ধারা লোপ না পায়।

সুলতান বলবন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই সকল অছিয়ত যথাযথ পালন করিবার জন্য বারংবার তাগিদ করিলেন এবং শাহী মর্যাদার সহিত তাহাকে মুলতানে ফেরৎ পাঠাইলেন।

যে বৎসর সুলতান বলবন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রচুর অছিয়ত এবং প্রচুরতর উপঢৌকনসহ মুলতানে ফেরৎ পাঠান, সেই বৎসরেই নাসির উদ্দিন উপাধিধারী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বগরা খানকে সামানা ও সান্নাম এবং তৎপার্শ্বস্থ সমস্ত অঞ্চল কেতাদারগণসহ প্রদান করেন ও তাহাকে সামানাতে পাঠান। বগরা খানও খুবই মার্জিত রুচির অধিকারী ও সভ্য ছিলেন। অবশ্য অন্যান্য সকল গুণের দিক হইতে তাহার বড় ভাইয়ের সহিত তাহার কোন তুলনাই চলিত না। সুলতান বগরা খানকে সামানা যাইবার আদেশ দিয়া তাহার উদ্দেশ্য বলিয়াছিলেন, বগরা খান তথায় পৌঁছিয়া যেন তাঁহার পুরাতন পারিষদবর্গের বেতন বৃদ্ধি করে এবং বর্তমানের অনুপাতে যেন দ্বিগুণ পারিষদ গ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে পরিচিত, বিশ্বস্ত ও রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তিকে আমীর পদে নিযুক্ত করিয়া যেন তাহাদিগকে কেতা বা জায়গীর প্রদান করেন ; সামানার সৈন্যদলকে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোক দ্বারা সুসজ্জিত করেন এবং মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

বগরা খান যেহেতু জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন না, সেই-জন্য সুলতান তাহাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কোন কার্য করিতে গিয়া অস্থিরতা প্রকাশ না করেন ; রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের

পরামর্শ গ্রহণ করেন ; কোন বিষয়ে অসুবিধা দেখা দিলে, তাহা যথারীতি সুলতানকে জানান এবং উক্ত বিষয়ে তিনি যাহা নির্দেশ দেন, তদনুযায়ী কার্য করেন। সুলতান বগরা খানকে মদ্যপান করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, 'সামানা অঞ্চলটি বেশ বড়, তথায় কার্যোপযোগী জনবলের সংখ্যাও প্রচুর ; এইগুলির শৃঙ্খলা বিধানের দিকে দৃষ্টি না দিয়া তুমি যদি স্বভাবানুযায়ী মদ্যপান ও আরাম আয়েশে দিন কাটাও, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি তোমাকে পদচ্যুত করিব, পুনরায় কোন অঞ্চল তোমার দায়িত্বে অর্পণ করিব না এবং তোমাকে বেকার দলের মধ্যে স্থান লাভ করিতে হইবে।'

সুলতান বলবনও এই পুত্রের কার্যাবলীর সংবাদ সংগ্রহের বহু চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং যথাসম্ভব তাহার সকল কার্য বিচার করিয়া দেখিতেন। এই প্রকার সতর্কতার জন্য বগরা খানও মদ্যপান ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তৎকালে 'বিয়াস' অঞ্চলের মধ্য দিয়া মোঙ্গল অশ্বারোহীরা অনেক সময় যাতায়াত করিত। সুলতান এই সংবাদ পাইয়া তাহাদের চলাচল বন্ধ করিবার জন্য মুলতান হইতে খান শহীদ, সামানা হইতে বগরা খান এবং দিল্লী হইতে মালীক বারবেক বখতেরসের নাম তালিকাভুক্ত করেন। তাহারা একত্র হইয়া বিয়াস (বিপাশা) জলাভূমি পর্যন্ত গমন করিয়া মোঙ্গলদের দৌরাত্ম দূর করেন এবং বারংবার উহাদের উপর জয়ী হন। ইহার ফলে মোঙ্গলদের ঐ এলাকায় আগমন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ উপরোক্ত তিনটি সৈন্যদলের মোকাবিলা করিবার মত ষোল সতের হাজার অশ্বারোহী উহাদের ছিল না।

সুলতান বলবনের রাজত্বকালের পনের ষোল বৎসর গত হওয়ার পর যখন শহর ও প্রদেশগুলির শাসনব্যবস্থা অনেকটা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে ; বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মূলোৎপাটনের কার্য শেষ হইয়াছে ; কেতাসমূহের কেতাদার ও শাহজাদাদের পারিষদবর্গ নির্ণীত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে এবং রাজ্যের সকল উচ্চপদে সুলতান বলবনের সহায়ক ও অনুগত ব্যক্তিবর্গ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ; তখন লক্ষণাবতী হইতে তুগরিলের বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদ রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। এই তুগরিল জাতিতে তুর্কী দাস ছিল ; বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, বীরত্ব, দানশীলতা প্রভৃতি বিষয়ে খ্যাতিমান হইয়া উঠিলে সুলতান বলবন তাঁহাকে বাঙ্গালা ও লক্ষণাবতীর শাসক পদে নিযুক্ত করেন। অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লক্ষণাবতীকে 'বলগাকপুর' (বিদ্রোহী অঞ্চল) বলিয়া ডাকিতেন। প্রাচীনকাল অর্থাৎ সুলতান মুয়েজউদ্দিন মুহম্মদের দিল্লী অধিকার করিবার পর হইতে দিল্লীর বাদশাহগণ যে সকল লোককে লক্ষণাবতীর শাসক পদে নিযুক্ত

করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে; যাহারা বিদ্রোহ করে নাই, অন্য লোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে। ইহার কারণ দিল্লী হইতে লক্ষণাবতী অনেক দূরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালা অঞ্চলটিও বহু দূরে বিস্তৃত। ফলে অনেকদিন হইতেই বিদ্রোহ ঘোষণা এই অঞ্চলের লোকজনের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে এবং যে কোন শাসক এই অঞ্চলে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার বিদ্রোহী জনসাধারণ তাহাকে কেন্দ্রের বিরোধী করিয়া তোলে।

তুগরিল লক্ষণাবতীতে পৌঁছিবার পর যখন কয়েকটি ব্যাপারে খুবই সাফল্য লাভ করিল এবং হাজী নগর বিজয়ের ফলে মালমাত্তা ও হাতী ঘোড়ায় সম্পদের প্রাচুর্য ঘটিল, তখন উক্ত ধনসম্পদ তাহার ভোগে আসিবার পূর্বেই বিদ্রোহীরা তাহাকে পরামর্শ দিল যে, সুলতান বলবন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার উভয় পুত্রকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ এমন কোন বৎসর নাই যে, মোঙ্গলরা হিন্দুস্থানে আসে না এবং তাহাদের দ্বারা কোন না কোন জনবসতির ক্ষতি সাধিত হয় না। মোঙ্গলদেরকে প্রতিরোধ করা ও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন দিল্লীর বাদশাহদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুলতান বলবন ও তাহার পুত্রদয় উক্ত কাজ ত্যাগ করিয়া কখনই লক্ষণাবতী আসিবেন না। অন্যদিকে হিন্দুস্থানের বাদশাহদের এত ধনবল ও জনবল নাই যে, সকল দিক রক্ষা করিয়া তোমার বিরুদ্ধে লক্ষণাবতীতে সৈন্যদল প্রেরণ করিবেন। সুতরাং তুমি রাজছত্র গ্রহণ করিয়া নিজেও বাদশাহ হও।

এইভাবে দুষ্ট লোকদের প্ররোচনায় তুগরিল সুলতান বলবনের বশ্যতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুগামী হইয়া পড়িল। সে বয়সে যুবক এবং বেপরোয়া স্বভাবের ছিল। বহুদিন হইতেই তাহার মগজে বাদশাহীর খুন ঢুকিয়াছিল। ইহার ফলেই সে সুলতান বলবনের ক্রোধ ও শাস্তির কথা ভুলিয়া গেল এবং নগর হইতে প্রাপ্ত হাতী ঘোড়া ও ধনসম্পদ দিল্লীতে না পাঠাইয়া নিজের অধীনেই রাখিয়া দিল। অহংকারের বশবর্তী হইয়া রাজছত্র গ্রহণ করিল এবং নিজেকে 'সুলতান মুগীস উদ্দিন' বলিয়া ঘোষণা করিল। তাহার নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রাও প্রচলিত করিল। তুগরিলের দানশীলতা ও দরাজ হাতের জন্য স্থানীয় শহরের লোকজন পূর্ব হইতেই তাহার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিল, এখন ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার লোভে তাহারা অপরিণামদর্শী হইয়া উঠিল এবং সুলতান বলবনের শক্তি ও বীরত্বের যে খ্যাতি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া তুগরিলের অনুগামী হইয়া পড়িল।

সুলতান বলবনের নিকট তাঁহার প্রতিপালিত দাস তুগরিলের এই প্রকার বিদ্রোহ একান্ত অসহ্য বোধ হইল এবং তজ্জনিত ক্রোধের দরুন তাঁহার আহার নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। লক্ষণাবতী হইতে তুগরিল কর্তৃক খোতবা, মুদ্রা প্রচলন এবং অন্যান্য দান ধ্যানের কথা যেমন অনবরত দিল্লীতে পৌঁছিতেছিল, সুলতান বলবনের ক্রোধও সেই অনুপাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল যে, তাঁহার সম্মুখে কেহ কোন দরখাস্ত পেশ করিতেও সাহস করিত না। তিনি দিবা রাত্র তুগরিলের সংবাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিতেন। এই অবস্থায় সুলতান বলবন প্রথমবারের মত স্বীয় দাস আয়তগীন মুয়ে দরাজকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। আয়তগীনকে আমীন খান বলা হইত; ইনি বহু বৎসর আওধের শাসকপদে নিযুক্ত ছিলেন। সৈন্যদলের যোগ্যতার দিক হইতে তাহার খ্যাতি ছিল। তাহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া সুলতান বলবন কতলুগ খান শামসীর পুত্র তমর খান শামসী ও মালীক তাজউদ্দিনকে একের পর অন্য—এই হিসাবে দিল্লীর পক্ষ হইতে লক্ষণাবতীর শাসকপদে নিয়োজিত করিলেন।

আমীন খান তাঁহার সৈন্যদল সহ 'আবে সরাও' (সরযু নদী) অতিক্রম করিয়া যুদ্ধং দেহি মূর্তিতে লক্ষণাবতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। অন্যদিকে তুগরিলও বহু সৈন্য, হাতী ও পদাতিকসহ দিল্লীর সৈন্যদলের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইল। তুগরিলের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা বেশী ছিল। কারণ তাহার অবাধ দান ধ্যানের ফলে স্থানীয় লোকজন প্রায় সকলেই তাহার অনুগামী হইয়াছিল এবং তাহার বখশিশের লোভে দিল্লীর সৈন্যদলের অনেক কাপুরুষও তাহার বন্ধু ও সহায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে তুগরিলের হাতে আমীন খান পরাজিত হইলেন এবং দিল্লীর সৈন্যদল বিধ্বস্ত ও নির্মমভাবে হিন্দু সৈন্যদের হাতে নিহত হইয়াছিল। এই বিজয়ে তুগরিল ও তাহার সৈন্যদল খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তদুপরি এমন অনেক সম্পদলোভী, যাহারা অন্তরে অন্তরে সুলতান বলবনের অধীনতাকে ভাল মনে করিত, তাহারাও দিল্লীর সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া তুগরিলের সহিত যোগদান করিল এবং তাহার নিকট হইতে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করিল।

আমীন খানের পরাজয়ের এই সংবাদ দিল্লীতে সুলতান বলবনের নিকট পৌঁছিলে তাঁহার লজ্জা ও ক্রোধ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ও তাঁহার অন্তর হইতে দূর হইয়া গেল এবং তিনি অহেতুক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর হইলেন। আওধের কেতাদার পরাজিত আমীন খান সম্পর্কে আদেশ দিলেন, তাহাকে যেন আওধের শাহী

দরজায় লটকাইয়া দেওয়া হয়। তৎকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁহার এই প্রকার কুশাসন দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বলবনী সাম্রাজ্যের অবসান আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আর বেশী দিন স্থায়ী হইবে না।

সুলতান বলবন পরবর্তী বৎসরে অন্য একটি সৈন্যদল নির্দিষ্ট করিয়া হিন্দুস্থানের সৈন্যসহ উহাকে লক্ষণাবতীর দিকে প্রেরণ করিলেন। তুগরিল আমীন খানকে পরাজিত করিবার পর খুবই সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার শক্তি সামর্থও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ লক্ষণাবতী হইতে অগ্রসর হইয়া দিল্লীর সৈন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল এবং এই সৈন্যদলকেও পরাজিত করিয়া বিধ্বস্ত করিল। এইবারও দিল্লীর বহু সৈন্য তুগরিলের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল এবং তাহার নিকট হইতে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার এই পরাজয়ের সংবাদ দিল্লীতে সুলতান বলবনের নিকট পৌঁছিল। ইহার ফলে তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল এবং জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তর যথার্থই পুড়িতেছিল; অবশেষে তিনি তুগরিলের বিনাস সাধনে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং নিজে সৈন্যদল পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সৈন্য সহ যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি যমুনা ও গঙ্গায় বজরা ও নৌকা প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর সৈন্যদলসহ তিনি লক্ষণাবতী আক্রমণের জন্য বাহির হইয়া শিকারের ছলে সামানা ও সান্নামের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং এই অঞ্চলটির একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত শাহী দাপটে প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। আমীরদিগকে যথাবিহিত নির্দেশ দিলেন এবং সেরজানদার মালীক সুঙ্গকে সামানার প্রতিনিধি ও সৈন্যদলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। বগরা খানকে একটি বিশেষ সৈন্যদল সহ শাহী পতাকার অনুসরণ করিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সুলতান বলবন সসৈন্যে সামানা হইতে দোয়াব পৌঁছিলেন এবং গঙ্গা পার হইয়া লক্ষণাবতীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র খান শহীদের নিকট মুলতানে খবর পাঠাইলেন, 'আমি এখন লক্ষণাবতীর পথে। সুতরাং ঐদিক সম্পর্কে এখন তোমাকেই সমুদয় সংবাদ রাখিতে হইবে এবং যথা সম্ভব তুমি মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। সামানায় সৈন্যদলকে তোমার অধীন করিয়া আসিয়াছি।' সুলতানের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী দিল্লীর কোতোয়াল মালীকুল উমরাকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধি হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, 'আমি তুগরিলের পিছনে চলিলাম। সে আমার ভয়ে যেখানে যাইয়া উপস্থিত হউক না কেন, তাহার ও তাহার সঙ্গী সাথীদিগের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতীত আমি ফিরিব

না। দিল্লীকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। তোমার দায়িত্ব উত্তমরূপে বুঝিয়া লও। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিবে। দেওয়ানে উজারত ও দেওয়ানে আরজের লেখকদের প্রতি এবং যাহারা তাহাদের অধীনে কাজ করে, তাহাদের সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। চতুর্দিকের আমীর ও কারকুনদের দরখাস্তের উত্তর তোমার বিবেচনা অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবে; যাহাতে তাহারা আমার অভাব বোধ না করিতে পারে। সাধারণ প্রজাদের কাজকর্ম যেন ব্যাহত না হয় এবং কর্মচারী নিয়োগ ও পদচ্যুতির ধারাও যেন পূর্ববৎ অবাধে চলিতে থাকে।'

এইরূপ ব্যবস্থাদি করিয়া সুলতান বলবন চতুর্দিকের সৈন্য দলকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন এবং ক্রমাগত রাত্রিদিন চলিয়া লক্ষণাবতীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অত্যধিক অপমানবোধ ও ক্রোধের দরুন তিনি বর্ষাকালের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। এইজন্য অযোধ্যা পৌঁছিবার পর এই সম্পর্কে একটি সাধারণ ফরমান জারী করিলেন। ইহার ফলে অশ্বারোহী, পদাতিক, ধানুকী, কুঠারী, তীরান্দাজ, পাইক বরকন্দাজ, চাকর নফর, বাজারী, সওদাগর প্রভৃতি মিলাইয়া প্রায় দুইলক্ষ লোকের নাম শাহী দপ্তরে লিপিবদ্ধ করা হইল এবং সৈন্য সংখ্যার অনুরূপ বহু সংখ্যক বজরাও সংগৃহীত হইল। কিন্তু সুলতান এই বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ সরযূ নদী পার হইবার পরই বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং পূর্ণ্য-মাত্রায় বর্ষাকাল দেখা দিল। সুলতানের নির্দেশে যদিও বহু সংখ্যক বজরা সংগৃহীত হইয়াছিল, তথাপি লোক সংখ্যার আধিক্য, নদী ও জলাভূমির প্রাচুর্য এবং অবিরত বৃষ্টির জন্য দশ বার দিন সৈন্য দলের অগ্রগমন সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইল।

সুলতান বলবনের এইরূপ সৈন্যসহ আগমনের সংবাদ পাইবার পূর্বে তুগরিল তাহার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদিগকে বলিয়াছিল যে, সুলতান ব্যতীত অন্য যে কেহ সৈন্যসহ লক্ষণাবতীতে আসিবে, তাহার সম্মুখীন হইতে আমি দ্বিধা করিব না। কিন্তু যদি সুলতান স্বয়ং দিল্লীর গুরুদায়িত্ব ত্যাগ করিয়া সৈন্যসহ এখানে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখীন হওয়া বা তাঁহার সৈন্যদলের দাপট সহ্য করা আমার সামর্থের বাহিরে। সুতরাং সে যখন শুনিতে পাইল যে, স্বয়ং সুলতানই সৈন্য সহ লক্ষণাবতীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তখন সে যথার্থই পলায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। পথে বৃষ্টির জন্য সৈন্যদলের অগ্রযাত্রা অতি-মাত্রায় ব্যাহত হইবার ফলে সে আরও সুযোগ লাভ করিল। অন্যদিকে সুলতান বলবনের শাস্তির ভয়ে তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্য হইতে বহুলোক পলাইতে আরম্ভ করিল। তথাপি তুগরিল তাহার অবশিষ্ট বন্ধুবান্ধব, সৈন্য, কর্মচারী প্রমুখদিগের পুত্র পরিজন এবং সুলতানের শাস্তির ভয় ও সোনা রূপার প্রলোভন দেখাইয়া

লক্ষণাবতীর প্রায় সকল কর্মঠ লোককে তাহার সাথে লইয়া হাজী নগরের দিকে যাত্রা করিল এবং স্থল পথে এক মঞ্জিল অগ্রসর হইয়া রহিল।

বস্তুতঃ তুগরিল লক্ষণাবতীর সর্বশ্রেণীর লোককেই তাহার সহিত পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। তদুপরি সুলতান লক্ষণাবতীর ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ দূরে পৌঁছিলে অবশিষ্ট লোকজনও সুলতানী সৈন্যদলের অত্যাচারের ভয়ে তাহার সহিত গিয়া মিশিয়াছিল। এইভাবে তুগরিল বহু সংখ্যক সৈন্য, লোকজন ও প্রচুর ধন সম্পদ সহ হাজী নগরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পথিমধ্যে সে সঙ্গীদিগকে আরও প্রতারণা করিয়া বলিয়াছিল, 'আমরা হাজী নগরের সীমান্তে গিয়া অবস্থান করিব। সুলতান লক্ষণাবতীতে আসিয়া কিছুদিন থাকিবার পর আর অগ্রসর হইবেন না; বরং সেখান হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। যখনই শুনিব যে, সুলতান ফিরিয়া গিয়াছেন, তখনই আমরা হাজী নগরের আশপাশ প্রচুর লুণ্ঠিত মালমাত্তাসহ আবার লক্ষণাবতীতে ফিরিয়া যাইব এবং সেখানে যাহাকেই তিনি স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাউন না কেন, সে আমাদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে না। বরং শুনিবে যে, আমরা লক্ষণাবতীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে পলাইয়া বাঁচিবে।' এইভাবে সে খোঁড়া যুক্তি ও প্রতারণার সাহায্যে বহুলোককে তাহার সঙ্গে লইয়া সম্মুখে আগাইয়া গেল।

সুলতান বলবন বিনা বাধায় লক্ষণাবতীতে পৌঁছিয়া মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। এখানে তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া যথা সম্ভব সত্বর তুগরিলের পশ্চাদ্ধাবন করিতে তৎপর হইলেন। বর্তমান ইতিহাস লেখকের মাতামহ সিপাহসালার উকিলেদর মালীক বারবেক হিশাম উদ্দিনকে লক্ষণাবতীর শাসক নিযুক্ত করিয়া নির্দেশ দিলেন, যেন প্রতি সপ্তাহে দিল্লীর সংবাদ এবং আমীর মালীকদিগের সর্বপ্রকার দরখাস্ত সৈন্যদলে সুলতানের নিকট প্রেরণ করা হয়।

অতঃপর সুলতান বলবন বাদশাহদের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং নিজের অন্তরকে বলিলেন, 'তুমি যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, কিন্তু আমি তুগরিলের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতীত কিছুতেই প্রত্যাবর্তন করিব না।' এই প্রকার সংকল্পে ব্রতী হইয়া তিনি দিবারাত্র সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই সোনার গাঁয়ের সীমান্তে গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে সোনার গাঁয়ের রাজা দনুজ রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সুলতান তাঁহার সহিত একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন। উক্ত চুক্তির মর্ম এই ছিল যে, তুগরিল যেন উক্ত রাজার এলাকার জলে স্থলে কোথাও থাকিতে না পারে;

বিশেষ করিয়া স্থলপথে বাধা পাইয়া যদি জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেখানেও তাহাকে বাধা দিতে হইবে।

সুলতান বলবন তাঁহার সৈন্যদিগকে একত্র করিয়া প্রায়শ: বলিতেন, 'আমি তুগরিলের পিছনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অর্ধেক ত্যাগ করিতে রাজী আছি। তুগরিল যদি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করে তথাপি আমি পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করিব না এবং তাহার ও তাহার বন্ধুদের রক্তে মাটি সিক্ত না করা পর্যন্ত ফিরিয়া যাইব না ; দিল্লীর নামও মুখে আনিব না।' সৈন্যদলের সকলেই যেহেতু সুলতানের মেজাজ ও তাঁহার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার কথা জানিত, সেইজন্য তাহারা প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সৈন্যদলের অনেকেই নিজগৃহে পরিবারবর্গের নিকট অছিয়তনামা পাঠাইয়া দিয়াছিল। শুধু সৈন্যদল নহে, শহরবাসী অন্যান্য লোকও সৈন্যদলের সঙ্গী হইয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল এবং কাসেদের মারফতে পত্রাদি আদান-প্রদান করিতেছিল।

সুলতান বলবন সসৈন্যে দিবারাত্র অগ্রসর হইয়া ষাইট সত্তর ক্রোশ দূরে হাজী নগরের সীমান্তে পৌঁছিলেন। তুগরিলের সংবাদ কেহ জানিত না এবং সে কোন দিকে কোথায় গিয়াছে ও কোথায় আছে, তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। সুলতান মালীক বারবেক বর্খতেরস সলতানীকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন সাত আট হাজার সৈন্যসহ সুলতানী ফৌজের দশ বার ক্রোশ অগ্রে গমন করেন এবং প্রতিদিন কিছু সংখ্যক অশ্বারোহীকে সংবাদ গ্রহণের জন্য দশ বার ক্রোশ অগ্রে পাঠান ; যাহাতে তাহারা তুগরিলের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে। মালীক বর্খতেরস যথা নির্দেশ অগ্রে গমন করিলেন এবং সুলতানী ফৌজ কয়েক ক্রোশ পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সম্মুখ ভাগের ঐ সকল সৈন্য, যাহাদিগকে 'ইয়াখকী' বলা হইত, যতই অগ্রে গমন করিল, যতই অগ্র পশ্চাতে ও দক্ষিণে বামে তুগরিল ও তাহার সৈন্যদলের অনুসন্ধান করিল ; ততই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং তুগরিলের কোন সন্ধানই কোথাও পাওয়া গেল না।

একদিন—কোলের কেতাদার মালীক মুহম্মদ শেরান্দাজ, তাহার ভাই মালীক মুকাদ্দর এবং 'তুগরিলকুশ'—যাহাকে 'শেরান', 'শেরমা' ও 'সফদরা' বলা হইত, —তাহাকে তুগরিলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য ত্রিশ চল্লিশ জন সৈন্যসহ মোতায়েন করা হইল। এই সকল লোক দশ বার ক্রোশ অগ্রে গমন করিয়া তুগরিলের অনুসন্ধান করিতেছিল, এমন সময় কয়েকজন শাকসবজীর ব্যাপারী তাহাদের

দৃষ্টিগোচর হইল। ইহারা তুগরিলের সৈন্যদের নিকট আনাজ বিক্রয় করিয়া নিজেদের গ্রামে ফিরিতেছিল। সৈন্যরা ব্যাপারীদিগকে পাকড়াও করিল এবং মালীক শেরান্দাজের নির্দেশে দুইজন ব্যাপারীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিল। ইহার ফলে অন্য ব্যাপারীরা ভয় পাইয়া বলিতে বাধ্য হইল যে, তাহারা তুগরিলের সৈন্য দলের নিকট আনাজ বিক্রয় করিয়াছে এবং তাহারা ঐ স্থান হইতে মাত্র অর্ধক্রোশ দূরে একটি শানে বাঁধা পুকুরের ধারে তাহাদের তাঁবু ফেলিয়াছে। যতদূর সম্ভব আগামী কল্য তাহারা উক্তস্থান ত্যাগ করিয়া জাজ নগরের দিকে গমন করিবে।

মালীক শেরান্দাজ আনাজের ব্যাপারীদের মধ্য হইতে দুইজনকে দুই তুর্কী অশ্বারোহীর হাতে সমর্পণ করিলেন এবং অগ্রগামী সৈন্য দলের সিপাহসালার মালীক বারবেকের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তুগরিলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, মালীক বারবেক যেন অতি সত্বর সসৈন্যে আগমন করেন ; নতুবা তুগরিল পলায়ন করিতে সুযোগ পাইবে। তুর্কী অশ্বারোহীরা বন্দীসহ অগ্রসর হইয়া যথাস্থানে তুগরিলের তাঁবু ও উহার চতুর্দিকে তাহার সৈন্যদলের তাঁবু দেখিতে পাইল। তুগরিল ও তাহার সৈন্যরা এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের অনেকেই শানে বাঁধা পুকুর ঘাটে কাপড় কাঁচিতেছিল, অনেকে শরাব পান করিতেছিল এবং অনেকে গানের সুর ভাজিতেছিল। হাতীগুলি গাছ হইতে ডাল ভাঙ্গিয়া আহার করিতেছিল এবং অশ্ব ও উটগুলি মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছিল। এইভাবে তুগরিলের সৈন্যরা নিশ্চিন্ত মনে আরাম করিতেছিল। তাহাদের এই অবস্থা দর্শনে তুর্কী অশ্বারোহীরা মনে মনে চিন্তা করিল—যদি তুগরিলের সৈন্যদলের কেহ আমাদিগকে দেখিয়া ফেলে, তবে তুগরিল অবশ্যই পলায়ন করিতে সক্ষম হইবে। তাহার হাতী ঘোড়া ধনসম্পদ আমাদের হাতে আসিতে পারে, কিন্তু তুগরিলের সাক্ষাত আর পাওয়া যাইবে না। এইরূপ হইলে আমরা কোন মুখে সুলতানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব এবং তাঁহার কোপদৃষ্টি হইতে আমাদের নিজেদেরকেই বা কী করিয়া রক্ষা করিব। ইহা অপেক্ষা প্রাণ হাতে লইয়া আড়ালে আবডালে অগ্রসর হইয়া তুগরিলের সৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়াই উচিত। কোন প্রকারে তুগরিলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেই তাহার শির কাটিয়া লইব। তাহা হইলে তুগরিলের কোন সৈন্য আমাদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে না। কারণ তাহারা এমনিতেই ভয়ে অস্থির হইয়া আছে ; সুতরাং আমাদের ত্রিশ চল্লিশ জনকে দেখিয়া ভাবিবে যে, শুধু ইহারাই আসে নাই, সুলতানের বাহিনীও ইহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে।

তুর্কী অশ্বারোহীরা এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোষমুক্ত তরবারী হাতে দ্রুত গতিতে তুগরিলের সৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং 'তুগরিল' 'তুগরিল' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সৈন্যদের তাঁবু ভেদ করিয়া তুগরিলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তুগরিল এই গোলমালে সতর্ক হইয়া তাহার তাঁবুর পশ্চাদ্দার দিয়া বাহির হইয়া একটি জিনপোষ শূন্য ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিল। নিকটেই একটি জলাভূমি ছিল, সেই দিকে সে সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। তাহার সৈন্যরা সুলতানী ফৌজের আক্রমণের আতঙ্কে অস্থির হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই সুযোগে মালীক মোকাদ্দর ও 'তুগরিল কুশ' তুগরিলের পিছু ধাওয়া করিল। তুগরিল প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া জলাভূমির ধারে পোঁছা মাত্রই—তুগরিল কুশ তরবারীর দ্বারা তাহার ঘাড়ে আঘাত করিবার ফলে সে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল এবং মালীক মুকাদ্দর দ্রুত ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার শির কাটিয়া ফেলিল। তাহারা উভয়ে তুগরিলের ধড়টি জলাভূমিতে ফেলিয়া দিয়া শিরটি লুকাইয়া রাখিল এবং পানির ধারে হাত মুখ ধোয়ার ভান করিয়া বসিয়া রহিল।

ইতিমধ্যে তুগরিলের পার্শ্বরক্ষীরা 'খোদাওন্দে আলম' বলিতে বলিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চতুর্দিকে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কোন কিছু ঘটিবার পূর্বেই মালীক বারবেক অগ্রগামী সৈন্যদল সহ আসিয়া পড়িলেন এবং তুগরিলের সৈন্যরা তাহা দেখিবা মাত্রই চতুর্দিকে পলায়ন করিল। মুকাদ্দর ও তুগরিল কুশ তুগরিলের শির মালীক বারবেকের সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং মালীক তৎক্ষণাৎ তুগরিলের শির ও বিজয় সংবাদ সুলতানের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

তুগরিলের পরিবার পরিজন, সঙ্গী সাথী, পারিষদ বয়স্য ও ধনসম্পদ সকলই সুলতানী সৈন্যদের হাতে আসিল। সৈন্যরা প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, হাতী ঘোড়া, ধনসম্পদ ও গোলামবাঁদী লাভ করিল। সর্ব সাকুল্যে দুই তিন হাজার স্ত্রী পুরুষ তাহাদের হাতে বন্দী হইয়াছিল।

সুলতান বলবন তুগরিলের কর্তিত শির ও বিজয়ের সংবাদ সেখানে পাইলেন, সেখানেই শিবির সংস্থাপন করিলেন। মালীক বারবেক সৈন্যদল, লুণ্ঠিত মাল ও বন্দীগণসহ যথারীতি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং পর্যায়ক্রমে তুগরিল নিধনের সকল বার্তা সুলতানের নিকট পেশ করিলেন। সুলতান বলবন মালীক শেরান্দাজের প্রতি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে, সে দুঃসাহসের সহিত আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছিল ; কিন্তু দিল্লীর সৈন্যদের ভাগ্য ও সাহসের জন্য উহার ফল শুভ হইয়াছে। এই সকল কথা বলিবার পর তিনি

ইয়াথকী সৈন্যদিগকে তাহাদের মর্যাদা অনুসারে সম্মান ও পারিতোষিক প্রদান করিলেন এবং তাহাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন। মালীক শেরান্দাজকে সন্তুষ্ট করিয়া তুগরিলকে যে সৈন্যটি প্রথম আঘাত করিয়াছিল, তাহাকে 'তুগরিল কুশ' উপাধি দান করিলেন এবং তুগরিলের শির কর্তনকারী মালীক মুকাদ্দরকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিলেন।

সৈন্যদল দীর্ঘদিন যাবত বিদেশে থাকিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এইবার তাহারা খুবই আনন্দিত হইল এবং স্ফূর্তি করিতে লাগিল। দবীরে খাস কেওয়াম উদ্দিন বিজয় বার্তা লিখিয়া দিল্লীতে পাঠাইলেন। বিজয় বার্তা জানাইবার কাজটি দবীরগণই করিতেন। দিল্লীতে বিজয় সংবাদ পৌঁছিবার পর প্রতি গৃহে উৎসব ও ভোজের আয়োজন হইল এবং সুলতান বলবনের শৌর্য ও ভীতি সকলের মনে পূর্বের তুলনায় শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

সুলতান বলবন তুগরিলের কর্তিত শির লাভের স্থান হইতে ফিরিয়া লক্ষণাবতীতে পৌঁছিলেন। সেখানে তিনি তুগরিলের সৈন্য, সঙ্গী, পারিষদ, পাইক বরকন্দাজ এবং তাহাদের পরিবার পরিজনকে ক্রোশাধিক দীর্ঘ এক বাজারের দোকানসমূহের সম্মুখে দুই সারিতে দাঁড় করাইয়া হত্যা করিতে এবং তাহাদের লাশ দরজায় লটকাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। শহরে একজন দরবেশ ছিলেন। তুগরিলের নিকট তাঁহার খুব সম্মান ছিল এবং সাধারণ লোক উক্ত দরবেশকে সুলতান দরবেশ বলিয়া ডাকিত। তুগরিল তাঁহাকে তিন মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন; যাহাতে এই দরবেশ ও তাঁহার সঙ্গীরা তাহাদের প্রয়োজনীয় লৌহ নির্মিত অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে এবং ব্যবহার করিতে পারে। সুলতান বলবনের আদেশে এই সকল দরবেশকেও হত্যা করিয়া তাহাদের শির লটকাইয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে সুলতান বলবন যে দুই তিন দিন লক্ষণাবতীতে ছিলেন, তাঁহার জাঁকজমক ও শাস্তি প্রদানের বহর দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী ভীতি বিহ্বল ও ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থের লেখক আমি অতিশয় বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ লোকজনের মুখে শুনিয়াছি, সুলতান বলবন লক্ষণাবতীতে যে ধরনের শাসন ও শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, দিল্লীর অন্য কোন বাদশাহের পক্ষে তেমন শাস্তিদান সম্ভব হয় নাই এবং তাঁহাদের সম্পর্কে অনুরূপ কঠোর শাসনের কথা কেহ কখনও শুনে নাই। দিল্লী ও দিল্লীর আশে পাশের যে সকল লোক তুগরিলের সহিত মিলিয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং সুলতানী সৈন্যদলের হাতে বন্দী হইয়াছিল, সুলতান তাহাদিগকে সৈন্যদলের সহিত দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য

আদেশ দিলেন এবং তাহাদের শাস্তিদান সেখানে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া নির্দেশ জারী করিলেন।

শাস্তিদান পর্ব শেষ হইবার পরও সুলতান তিন চার দিন লক্ষণাবতীতে অবস্থান করেন। লক্ষণাবতীর সমুদয় অঞ্চল নিজ কনিষ্ঠ পুত্র বগরা খানকে প্রদান করেন এবং তাহার যোগ্য ছত্র ও শাহী হুকুমনামা দেন। সরদার ও কেতাদারদের নিযুক্তি ও সুলতানের সম্মুখেই সম্পন্ন হয়। তুগরিলের পরিত্যক্ত যত কারখানা তাঁহার আয়ত্তে আসিয়াছিল, তৎ সমুদয়ই পুত্রকে দান করেন। বগরা খানকে নিজের সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলেন যে, বাঙ্গলাদেশ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ও নিজের শক্তি সামর্থের স্থায়িত্ব আসিবার পূর্বে সে যেন কোন জলসা না ডাকে, মদ না খায় এবং খেলাধূলায় মত্ত না হয়।

লক্ষণাবতীতে শাস্তিদান কালে একদিন সুলতান বগরা খানকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! তুমি কোথায় ছিলে? পুত্র উত্তরে বলিয়াছিল, বড় বাজারের নিকট পুরাতন মালীকদের একটি গৃহে ছিলাম। বগরা খানের নাম ছিল মাহমুদ; সুলতান বলিলেন, হে মাহমুদ, দেখিয়াছ? বগরা খান সুলতানের এই প্রকার হেঁয়ালিপূর্ণ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে সুলতান আবার বলিলেন, হে মাহমুদ, দেখিয়াছ। বগরা খান আরও অবাক হইল এবং কী উত্তর দিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তৃতীয় বারে সুলতান তাহাকে খুলিয়া বলিলেন, হে মাহমুদ, বড় বাজারে আমার প্রদত্ত শাস্তি দেখিয়াছ? বগরা খান এইবার বলিল, হাঁ, দেখিয়াছি। সুলতান বলিলেন, যদি কোন দিন কোন হারাম খোর বদমায়েশ তোমার কানে কুমন্ত্রনা দিয়া বলে যে, তুমি নিজেই বাদশাহ হও; দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার কর; সেই দিন বড় বাজারে দেখা এই শাস্তি ও হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিও এবং আমার কথা ভুলিয়া যাইও না। হিন্দুস্থানের দূরদূরান্তে অবস্থিত এইরূপ কোন প্রদেশ সিন্ধু, গুজরাট, লক্ষণাবতী, সোনার গাঁও যদি দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহা হইলে উহার এবং উহার শাসকের স্ত্রী পুত্র, পাত্রমিত্র ও সৈন্য অসৈন্য সকলের অবস্থা তেমনই হইবে, যেমন এই তুগরিলের হইয়াছে।

সুলতান বলবন ফিরিয়া আসিবার সময় একদিন অন্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীসহ বগরা খানকে নিজ খাস দরবারে ডাকিয়া আনিয়া উক্ত মহৎ ব্যক্তিদের সম্মুখে তাহাকে বলিলেন, 'হে মাহমুদ, আমি তোমার মধ্যে যোগ্যতা ও কর্তৃত্বের ভাব দেখিতে পাই বা না পাই, তাহাতে কিছু যায় আসে না; শুধু সন্তান স্নেহের বশবর্তী হইয়া এবং বাদশাহের উপযুক্ত কাজ করিতে গিয়া এই

লক্ষণাবতী ও বাঙ্গলাদেশ তোমার হাতে অর্পণ করিলাম। তুমি নিজেই দেখিতে পাইলে এই দেশ জয় করিতে কত রক্ত প্রবাহিত করিয়াছি, এই দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনিতে কতদূর ফেরআউনী করিয়াছি এবং মানুষকে কী ভাবে দরজায় দরজায় লটকাইয়া দিয়াছি। কারণ দুনিয়ার নিয়মই এই; ইহাতে আসক্ত হইলে মানুষ পাগল ও অস্থির হইয়া পড়ে এবং প্রতিটি কঠিন কাজে নিজকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করিয়া উহাকে সহজ করিয়া তোলে। কিন্তু সেই তুলনায় আখেরাতের কাজ খুবই কঠিন এবং কিয়ামতের জবাবদিহি আরও জটিল। যদি কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমিত তোমার পুত্রের অপকার্যের কথা জানিতে; মদ্যপান ও কুকাজে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলে, তাহা হইলে কেন এমন এক দূরদেশের শাসনভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলে এমন একজন কুলোককে কেন আল্লাহর বান্দা-দিগকে শাসন করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলে? তখন হে মাহমুদ, আল্লাহর সম্মুখে আমি কী উত্তর দিব?

আমি জানি যে, লক্ষণাবতী হইতে আমি পাঁচ ছয় মঞ্জিল গমন করিতে না করিতেই তুমি আয়েশ আরামে লিপ্ত এবং তোমার সাথী সঙ্গী, সৈন্য ও কর্মচারী সকলে অকাজে নিরত হইবে। যখন এই দেশের লোক দেখিবে যে, বাদশাহের দলবল, অনুচর ও অনুগামীরা মদ্যপান ও কুকাজে লিপ্ত, তখন আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই কুকাজে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। তাহারা এমন বেপরোয়া-ভাবে এই সকল কাজ আরম্ভ করিবে যে, হিন্দুদের অকর্ম, বিধর্মীদের অপধর্ম ইত্যাদি অপেক্ষাও মুসলমানদের কুকাজের তালিকা দীর্ঘ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার ফলে যেমন হিন্দুরা পুতুল পূজা করিয়া আল্লাহর নাম ভুলিয়া গিয়াছে, তেমনি মুসলমানরাও আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাইবে। আন্তরিকতার সহিত খোদার নাম উচ্চারণ করিবার জন্য একটি লোকও অবশিষ্ট থাকিবে না। এই কারণে আমাকে ও তোমাকে অনন্ত কাল দোজখে থাকিতে হইবে।

এই সকল কথা আলোচনার পর সুলতান বলিলেন, 'হে মাহমুদ, সুলতান শামস উদ্দীনের দরবারে আমি যে সকল আলেম ও বুজর্গকে দেখিয়াছি এবং যাঁহাদের কথা শুনিয়াছি; তুমি তাঁহাদের কাহাকেও দেখ নাই এবং তাঁহাদের কথাও শুন নাই। বর্তমান সময়ের আলেম ও বুজর্গ ব্যক্তিরা তদ্রূপ ধার্মিক ও খোদাভীরু নহেন যে, বাদশাহের মুখের উপর কথা বলিবেন বা তাহার অপছন্দনীয় কোন কথা শুনাইতে তাঁহারা সাহস করিবেন। আমি এক দেশে থাকিব এবং তুমি থাকিবে অন্য এক দেশে। এখানে যদি তুমি স্ফূর্তিতে নিমজ্জিত হইয়া শাসন কার্য সম্পর্কে উদাসীন হইয়া যাও, তবে তোমাকে কাঁহারা

সচেতন করিতে পরিলেও তাহা করিবে না। এই সকল কথা বলিয়া সুলতান বলবন কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং দিল্লীর দিকে যাত্রা করিবার জন্য দামামা বাজাইতে আদেশ দিলেন।

বগরা খান কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত সুলতানের সহিত গমন করিল। দ্বিতীয় দিন বগরা খানকে বিদায় দিবার কালে সুলতান শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং এশরাকের নামাজ আদায় করিবার পর অন্য কোন কাজে লিপ্ত হন নাই। তিনি তাঁহার এই খাস দরবারে অভিজ্ঞ ও বয়স্ক কয়েক জন আমীরকে ডাকিয়া আনিয়া কাগজ ও কলমসহ শামস দবীরকে হাজির করিতে বগরা খানকে নির্দেশ দিলেন; যাহাতে তিনি পুত্রের জন্য কতিপয় উপদেশ লিখাইয়া দিয়া যাইতে পারেন। শামস দবীর ও বগরাখান যথারীতি খেদমতে উপস্থিত হইলে তাহা-দিগকে সুলতান তাঁহার সম্মুখে বসিতে আদেশ দিলেন। সুলতান উপস্থিত আমীরদিগের প্রতি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'আমি জানি যে, এই পুত্রকে আমি রাজ্য শাসন সম্পর্কে যে উপদেশই দিই না কেন, কুপ্রবৃত্তির ফাঁদে পড়িয়া সে তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে ও তদনুযায়ী কাজ করিতে সমর্থ হইবে না; তথাপি পুত্র স্নেহের অনুরোধে আমি আপনাদের ন্যায় অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মুখে কতিপয় উপদেশ এই পুত্রের উদ্দেশ্যে লিখাইয়া রাখিতেছি এবং আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিতেছি, তিনি যেন তাহাকে এই সকল উপদেশ পালনের ক্ষমতা প্রদান করেন। এই কয়েকটি কথা বলিয়া তিনি শামস দবীরকে লিখিতে আদেশ দিলেন।

রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মাহমুদের প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই যে, লক্ষণা-বতীর শাসনভার যখন তাহার কাছে ন্যস্ত করা হইল, তখন সে যেন দিল্লীর বাদশাহ তাহার ভ্রাতার আদেশ অমান্য না করে। দিল্লীর বাদশাহ তাহার ভাই অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন সে যেন অনর্থক তাহার সহিত ঝাগড়ায় লিপ্ত না হয়। যে কোন অবস্থাতেই দিল্লীর বাদশাহের সহিত তাহার মনোমালিন্য সৃষ্টি করা এবং তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তাহার জন্য উপযুক্ত হইবে না। কারণ লক্ষণাবতী দূরে অবস্থিত হইলেও দিল্লীর আওতার বাহিরে নহে। লক্ষণাবতী বিজিত হওয়ার পর হইতে তথাকার সকল শাসকই দিল্লীর তরফ হইতে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে সকল শাসক দিল্লীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহারা দিল্লীর শাহী ক্ষমতার দাপট খুবই ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। মাহমুদ যেন ইহা ভাল করিয়া জানিয়া রাখে যে, দিল্লীর বাদশাহের নিকট লক্ষণাবতীর শাসকের দাপট কোন কালেই সহনীয় হইতে পারে না; ইহা কখনই সম্ভব নহে। যদি মাহমুদ প্রাণের ভয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হইতে না পারে কিংবা সেখানে যাইতে ইচ্ছা না হয়, তবু ইহাকে সে অজুহাত

হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। কারণ একই রাজ্যে দুই ব্যক্তির নামে খুতবা ও মুদ্রার প্রচলন কখনও সম্ভবপর নহে। সে ক্ষেত্রে মাহমুদের উচিত হইবে নূতন নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা এবং যথাযোগ্য উপঢৌকন ও পত্রাদিসহ তাহার দরবারের বিশ্বাসী লোকদিগকে তথায় প্রেরণ করা। যাহাতে বাদশাহ এই সকল দূতের নিয়মিত উপস্থিতির ফলে লক্ষণাবতীর ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলিয়া আশংকা না করেন। সময়ে সময়ে কিছু সংখ্যক হাতী দিল্লীতে পাঠাইতে সে যেন বিরত না হয়; তাহা না হইলে বাদশাহ তাহার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য হইবেন। যদি এমন হয় যে, বাদশাহ লক্ষণাবতী আক্রমণের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কখনও সৈন্যদলসহ তাহার সম্মুখীন হইবে না; বরং নিজের ধন সম্পদ, লোক লস্কর ও হাতী ঘোড়াসহ এমন একস্থানে যাইয়া আত্মগোপন করিবে, যেখানে দিল্লীর সৈন্যদল পৌঁছিতে না পারে। সেখানে সে নিজের ধন সম্পদ ও লোক লস্কর সংরক্ষণ করিবে এবং কোন অবস্থাতেই বাদশাহের সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়াকে অন্তরে স্থান দিবে না। কারণ দিল্লীর বাদশাহ ইচ্ছা করিলে একবারের সামলাতেই লক্ষণাবতীর শাসককে পদানত এবং উহার সকল শক্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারেন। লক্ষণাবতীর শাসক সম্পর্কে সে ইহা যেন জানিয়া রাখে যে, সুযোগ্য, পরাক্রমশালী ও গুণবান বালক ছাড়া লক্ষণাবতীকে শাসন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কাজেই দিল্লীর বাদশাহের প্রত্যাবর্তন শোনা মাত্রই সে যেন লক্ষণাবতীতে ফিরিয়া আসে এবং সেখানে এমনভাবে শৃঙ্খলা স্থাপন করে, যেন একমাত্র বাদশাহ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী না হয়। আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই এই সকল উপদেশ আমি তাহাকে দিতেছি, সে যেন ইহা ভালভাবে জানিয়া রাখে।

মাহমুদের প্রতি আমার দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, সে ইহা বারংবার জানিয়া রাখুক, বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত কেতাদারদের কাজ এবং রাজ্যশাসন এক শ্রেণীর কাজ নহে। কেতাদার যদি ভুল করে কিংবা তাহার কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তবে এই ত্রুটির জন্য সে বাদশাহ কর্তৃক পদচ্যুত হইবে এবং তাহার ধনসম্পদ বাদশাহের ক্রোধ শান্তির জন্য ব্যয়িত হইবে মাত্র; কিন্তু ইহাতে তাহার প্রাণের কোন ভয় নাই, তাহার পুনর্বহালের আশাও নষ্ট হইবে না এবং তাহার পরিবার-পরিজন ও সাথী-সঙ্গী অনাহারে মারা যাইবে না। অন্যদিকে রাজ্যশাসনে যদি শাসক ভুল করে বা তাহার দ্বারা অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহার এই অপকর্মের প্রভাব সমস্ত রাজ্যে বিস্তার লাভ করিবে, প্রজাবৃন্দের মধ্যে

ঐক্য ও আনুগত্যের অভাব দেখা দিবে এবং নিজের সাথী ও অনুরাগীরাও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। এমন মারাত্মক ত্রুটি, যাহাতে শাসন ব্যবস্থা ও রাজ্য-সমূহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং যাহার ফলে ন্যায় বিচার, ক্ষমা প্রার্থনা, বন্ধুত্বের দাবী ও সংশোধনের কোন আশা না থাকে; উহার সমস্ত ফলাফল তথা দেশের অরাজকতার শাস্তি শাসক, তাহার পরিবারবর্গ ও সঙ্গী সাথীদের উপর আপতিত হইবে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে এই বিষয়টি সম্পর্কে মাহমূদ যেন চিন্তা করে এবং ভাল মন্দ, শুভা-শুভ সকল বিষয় তাহার কল্যাণকামী ও চিন্তাশীল লোক-দিগের নিকট উপস্থিত করে। তাঁহাদের পরামর্শ সে যেন অবশ্যই গ্রহণ করে। কেননা এইভাবেই তাহার পক্ষে রাজ্যশাসনে ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব।

মাহমূদের জানিয়া রাখা উচিত যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতের বিপরীতে তাহার সৌভাগ্যের ফলে যদি কোন কাজ সাফল্য লাভ করে, কোন ত্রুটিগুণে পরিণত হয় এবং তাহার মারাত্মক ভুল সত্ত্বেও রাজ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়, তবুও ইহাকে তাহার জন্য লজ্জাকর অশুভ ও নিজের খামখেয়ালী বলিয়াই ভাবিতে হইবে। তেমনি বহু চিন্তা ভাবনার পরও যদি কোন কাজে ত্রুটি দেখা দেয়, তবে তাহার জন্য অস্থির হইয়া পড়া উচিত হইবে না। কোন কারণে দোষের গুণে পরিণত হওয়া বা কাজে ভুল করিয়া সফল হওয়ার প্রতিকার এই যে, এই প্রকার কাজ নিজের মনে গোপন করিয়া রাখিতে নাই। কারণ ইহা জানিয়া রাখা ভাল যে, যদি কেহ কাজে ভুল করিয়াও সফল হয় বা কোন দোষ করিয়াও সুখ্যাতি লাভ করে, তাহা হইলে এই ধরনের অযৌক্তিক ব্যাপারকে আল্লাহ্‌তালার নিকট হইতে বিশেষ পরীক্ষা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

এই জন্যই দেখা যায় অনেক বাদশাহ সারাজীবন মানুষের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছে এবং যাহা কিছু করিয়াছে, তাহাকেই অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি গুণে পরিণত হইয়াছে। এমন অনেক বাদশাহ ছিল, যাহারা অকাজ, অধর্ম, অন্যায় ও অবিচারে লিপ্ত রহিয়াছে এবং মানুষ তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া শেরেক কুফুরী ও খোদার না ফরমানী করিয়াছে। ধর্মের জন্য তাহাদের কোন প্রকার মাথা ব্যথা ছিল না এবং ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কেও তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল না। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করিবার কোন প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই। মানুষ শতপ্রকার কুকাজ ও খোদার না ফরমানী করিয়াও সুখে শান্তিতে আছে শুনিলেই তাহারা মনে করিত আমরা ইহাদের প্রতি সুবিচার এবং ইহাদের জীবনে সুখ শান্তির বিধান করিয়াছি। প্রজাদের শত প্রকার অন্যায় ও অপকর্মেও তাহাদের অন্তঃকরণ বিচলিত হইত না। তাহারা কিসে ইহাদের ভাল হইবে ও কিসে মন্দ হইবে, তাহা জানিত

না। মুক্তির উপায়কে মনে করিত ধ্বংসের পথ এবং ধ্বংসের পথকে তাহারা মুক্তির পন্থা বলিয়া ভাবিয়াছিল। প্রজাদের জীবনকে সৎপথে পরিচালিত করা এবং ইহাদেরকে ধর্মীয় জীবন যাপনে বাধ্য করা—যাহা প্রকৃতপক্ষে বাদশাহদের মুক্তি ও সম্মান লাভের পথ, তাহা এই সকল বাদশাহ নামধারী ব্যক্তির জ্ঞানের অতীত ছিল। তাহারা প্রজাদের অপকর্মে যোগদান ও ইহাদের অপকথায় সায় প্রদানকে তাহাদের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। এই প্রকার অপ্রশংসনীয় কার্য সত্ত্বেও তাহাদের রাজ্যে যে কোন বিশৃঙ্খলা বা বিপদ আসে নাই এবং তাহাদের জনবল ও ধনদৌলতে যে সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছে, ইহাকে তাহারা তাহাদের ন্যায় বিচার ও প্রজাপ্রতিপালন গুণের ফল বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহর একটি কৌশল ও পরীক্ষা মাত্র। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরাই ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে সক্ষম।

সুলতান শামস উদ্দিনের দাস, আমি বলবন, হে আমার প্রিয় পুত্র মাহমুদ, তোমার সম্পর্কেও এমনি অখ্যাতিজনক জীবনের ভয় করিতেছি। নিজ রাজ্য ও প্রজাদিগকে লইয়া তুমিও অনুরূপভাবে অধর্মের পথে চলিবে। তুমি যেমন নিজের জন্য ধর্মের পরোয়া কর না, তেমনই ভাবে প্রজাদের জন্যও তাহা করিবে না। যে সকল লোক তোমাকে ধোঁকা দিতে চাহিবে—মিথ্যার দ্বারা তোমার কান ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, তাহারাই তোমার সম্মুখে বলিবে,—কী সুবিচারক বাদশাহ। তাহার রাজ্যে প্রজারা কতই না সুখে শান্তিতে বাস করিতেছে! তাহারা যাহা চায়, তাহাই করে,—দিনরাত স্ফূর্তিতে কাটাইতেছে এবং বাদশাহকে দোয়া করিতেছে। সকলেই বলিতেছে, কোন বাদশাহের সময়েই এমনভাবে সুখ শান্তি ও আমোদ স্ফূর্তিতে কাল কাটাইবার সুযোগ ঘটে নাই। এইভাবে বহুলোকই তোমার সম্মুখে প্রজাদের সুখ শান্তির কথা উল্লেখ করিবে। অন্যদিকে শয়তানও তোমার মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকিবে যে, তুমি যে ভাবে কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া দিনরাত আমোদে কাটাইতেছ, তেমনিভাবে তোমার প্রজাদের অনেকেই সুখ শান্তিতে রহিয়াছে। ইহার ফলে তুমি সুখ্যাতি লাভ করিবে এবং তাহাদের দোয়ায় বেহেশতে যাইবে।

মাহমুদের প্রতি আমার তৃতীয় উপদেশ কতকগুলি অছিয়ত। যদি মাহমুদ এই অছিয়তগুলি পালন করে, তবে তাহার এই নশ্বর জগতের রাজ্যও স্থায়ী হইবে। যদি সে এই অছিয়তগুলিতে রাজ্যের উপকার দর্শন করে, তবে যেন সে নেক দোয়া ও সদকা খয়রাতসহ তাহার পিতার কথা স্মরণ করিতে সচেষ্ট হয়। অছিয়তগুলি এই :

প্রথম অছিয়ত— যাহাতে তাহার রাজ্য স্থায়ী হইবে, এই প্রকার কার্য করা এবং প্রজাদের ব্যাপারে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব বা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত অবস্থায় রাখিতে নাই। প্রজাদের নিকট হইতে নিজ কার্যাবলীর প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা কখনও ফলপ্রসূ হয় না। পূর্ববর্তী বাদশাহগণ যে সকল কাজ করাইয়া গিয়াছেন, সেই ধরনের কাজ তাহাদের দ্বারা করাইতে হইবে। নিজের মতানুযায়ী নূতন কাজ বা আদেশ না দেওয়াই ভাল। প্রজাদের ব্যাপারে এমনভাবে চলিতে হইবে, যাহাতে সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া না পড়ে। খাজনাদি আদায়ের ব্যাপারেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এতবেশী চাহিবে না, যাহাতে তাহারা নিঃস্ব হইয়া যায়; আবার এত কমও লইবে না, যাহাতে অতিরিক্ত ধনদৌলতের অধিকারী হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কারণ অতিরিক্ত সম্পদ রায়তের মাথায় ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিবে এবং ক্রমশ তাহাদিগকে আয়ত্তের বাহিরে লইয়া যাইবে। ধনের গরমে তাহারা বিবেকশূন্য হইয়া নাফরমানীর জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। নিজ কর্মচারী ও রায়তদিগকে এমনভাবে রাখিবে, যাহাতে নিজ নিজ চাকুরীর বেতন ও গৃহস্থীর ফসল দ্বারা সাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতে পারে।

বাদশাহের নিজ কর্মচারী ও রায়তদিগকে পূর্ব বর্ণিত প্রণালীতে প্রতিপালন করিবার বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহা রাজ্যশাসনের বৃহত্তম বিষয়গুলির অন্যতম। নবী সুলায়মান ও বাদশাহ সেকান্দরও এইভাবেই প্রজাপালন করিয়াছেন। কর্মচারীদিগকে বেতনের উপর এবং প্রজাদিগকে গৃহস্থী বা পেশার উপর এমনভাবে নির্ভরশীল করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিঃস্বতা ও ধনাঢ্যতার মাঝামাঝি অবস্থান করে। বস্তুতঃ এই কাজটি প্রতিযুগের 'অ্যারিস্টটল' এবং প্রতি রাজ্যের 'বুরজচ মেহের' দের পালনীয় কর্তব্য হইয়া রহিয়াছে।

বাদশাহ যদি নিজে খামখেয়ালী ত্যাগ না করে এবং বহুদর্শী ও জ্ঞানীদের দ্বারা নিজ দরবার সুশোভিত করিয়া না রাখে, তাহা হইলে এই বিরাট দায়িত্ব পালন তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। হে মাহমুদ! এই অছিয়তটির অনেকগুলি দিক বর্তমান। তোমার দরবারের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সহিত যথাযোগ্য আলোচনার মাধ্যমেই কেবল তুমি ইহার সকল দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং যথাবিহিতভাবে তাহা পালন করিতে সক্ষম হইবে।

মাহমুদের জন্য আমার দ্বিতীয় অছিয়ত এই যে, সে নিজ পরামর্শদাতাদিগকে চিন্তা করিয়া সকল বিষয়ে সঠিক নিয়ম নির্ধারণ করিতে বলিবে এবং সে নিজে

এই সকল নিয়মের বাহিরে কোন কাজ করিবে না। নিজের খেয়াল খুশিমত দিনের প্রথম প্রথমভাগে একপ্রকার, দিনের শেষভাগে একপ্রকার, রাত্রিতে এক ধরনের এবং দিনের বেলায় একধরনের আদেশকে সে যেন কার্যকরী না করে। বাদশাহ ও শাসকদের এই প্রকার অস্থির মতিত্ব ও খেয়ালীপনা হইতেই দেশ ও রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কাজেই শয়তান যেন মাহমুদের অন্তরে এই ভাবের উদ্রেক করিতে না পারে যে, আমিই বাদশাহ ; সুতরাং যাহা কিছু আমার মনে উদয় হয় এবং যাহা কিছু আমার ভাল লাগে, আমি তাহাই করিব। কারণ এই ধরনের ভাব নিশ্চিতভাবেই শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ইহার ফলেই পৃথিবীর অত্যাচারী ফেরাউনরা অধ:পাতে গিয়াছে ও চিরদিনের জন্য দোজখের ভাগী হইয়াছে।

মাহমুদের জন্য আমার তৃতীয় অছিয়ত এই যে, নিজ পরিষদ ও কর্মচারী-দিগের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে সে যেন এক মুহূর্তও বিরত না থাকে। কারণ রায়তদের সহিত তাহার কাজকর্ম বৎসরের কয়েকদিনেই শেষ হইয়া যায় ; অথচ পরিষদ ও কর্মচারীদিগের সহিত তাহাদের যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। এইজন্য তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকিলে রাজ্যের অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। মাহমুদ যেন তাহাদের খবরাখবর লইতে কোনপ্রকার দুর্বলতার পরিচয় না দেয়। যে ব্যক্তি কর্মচারী ও পরিষদের জন্য খরচ ও পুরস্কারের বিষয়ে সাবধান করিয়া ধন সঞ্চয়ের উপদেশ দিবে, তাহাকে দেশ ও রাজ্যের শত্রু হিসাবে গণ্য করিবে। কারণ অধিক সংখ্যক সন্তুষ্ট পারিষদ ও কর্মচারী এবং তাহাদে স্থায়িত্বের উপরই নিজ রাজত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করে বলিয়া জানিবে। দেওয়ানে আরজের লোকেরা যেন সর্বদা প্রাচীন পারিষদ ও কর্মচারীদিগকে প্রতিপালন করে এবং নবীনদের মধ্য হইতে অশ্বারোহী ও পদাতিক নিযুক্তির ব্যাপারে তৎপর থাকে। পারিষদ ও কর্মচারীদিগের বেতন সম্পর্কীয় বিবরণ এবং বকেয়া হিসাব যেন নিয়মিত বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত করে।

মাহমুদের রাজ্য ও সম্পদের স্থায়িত্বের জন্য আমার চতুর্থ অছিয়ত এই যে, মাহমুদ যেন বারংবার ইহা জানিয়া রাখে—বাদশাহীর সহিত বন্দেগীর সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। কারণ বাদশাহীর সবটুকুই বলিতে গেলে সাফল্য ও কৃতকার্যতা লাভের উপর নির্ভর করে ; অথচ মুসলমানী দুনিয়াবী সাফল্য বা স্বার্থপরতার সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। সুতরাং আমি যদি তাহাকে বলি যে, বাদশাহী লাভের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সে যেন সর্বদা মাটিতে তাহার শির

লুটাইয়া রাখে এবং এই মহান সম্পদ লাভের শোকরিয়া আদায়ের জন্য সে যেন বিভিন্ন প্রকার এবাদতে নিজকে নিয়োজিত করে, তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না। অবশ্য আল্লাহ্ই ভাল জানেন; তবে এমন অনেক বাদশাহ ছিলেন, যাহারা এইভাবেই তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। মাহমুদও যদি নিজকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও সৃষ্টি বলিয়া জানে, তাহা হইলে সে যেন যে কোন অবস্থায় পাঁচঅক্ত নামাজ আদায় করে, জমাতের সঙ্গে ফরজ নামাজ পড়ে এবং জমাতের 'সুন্নতে মোয়াক্কাদা'—হওয়া সম্বন্ধে হজরতের বাণী—'জমাত নবীর সুন্নতগুলির অন্যতম, একমাত্র মুনাফেক ব্যতীত অন্য কেহ উহা ত্যাগ করে না'; 'জমাত ত্যাগকারী অভিশপ্ত'; 'ইমামের সঙ্গে তহরিমা বাঁধা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম'—প্রভৃতির তাৎপর্য স্মরণ রাখে। যদি কোন অক্তের নামাজ কাজা হইয়া যায়, তাহা হইলে দিন রাত্রির যে কোন সময়ে সে যেন ইহাও আদায় করে। কেবলমাত্র এইভাবেই তাহার পরকাল শুভ হইতে পারে।

এই সকল উপদেশ দেওয়ার পর সুলতান বগরা খাঁনকে বলিলেন, হে মাহমুদ, আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহা তোমার যুগেরই উপযোগী। কিন্তু আমি যদি তোমাকে ধার্মিক বাদশাহের উপদেশ দান করিতে যাই এবং বলি যে, তুমি তোমার সমস্ত শক্তি সামর্থ শেরেক ও কুফুরীর বিনাশ সাধনে ব্যয় করিবে; পৌত্তলিকদিগকে সর্বদা হীন অবস্থার মধ্যে রাখিবে, যেন তুমি নবীদের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পার; ব্রাহ্মণ দিগকে সমূলে বিনাশ করিবে, যাহাতে কুফুরীর উৎপাত ঘটে; হজরতের সুন্নতের অনুসরণ করিবে ও বাদশাহী অনুষ্ঠানের আতিশয্যকে উক্ত সুন্নতের খেলাফ বলিয়া মনে করিবে; নিজ বাদশাহীর জন্য আব্বাসী খলিফাদের নিকট হইতে এজাজতনামা আনিবে; তোমার রাজধানী জ্ঞানী, শায়খ, তফসিরবিদ, হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ, হাফেজ, ওয়ায়েজ ও সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, যাহাতে উহা সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়; জুম্মার নামাজ খলিফার আদেশ অনুসারে আদায় করিবে; তাহা হইলে এই সকল উপদেশ বলা ও শোনাই আমার পক্ষে সার হইবে, তোমার ন্যায় প্রবৃত্তির দাসের জন্য উহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

অবশ্য তুমি প্রবৃত্তির দাস বলিয়াই তোমাকে অন্য ধরনের কতিপয় উপদেশ দিতেছি। যদি সামর্থে কুলায়, তবে তাহা পালন করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিবে। শেষ পর্যায়ের অছিয়ত গুলি এই; যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে নিজকে শত বিনয় ও তুচ্ছতার সহিত এমন কোন লোকের পদতলে নিক্ষেপ করিবে, যিনি সর্বদিক হইতে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন

এবং সর্বদা সর্বভাবে আল্লাহ্ তা'লার এবাদতে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু সাবধান, হাজারবার সাবধান, যে ব্যক্তি তোমার নিকট কিংবা অপর কাহারও নিকট কোন বস্তুর অভিলাষী হয় এবং সাংসারিক লোকদের সহিত মেলামেশা করে, তেমন লোকের খপ্পরে পড়িবে না। কারণ যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য লালায়িত, সে কখনই পুণ্যাত্মাদের কেহ হইতে পারে না, ইহা বিশ্বাস করিবে।

সুলতান শামসুদ্দিনের বান্দা আমি বলবন বিশিষ্ট কাজী জালাল আরুসের নিকট শুনিয়াছি, তিনি যে সময় দূত হিসাবে বাগদাদ হইতে দিল্লীতে আসেন, তখন খলিফা হারুনুর রশিদের গুণাবলীর কিছু অংশ উপদেশ হিসাবে সুলতান শামসুদ্দিনের সম্মুখে পেশ করেন। সুলতান ইহাতে এতদূর খুশী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বিনাদ্বিধায় অর্ধেক রাজ্য দান করিতে পারিতেন। কাজী জালাল আরুস খলিফা মামুনের লেখা একটি পুস্তকে এই সমস্ত গুণ বাগদাদে দেখিতে পান এবং স্বয়ং মামুনের হস্তলিখিত যে উপাদেশাবলী তিনি চাহিয়া লইয়া সুলতান শামসুদ্দিনের জন্য তোহফা হিসাবে আনেন, তাহা এই : আমীরুল মুমেনীন মামুন 'সফিনাতুল খুলাফা' নামক একটি পুস্তকে স্বহস্তে লিখিয়াছেন যে, আমার পিতা আমীরুল মোমেনীন হারুনুর রশীদ অতীব জাঁকজমকের অধিকারী হইয়াও অনেক রাত্রেই বাগদের দরবেশদের অন্যতম দাউদতাঈ ও মুহম্মদ সাম্মাক-এর খানকার উদ্দেশ্যে পায়ে হাঁটিয়া গমন করিতেন। কোন রাত্রে সাথে চাকর নফর থাকিত এবং কোন রাত্রে তিনি একাকীই তাঁহার খানকার সম্মুখে মাটির উপর বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু তথাপি দাউদতাঈ বা মুহম্মদ সাম্মাক তাঁহার দরজা খুলিতেন না এবং আমার পিতাকে ভিতরে যাইতে বলিতেন না। বারংবার আমার পিতা এই দরবেশদের খেদমতে হাজির হইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বাধা পাইয়াও কখনও বিরক্ত বা লজ্জিত হন নাই। বরং তাঁহাদিগকে আরও ভাল বাসিয়াছেন এবং তাঁহাদের সততা সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। তিনি সর্বদাই এমন লোক অনুসন্ধান করিয়াছেন, যাহার মাধ্যমে তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। এই ব্যাপারে চেষ্টা করিবার জন্য অনেককে ধনসম্পদ দেওয়ার অঙ্গীকারও করিয়াছেন। বস্তুত: আমীরুল মোমে-নীনের এইভাবে দরবেশদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টাও বিফল হইয়া ফিরিয়া আসা আমার ও তাঁহার অন্যান্য নিকট সঙ্গীদের মোটেও সহ্য হইত না। কারণ এই দরবেশগণ বহু দীন দরিদ্রকে তাঁহাদের দরবারে উপস্থিত হইতে দিত; কিন্তু আমীরুল মোমেনীনের সেখানে প্রবেশ করিবার কোন আহ্বান আসিত না।

এই অবস্থায় একদিন আমরা দরবারে বসিয়া আছি, এমন সময় কাজী আবু ইউসুফ সেখানে উপস্থিত হইলেন। আমীরুল মোমেনীন তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি আমাকে দাউদ তাঈর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন না। শুনিতে পাইলাম আপনি ও তিনি নাকি একসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আবু ইউসুফ ইহার উত্তরে খলিফাকে বলিলেন, যখন আমি ফকির ছিলাম, তখন সে আমাকে তাহার খানকাতে প্রবেশ করিতে দিত। কিন্তু কাজী হওয়ার পর অন্ততঃ বিশ বার আমি তাহার নিকট যাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু একবারও তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই। খলিফা বলিলেন, আপনার এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়াছে এবং তাঁহার সততা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। কাজী আবু ইউসুফ খলিফাকে বলিলেন, আলেম, শায়খ ও ইসলাম ধর্মের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিই জগতের চতুর্দিক হইতে খলিফার দরবারে উপস্থিত হন এবং জাতির নেতা ও হজরত মুহম্মদ মোস্তফার চাচার বংশধর হিসাবে খলিফার সাক্ষাৎ লাভকে তাঁহার অতীব সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করেন। অথচ এই দুইজন ফকির বাগদাদে থাকিয়াও যদি জননেতা, হজরতের আত্মীয় ও খলিফার সম্মানের খেয়াল না করে, তাহা হইলে খলিফার কি তাঁহাদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত ? কারণ খলিফা রাত্রিতে রাত্রিতে দাউদতাঈ ও মুহম্মদ সাম্মাকের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা এবং ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসার কাহিনী বাগদাদের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। খলিফা বলিলেন, তাহারা যে আমাকে তাঁহাদের নিকট যাইতে দেন নাই, এমন কি আমার প্রতি ফিরিয়াও তাকান নাই, ইহাতে তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই এবং তাঁহাদের সততা সম্পর্কে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে। কারণ ইহাতে আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা সর্বভাবে সংসারকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং খোদার প্রেমে মশগুল হইয়া পৃথিবীকে শত্রু বলিয়া ভাবিতেছেন। অথচ আমি সেই তুলনায় সংসারের মধ্যভাগে রহিয়াছি এবং উহার ধনদৌলত আমার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই তাঁহারা যেহেতু সংসারকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধনদৌলতকে শত্রু বলিয়া ভাবিয়াছেন, সেইজন্য আমার ন্যায় সর্বতোভাবে সংসারীকে শত্রু ভাবা তাঁহাদের জন্য বিচিত্র কিছু নহে। সুতরাং আমাকে খানকার ভিতরে ডাকিয়া নেওয়া বা ভালবাসার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমরা, যাহারা দুনিয়ার মালমাত্তা একত্র করিয়া উহার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি, তাহাদিগকে এই সকল খোদাপ্রেমিক খোদার জন্য শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং আমরা তাঁহাদের খোদাপ্রেমের জন্য তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া ভাবিয়া

থাকি। তাঁহারা আমাদিগকে শত্রু মনে করিয়া যেমন পুণ্যের অধিকারী হন, তেমনই আমরা তাঁহাদিগকে বন্ধু ভাবিয়া পুণ্য লাভ করিয়া থাকি। আমি আশা করি যে, এই ধরনের সংসারত্যাগী ব্যক্তিরা যদি কোনপ্রকারে আমার কণামাত্রও সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি দুনিয়ার ধান্দা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। চতুর্দিক হইতে যাহারা সম্পদ ও সম্মানের লোভে আমার খেদমতে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহারা আসলে দুনিয়ার পরিবর্তে ধর্মকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এমন লোকদের নিকট আমি কী আশা করিতে পারি এবং এই প্রকার লোকদের শরণাপন্ন হওয়াতে আমার কি উপকার হইবে। বরং বিপরীতভাবে তাহাদের সংসর্গের ফলে আমার দুনিয়ারী জাঁকজমক আরও বৃদ্ধি পায়।

আমীরুল মোমেনীন এই সকল কথা বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি আমার কথাবার্তা, কাজকর্ম ও চালচলনকে হজরত মুহম্মদ মোস্তফার সুন্নতের খেলাফ বলিয়া মনে করি। সুতরাং কিয়ামতের দিন কোন মুখে হজরতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবা! দুনিয়ায় আমি এমন কী পুণ্য কাজ করিয়াছি যে, দুনিয়াদারীর হিসাবনিকাশ হইতে বেকসুর খালাস পাইব! কাজী আবু ইউসুফ খলিফার এই সকল উপদেশ শুনিয়া তাঁহার জানুতে চুমা দিয়া বলিলেন, আমি যদিও অনেক বিদ্যা অর্জন করিয়াছি, তথাপি খোদার যথার্থ পরিচয় আজ আমি খলিফার সংসর্গ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইলাম!

এই কাহিনী মাহমুদের নিকট বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য সুলতান বলবনের এই ছিল যে, পুত্র যেন পিতার স্নেহের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং কথা ও কাজে সৎ হইয়া কাল আখেরাতের কঠিন শাস্তি হইতে নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

সুলতান বলবন বগরা খানকে এই সকল উপদেশ মৌখিক দান করিলেন এবং শিখাইয়াও দিলেন। তিনি তাহাকে পোশাক পরাইলেন, তাহার চোখে মুখে চুমা দিলেন ও কিছুক্ষণ কাঁদিলেন এবং পরিশেষে বগরা খানকে বিদায় করিলেন।

বগরা খান লক্ষণাবতীর দিকে বিদায় হইবার পর সুলতান বলবন সৈন্যদলসহ 'আবে সরাও'-* এর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। সকলের মধ্যে এই আদেশ জারী করিলেন যে, শাহী সৈন্যদলের

* সরযু নদী

সঙ্গে যাহারা দিল্লী হইতে লক্ষণাবতীতে আসিয়াছিল; তাহাদের কেহই বিনা অনুমতিতে তথায় থাকিতে পারিবে না এবং তেমনই যাহারা লক্ষণাবতীতে থাকিবার কথা তাহারা দিল্লীতে আসিতে পারিবে না। এই বিষয়ে যথারীতি অনুসন্ধান করিবার পর সুলতান 'আবে সরাও' পার হইয়া জয়ীর বেশে দিল্লীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইহার ফলে পথে যে শহর বা গ্রামে তাঁহার শাহী ঝাণ্ডা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেই চতুর্দিকের আলেম, শায়খ, বিশিষ্ট ব্যক্তি, কর্মচারী, মুতসরিফ, মালীক, রায়, চৌধুরী এবং অন্যান্য লোকেরা বিজয়ের খুশীর সঙ্গে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহার খেদমতে যথাযোগ্য তোহফা ও নজরানা উপস্থিত করিয়াছেন, পুরস্কার লাভ করিয়াছেন এবং বাদশাহের জন্য নেক দোয়া করিতে করিতে ফিরিয়া গিয়াছেন। বড় শহর ও গ্রামে গম্বুজ তৈরী হইয়াছে এবং সর্বত্র মানুষ উৎসব পালন করিয়াছে।

বাদাউন অতিক্রম করিবার পর সুলতান 'খানুর'-এর ঘাটে গঙ্গানদী পার হইলেন। দিল্লীর সকল স্থান হইতে সরদার, কাজী, আলেম, সদর, বিশিষ্ট ও বিখ্যাত লোকেরা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তাহারা সুলতানের খেদমতে অনেক কিছু নজরানা হিসাবে পেশ করিলেন এবং অনুরূপভাবে পুরস্কার ও দাক্ষিণ্য লাভ করিলেন। বাহিরে বড় বড় গম্বুজ তৈরী হইল এবং সুলতান তিন বৎসর পরে দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। আত্মীয়স্বজন গৃহে ফিরিয়া আসায় সর্বত্র উৎসবের বন্দোবস্ত হইল এবং গীতবাদ্যেরও আয়োজন করা হইল। সুলতান সকলকে সদকা খয়রাত দিতে বলিলেন। সুলতান পশ্চিম দিকে বসবাসকারী সকল বিশিষ্ট লোক এবং তৎকালে জীবিত দরবেশদের গৃহে গমন করিলেন ও তাহাদের নিকট বিজয় বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। কয়েদখানার মালীককে কয়েদীদিগকে মুক্তি দিতে এবং তাহাদিগকে যথারীতি আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতে বলিলেন। বাকী খাজনা ও কর মওকুফ করিবার আদেশও সর্বত্র প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

সুলতান শহরে প্রবেশকালে বিশিষ্ট লোকেরা ধনরত্ন ছিটাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। সুলতান শাহীমহলে পৌছিবার পর তাঁহার পরিধানের 'কাবা' টি দিল্লীর মালীকুল উমারা কতোয়ালকে প্রদান করেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে শৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য পরিচালনার জন্য তাহাকে এমন অনেক বিষয়ের সম্মান দান করেন, যদ্দরুন অন্যদের মধ্যে এই আতিশয্যের নিমিত্ত হিংসার উদ্রেক হয়। লক্ষণাবতীতে অবস্থানকালেই সুলতান এক ফরমানে লিখিয়াছিলেন, 'ভাই মালীকুল উমারা বলিয়াছেন'—; এই সম্বোধনের

ফলে তাহার সম্মান অন্যান্যদের উপর আরও বাড়িয়া যায় এবং সর্বপ্রকার মানুষ মালীকুল উমারার নিকট তাহাদের অভিযোগ উত্থাপন ও বিচার প্রার্থনা করিতে থাকে। ইহার ফলে সুলতানের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান শহরে আসিয়া পৌঁছিলে উহা প্রশমিত হইয়া যায়।

বিজয় উৎসব ও ভোজনাদি শেষ হইলে এবং গম্বুজগুলির কাপড় ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিবার পর সুলতান বাদাউন হইতে তলিপথ পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে মুখোমুখী গম্বুজ নির্মাণের আদেশ দিলেন। যাহাতে দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার যে সকল লোক লক্ষণাবতীতে তুগরিলের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল এবং পরে বন্দী হইয়া সুলতানী সৈন্যদলের সহিত দিল্লীতে আসিয়াছিল, তাহাদের শাস্তিদানের পর মৃতদেহগুলি এই সকল গম্বুজে দর্শনীয়ভাবে লটকাইয়া দেওয়া যায়। এই সর্বনাশা সংবাদে শহরের লোকজনের মধ্যে শোরগোলের সৃষ্টি হয়; কারণ তাহাদের আত্মীয় স্বজন বহু লোক এই বন্দীদের মধ্যে ছিল। এই কারণে শহরের অনেক লোক একান্তই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বন্দী-দের কান্নাকাটির ফলেও সাধারণ মুসলমানের মন অনেকখানি নরম হইয়া উঠিয়াছিল। লোকজনের এই প্রকার আহাজারির সংবাদ সৈন্যদলের কাজী, তৎকালের বিশিষ্ট ধার্মিক ও সর্বজনমান্য এক গুণীর নিকট পৌঁছিল। তিনি সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন যে, কিছু দিনের মধ্যেই বহু মুসলমানকে হত্যা করা হইবে এবং তাহাদের লাশ গম্বুজে গম্বুজে লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

এই সংবাদ পাইয়া সৈন্যদলের ধর্মপ্রাণ কাজী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জুম্মার রাত্রিতে বাদশাহের নিকট গেলেন এবং সর্বভাবে বিনয় বচনে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। ইহার ফলে সুলতানের কঠোরভাব নরম হইয়া তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। কাজী সাহেব এই সুযোগে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সকল বন্দীর জন্য সুলতানের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সুলতান তাহার প্রার্থনা কবুল করিয়া রাস্তার দুই পাশে নির্মিত সকল গম্বুজ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। বন্দীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল, যাহাদের কোন খ্যাতি ও প্রভাব ছিল না, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। অনেক খ্যাতিসম্পন্ন বন্দীকে নিকটের গ্রামগুলিতে নির্বাসন এবং অনেককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কয়েদ করিয়া রাখিতে আদেশ দেওয়া হইল। যে সকল বন্দী শহরের বিশিষ্ট লোক ছিল, শাস্তি হিসাবে তাহাদিগকে ষাঁড় ও মহিষের পিঠে

চড়াইয়া শহর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে বলা হইল। ইহার কিছু দিন পরে কাজী সাহেবের সুপারিশ অনুসারে সকল বন্দীকেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল।

বিজয় লাভের পর সুলতানের রাজধানীতে ফিরিয়া আসার সংবাদ রাজ্যের চতুর্দিকে পৌছিলে হিন্দু, মুসলমান, তুর্কী, অতুর্কী—যাহারা সম্মান, খ্যাতি ও পদমর্যাদার অধিকারী, তাহারা সকলে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশের জন্য সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং যথারীতি ভূমি চুম্বন করিলেন। অশ্ব, উট ও অন্য বহুবিধ বস্তু নজরানা হিসাবে তাহার খেদমতে উপস্থিত করিলেন এবং যথাযোগ্য শাহী পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভ করিলেন। চতুর্দিকের রাজ্যগুলিতে যথারীতি ছত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল। ইহার ফলে শাহী খাজানায় প্রচুর ধনের সমাগম ঘটিল।

সুলতান বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাহাকে 'সুলতানের খান' বলা হইত এবং সিন্ধু অঞ্চলটি যাহার শাসনাধীনে ছিল, তিনি পিতার তিন বৎসরকালীন অনুপস্থিতির পর রাজধানীতে ফিরিয়া আসায় বাহরজী ও তাতারী অশ্ব এবং সিন্ধু অঞ্চলের এতদিনকার সম্পূর্ণ খাজনাসহ তাঁহার দর্শন লাভের জন্য দিল্লীতে আসিলেন। শাহীমহলে পৌঁছিয়া যথারীতি কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সুলতান তাঁহাকে নিকটে পাইয়া খুবই উৎফুল্ল হইলেন এবং তাঁহার এই পুত্রের জন্য নির্দিষ্ট খাতির যত্ন পূর্বাপেক্ষা দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। সুলতান তাঁহাকে কিছুদিন তাহাকে নিজের কাছে রাখিলেন এবং নির্জনে রাজ্যশাসন বিষয়ে বহু উপদেশ দান করিলেন। অতঃপর তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এই পুত্রকে সর্ব প্রকার সম্মানের সহিত সুলতানের দিকে রওয়ানা করাইয়া দিলেন।

লক্ষণাবতীর বিজয়, তুগরিলের নিধন ও লক্ষণবতীতে প্রদত্ত কঠোর শাস্তির ফলে সুলতানের সম্মান ও ভীতি হিন্দুস্থানের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাইল। প্রকৃতপক্ষে এই বিজয়ের পর সুলতান বলবনের রাজ্য আরও দৃঢ় হইল এবং তাঁহার হৃদয় রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োজিত হইতে অবকাশ পাইল। ইহার ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার বা কহিবার আর কেহ রহিল না এবং সর্ব বিষয়ে সাফল্য লাভ সুলভ হইয়া উঠিল।

অতঃপর যেমন প্রবাদে আছে—কোন বিষয় পূর্ণতা প্রাপ্তির পর তাহাতে অবনতি দেখা দেয়—তেমনি সুলতানের জন্যও সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তদনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিল। ৬৮০ হিজরীতে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারী ও রক্ষী 'খানে সুলতান'-এর সঙ্গে লাহোর

ও দেবপালপুরের মধ্যবর্তী স্থানে মোঙ্গল নেতা অভিশপ্ত কুকুর তমর-এর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছায় 'খানে মুলতান' বহু সংখ্যক আমীর ও বিশিষ্ট সৈন্যসহ উক্ত যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। ইহার ফলে সুলতান বলবনের রাজ্যে একটা বৃহৎ ভাঙ্গন দেখা দেয়। বহু সুদক্ষ সৈন্য এই যুদ্ধে শহীদ হওয়ার ফলে মুলতানের প্রতি ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসে এবং মানুষ মলিন জামা পরিধান ক্রন্দনরোলে চারিদিক আকুল করিয়া তুলে। এই সময় হইতে 'খানে মুলতান'কে খান শহীদ বলিয়া ডাকা হইতে থাকে। এই যুদ্ধে আমীর খসরু বন্দী হন এবং কোনপ্রকারে শত্রুদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি খান শহীদের সম্মানে দুইটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহা অতিশয় উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলেন,

সাম্রাজ্য সূর্যের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছিল,
কিন্তু সেই সময়ই বা কেমন, যখন সূর্য অস্তমিত হয়!

সুলতান তাঁহার এই পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খান শহীদই রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হইবেন—এই কথা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। রাজ্যশাসন সম্পর্কে খান শহীদও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং এহেন পুত্রের মৃত্যু এবং সুলতানের সুশিক্ষিত সৈন্যদলের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া সুলতান খুবই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই সময়ে সুলতানের সময় আশি বৎসরের উপর হইয়াছিল। তিনি যদিও ধৈর্যের পরকাষ্ঠা দেখাইলেন এবং নিজের উপর অনেকখানি অত্যাচার করিয়াই বুঝাইতে চাহিলেন যে, পুত্রের শাহাদতের সংবাদে তিনি খুব বিচলিত হন নাই; তথাপি দিনে দিনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। দিনের বেলা সুলতান যথারীতি দরবারে আসিতেন এবং এমন ভাব দেখাইতেন যে, পুত্রের শোক তাঁহাকে কাহিল করিতে পারে নাই; কিন্তু রাত্রিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন, কাপড় ফাঁড়িতেন এবং মাথায় ধূলিবালি মাখিতেন।

খান শহীদের এই দুর্ঘটনার পর সুলতান বলবন মুলতান ও তৎপার্শ্বস্থ অঞ্চল এবং বাদশাহীর যোগ্য যাহা কিছু খান শহীদকে দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কায়-খসরু নামী পুত্রকে প্রদান করেন। কায়খসরু যুবক হইলেও স্বয়ং সুলতানের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নূতন আমীর, উজির ও কারকুন সহ মুলতানে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই দুর্ঘটনার পর হইতে বলবনী রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগিল এবং দিন দিন সুলতানের স্বাস্থ্য আরও ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

তারিখে ফিরোজশাহীর লেখক আমি বহু বিশ্বস্ত বৃদ্ধলোকের নিকট শুনিয়াছি যে, সুলতান বলবনের রাজত্বকালে সুলতান শামস উদ্দিনের সময়কালীন বেশ কয়েকজন বুজর্গ ব্যক্তি জীবিত ছিলেন এবং সুলতান বলবনের পারিষদবর্গের মধ্যেও কতিপয় বিরলগুণের অধিকারী মালীকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদের জন্যই বলবনী সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি ও বিশিষ্টতা অর্জন করিতে পারিয়াছিল। এই সকল বুজর্গ ব্যক্তি হইলেন—বাদাউনের কাজীদের দাদা ও শহরের শায়খুল ইসলাম কুতুব উদ্দিন, সৈয়দ মুন্তাখাব উদ্দিন, সৈয়দ মুবারকের পুত্র সৈয়দ জামাল উদ্দিন, সৈয়দ আজীজ, সৈয়দ মুঈন উদ্দিন সামানা, সৈয়দ সাজুর পূর্বপুরুষ কুদিজের সৈয়দগণ, কথিলের বিশিষ্ট সৈয়দগণ, জজ্জিরের সৈয়দগণ, বয়ানার সৈয়দগণ, বাদাউনের সৈয়দগণ এবং অন্যান্য এমন অনেক সৈয়দ, যাঁহারা চেঙ্গিজ খানের হাঙ্গামার ফলে এই দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বংশ মর্যাদায় ও ভদ্রতায় অতুলনীয় এবং ধার্মিকতার দিক হইতেও প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন। এই প্রকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা যে রাজত্বকাল শোভিত হইয়াছিল· তাহা অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ কাল ছিল।

সুলতান বলবনের রাজত্বকালে এমন অনেক আলেমও ছিলেন, যাহারা নানান গুণে বিশিষ্ট এবং নানান বিষয়ে শিক্ষাদানের অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা হইলেন—মওলানা বুরহান উদ্দিন মলখ, মওলানা বুরহান উদ্দিন বাজ্জাজ, মওলানা ফখর উদ্দিন রাজীর শিষ্য মওলানা নজম উদ্দিন দামেশকী, মওলানা সিরাজ উদ্দিন সঞ্জরী, মওলানা শরফ উদ্দিন ওয়াল ওয়ালজী, সদরে জাহান মিনহাজ উদ্দিন জুরজানী, কাজী রফিউদ্দিন কাযরুনী, কাজী শামস উদ্দিন মুরাজী, কাজী রুকন উদ্দিন সামানা, কাজী কুতুব উদ্দিন কাশনীর, কাজী জালাল উদ্দিন কাশানী, লস্করের কাজী, কাজী সদিদ উদ্দিন, কাজী জহীর উদ্দিন, কাজী জালাল উদ্দিন এবং অন্যান্য বহু উস্তাদ, মুফতী ও বিশিষ্ট জ্ঞানী সুলতান শামসউদ্দিনের সময়কার আলেমদের শিষ্য ও পুত্রদের মধ্য হইতে শিক্ষাদান ও ফতোয়া প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন। মোট কথা সুলতানের রাজত্বকাল এমনই ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা শোভিত ছিল যে, তাঁহাদের যে কোন একজনই একটি রাজ্যের গৌরবের বিষয় হইতে পারিতেন।

বলবনী রাজত্বে ওলীআল্লাহ্ দরবেশদের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁহারাও রাজ্যের শোভা বর্ধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান বলবনের রাজত্বের প্রথমদিকে দরবেশ কুল-শিরোমণি শায়খ ফরিদ উদ্দিন মাসউদ কুতুবে আলম জীবিত ছিলেন। তিনি চতুষ্পার্শ্বের জনমণ্ডলীকে নিজের পুণ্যছায়ায় ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার

পুণ্য অস্তিত্বের অছিলায় মানুষ ঐহিক ও পারত্রিক বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিত এবং তাঁহার ফয়েজ লাভ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিরা মহত্তর সম্মানে বরিত হইতেন। শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার পুত্র শায়খ সদর উদ্দিন, শায়খ কুতুব উদ্দিন বখতিয়ারে খলিফা শায়খ শায়খ-বদর উদ্দিন গজনবী, শায়খ মুলক ইয়ার পরান, দেবী সাম, সৈয়দী মওলাহু এবং অন্যান্য অনেক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দরবেশ তৎকালে জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের পুণ্যের ফলে ও গুণের আকর্ষণে সুলতান বলবনের রাজত্বে আল্লাহ্‌র রহমত অবিরল ধারায় বর্ষিত হইত।

সুলতান বলবনের রাজত্বে এমন বহু হেকিম ও চিকিৎসক ছিলেন, যাহারা নিজ নিজ বিদ্যায় অতুলনীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন মওলানা হামিদ উদ্দিন মুতরেষ, তিনি তিব্বী ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তৎকালের 'হিপোক্রি-টাস' ও 'গ্যালেন' বলিয়া কথিত হইতেন। মওলানা বদর উদ্দিন দামেশকী, তিনি যেমন তিব্বী শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন, তেমনি পরহেজগারি ও ধার্মিকতায় তাঁহার খ্যাতি ছিল। মওলানা হিসাম উদ্দিন মারীগলা এবং অন্যান্য বহু অভিজ্ঞ হেকিম সেকালের শোভা বর্ধন করিয়াছিলেন।

সুলতান বলবনের রাজত্বকালে উজীর, শরীফ, বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান লোকদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। আলেম ফাজেল, জ্ঞানীগুণী ও বাদক গায়কগণের সকলেই অতুলনীয় এবং রাজ্যে হিতাকাঙক্ষী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে গণ্যমান্য লোক বেশী ছিল বলিয়াই জগতের সর্বত্র সুলতানের সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাদশাহী সম্বন্ধীয় তাঁহার চরিত্র ও ক্ষমতা এবং শাসন বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অবশ্য অনুসরণীয় বলিয়া গন্য হইত। বলবনী রাজত্বে সুশৃঙ্খলার ফলে এমন কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট মালীকের আবির্ভাব ঘটে, যাহারা বলবনী দরবারের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

এমনই একজন বিশিষ্ট মালীক ছিলেন সুলতান বলবনের ভাতিজা মালীক আলাউদ্দিন কশলী খান। তিনি তাঁহার দানধ্যান ও সদালাপে সেই যুগের 'হাতেম তাই' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। আমি (লেখক) বহু বিশিষ্ট লোক ও আমীর খসরুর নিকট শুনিয়াছি যে, দানধ্যান, সুভাষণ, তীরনিক্ষেপ, শিকার পলো খেলার ব্যাপারে মালীক কশলী খানের ন্যায় দক্ষ কাহারও জন্ম হয় নাই। তাঁহার পিতা কশলী খান, সুলতান বলবনের ভাই, বর্তমান থাকাকালেই মালীক আলাউদ্দিন বারবেক নিযুক্ত হন এবং স্বর্ণ-মণ্ডিত লাঠি ও কোন অঞ্চলটি জায়গীর হিসাবে লাভ করেন। মালীক কুতুব উদ্দিন হাসনে গোরীর অন্তরঙ্গ

সাথী খাজা শামসমুঈন, যিনি এই মালিক আলাউদ্দিনের গুণাবলী বর্ণনায় বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তিনি তখনও জীবিত ; এমনি সময়ে একদিন মালীক আলাউদ্দিনের প্রশংসায় একটি কবিতা পাঠ করিলেন এবং উহার বিষয় লইয়া একটি গজল প্রস্তুত করিয়া দরবারের গায়কদিগকে প্রদান করিলেন। তাহাদিগকে এই কবিতা ও গজল যথারীতি তিনিই শিখাইয়া দিয়াছিলেন এবং গাহিয়া শুনাইবার জন্যও বলিয়াছিলেন। নওরোজের উৎসবের সময়, যখন সকল শ্রেণীর মালীকের খেদমতের তালিকা সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করা এবং প্রত্যেকের জন্য যথাযোগ্য সম্মান প্রদানের ব্যবস্থা করা হইত, তখন শামস্ মুঈন সেখানে হাজির ছিলেন। গায়করা উক্ত গজলটি এই উপলক্ষে সুলতানের সম্মুখে গাহিয়া শুনিয়াছিল।

'শাহ আলাউদ্দিন উলুগ কুতুলুগ বিশিষ্ট বারবেক—বিশিষ্ট কশলী খানের বংশধর—জগতের সম্রাট।' ইহা শুনিয়া মালীক আলাউদ্দিন তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কারের সমুদয় অশ্ব শামস মুঈনকে দান করেন এবং গায়কদিগকে হাজার তঙ্কা করিয়া পুরস্কার প্রদান করেন। অবশ্য এই সামান্য ঘটনা হইতে মালীকের দানধ্যানের কোন ধারণাই করা যায় না। বস্তুতঃ দানধ্যান, সদালাপ তীরন্দাজি ও শিকারের ব্যাপারে মালীক আলাউদ্দিনের যে খ্যাতি সমগ্র হিন্দুস্থান ও খোরাসানে পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহাতে নিজ ভাতিজা হওয়া সত্ত্বেও সুলতান বলবন তাঁহাকে হিংসা করিতেন এবং তাঁহার সপ্রচুর দানশীলতার সংবাদে মনক্ষুণ্ণ হইতেন।

সুলতান বলবনের উজীর, হাসান বসরীর ভাগিনেয়, খাজা বকীর নিকট আমি (লেখক) শুনিয়াছি যে, বলবনী রাজত্বকালে মালীক আলাউদ্দিন কশলী খানের দানশীলতা, বাগ্মিতা, তীরনিক্ষেপ ও শিকারে দক্ষতার সংবাদ বাগদাদে হালাকু খানের নিকট পৌঁছিয়াছিল। ইহার ফলে হালাকু খান স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে একটি ছোট ছুরি পাঠাইয়া দেয়। এই ছুরিটি সুলতান বলবনের উকিলে দর বুযগালার পুত্র বহন করিয়া আনিয়াছিল। হালাকু খান তাহার নিকট বলিয়া পাঠায় যে, 'আমার তরফ হইতে মালীকি আলাউদ্দিনকে বলিও, আমি তাহার তীরন্দাজি ও বাগ্মিতার কথা শুনিয়াছি। তাহাকে আমার দেখিবার ইচ্ছা হয়। সে যদি আমার নিকট চলিয়া আসে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ইরাকের অর্ধেক দান করিব।'

সুলতান বলবন এই সংবাদ শুনিয়া খুবই মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কারণ ইহা তাঁহার নিকট খুব ভাল সংবাদ বলিয়া মনে হয় নাই এবং ইহার ফলে

মালীক আলাউদ্দিনের প্রতি তাঁহার হিংসা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বস্তুতঃ আলাউদ্দিন সম্পর্কে এই প্রকার আরও বহু কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে।

মালীক আলাউদ্দিন সুলতান বলবনের আমীর হাজেব ছিলেন। দানধ্যান ও সম্ভ্রম মর্যাদায় তাঁহার তুলনা ছিল না। বহুবার নিজ বাসস্থান ও জমিজমা নষ্ট করিয়াছেন এবং নিজের পরিধেয় পোশাক ব্যতীত অন্য কিছু নিজের জন্য রাখিতে সক্ষম হন নাই। হায়, আফসোস, হাজার আফসোস! এমন এক মহান ব্যক্তিকেও সময় বিনাশ করিয়াছে এবং কালের এমন একটি মধুর ফসলকে আকাশ মাটির নীচে প্রোথিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি যে ব্যক্তি এমনই মহান লোকদের শোকগাথা লিখিতেছি এবং বহু অভিজ্ঞ গুণী ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি—আকাশ আমার উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহা কোন অযথা অহঙ্কারীর উপরও ন্যায্য বলিয়া গণ্য হইত না। সেইজন্যই আমি এই সকল অভিজ্ঞ ও মহান ব্যক্তির জন্য কাঁদিতেছি এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছি—'এই প্রতারক সময়ের নিকট হইতে তুমি তাঁহাদের জন্য ইহার অধিক কি আশা করিতে পার।'

সুলতান বলবনের বিশিষ্ট মালীকদের অন্যতম দ্বিতীয় মালীক ছিলেন ইমাদুল মুলক 'রাওতে আরজ'। ইনিও সুলতান শামসউদ্দিনের দাস এবং তাঁহার রাজত্বকালেই 'শেকরা'র আরজ দপ্তর হইতে রাজধানীর আরজ দপ্তরে আরজে মুমালিকের পদে যোগ দিয়াছিলেন। সুলতান শামসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের ত্রিশ বৎসর কালীন রাজত্বেও আরজের কাজ যথারীতি ইমাদুল মুলকের হাতে ছিল। সুলতান বলবনের সিংহাসন আরোহণের পরও তাঁহাকেই রাওতে আরজের পদে বহাল রাখা হয়। কারণ ইমাদুল মুলক সুলতান শামসউদ্দিনের রাজত্বকালেও বলবনের বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন। মোট কথা এই যে, দীর্ঘ বাষট্টি বৎসরকালব্যাপী রাজত্বে রাওতে আরজের পদ তাঁহার আয়ত্তাধীনে এবং উহার সর্বপ্রকার কাজ তাঁহার পরিচালনায় নিষ্পন্ন হইত। এইজন্য সুলতান বলবন রাওতে আরজের পদাধিকারীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনও অবহেলা করিতেন না। তাঁহাকে সুলতান নিজের পরাক্রমশালী অন্য মালীকদের তুল্য বলিয়া ভাবিতেন। এই কারণেই ইমাদুল মুলক আরজের দপ্তর পরিচালনায় বলিতে গেলে প্রায় স্বাধীন ছিলেন।

সুতরাং রাওতে আরজের চোখে কোন অশ্বারোহীর কর্মতৎপরতা ধরা পড়িলে, তাহার বেতন বাড়াইয়া দিতেন এবং নূতন পোশাক ও অন্যবিধ পুরস্কার দানে তাহাকে উৎসাহিত করিতেন। সুলতানের নিজস্ব অশ্বারোহীদের কাহারও উপর কোন বিপদ আপতিত হইলে, সে যদি রাওতে আরজের নিকট আসিয়া

বলিত যে, আমার উপর এই বিপদ আসিয়াছে, আমার ঘোড়া ও অস্ত্র উক্ত দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হইয়াছে ; তাহা হইলে রাওতে আরজ তাহাকে নিজহাতে ধরিয়া কাছে বসাইতেন এবং নিজের বিশেষ তহবিল হইতে হইলেও তাহাকে সাহায্য করিতেন। তিনি বলিতেন, আমি যতক্ষণ কর্মচারীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার কাঁধে করিয়া আছি, ততক্ষণ যদি তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে এমন দায়িত্বের বোঝা বহিয়া বেড়াইবার সার্থকতা কী! বাস্তবিকই কর্মচারীদিগের প্রতি রাওতে আরজের ব্যবহার পিতামাতা অপেক্ষাও অধিক আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। কোন অশ্বারোহীর অশ্বটি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিলে তিনি তাহার চরিত্র সম্পর্কে সংবাদ লইতেন এবং সে বদমায়েশী ও মদ্যপান করে কিনা খুঁজিয়া দেখিতেন। যদি তেমন কিছু না হইত, তাহা হইলে তাহাকে নিজস্ব আস্তাবল হইতে একটি ঘোড়া ও ঘোড়ার বাচ্চা এবং পঞ্চাশটি তঙ্কা দিয়া বলিতেন, 'ইহার সাহায্যে তোমার ঘোড়াটিকে মোটাতাজা করিও।'

রাওতে আরজ প্রতি বৎসর আরজ দপ্তরের সকল কর্মচারীকে নিজ গৃহে দাওয়াত করিয়া আহার করাইতেন ও পোশাকাদি দিতেন এবং নিজস্ব তহবিল হইতে বিশ হাজার তঙ্কা তাহাদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুসারে বাঁটিয়া দিবার জন্য প্রদান করিতেন। তিনি কর্মচারীদিগের প্রত্যেককে নিজের সম্মুখে ডাকিয়া আনিতেন, হাতে চুমা দিতেন এবং যথাযোগ্য প্রশংসা করিয়া বলিতেন, 'আমি তোমাদের নিকট এই আশাই করি যে, তোমরা কর্মচারীদের মালীক সুলতানের উপর, দপ্তরের মালীক আমার উপর ও রাজ্যের রক্ষী সাধারণ কর্মচারীদের উপর কোন অত্যাচার করিবে না। ঘুষ রেশোয়াত হিসাবে কর্মচারীদের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিবে না। যদি তোমরা তোমাদের সহকর্মী ও আমীরদের নিকট হইতে প্রাপ্য বলিয়া কোন কিছু গ্রহণ কর, তাহা হইলে সহকর্মীরা নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য লোকদের নিকট হইতে উহার দুই তিন গুণ আদায় করিয়া তাহাদের বেতনের পয়সা অক্ষুণ্ন রাখিবে এবং উহার তিন ভাগ বা চারিভাগের একভাগ তোমাদিগকে দিয়া বাকী অংশ তাহারা ভোগ করিবে। তোমরা যদি কর্মচারীদিগকে নিঃস্ব করিতে না চাহ, তাহা হইলে কর্মচারীদের বেতন হইতে যাহাতে এক 'চীতল'ও কম না হয় এবং তাহাদের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার না হয়, তজ্জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে।'

অনেকবারই রাওতে আরজ দপ্তরে আরজের কুরসীতে বসিয়া সম্মুখের সকলে শুনিতে পায় এমনভাবে বলিয়াছেন, আমি রাজ্যের রক্ষী ও শাসনব্যবস্থার সাহায্যকারী। কারণ কর্মচারীদের দায়িত্বভার আমার উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

তাহাদের সম্পর্কে যাহা কিছু করিতে হয়, আমাকেই করিতে হইবে। কাজেই আমি যদি রাত্রিদিন কর্মচারীদের যাহাতে ভাল হয়, তাহা না ভাবি এবং তাহাদিগকে আমার ভাই ও বেটার ন্যায় ভাল না বাসি, তাহা হইলে দুনিয়াতে আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্য লজ্জা পাইতে হইবে এবং আখেরাতেও খোদার দরবারে মুখ দেখাইতে পারিব না।

এইভাবে দপ্তরে আরজ হইতে প্রাপ্ত ইমাদুল মুলক রাওয়াতে আরজের খোরাকী এই দাওয়াতের একদিনেই শেষ হইয়া যাইত। পঞ্চাশ ষাইট খানি দস্তরখান পড়িত। ইহাদের উপর ময়দার রুটি, ছাগীর মাংস, কবুতর ও বাচ্চা মোরগের মুসল্লম, টিকিয়া, বুরবান, শরবত ও পান সজ্জিত থাকিত। রাওতে আরজ দপ্তরেই এই সকল খাদ্য আনয়নের ব্যবস্থা করিতেন এবং সকল দপ্তর লেখক, সহমুল হশমাঁ, নায়েব সহমুল হশমাঁ, চাওশা, নকীব, নায়েব আরজ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত দিতেন। মোট কথা দপ্তরে আরজের সহিত যাহাদের কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকিত, তাহারা সকলেই এই দস্তরখানে উপস্থিত হইতেন এবং এই সুপ্রচুর খাদ্য সম্ভার নিঃশেষ হইয়া যাইত। বাদবাকী যাহা থাকিত, ফকিরদিগকে বিলাইয়া দিতেন। যাহাদের বসিবার কোন স্থান হইত না, তাহারা রাওতে আরজ ইমাদুল মুলকের দস্তরখান হইতে আহার গ্রহণ করিত। তাঁহার পানের প্রাচুর্য ও স্বাদের খুব সুখ্যাতি ছিল। তিনি তাহার স্বভাব অনুসারে খুব ঘন ঘন পানের জন্য আদেশ দিতেন। যখনই তিনি পান হাতে লইতেন, সম্মুখে উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান, পরিচিত অপরিচিত যতলোক উপস্থিত থাকিত, সকলের জন্য পানের ব্যবস্থা করিতেন। ফলে যতক্ষণ তিনি দপ্তরে আরজে থাকিতেন পাঁচ ছয়জন চাকর* উপস্থিত লোকদের মধ্যে পান বাঁটিয়া দেওয়ায় ব্যস্ত থাকিত। রাওতে আরজ পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ মালীক ও খানদের জাঁকজমকের সকল প্রথার অনুসরণ করিতেন। দানধ্যানের ব্যাপারেও তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তিনি বহু গ্রাম ওয়াকফ করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর বহু বৎসর অতীত হওয়া সত্বেও বর্তমানে তাঁহার প্রদত্ত একটি ওয়াকফী গ্রাম বিদ্যমান। ইহার আয় উত্তরাধিকারীদিগের নিকট যথারীতি পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহারাও ইমাদুলমুলক রাওতে আরজের জন্য খতম পড়ায় ও দোয়া করায়।

সুলতান বলবনের বিশিষ্ট মালীকদের অন্যতম তৃতীয় মালীক ছিলেন মালীকুল উমরাহ্ ফখর উদ্দিন কতোয়াল। দানধ্যানের ব্যাপারে শহরে তাঁহার

* পঞ্চাশ ষাইট জন (?)

প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি বার হাজার অজিফা পাঠকারী পোষণ করিতেন। তাহারা প্রতিদিন হাজার বার কোরান খতম করিত এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে এক দিনেই কোরান খতম করিতে পারিত। বৎসরের তিন শত ষাইট দিনে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সর্বদা তিনি একটি নূতন কাবা, 'একতা', পিরহান, ইজার ও পাগড়ী পরিধান করিতেন। যে কাপড় একবার পরিতেন, তাহা দ্বিতীয়বার তাঁহার শরীরে শোভা পাইত না। এই সমস্ত কাপড় তিনি দান করিয়া দিতেন। তাঁহার শয্যার খাট ও বিছানাও এইরূপ নূতন হইত। এই সকল খরচের পর যাহা জমা হইত, তাহা পিতৃমাতৃহীন অনাথ ও গরীব পিতামাতার সন্তানদের বিবাহের যৌতুকের জন্য ব্যয় হইত। এক বৎসর তিনি এক হাজার নিঃস্ব মেয়ের বিবাহের যৌতুক প্রদান করেন। কোরানের লিপিকাররা কোন নূতন লিখিত কোরান তাঁহার সম্মুখে পেশ করিলে শোকরিয়া আদায় বাবদ তাহা-দিগকে কিছু দান করিতেন এবং কোরান পড়িতে পারে এমন কোন গরীব লোক যদি কোরানের জন্য প্রার্থনা জানাইত, কিংবা হেফজ করিবে বলিয়া সাহায্য চাহিত, তাহা হইলে তাহাদের জন্য যথাসাধ্য ব্যয় করিতেন। এই স্থলে যাহা কিছু উল্লেখ করা হইল, তাহা হইতে মালীক ফখর উদ্দিন কতোয়ালের দানধ্যানের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি বড় মসজিদের দরজার নিকট তাঁহার কবর তৈয়ার করাইয়া রাখেন, যাহাতে মৃত্যুর পর তিনি সর্বদা মুসল্লীদের দোয়া লাভ করিতে পারেন।

সুলতান বলবনের বিশিষ্ট মালীকদের অন্যতম চতুর্থ মালীক ছিলেন, তৎকর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস পুত্র মালীক আমীর আলী সের জানদার। অতিরিক্ত দানশীলতার জন্য তাঁহাকে 'হাতেম খান' বলিয়া ডাকা হইত। আমীর খসরুর 'দিওয়ানে' তাঁহার বহু প্রশংসা বিদ্যমান। কবি আমীর আলী সের জানদারের অজিফাখোর ছিলেন ; তাঁহার নামে 'আসপে নামা' রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের দুই তিনটি বয়েত নিম্নরূপ :—

যুগের সম্রাট, ধর্ম ও রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ;
সৌন্দর্যমণ্ডিত গৃহে তিনি মর্যাদার সূর্য।
তাঁহার নাম 'আলী' আর অন্তরও উদার ;
আলীর ন্যায় সিংহতুল্য, দুলদুলে আরোহী।
জগৎ-অশ্বের বল্গা তাঁহার হাতে এবং
তাঁহার চাবুকের ইঙ্গিতে সে সদা ধাবমান।

সুলতানের এই দাসপুত্র কতইনা বিশিষ্ট, মানী, দাতা ও অদ্ভুত গুণের অধিকারী ছিলেন, যাহার জন্য মানুষ তাঁহাকে 'যুগসম্রাট' ও 'হাতেম খান' বলিয়া ডাকিত। আর এই বাদশাহই বা কত উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যাহার দাস পুত্রকে মানুষ তাঁহার রাজত্বকালে এবং পরবর্তী সময়েও 'শাহ' ও 'হাতেম' বলিয়া স্মরণ করিত। মালীক আমীর আলী সের জানদারের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ছিল হাজার হাজার। আমীর খসরু যেমন তাঁহার গুণ কীর্ত্তনে বলিয়াছেন :—

> 'সমুদ্রকে বলিলাম, তুমি যদি খানের হাতে দয়ার সমুদ্র হইতে, তাহা হইলে কম্পিত হৃদয়ে স্মরণ করিতে যে, এইস্থান তোমার জন্য নহে। কারণ দানের সামগ্রী হিসাবে তাঁহার হাতে শোভা পায় হীরামুক্তা, যেমন আমাদের হাতে শোভা পায় আবর্জনা।'

বস্তুতঃ তাঁহার দানের নিম্নতম পরিমাণ ছিল একশত তঙ্কা। তিনি যাহাকে পোশাক ও ঘোড়া দান করিতেন, তাহার হাতে কিছু স্বর্ণও দিতেন। পথে পথে ভিক্ষাকারী ফকিরদিগকেও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দান করিতেন। 'চীতল'-এর উল্লেখ তাঁহার মুখে কখনও শোনা যাইত না। তাঁহার এই প্রকার দানধ্যানের সংবাদ যতই সুলতান বলবনের নিকট পৌঁছিত, তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ উদারতার সহিত ততই আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। কারণ তাঁহার দয়াতেই তাঁহার রাজত্বে এমন একজন দানশীল ব্যক্তি বিদ্যমান, যিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য ও আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার সম্মান একদিক হইতে বাদশাহেরও প্রাপ্য। এই কারণে সুলতান যখনই তাঁহার অত্যাধিক দানের কথা শুনিতেন, তখনই 'কেতা' ও অন্যান্য পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। একদিন সুলতান তাঁহাকে বলিলেন, 'আলী, আমি শুনিতে পাইলাম মদের নেশায় বিভোর হইয়া তুমি অনেক কিছুই দান করিয়া থাক; কিন্তু সচেতনভাবে যদি তুমি এইরূপ দান করিতে, তাহা হইলে কতইনা ভাল হইত।' সুলতানের এই মন্তব্য শুনিবার পর হাতেম খান শরাব পান ত্যাগ করেন এবং সচেতনভাবে মত্তাবস্থা হইতে অধিকতর দান খয়রাত করিতে বদ্ধপরিকর হন।

সুলতান শামস উদ্দিনের কয়েকজন বিশিষ্ট মালীকও সুলতান বলবনের সময় জীবিত ছিলেন। এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহার রাজত্বকাল গৌরবপূর্ণ ছিল। বাস্তবিক তাঁহাদের অন্তর্ধানের পর অনুরূপ ব্যক্তিত্বের কথা আর শুনি নাই এবং তদ্রূপ কাহাকেও দেখি নাই।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক, আমি আমার মাতামহ সিপাহসালার হিসাম-উদ্দিন উকিলে দরের নিকট শুনিয়াছি যে, সুলতান শামস উদ্দিন, নাসির উদ্দিন ও বলবনের মালীকদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ ও রেষারেষির কোন ভাব ছিল না। একমাত্র শুভ কার্যেই তাঁহাদের আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়া উঠিত। যদি কোন খান বা মালীক শুনিতেন যে, অমুকের দস্তরখানে পাঁচ শত লোক আহার করিয়াছে, তবে তিনি তাঁহার দস্তরখানে হাজার লোকের আহার্য উপস্থিত করিতেন। যদি কেহ শুনিতেন যে, অমুক বাহিরে যাইবার সময় দুইশত তঙ্কা দান করিয়াছে, তবে তিনি বহির্গমনের সময় চারিশত তঙ্কা দান করিয়া ফেলিতেন। যদি কেহ শরাবের মজলিশে পঞ্চাশটি ঘোড়া ও দুই শত লোককে পোশাক দান করিত, তাহা হইলে অপরে এই সংবাদ শুনিয়া এক শত ঘোড়া ও পাঁচ শত লোককে পোশাক দান করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। এইভাবে অতিমাত্রায় দান খয়রাতের ফলে তৎকালের খান ও মালীকরা সর্বদাই ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের আবাস গৃহের সাজসজ্জা ব্যতীত অন্যত্র স্বর্ণরৌপ্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যাইত না। এইরূপ অতিরিক্ত দানধ্যানের ফলে ধন-সম্পদ মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিবার কোন উদ্যোগ ছিল না; বরং এই প্রকার প্রতিযোগিতামূলক দান-ধ্যানকেই তাঁহারা তদপেক্ষা ভালবাসিতেন।

দিল্লীর মুলতানী ও সাহুদের বিরাট ঐশ্বর্য এই সকল প্রাচীন মালীক, আমীর ও খানের বদৌলতেই হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা ইহাদের নিকট হইতে যথাসাধ্য ঋণ গ্রহণ করিতেন এবং কেতা ও জায়গীরের আয় হইতে নানাবিধ পুরস্কার সহ তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতেন। আমীর ও খানরা কোন ভোজের ব্যবস্থা করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করিতেই এই সকল মুলতানী ও সাহুর কর্মচারীরা তৎপর হইয়া উঠিত এবং যথাস্থানে উপস্থিত থাকিয়া ধনসম্পদ সরবরাহ করিত। অতঃপর যথাযোগ্য সুদ সমেত উহা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করিয়া লইত।

এইক্ষণে সুলতান বলবনের সময়কার বিশিষ্ট মালীকদের গুণাবলীর বর্ণনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজত্বের শেষকালের অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছি।

খান শহীদের শাহাদতের পর সুলতান বলবন খুবই শোকাকুল ও বিচলিত হইয়া লক্ষণাবতী হইতে বগরা খানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বগরা খান উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিলেন, 'হে পুত্র, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে খুবই আঘাত পাইয়াছি, তাহা আমাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছে এবং যতদূর মনে হয়, আমার জীবনের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময়ে তোমার দূরে

থাকা উচিত নহে। কারণ তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন পুত্র সন্তান নাই। কায়কোবাদ ও কায়খসরু নামে তোমাদের যে দুই পুত্রকে আমি লালন পালন করিয়াছি, তাহারা এখনও যুবক; জীবনের কোন অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই। তাহারা আমার স্থলাভিষিক্ত হইলে যৌবনের নেশায় এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় শৃঙ্খলার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে না। ফলে সুলতান শামস উদ্দিনের পরে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজ্যের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই পুনরায় দেখা দিবে। যদি তুমি লক্ষণাবতীতে থাক এবং দিল্লীর সিংহাসনে অন্য কেউ আরোহণ করে, তবে তোমাকে তাহার নফর হিসাবে কাজ করিতে হইবে। অন্য-দিকে তুমি যদি দিল্লীতে থাক, তবে লক্ষণাবতীতে যাহাকে পাঠাইবে, সে তোমা-কেই মান্য করিবে। আমার এই কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ এবং এই সময়ে আমার নিকট হইতে দূরে থাকিও না। লক্ষণাবতী যাইবার কথা মনেও আনিও না।'

কিন্তু সুলতানের এই আবেদন বগরা খান তেমন গুরুত্ব দিয়া গ্রহণ করিল না। সে স্বভাবতই অস্থির ছিল, সে জানিত না যে, রাজ্যের উত্থান-পতনের সময় অনেক কিছুই ঘটিয়া থাকে এবং চতুর্দিকে অপ্রত্যাশিত বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে দুই তিন মাস দিল্লীতে পিতার নিকট অবস্থান করিল। বস্তুত: তাহার এই প্রকার অবস্থান কিছুদিনের জন্য সুলতানের মনে একটি স্বস্তির ভাব আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু বগরা খানের মন ক্রমশ লক্ষণাবতীর আমোদ স্ফূর্তির জন্য অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং সে অজুহাত সৃষ্টি করিয়া পিতার অমতেই লক্ষণাবতীতে ফিরিয়া গেল।

বগরা খানের এক ছেলের নাম ছিল কায়কোবাদ। সুলতান তাহাকে তাহার নিকটে রাখিয়া পালন করিয়াছিলেন। সে এই সময়ে সুলতানের নিকটেই ছিল। তথাপি বগরা খান লক্ষণাবতীতে পৌঁছিবার পূর্বেই সুলতান পুনরায় শোকাকুল হইয়া পড়িলেন, নানাবিধ যাতনার গুরুভার তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জীবনের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ রুগ্ন অবস্থায় মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তিনি মালীকুল উমারা কতোয়াল, উজির খাজা হোসেন বসরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট লোকদিগকে নিজের সন্নিকটে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুলতান মালীকুল উমা-রাকে বলিলেন, আপনি বৃদ্ধ ব্যক্তি, আপনার অভিজ্ঞতা প্রচুর, অনেক রাজ্যের উত্থান-পতন দেখিয়াছেন; কাজেই আপনি জানেন যে, অন্তিমকালে বাদশাহগণ কী অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করিয়া যায়। আমার মনে হয়, আমার জীবনের

মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং রাজ্যের অবস্থাও প্রাচীনত্ব লাভ করিয়াছে। আমার মনে যে আশংকা জাগিতেছে, তাহা এই যে, এই দুনিয়ার বাদশাহী চির-স্থায়ী নহে ; আরও কিছুকাল হয়ত আমি থাকিতে পারি, কিন্তু ইহার পরে সময় শেষ হইবেই এবং এই দুনিয়ার অন্যান্য বাদশাহের সহিত সময় যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছে, আমার সহিতও সেই ব্যবহারই করিবে। সুতরাং আমি বলিয়া যাইতেছি যে, আমার পরে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ছেলে কায়খসরুকে আপনি সিংহাসনে বসাইবেন। তাহাকে আমি তাহার পিতার মৃত্যুর পর সিংহা-সনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছি এবং আমার আশা অনুসারে তাহার মধ্যে রাজ্য পরিচালনার গুণও কিছুটা দেখা গিয়াছে। সে বয়সে ছোট; আশংকা হয় যে, সে রাজ্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহন করিতে পারিবে না ; তথাপি অন্য কোন উপায় নাই। কারণ মাহমুদ এইক্ষণে উপস্থিত নাই। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবার পরও সে এইস্থলে কোন কাজে লাগিবার পূর্বেই পুনরায় লক্ষণাবতীতে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনিবার সময়ও নাই। কাজেই কায়খসরুকে তখতে বসাইবার উপদেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ আমার সম্মুখে খোলা নাই। সুলতান এই প্রকার উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া মালীকগণকে বিদায় করিলেন এবং রোগ ভোগের তৃতীয় দিনে তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া আপন প্রভু মহান আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়া গেলেন।

কতোয়াল ও তাঁহার সঙ্গিগণ শহরের সামাজিকতায় বেশ দৃঢ়তার সাথে আসর জমাইয়া বসিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহারা একদিকে যেমন শাসন করিতেন, অন্যদিকে তেমনি নানাপ্রকার প্রাচীন দুষ্কর্মেরও সহায়ক ছিলেন। তাঁহাদের এই প্রকার আচার-আচরণ খান শহীদের চোখে খুব ভাল ঠেকিত না। ফলে খান শহীদের সহিত কতোয়ালের খুব সদ্ভাব ছিল না। এই কারণেই কতোয়াল সুলতানের এই অন্তিম উপদেশের কথা শুনিয়া বেশ চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ কায়খসরু যদি বাদশাহ হয়, তাহা হইলে তাহার উপর বিপদ আসিবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং তিনি সেইদিনই কায়খসরুকে মুলতান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বগরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে মইয উদ্দিন উপাধি প্রদান করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন।

রাত্রিশেষে সুলতান বলবনের মৃতদেহ 'কওশকে লাল' প্রাসাদ হইতে বাহিরে আনাইলেন এবং 'দারুল আমান'-এ লইয়া গিয়া দাফন করাইলেন। যে পরাক্রমশালী-নিয়মনিষ্ঠ ও সার্থক শাসক বহুকাল জাঁকজমকের সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তিনি মাটির নীচে শয়ন করিলেন এবং মাত্র চারি গজ জমিনে তাঁহার লাশ স্থাপন করা হইল। কবি বলেন,—

বাদশাহের রাজ্য ছিল পানি ও আগুনের ;
সে পানি শুকাইয়া গিয়াছে ও আগুন নিভিয়া গিয়াছে।
এখন সে রাজ্য মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত
ও তাঁহার সৈন্যবাহিনী মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে।

সুলতান বলবনের জানাজা কওশকে লাল হইতে বাহিরে আসিলে বিশিষ্ট মালীক ও পারিষদগণ খালি মাথায় মাটি মাখিয়া পরনের কাপড় ছিঁড়িয়া উহার অনুগামী হইলেন। জানাজা 'দারুল আমান'-এ পৌঁছিলে দাফন করিবার পর-মূহূর্তেই বিচক্ষণ মালীকুল উমারা কতোয়াল পুনরায় মাথায় মাটি মাখিয়া সকলে শুনিতে পায় এইরূপ উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, মরহুম বাদশাহ প্রায় বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন এবং সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার উপর যেমন লোকের দাবী রহিয়াছে, তেমনি তাঁহার বহু দাবী মানুষের উপর বিদ্যমান। কাজেই মানুষ নামধারী কেহ যদি সন্তুষ্টচিত্তে বৎসরে বা মাস ছয়েকের জন্য দিল্লীকে দুর্ঘটনা ও বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত রাখিতে ইচ্ছা না করে এবং কোন বেয়াদব কমজাতের মনে যদি রাজ্যলাভের লোভ দেখা দেয়, তাহা হইলে এই প্রকার কুচিন্তা তাহার মস্তিষ্কে দানা বাঁধিবার পূর্বেই উপস্থিত এই সকল লোক উহার বিরোধিতা করিবে; কারণ তাহারা সুলতানের প্রভাবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছে। তদুপরি প্রাচীন বংশাবলীর সকল লোক এবং সৈন্যদলও এই বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

মালীকুল উমারা কতোয়াল সুলতানের মৃত্যুশোক পালন করিবার জন্য ছয় মাস মাটিতে শয়ন করেন। মালীক, আমীর, সদর এবং শহরের অন্যান্য বিশিষ্ট লোকেরা চল্লিশ দিন মাটিতে শয়ন করিয়া শোক প্রকাশ করেন। জ্ঞানী, গুণী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ সুলতানের মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত হন। শহরের বিশিষ্ট সকল পরিবারই মরহুম সুলতানের নামে 'ফাতেহা' ও 'সিওম' পালন করেন।

সুলতান বলবন, যিনি অনুগত, বাধ্য ও শান্তিকামী মানুষের পিতামাতার ন্যায় ছিলেন, যেদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেন, সেইদিন হইতেই বলিতে গেলে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দূরীভূত হইল এবং রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে মানুষের মনের দৃঢ় বিশ্বাস লোপ পাইতে লাগিল। অতি সত্বর, সুলতানের পৌত্র মুইয উদ্দিনের রাজত্বকাল এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই মালীক, আমীর ও সৈন্যদলের লোকেরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হইল এবং অনেক লোক সন্দেহের জন্য নিহত হইল। ফলে মানুষের

মনে বলবনী রাজত্বের শান্তি শৃঙ্খলার কথা সর্বদাই জাগরিত হইতে থাকিল এবং তাঁহার গুণাবলীর আলোচনা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি, জিয়া বারাণী এই গ্রন্থে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছি সত্য এবং ইহাও জানি যে, বর্তমানে ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তি একান্তই বিরল; তথাপি এই আশা পোষণ করিতে পারি যে, ইতিহাস প্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই এই কথা স্বীকার করিবেন—তারিখে ফিরুজশাহীর ন্যায় রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় ব্যাপক ইতিহাস বিগত এক সহস্র বৎসরের কোন ঐতিহাসিক রচনা করেন নাই। কিন্তু হায়; আমার করিবার কিছু নাই! আমি শুধু এই অনুরোধ করিতে পারি যে, তাহারা যেন অন্যান্য তারিখের সহিত এই গ্রন্থটির তুলনা করেন এবং আমার পরিশ্রমের যথোচিত মূল্য প্রদান করিতে দ্বিধান্বিত না হন। কারণ ইহাতে আমি শুধু ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করি নাই; বরং সকল প্রকার সংবাদের সঙ্গে যথাযথ শৃঙ্খলা স্থাপনের পথনির্দেশও করিয়াছি এবং রাজ্যের উত্থান-পতন সম্পর্কে যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে ও আভাসে ইঙ্গিতে বর্ণনা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, ইতিহাসামোদী ব্যক্তিদিগের অস্তিত্ব বর্তমানে একান্তই বিরল। সে সকল ব্যক্তি ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের মর্যাদা বুঝিতে পারিতেন, তাঁহারা লোপ পাইয়াছেন। নতুবা শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, মনে হয়, বাদশাহ জমশেদ ও কায়খসরু—যাঁহারা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন কিংবা বাদশা নওশেরোয়াঁ ও পারভেজ—যাহারা যথার্থ বাদশাহী করিয়া গিয়াছেন; যদি আজ জীবিত থাকিতেন এবং আমি এই গ্রন্থ তাহাদের সম্মুখে পেশ করিতাম, তাহা হইলে তাঁহারা যদি চমৎকৃত হইয়া আমার এই তারিখের পরিবর্তে আমাকে অনেকগুলি শহর দান করিতেন, তথাপি আমি তাহা গ্রহণ করিতাম না। বরং আমি তাঁহাদের দরবারে এই ভিক্ষা চাহিতাম, যেন তাঁহাদের অনুগ্রহ, আমার কল্যাণকামনা এবং গ্রন্থের পবিত্রতায় এই তারিখ আপামর জনসাধারণের মনে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয়। যদিও আমার এই ধারণা অসম্ভব, অবিমৃষ্যকারিতা ও নিতান্তই আকাশ কুসুম কল্পনামাত্র, তথাপি বলিব, যদি আমার এই তারিখটি এ্যারিস্টটল ও বুযরচ মেহেরের লক্ষ্য গোচর হইত, তবে তাঁহারা আমার এই কার্যের জন্য কী প্রশংসাই না করিতেন! আমিও ভাবি, লোকেও ইহাকে বদ্ধ পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে করিতে পারে, তথাপি বলিতে ইচ্ছা হয়, যদি সুলতান সঞ্জর ও মাহমুদের সময় কোন লেখক এইরূপ একটি তারিখ তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিত, তাহা হইলে উক্ত লেখকের নাম সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করিত।

উপরের কয়েক ছত্রে যাহা লিখিলাম, অনুরূপ আক্ষেপের সহিত আমার অন্তরে আরও একটি বৃহত্তর আক্ষেপ বিদ্যমান এবং তাহা এই যে, বর্তমান বাদশাহের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ এবং তৎসম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শত্রুদের চক্রান্তে আমি তাঁহার খেদমত হইতে বহুদূরে পড়িয়া আছি। তাঁহার সুদৃষ্টির সম্মুখে আমার এই প্রচেষ্টা তুলিয়া ধরিবার কোন সুযোগই আমি পাই নাই। আমি তাঁহার পুণ্য নামে এই তারিখের নামকরণ করিয়াছি এবং তাঁহার জীবনের বহু কথাও ইহাতে বর্ণনা করিয়াছি; সুতরাং এই তারিখ যদি তাঁহার পুণ্য খেদমতে উপস্থিত করিতে পারিতাম এবং তাঁহার সদয় দৃষ্টি যদি ইহার যোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে আমার হৃদয়ের সকল আক্ষেপ—আমার অপূর্ণ আশার সকল জ্বালা দূরীভূত হইত!

পবিত্র ও অদৃশ্য প্রভু মহান আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি খুবই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি এবং এই নিরাশার আঁধারে পড়িয়া সেই পরম প্রভু চির মহানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেছি, হে আল্লাহ্‌, আমার এই নিরাশা, আমার এই অক্ষমতার দরুন তুমি আমার প্রতি সেই অপার করুণার দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকাও, যাহার স্পর্শে আমার এই গ্রন্থ বর্তমান কালের বাদশাহ ফিরুজ শাহের গোচরীভূত হইতে পারে। হে আল্লাহ্‌, বাদশাহের রাজ্য ও পরাক্রম চিরস্থায়ী কর এবং আমার এই প্রচেষ্টা যেন বিফলে না যায়। হে আল্লাহ্‌, ইহা তোমার নিকট অতি সহজ কাজ এবং তুমি সকলের প্রার্থনাই কবুল করিয়া থাক।

সুলতান মুইয উদ্দিন কায়কোবাদ

কাজী সদরে জাহান জালাল উদ্দিন কাশানী; সুলতান শামস উদ্দিনের পুত্র কিওমরচ; খানে খুরাসান; মালীকুল উমারা কতোয়াল বেগ; হজরত খান মালীক শাহক লশকর খান; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন জীজু; হাতেম খান আমীর আলী সের জানদার; শায়েস্তা খান মালীক জালাল উদ্দিন খিলজী; মালীক নিযাম উদ্দিন দাদ বেগ; মালীক কেওয়ান উদ্দিন এলাকা দবীর; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন তুর্কী; মালীক এতমার কাজন; মালীক বিশর সুলতানী; মালীক মুহম্মদ বকবক বারবেক; মালীক আজম উদ্দিন হোরস; মালীক নসরত সবাহ; মালীক তুরমতী শাহানাপীল; মালীক নসরত উদ্দিন রানা শাহানাপীল; মালীক তাজউদ্দিন কুচী; মালীক আলী শাহ কুজুদী; মালীক ফখরউদ্দিন কুচী; মালীক তাজউদ্দিন কীরবেক; মালীক আজম উদ্দিন গোরী; মালীক সায়েফ উদ্দিন নাহজন; মালীক আলাউদ্দিন তাজের; মালীক নাসির উদ্দিন আলগচী; মালীক তাজউদ্দিন নাখোদর; মালীক নসরত উদ্দিন নসর উল্লাহ; মালীক আইন উদ্দিন হরিণমার; মালিক জিয়াউদ্দিন ঝঞ্জী: মালীক আইনউদ্দিন বরমশ; মালীক রুকন উদ্দিন: মালীক সায়েফ উদ্দিন কীরবেক; মালীক নাসির উদ্দিন মকরহাণী; মালীক কামাল উদ্দিন মাঢীয়ার; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন পাজী; মালীক নাসির উদ্দিন সিফর সুলতানী; মালীক ইজ্জউদ্দিন ইয়াগা খান; মালীক জয়নউদ্দিন শরকে শক্কর; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন সকুনত; হজরত খানের পুত্র মালীক হিশাম উদ্দিন; করলগপৌ; মালীক হিযবর উদ্দিন; মালীক বাহাউদ্দিন হিলমী।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওস্‌সালাতু
আলা রসূলিহি মহম্মাদিও ও আলিহি আজমাঈন
ও সল্লম তসলীমান কাসীরান কাসীরা—

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি জিয়া বারাণী বলিতেছি যে, সুলতান বলবনের পৌত্র সুলতান মুইয উদ্দিন কায়কোবাদ সিংহাসনে আরোহণের সময় অল্প বয়সের ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের যে সকল সংবাদ আমি আমার এই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা আমার পিতা মুয়াইয়াদুল মুলক এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী আমার অন্যান্য উস্তাদগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি। তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, বগরা খানের পুত্র ও সুলতান বলবনের পৌত্র সুলতান মুইয উদ্দিন ৬৮৫ হিজরীতে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।* তৎকালে তাঁহার বয়স সতের বা আঠার বৎসর ছিল।

---

* শুদ্ধ তারিখ ৬৮৬ হিজরী। 'কেরানুস সাদাইন' গ্রন্থে আমীর খসরু বলিয়াছেন, 'বর সরে শানে শাহে জোয়া বখতে যাদ—তাজোত্তার পাক গহর কায়কোবাদ—করদে চু দর শশসদ ও হাশতাদ ও শশ—বর সেরে খোদ তাজে জেদ্দে খোশখুশ। অর্থাৎ যুবক, ভাগ্যবান, পবিত্র মুকুটধারী সুলতান কায়কোবাদ ৬৮৬ হিজরীতে পিতামহের মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছেন।

যুবরাজ থাকাকালে সুলতান মুইয উদ্দিনের স্বভাব চরিত্র খুবই পবিত্র ও সুন্দর ছিল। তাঁহার মনের গভীরে তখন যৌবনের সকল রঙ্গীন কামনা এবং ভোগ বিলাসের বাসনা পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। বাল্যকাল হইতে সিংহাসন আরোহণের কাল পর্যন্ত সুলতান বলবনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার লালন-পালন ঘটিয়াছিল বলিয়া উহার প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে নাই। বস্তুত: তাঁহার উপর এমন কিছু সংখ্যক কঠোর প্রকৃতির লোক পাহারাদার হিসাবে নিয়োজিত ছিল, যাহাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া কোনপ্রকার ভোগ বিলাসের কামনা চরিতার্থ করিবার কল্পনাও তিনি করিতে পারিতেন না। রক্ষিগণও সুলতান বলবনের ভয়ে তাহাকে কোন সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি দিতে কিংবা এক পিয়ালা মদ্যপান করিতে দিতে সক্ষম হইত না। রাত্রিদিন কঠোর মেজাজের আতাবেগগণ তাঁহাকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিখাইতে ব্যস্ত থাকিতেন। উস্তাদগণ তাঁহাকে লেখাপড়া, তীরনিক্ষেপ, বক্তৃতা, বর্শাবাজি প্রভৃতি শিখাইতেন এবং কুকথা বলা ও কুপথে চলা হইতে সর্বদা বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেন। সুতরাং সুলতান মুইয উদ্দিন যখন এইরূপ বেড়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া হঠাৎ আসমুদ্র বিস্তৃত এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন এবং অন্য লোকের সারাজীবনের স্বপ্ন ও জীবনপণ করিয়াও লভ্য নহে, এমন ক্ষমতার অধিকারী হইলেন, তখন ভোগবিলাসের ব্যাপারে একান্তই বল্গাহীন হইয়া উঠিলেন। এই পর্যন্ত যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, শুনিয়াছিলেন ও দেখিয়াছিলেন তাহা বেমালুম ভুলিয়া গেলেন। শিক্ষা ও শিষ্টাচারকে তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইলেন। রাজ্যশাসনের বিধিব্যবস্থা অপেক্ষা প্রবৃত্তির আনন্দবিধান তাঁহার নিকট অধিকতর মর্যাদা লাভ করিল।

সুলতান বলবনের সময়ে তাঁহার পরাক্রম ও শাস্তির ভয়ে খান ও মালীকরাও বেপরোয়া খেলাধুলায় মত্ত বা মদ্যপানে নিরত হইতে পারিত না এবং হাসিঠাট্টা, গান বাজনা ও খোশগল্পে সময় অতিবাহিত করিবার কোন অবকাশই তাহাদের ছিল না। সুশাসক ও নিষ্ঠাবান সুলতানের ষাইট (?) বৎসরকালীন শাসনে রাজ্যে যে ভীতি ও শ্রদ্ধার ভাব বিরাজিত ছিল, তাহা এই যুবকের লাগামহীন প্রবৃত্তি সেবায় দুরীভূত হইল। সকলেই দেখিল সেই পরাক্রমশালী সুলতানের স্থলে একজন সুন্দর যুবক সিংহাসনে বসিয়াছে; রাজ্যশাসনে যাহার কোন অভিজ্ঞতা নাই এবং সময়ের নির্দয়তা সম্পর্কে যাহার কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত: এই প্রকার যুবকের সিংহাসনে বসিবার ফলে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎ লোকদের হাতে চলিয়া গেল। আমোদী, আড্ডাবাজ, খোশগল্পকারী

ও ভাঁড় শ্রেণীর লোক, যাহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত না, তাহারা নিজ নিজ গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং কাজের লোক হইয়া উঠিল। প্রতিটি দেওয়ালের আড়ালে একজন সুন্দরী যুবতী এবং প্রত্যেক কক্ষে সুন্দরী যুবতী এবং প্রত্যেক কক্ষে সুন্দর যুবকদের মেলা বসিয়া গেল। প্রত্যেক গলিতে একজন গায়ক জন্ম লইল এবং প্রতিটি মুহূর্ত তাহারা গানে গজলে ভরিয়া তুলিল। আলস্যপরায়ণ ও আমোদপ্রিয় লোকদের দিন আসিল এবং বয়স্য ও তোষা-মোদীদের ভাগ্য খুলিয়া গেল। ভাঁড় ও হাস্যরসিকদের নিত্য নূতন অভ্যর্থনা লাভ ঘটিল এবং গায়ক ও সুন্দর যুবকদের গুণাবলীর কোন সীমা-পরিসীমা রহিল না। সুন্দরিগণ চারিদিক হইতে চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখচ্ছবি লইয়া উদিত হইতে লাগিল। সুলতান মুইয উদ্দিন, তাঁহার পারিষদবর্গ, তাঁহার মালীক পুত্র ও খানজাদাগণ এবং তাঁহার রাজ্যের সর্বপ্রকার আমোদী, বিলাসী ও অসৎচরিত্রের লোকেরা একসঙ্গে আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনে আত্মনিয়োগ করিল। রাজ্যের বিশেষ নির্বিশেষ সকল লোকই মদ, গান ও হাসিঠাট্টায় যোগ দিতে আরম্ভ করিল এবং প্রজারা যে রাজার ধর্মই গ্রহণ করে—এই প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধবনিতা, সর্ব শিক্ষিত, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল হিন্দু-মুসলমান সর্বস্থানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। দুনিয়ার চেহারাই বদলাইয়া গেল এবং সবত্র আমোদ-প্রমোদই প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল।

সুলতান মুইয উদ্দিন শহরের বাস ত্যাগ করিলেন। শাহী মহল কওণকেলাল হইতে কেলুখড়ি গমনপূর্বক তথায় যমুনা নদীর তীরে একটি অতুলনীয় প্রাসাদ ও উদ্যান নির্মাণ করাইলেন এবং মালীক, আমীর ও দরবারের অন্যান্য কর্মচারী সহ সেখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্বশ্রেণীর মালীক, আমীর ও বিশিষ্ট লোকেরা সুলতানের প্রাসাদের নিকটে তাহাদের আবাসস্থল নির্মাণ করিলেন। অন্যান্য লোকেরাও যখন দেখিল যে, সম্রাট কেলুখড়িতে বাস করিতে অধিক আগ্রহী, তখন সেখানেই তাহারা নিজেদের বাসস্থান হিসাবে কুটির ও প্রাসাদ নির্মাণ করাইল এবং চতুর্দিক হইতে সরদার ও আমীর শ্রেণীর লোকেরা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল ও বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। কেলুখড়ি দেখিতে জনবসতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সুলতানের এই প্রকার আমোদ-প্রমোদের লিপ্ত থাকিবার সংবাদ পাইয়া দরবারের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল শ্রেণীর লোকই চতুর্দিকের রাজ্যগুলিতে গমন করিল এবং যেখানে যে প্রকার বাদক, গায়ক, সুন্দর যুবক, ভাঁড় ও রসিকের সাক্ষাৎ পাইল, সকলকে দরবারে আনিয়া হাজির করিল। চতুর্দিকের

জনবসতি তাহাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সকল প্রকার কুকাজে দেশ ভরিয়া গেল। মসজিদের মুসল্লী কমিয়া গেল এবং শরাবখানা লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। লুকাইয়া ছাপাইয়া আর কেহ রহিল না; সর্বপ্রকার দুষ্কৃতিই প্রকাশ্যে চলিতে লাগিল। মদের মূল্য দশগুণ বাড়িয়া গেল। মানুষ আমোদ স্ফূর্তিতে মত্ত হইল এবং কাহারও মনে দুঃখ-কষ্ট ও ভয়-ভাবনার কোন চিহ্ন রহিল না। হাস্যরসিক, খোশগল্পকারী ও ভাঁড়ের দলও শহরের অধিবাসী হইল এবং গায়ক বাদক ও সুন্দরীদের আরাম-আয়েশের কোন সীমা পরিসীমা রহিল না। মদবিক্রেত'দের থলি সোনারূপার তঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং কুলটা সুন্দরী ও বেশ্যার দল প্রকাশ্যে কুকাজে লিপ্ত হইল। রাত্রিদিন আমোদ স্ফূর্তিতে কাটান, জীবনকে যথেচ্ছা ভোগ করা, মদ্যপান, আড্ডা দেওয়া, জুয়া খেলা ও দানধ্যানে নিরত থাকা ব্যতীত আমীর উমরাহ্‌দের অন্য কোন কতব্য ছিল না। মোটকথা তাহারা সুলতানের দরবারকে সুন্দরী ও গায়কদের দ্বারা এমনভাবে সাজাইয়াছিল যে, কেহ একবার সেই দরবারে উপস্থিত হইলে, বাকী জীবন পুনরায় অনুরূপ একটি দরবার দেখিবার আশা মনে মনে পোষণ করিত।

জিয়া জহজী ও হুসাম দরবেশ ছিল তৎকালীন দুইজন বিশিষ্ট হাস্যরসিক; বস্তুতঃ সেকালে তাহাদের ন্যায় সুরসিক ও সুবক্তা আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা সুলতানের বয়স্যদের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং প্রতি মুহূর্তে হাস্যরস ও খোশ গল্প দ্বারা আসর জমাইয়া রাখিল। ইহার বিনিময়ে তাহারা নানাপ্রকার পারিতোষিক—তঙ্কা, অশ্ব ও পোশাক লাভ করিল এবং অতিমাত্রায় সচ্ছল হইয়া উঠিল।

সুলতান মুইয উদ্দিন রাত্রিদিন এই প্রকার সকল আমোদ-প্রমোদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। দিল্লীর কতোয়াল মালীকুল উমারার দামাদ ও ভ্রাতুষ্পুত্র মালীক নিযাম উদ্দিন এই প্রকার সকল উপলক্ষে সর্বদা সুলতানের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। প্রকাশ্যে তাহার পদমর্যাদা ছিল দাদ বেগ; কিন্তু গোপনে তিনিই ছিলেন নায়েবে সুলতান এবং রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তাহার হাতে ন্যাস্ত ছিল। মালীক কেওয়াম উদ্দিন এলাকাদবীর, যাহার ভাষাজ্ঞান ও লিপি কৌশলের তুলনা ছিল না, তিনি উমদাতুল মুলক ও নায়েবে উকিলে দর হইলেন। মালীকুল উমারার জামাতা মালীক নিযাম উদ্দিন একদিকে কর্তব্যপরায়ণ, ব্যক্তিত্বশালী ও গুণগ্রাহী এবং অনদিকে কূটকৌশলী ও প্রতারক শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাহার হাতে রাজ্যের সর্বপ্রকার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সুলতান বলবনের যে সকল মালীক ও আমীর বর্তমান সময়ে সুলতান মুইয উদ্দিনের

অধীনস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। মালীক নিযাম উদ্দিনের মগজেও কর্তৃত্বের নেশা জমিয়া উঠিল এবং তিনি বেপরোয়া হইয়া আমোদ স্ফূর্তিতে নিমগ্ন হইলেন। অন্যদিকে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মালীক ও আমীরদের মন এই আশংকায় পূর্ণ হইয়া উঠিল যে, মালীক নিযাম উদ্দিন, যতদূর সম্ভব, তাহাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবেন না। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে যে ঐক্য বিদ্যমান ছিল, তাহা নষ্ট হইল এবং তাহারা অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। অবশ্য ইহা সত্বেও তাহাদের অনেকের মনেই রাজ্যলাভের লালসা দেখা দিল। সুলতান মুইয উদ্দিনের এই প্রকার আমোদপ্রমোদে মগ্ন থাকা এবং রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়ার জন্য মালীক নিযাম উদ্দিন ও তাহার আচরণ দ্বারা রাজ্য লাভের ব্যাপারে অনেককে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তিনি নিজেও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, সুলতান বলবন নামক বৃদ্ধ সিংহ, যাহার হাতের মুঠিতে সমগ্র রাজ্য অতিশয় দক্ষতার সহিত ষাইট বৎসর ধৃত ছিল, তিনি বিগত হইয়াছেন; তাঁহার যে পুত্র বিচক্ষণতার সহিত তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিত, সেও আর ইহজগতে নাই এবং বগরা খানও লক্ষণাবতীতে নিজ কার্যে লিপ্ত। রাজ্যের অটুট শাসনব্যবস্থা দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সুলতান মুইয উদ্দিন উহা লক্ষ করিবার বদলে তৎপ্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে আমি যদি কায় খসরু ও অন্যান্য কয়েকজন আমীর মালীককে শেষ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে এই রাজ্য অতি সহজেই আমার হাতে আসিয়া পড়িবে।

এই প্রকার নিতান্ত কুধারণায় মগজপূর্ণ করিয়া মালীক নিযাম উদ্দিন রাজ্য-লাভের নেশায় বিভোর হইয়া সুলতান মুইয উদ্দিনকে বলিলেন, সুলতান, কায় খসরু আপনার রাজ্যের অংশীদার এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারেও তাহার বিচক্ষণতা সমধিক। সুলতান বলবন তাহাকেই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে মালীকদের অনেকেই তাহাকে ভালবাসে। কাজেই বলবনী মালীকদের কয়েকজনও যদি তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে অতি সহজেই আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাকে আনিয়া দিল্লীর তখতে বসাইতে পারে। এই জন্য রাজ্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে হইলে কায়খসরুকে মুলতান হইতে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান দরকার এবং সুযোগমত পথে কোথাও তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলা উচিত।

বস্তুতঃ সুলতানের সম্মুখে এইরূপ হীন সমস্যা উত্থাপন করিয়া নিযাম উদ্দিন কায়খসরুকে ডাকিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সুলতানের নেশাগ্রস্ত

অবস্থার সুযোগে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত একজন শাহজাদাকে হত্যা করিবার ফরমান সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এই ব্যাপারে দরবারের কোন এক ব্যক্তিকে যথারীতি নির্দেশ দেওয়া হইল এবং শাহজাদা কায়খসরু রোহিতক গ্রামে পৌঁছিলে সে তাঁহাকে হত্যা করিল। তাঁহার এইভাবে নিহত হওয়ার সংবাদে বলবনী মালীক ও সরদারগণ যাহারা সুলতান মুইয উদ্দিনের সভাসদ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা সকলেই মালীক নিযাম উদ্দিনের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। মালীকদের সর্বপ্রকার জাঁকজমক ও চাকচিক্য বিষণ্নভাব ধারণ করিল এবং সকলের মনে অস্থিরতা দেখা দিল।

কিন্তু অন্যদিকে ইহার ফলে মালীক নিযাম উদ্দিনের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইল। খাজা খতির ছিলেন সুলতান মুইয উদ্দিনের উজীর। মালীক নিযাম উদ্দিন তাঁহার উপর অযথা দোষারোপ করিয়া উহার শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে একটি গাধার উপর বসাইয়া সমস্ত শহর ঘুরাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। উজীরের এই প্রকার শাস্তি দর্শনে শহরের সর্বশ্রেণীর লোকের মনে মালীক নিযাম উদ্দিনের প্রতি ভীতির সঞ্চার হইল। ইহার ফলে সুযোগ পাইয়া মালীক নিযাম উদ্দিনও অন্যান্য মালীক ও সৈন্যদলের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। নির্জনে সুলতানকে বুঝাইলেন, সকল নূতন মুসলমান সরদার, যাহারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহারা একমন একপ্রাণ হইয়া গিয়াছে। আপনি যতই তাহাদিগকে নিজ দরবারে বয়স্য ও সঙ্গী হইতে বলিবেন, ততই তাহারা নানাপ্রকার ওজর আপত্তি দেখাইবে। একদিন হঠাৎ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে এবং রাজ্যের শাসনভার তাহাদের হাতে তুলিয়া লইবে। এই সকল মোগল আমীর তাহাদের গৃহে জলসা বসাইয়া থাকেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শে লিপ্ত হন তাহারাও সকলেই একই পথের পথিক। তাহাদের লোকজন অধিক এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া ক্রমাগত এই জনবল বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারাও হঠাৎ বিদ্রোহ করিতে ইচ্ছুক। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কথিত তাহাদের কিছু আলাপ-আলোচনা ও আচরণের সংবাদ তিনি ইহার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিলেন। ইহার ফলে সুলতান মুইয উদ্দিনের নিকট হইতে তাহাদিগকে গ্রেফতার ও হত্যা করিবার ফরমান সংগ্রহ করিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। যথারীতি সকলকে প্রাসাদে একত্র করা হইল এবং তাহাদের অধিকাংশকে হত্যা করিয়া যমুনা নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের সহায় সম্পদও বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। সুলতান বলবনের বহু বিশিষ্ট দাসপুত্র ও মালীক, যাহারা এই নূতন মুসলমানদের সহিত উঠাবসা করিতেন এবং

প্রয়োজনীয় মনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া দূরদূর অঞ্চলের দুর্গসমূহে প্রেরণ করা হইল। প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত সৈন্য শিবিরগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হইল।

মুলতানের আমীর মালীক শাহক ও 'বরণ' কেতার কেতাদার মালীক তুযকী, যিনি আরজে মুমালেক ছিলেন এবং সুলতান বলবনের সময় হইতেই যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাদের উভয়কেই নানান কৌশলে ক্ষমতাচ্যুত করা হইল। শাহী পরিবারের লোকজন ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই মালীক নিযাম উদ্দিনের সম্মুখে কয়েদীর ন্যায় হইয়া পড়িলেন এবং তাহার গৃহ ও দরবার সকল বিশিষ্ট লোকের আশ্রয় স্থলে পরিণত হইল। সুলতান মুইয উদ্দিনকে তিনি এমনভাবে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন যে, শহরের কোন লোক যদি নিতান্তই আন্তরিকতা ও নিমক হালালির পরিচয় দিয়া মালীক নিযাম উদ্দিনের স্বেচ্ছাচারিতার কোন বার্তা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিত, তবে সুলতান তৎক্ষণাৎ মালীক নিযাম উদ্দিনকে বলিতেন, অমুক ব্যক্তি তোমার নামে এই কথা বলিয়াছে; তাহাকে অবিলম্বে গ্রেফতার কর। গ্রেফতার করিবার পর ঐ লোককে মালীক নিযামের হাতে দিয়া বলিতেন, 'সে তোমার ও আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে চায়।'

মালীক নিযাম উদ্দিনের মর্যাদা ও ক্ষমতা চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। তাহার স্ত্রী, মালীকুল উমারার কন্যা সুলতানের মাতা হিসাবে স্থানলাভ করিল এবং শাহী হারেমের সকল কিছু তাহার কর্তৃত্বাধীনে চলিতে লাগিল। মালীক নিযাম উদ্দিনের এই প্রকার ক্ষমতা দর্শনে সর্বশ্রেণীর আমীর, শাহী খান্দানের লোকজন, কেতাদার ও কর্মচারিগণ খুবই শংকিত হইয়া পড়িলেন। তাহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং যথাসম্ভব সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বনে তাহার স্বেচ্ছাচারিতার কবল হইতে নিজেদেরকে রক্ষা করিয়া চলিতেন। যে কোন প্রকারেই হউক তাহারা মালীক নিযাম উদ্দিনের সহায়তা ও স্বায়িত্বের জন্য প্রকাশ্যে চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেন।

অনেক সময়েই মালীকুল উমারা ফখর উদ্দিন কতোয়াল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও দামাদ মালীক গিয়াস উদ্দিনকে নির্জনে নিজের সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া রাজ্যের লোভ, আমীর ও মালীকদের শত্রুতা এবং বিশিষ্ট লোকদিগকে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, দেখ, আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি, তুমি আমার পুত্রের সমান। আমি ও আমার পিতা আশি বৎসর ধরিয়া এই দিল্লীতে কতোয়ালগিরি করিলাম; আমরা রাজ্যলাভের

প্রলোভনে পড়ি নাই বলিয়াই শান্তিতে ছিলাম। হে পুত্র, তোমার জানা উচিত যে, আমরা সৈন্যদলের সরদার মাত্র এবং তুমি আমাদেরই সন্তান। অথচ বাদশাহী হইল কতোয়ালদের সরদারী। কোন সেনানায়ক যখন অতি বৃদ্ধ ও মর্যাদার চরম সীমায় পৌঁছে তখনই সে কতোয়ালের পদ লাভ করে। আমিও মাত্র কয়েক বৎসর যাবৎ কতোয়াল হইয়াছি। কাজেই তোমার উচিত নিজ মগজ হইতে এই বাদশাহীর নেশা দূর করা; কারণ বাদশাহীর সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বাদশাহীর পোশাক তেমন লোকের অঙ্গেই শোভা পায়, যাহারা যুদ্ধবিদ্যায় একযুগ কাটাইয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। আমাদের ন্যায় যাহারা অশ্বারোহণ করিতে, তীর চালাইতে বা বল্লম নিক্ষেপ করিতে জানে না এবং যাহারা খঞ্জরের চেহারা জীবনেও দেখে নাই, তাহাদের জন্য ইহা উপযুক্ত নহে। এই প্রকার বাদশাহীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আমাদের কোনও কালেই জন্মে নাই। সুতরাং সুলতানের নৈকট্য লাভের ফলে তোমার মনে যে কুমতলব দানা বাঁধিয়াছে, তাহা যদি তুমি দূর না কর, তাহা হইলে তুমি নিজেকে, আমাদিগকে এবং আমাদের অনুগামী সৈন্যদিগকে সমূহ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই কথা খুব ভাল করিয়াই জানিয়া রাখ যে, কোন বস্তুর আশা করিলেই তাহা পাওয়া যায় না। এই ভাবে কতোয়াল উপদেশ দান করিবার ভ্রাতুষ্পুত্র নিযাম উদ্দিনকে এই দুইটি পদ শুনাইলেন—

> ওহে শৃগাল, তুই কেন তোর নিজের সামর্থে সন্তুষ্ট থাকিলি না;
> তাহা হইলে সিংহের সহিত পাঞ্জা লড়িবার ফলে প্রাপ্ত এই শাস্তি
> তোর ভোগ করিতে হইত না।

মালীক নিযাম উদ্দিনকে মালীকুল উমারা কতোয়াল ঠিক এইভাবেই বলিলেন, তুমি সুলতান শামস উদ্দিন এবং তাঁহার সভাসদ মালীক ও আমীরগণকে না দেখিতে পার; কিন্তু সুলতান বলবনকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। তাঁহার সভাসদ ও বন্ধুবান্ধবসহ তিনি যেভাবে সুলতান সঞ্জর ও মাহমুদের ন্যায় রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন, যেভাবে তাঁহার পরাক্রম ও জাঁকজমকে ভয়ে তাঁহার মালীক ও আমীরগণ পর্যন্ত তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিত এবং যেভাবে তাঁহার নাম শুনিলে বড় বড় বীরের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিত; সেই সকল ব্যাপার অবশ্যই তুমি দর্শন করিয়াছ। আমরা, যাহারা গোলামির চাদর কাঁধে ফেলিয়া তাঁহার দাসানুদাস সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, তাহাদের মনে রাজ্য পরিচালনা ও বাদশাহীর লোভ স্থান লাভ

করিতে পারে না। অথচ তুমি সুন্দর টুপি মাথায় চড়াইয়া, সাদা কোমরবন্দ অাঁটিয়া, জরির কাবা গায়ে জড়াইয়া, তাজী ঘোড়ার সোনালী জীনপোশে সোয়ার হইয়া এবং কতিপয় ভাঙখোর লুঠেরা ও নামধামহীন কুলাঙ্গারদের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পাইয়া বাদশাহীর স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িয়াছ। আসলে তুমি জাননা—কে বা কাহারা বাদশাহী করিবার যোগ্য। কারণ তেমন লোকের বংশ মর্যাদা অতি উচ্চ ও মহান। তাঁহারা যথার্থই পুরুষ; প্রাণদানকে তাঁহারা খেলার মতই তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। যুদ্ধের সময় তাঁহারা খুনের নদী বহাইয়া দেন এবং আসমান জমিনকে একত্র করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের তুলনায় তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ও স্বভাব চরিত্রে এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে! তুমি পিয়াজের পাতা দিয়া একজন আনাজ বিক্রেতার গায়েও আঘাত করিতে পার না; একটি শৃগালের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিবার শক্তিও তোমার নাই। অথচ নিজকে খুব বড় বীর বলিয়া মনে কর এবং সেই অনুমানে রাজ্যলাভের প্রলোভনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছ। তুমি কি এই পদটি শুন নাই—

পুরুষের প্রকৃতি যদি চাও, গৃহ হইতে ময়দানে গমন কর;
দেওয়ালের রুস্তম ও ইস্কেন্দিয়ারের ছবিতে কোন ফায়দা নাই।

স্বীকার করিয়া লইলাম যে, এই নেশাগ্রস্ত ও উদাসীন বাদশাহকে তুমি নিমক হারামের মত কোন এক অজুহাতে হত্যা করিবে। কিন্তু ইহাতে তোমার বংশের মুখে যে কলংকের দাগ লাগিবে, তাহা কিয়ামত পর্যন্ত দূর হইবে না। ধরিয়া লইলাম যে, ইহার পরে তুমি দিল্লীর তখতে বসিয়া উহার চরম অমর্যাদা ও অসম্মান করিবে; কিন্তু যাহাই কর, বাদশাহের যোগ্য তোমার সহচর ও সভাসদ কোথায়? বাদশাহজাদার উপযুক্ত তোমার সন্তানাদি কোথায়? যাহারা তোমার জন্য নিমক হালালীর পরিচয় দিবে, তোমার তেমন লোকজন ও অন্তরঙ্গ সেবক কোথায়? বাদশাহ ও তাহার বিশিষ্ট সভাসদদের উপযুক্ত চাকর-নফরইবা কোথায়? তুমি কি চাও যে, তোমার আশেপাশে যে সকল লুঠেরা ও বদমায়েশ আসিয়া ভীড় জমাইয়াছে, তাহাদিগকে তুমি তোমার রাজ্যের হিতকামী বলিয়া গণ্য করিবে? যাহারা বর্তমানে তোমার সম্মুখে 'পিয়ালা কোথায় রাখিব, সোরাহী কোথায় রাখিব' বলিয়া চীৎকার করে এবং দাড়ি মুণ্ডাইয়া, ভাল জামা-কাপড় পরিয়া, সোনার তকমা কোমরে বাঁধিয়া ও গায়ে-মাথায় আতর মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহাদিগকে কি তুমি জমশেদ ও কায়খসরুর রাজ্যের যোগ্য সভাসদ ও কর্মচারী বলিয়া মনে কর? এই সকল কৃপণ, নিঃস্ব, নীচমনা, প্রতারক ও অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা কি তুমি রাজত্বের মর্যাদা নষ্ট করিতে চাও? রাজ্যের যে গুরুত্ব-

পূর্ণ দায়িত্ব পালন মহান ও নেতৃস্থানীয় লোক ছাড়া অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে, তুমি কি তাহা এই সকল হেয়, অনভিজ্ঞ লোকের হাতে সমর্পণ করিতে চাও ; যাহারা অন্যায়ভাবে একটি চীতল বা তঙ্কা সংগ্রহ করিবার জন্য হীন কৌশল অবলম্বন করিতে এবং প্রয়োজন হইলে আসমান হইতে জমিনে পড়িতেও পিছপা নহে।

তুমি কি অনেক সময়েই সুলতান শামস উদ্দিনের সভাসদের কথা আমার নিকট শুন নাই ? আমি তোমাকে বলিয়াছি যে, তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং কী প্রকার উচ্চ মর্যাদায় তাঁহারা অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুলতান শামস উদ্দিন অনেকবারই দরবারে বসিয়া বলিয়াছেন, খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সামর্থ আমার কতটুকুইবা আছে ; কারণ তিনি আমাকে এমন সব সভাসদ ও সহচর দান করিয়াছেন, যাহারা আমা অপেক্ষা হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ। আমি যখনই বহিরাগত রাজা-বাদশাহদের সম্মুখে, আমার দরবারে ও আমার তখতের আশে-পাশে তাঁহাদের চলাফেরা লক্ষ্য করি, তাঁহাদের উন্নত আচার-আচরণে এই সিংহাসনে বসিয়াও আমার লজ্জা করিতে থাকে। আমার ইচ্ছা হয়, এই সিংহাসন হইতে উঠিয়া আমি তাঁহাদের হস্তপদ চুম্বন করি।

সুলতান বলবন বিশ বৎসর মালীক, বিশ বৎসর খান হিসাবে দেহের রক্ত পানি করিয়া সর্বশ্রেণীর বুজর্গ ও অভিজ্ঞ লোকদিগকে নিজের অনুগত করিয়াছিলেন বলিয়াই তখতে বসিয়া তিনি এমন বিশিষ্ট সভাসদ ও সহচর লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই উভয় বাদশাহই সৎ ও অভিজ্ঞ সভাসদদের সহায়তায় সঠিকভাবে ও জাঁকজমকের সহিত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রাজ্যপরিচালনা কিয়ামত পর্যন্ত গৌরবের বিষয় ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য হইয়া থাকিবে।

এই সকল কথার পর মালীকুল উমারা কতোয়াল মালীক নিযাম উদ্দিনকে বলিলেন, বাবা ! তুমি গিয়া নিজের কাজ কর এবং এই প্রকার অযথা আশা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হও। কারণ আমাদের ন্যায় লোকদের দ্বারা বাদশাহীর কাজ চলিতে পারে না। নিযাম উদ্দিন ইহার উত্তরে বলিলেন, তাহা ঠিক, আমাদিগকে মালীক হিসাবেই কাজ করিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু এইক্ষণে আমি মানুষের শত্রুতার সম্মুখীন হইয়াছি এবং সকলেই জানিতে পারিয়াছে যে, আমার উদ্দেশ্য কী ! এমন অবস্থায় আমি যদি রাজ্যলাভের সকল প্রচেষ্টা বন্ধ করিয়া দেই, তাহা হইলে নির্ঘাৎ মারা পড়িব। মালীকুল উমারা ইহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, যদি তুমি তোমার এই অন্যায্য বাসনা ত্যাগ করিতে না পার,

তাহা হইলে তুমি ইচ্ছামত তোমার জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে এবং তোমার কুঁড়েঘরকে রাজপ্রাসাদে পরিণত করিতে পার; খোদা রক্ষা করুন, তোমার এই অন্যায় আশার ফলস্বরূপ আমরা যেন ধনে-প্রাণে মারা না পড়ি।

মালীকুল উমারা মালীক নিযাম উদ্দিনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই বলিবার ও শুনিবার উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ্‌র কুদরতে এই সকল কথা মুখে মুখে শহরের সর্বশ্রেণীর আমীর ও মালীকদের কানে পৌঁছিল; তাঁহারা মালীকুল উমারার প্রশংসা করিলেন এবং এই প্রকার অন্যায় আশার পরিণাম সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য যথার্থ শুভ ও হিতকরী বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু এই সকল মূল্যবান উপদেশ মালীক নিযাম উদ্দিনের কোন কাজে আসিল না। রাজ্যের লোভ তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার ফলে সে বাদশাহীর পাশাখেলায় প্রতিদিন নূতন নূতন চাল দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দিন কখনও সমান যায় না; সুলতান বলবনের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী খিলজীগণ তাহার প্রতিটি চাল নষ্ট করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। আকাশ নিযাম উদ্দিনের এই প্রকার অযথা হস্তক্ষেপকে পরিহাসে পরিণত করিয়া খিলজীদের শিরে সৌভাগ্য পুষ্প বর্ষণ করিল।

সুলতান মুইয উদ্দিনের কানেও মালীক নিযাম উদ্দিনের দ্বারা তাঁহার সিংহাসনচ্যুত হইবার কথা পৌঁছিয়াছিল এবং বিশেষ নির্বিশেষ সকল লোকই তাহার এই প্রকার ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পরিয়াছিল।

সুলতান মুইয উদ্দিনের সিংহাসন আরোহণের সময় বগরা খানও লক্ষণাবতীতে সুলতান নাসির উদ্দিন উপাধি ধারণ করিয়া নিজনামে খোতবা ও মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। পিতা ও পুত্রের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইত এবং নানাবিধ সংবাদ সহ উভয়ের মধ্যে দূত ও কাসেদের যাতায়াত সর্বদাই ঘটিত। দিল্লী সুলতান মুইয উদ্দিনের নানাবিধ উপঢৌকন পিতার নিকট লক্ষণাবতীতে এবং লক্ষণাবতী হইতে সুলতান নাসির উদ্দিনের বহুপ্রকার আশীর্বাদী বস্তু—পুত্রের নিকট দিল্লীতে পৌঁছিত। সুলতান নাসির উদ্দিনের নিকট সুলতান মুইয উদ্দিনের আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিবার কথা এবং মালীক নিযাম উদ্দিনের চক্রান্তের বার্তাও পৌঁছিয়াছিল। সুলতানের বিচক্ষণ কর্মচারী ও আমীরদিগকে মালীক নিযাম উদ্দিন কিভাবে হত্যা করিয়াছে এবং সময় ও সুযোগে সুলতান মুইয উদ্দিনকেও কি উপায়ে সিংহাসনচ্যুত করিবে ও দিল্লীর শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবে, তাহাও সুলতান নাসির উদ্দিন জানিতে পারিয়াছিলেন। ফলে তিনি পুত্রের উদ্দেশ্যে নানাবিধ উপদেশ

লিখিয়া পাঠাইতেন এবং মালীক নিযাম উদ্দিনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কথা আভাসে ইঙ্গিতে বর্ণনা করিতেন। কিন্তু মুইয উদ্দিনকে যৌবন, বাদশাহী, কুপ্রবৃত্তি ও মদের নেশা এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, পিতার উপদেশের প্রতি কান দেওয়ার তাঁহার ফুরসত ছিল না এবং তিনি মালীক নিযাম উদ্দিনের নিমকহারামীর কথাও ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইতেন না। আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিবার ফলে রাজ্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধিমূলক কোন কাজে মন দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুন্দরীদের অনবরত আগমন, সাকীদের অবিরত পরিবেশন এবং সুকণ্ঠ গায়কদের সঙ্গীত লহরী ও হাস্যরসিকদের খোশগল্পের স্রোতে ভাসমান সুলতানের অন্য কোন কর্তব্য ছিল না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন নূতন স্ফূর্তি এবং তজ্জনিত আনন্দ লাভের মধ্যেই তাঁহার সমুদয় সময় অতিবাহিত হইত।

সুলতান নাসির উদ্দিন লক্ষণাবতী হইতে পুত্রের এবংবিধ মত্তাবস্থার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রের বিনাশকাল আসন্ন। তিনি মনে করিলেন, দূরে থাকিয়া উপদেশ দেওয়ার ফলেই তাহা কার্যকরী হইতেছে না। সুতরাং তিনি সাক্ষাত করিয়া পত্রাদিতে লিখিত সমুদয় উপদেশ নিজ মুখে শুনাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন। এই মর্মে তাঁহার আগ্রহের কথা জানাইয়া তিনি পুত্রকে একটি পত্র দিলেন এবং উহার শেষে লিখিলেন, হে পুত্র তুমি রাজ্যের মালীক ; তোমার আমোদ-প্রমোদের সময় ফুরাইয়া যাইবে না। সুতরাং আমার সহিত সাক্ষাত করাকে জরুরী বিষয় মনে করিও। কারণ তোমাকে দেখিবার অতি আগ্রহ আমি লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। পত্রের শেষ দিকে তিনি নিম্নের এই পদটি উদ্বৃত করিলেন—

ফেরদৌস যদিও একটি উত্তম স্থান, তথাপি
তথাকার ভোগ্য বস্তুর মধ্যে দীদারই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সুলতান মুইয উদ্দিন পিতার মোহরাংকিত পত্র পাঠ করিয়া রক্তের টান অনুভব করিলেন এবং পিতার সহিত সাক্ষাতের বাসনা তাঁহারও প্রবল হইয়া উঠিল। আবেগের আতিশয্যে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইয়া পত্রসহ কতিপয় বিশিষ্ট লোককে লক্ষণাবতীতে প্রেরণ করিলেন। পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্থির হইল যে, সুলতান মুইয উদ্দিন দিল্লী হইতে অযোধ্যায় গমন করিবেন এবং সুলতান নাসির উদ্দিন লক্ষণাবতী হইতে সরযু নদীর তীরে উপস্থিত হইবেন। সেখানে পিতাপুত্রের সাক্ষাত হইবে।

সুলতান মুইয উদ্দিনের ইচ্ছা ছিল তিনি একাকী দিল্লী হইতে অযোধ্যায় গমন করিবেন। কিন্তু মালীক নিযাম উদ্দিন ইহাতে বাদ সাধিলেন। তিনি বলিলেন, বাদশাহের এই প্রকার একাকী গমন সম্পূর্ণ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। দিল্লী হইতে অযোধ্যা বহু দূরের পথ। এই কারণে পিতা ও পুত্রের রাজ্য হইলেও শাহী জাঁকজমক ও লোকলস্কর ত্যাগ করিয়া যাওয়া কোন মতেই উচিত নহে। কেননা আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, 'রাজত্ব একটি বন্ধ্যা স্ত্রীলোক।' ইহার দ্বারা তাঁহারা এই অর্থ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রে কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পিতা-পুত্রকে হত্যা করে এবং পুত্র পিতাকে বিনাশ করিতে দ্বিধা করে না। কারণ এইস্থলে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ কোন উপকারেই আসে না। এইজন্য প্রায় প্রতিধর্মেই পিতা নিজ স্বার্থের জন্য পুত্রকে হত্যা করিয়াছে এবং পুত্র কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পিতাকে শেষ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের মধ্যকার রক্তের সম্বন্ধ সেখানে কোন বাধার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তদুপরি পিতা যেখানে নিজে পৃথক খোতবা ও মুদ্রার মালীক এবং পুত্রের রাজ্যেরও একজন যথার্থ উত্তরাধিকারী, সেখানে পুত্রের একাকী যাওয়াতে অনেক কিছুই ঘটিতে পারে। সেজন্যই সুলতানের সসৈন্যে ও শাহী কায়দায় সেখানে গমন করা উচিত।

ইহা ছাড়া, এমনিতেও বাদশাহীর একটি বিরাট মর্যাদা, সম্মান ও জাঁকজমক বিদ্যমান। এই অবস্থায় বাদশাহ হিন্দুস্তানের যে কোন দিকেই গমন করুন না কেন, সর্বত্রই রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলে আসিয়া বাদশাহের খেদমতে ভূমি চুম্বন করিবে। এইজন্যই বাদশাহ যদি একা থাকেন, তাহা হইলে লোকের মনে বাদশাহীর প্রতি ভীতি ও সমীহের ভাব জাগরিত হইবে না; বরং তৎস্থলে অনেকের মনেই বাদশাহের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের কুমতলব জাগিয়া উঠিবে।

সুলতান মুইয উদ্দিনের মনে মালীক নিযামের এবংবিধ উপদেশ খুবই ভাল ঠেকিল। তিনি সৈন্যদল ও শাহী সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সবকিছু প্রস্তুত করা হইল এবং সুলতান সৈন্যদল ও শাহী জাঁকজমক সহ অযোধ্যার দিকে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যায় পৌঁছিবার পর শাহী দরবার সরযু নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অন্যদিকে সুলতান নাসির উদ্দিনও সসৈন্যে পুত্রের অযোধ্যা আগমনের সংবাদ পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মালীক নিযাম উদ্দিন তাঁহাকে ভয় পাইয়াছে। তিনিও সৈন্যদল ও হাতীঘোড়া সহ লক্ষণাবতী হইতে সরযু নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় সৈন্যদল সরযুর তীরে পরস্পর মুখোমুখী হইয়া শিবির স্থাপন করিল।

দুই তিন দিন ধরিয়া উভয় পক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পিতা ও পুত্রের মধ্যে যাতায়াত করিয়া উভয়ের সংবাদ আদান-প্রদান করিলেন। অবশেষে পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের শর্ত এই স্থির হইল যে, সুলতান নাসির উদ্দিন দিল্লীর বাদশাহের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং সাক্ষাতের জন্য সরযূ নদী পার হইয়া অপর তীরে যাইবেন। পুত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন এবং পিতা তাঁহার হস্তচুম্বনের প্রথা পালন করিবেন। সুলতান নাসির উদ্দিন বলিলেন, পুত্রের খেদমত করিতে আমার মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নাই। সে আমার পুত্র হইলেও দিল্লীতে আমার পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে এবং দিল্লীর তখতের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর অন্যান্য বাদশাহগণ যথার্থই ইহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকেন। আমি যদিও সুলতান বলবনের পুত্র এবং এই সিংহাসনের উপর আমারও অধিকার আছে; তথাপি ইহা যখন আমার পুত্র লাভ করিয়াছে, তখন ইহাকে আমার নিজের বলিয়া মনে করিতে পারি। আমার মৃত্যুর পর সে উহা লাভ করিতই; সেক্ষেত্রে আমার জীবদ্দশায় তাহার উক্ত সিংহাসন লাভ আমার জন্য অধিকতর আনন্দের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দিল্লীর রাজ্য আমার নিজ গৃহে পরিণত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমি যদি দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন না করি, আমার পুত্রের খেদমতের জন্য হাত না বাড়াই ও তাহার সম্মুখে না দাঁড়াই, তাহা হইলে দিল্লীর বাদশাহের অসম্মান ঘটিবে এবং আমার ও আমার পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিবে। ইহা ছাড়াও আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, আমি যেন দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার এবং তাহার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাইতে পরাঙ্মুখ না হই।

এই ব্যাপারে দরবারের জ্যোতিষীরা পিতা ও পুত্রের রাশি গণনা করিয়া সাক্ষাতের জন্য একটি শুভদিন ধার্য করিল। ঐদিনে সুলতান মুইয উদ্দিন শাহী জাঁকজমকের সহিত একটি উচ্চ প্রাঙ্গণে দরবারে আম ডাকিলেন। সুলতান নাসির উদ্দিন যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া শাহী পর্দার নিকট আসিলেন এবং ভূমি চুম্বন করিয়া শির নত করিলেন। প্রথা অনুসারে আরও তিন স্থানে তাঁহাকে ভূমি চুম্বন করিতে হইল। এইভাবে তখতের নিকট পেঁৗছিলে সুলতান মুইয উদ্দিন নিজ পিতার এই প্রকার অসম্মান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখত হইতে নামিয়া আসিয়া পিতার পদতলে পতিত হইলেন। পিতার সহিত সাক্ষাতের পর তিনি শাহী কায়দায় তখতে বসিয়া থাকিবার নিয়ম পালন করিতে সক্ষম হইলেন না। উভয় পক্ষ হইতেই আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য দেখা দিল এবং পিতা ও পুত্র ইহার আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পিতা পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া চক্ষে ও কপোলে চুম্বন করিলেন এবং পুত্র কাঁদিতে

কাঁদিতে পিতার পদতলে নিজ শির অবনত করিলেন। পিতা-পুত্রের এহেন ক্রন্দনের আবেগ উপস্থিত লোকজনের মধ্যে সংক্রামিত হইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের ক্রন্দন কিছুটা থামিয়া আসিলে পিতা-পুত্রের হাত ধরিয়া তাহাকে তখতের উপর বসাইতে চাহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তখতে উপবিষ্ট পুত্রের সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শাহী মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু পুত্র অগ্রসর হইয়া পিতাকে সিংহাসনের ডাইন দিকে বসাইয়া নিজে তাঁহার সম্মুখে আদবের সহিত নিম্নে উপবেশন করিলেন। তখন সোনা-রূপার তবক ও মুদ্রাপূর্ণ থলিগুলি পিতা ও পুত্রের মস্তকোপরি ছড়াইয়া দেওয়া হইল। তখতের নিকট দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা তাহা কুড়াইয়া সংগ্রহ করিলেন। সোনা-রূপার তবকগুলি দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া নিক্ষেপ করা হইল। কবিরা প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠ করিলেন এবং গায়কগণ কল্যাণমূলক সঙ্গীত গাহিলেন। সহমুল হশমাঁ, চাওশাঁ ও নকিবগণ এই সকল ছড়ানো দৌলত কুড়াইয়া লইবার জন্য উপস্থিত লোকদিগকে আহ্বান করিল। উপস্থিত সকলে অন্যবিধ কার্যে নিযুক্ত হইলে পিতা ও পুত্র আবার মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন এবং তাঁহাদের চক্ষে পুনরায় অশ্রু দেখা দিল। আবেগের আতিশয্যে তাঁহারা এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সর্বসাধারণের আহারাদি শেষ হইলে উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দরবার ভাঙ্গিয়া গেল। পিতা পুত্র এইবার নির্জনে গিয়া কিছুক্ষণ বসিলেন এবং পরস্পর কথাবার্তা বলিলেন।

ইহার পর যথা সময়ে সুলতান নাসির উদ্দিন নদীপার হইয়া নিজ দরবারে ফিরিয়া গেলেন তথায় অবস্থানকালে সময় সময় নানাবিধ তোহফা, অদ্ভুত ফলমূল পুত্রের খেদমতে পাঠাইলেন এবং পুত্রও শাহী মর্যাদা অনুসারে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও শরাব পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিনে সুলতান মুইয উদ্দিন বলিলেন, আমার রাজ্যই আমার পিতার রাজ্য। আমাদের মধ্যে যেহেতু কোন প্রকার শত্রুতা নাই, সেইজন্য উভয় সৈন্যদলকে এক মনে করিতে কোন বাধা থাকা উচিত নহে। ইহার ফলে উভয় সৈন্যদলের লোকদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিতে, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাত করিতে এবং একে অন্যের মেহমান হইতে আদেশ দেওয়া হইল। এক শিবির হইতে অন্য শিবিরে যাওয়া-আসা ও জিনিসপত্র কেনা-কাটা করিতে কোন বাধা ছিলনা। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইবার পর বিদায়কাল উপস্থিত হইলে উভয় সৈন্যদলের মধ্যে হাতীর উপর হইতে ঘোষণা করা হইল যে, বিনা ফর-

মানে লক্ষণাবতীর কোন সৈন্য বা অন্যলোক দিল্লীতে এবং দিল্লীর কেহ লক্ষণাবতীতে থাকিতে পারিবে না।

এই কয়েক দিনই সুলতান নাসির উদ্দিন পুত্রের নিকট সর্বদা আসিয়াছেন। উভয় সুলতান একত্রে বসিয়া নানাবিধ আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সকলে আমোদ স্ফূর্তি করিয়াছে এবং পূর্ব পুরুষের কথা স্মরণ করিয়া শরাব পান করা হইয়াছে। এই প্রকারে তাঁহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাত করাকে অতিশয় ফলদায়ক বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু অপেক্ষা কঠিন বিচ্ছেদের কথা কেহ উচ্চারণ করিতে চাহিতেন না। অনুরূপ সাক্ষাতের সময় একদিন সুলতান নাসির উদ্দিন তাঁহার পিতা সুলতান বলবনের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং পুত্রকে বলিলেন, যখন আমিও আমার বড় ভাই লিপিকরের নিকট অভিধান ও লিপির পাঠ সমাপ্ত করিলাম, তখন আতাবেগরা আসিয়া বলিল যে, ইহার পর শাহজাদাদিগকে আরবী ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অন্য কী বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং কোথায় তাঁহারা শিক্ষালাভ করিবেন—এই ব্যাপারে যথাবিহিত আদেশের প্রয়োজন। ইহা শুনিয়া সুলতান বলিলেন, লিপিকরকে উপযুক্ত পোশাক ও পুরস্কার দেওয়া হউক এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হউক। ইহার আমার পুত্রদিগকে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সুলেখকদের পুস্তক 'আদাবুল সালাতীন' ও 'মাআসিরুস সালাতীন', যাহা আমার প্রভু সুলতান শামস উদ্দিনের পুত্রদের জন্য বাগদাদ হইতে আনান হইয়াছিল, সেই সকল পুস্তক শিক্ষা দিতে হইবে। অতঃপর বৃদ্ধ বিচক্ষণ উস্তাদগণের নিকট তাহারা ইতিহাস পাঠ করিবে। কোন নীচমনা ও ভিক্ষুক শ্রেণীর শিক্ষক যেন আমার পুত্রদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত না হয়। কারণ তাহাদের শিক্ষা পুত্রদের রাজ্যশাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে কোন প্রকার সাহায্য করিবে না। এতদ্‌ব্যতীত নামাজ, রোজা, অজু, গোসল সম্পর্কে যাহা জানা নিতান্তই অত্যাবশ্যকীয়, তাহা তাহারা নিজেরাই শিখিয়া লইতে পারিবে।

এই নির্দেশ অনুসারে আমরা উভয় ভ্রাতা খাজা তাজ উদ্দিন বোখারীর নিকট 'আদাবুস্ সালাতীন' গ্রন্থটি পাঠ করি। তিনি সুলতান শামস উদ্দিনের সভাসদ ছিলেন। তাঁহার নিকট আমরা গ্রন্থটি আদ্যন্ত শেষ করিয়াছিলাম। এইজন্য সুলতান শামস উদ্দিনের এই প্রিয় সভাসদ বয়োবৃদ্ধ খাজা তাজ উদ্দিনকে এক লক্ষ চীতল দান করা হয়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম দিকে পড়িয়াছিলাম—মহান বাদশাহ জমশেদ তাঁহার পুত্রদিগকে প্রায়ই বলিতেন, যে অশ্বারোহী নায়কের দশজন বিশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য নাই, তাহাকে অশ্বারোহী নায়ক বলা যায়

না। যে সিপাহসালারের এমন দশজন অশ্বারোহী নায়ক নাই যাহারা তাহার জন্য নিজের জন-ফরজন্দ কোরবানী করিতে পারে, তাহাকে সিপাহসালার বলা যায় না। যে আমীরের দশজন সিপাহসালার চালাইবার ক্ষমতা নাই, তাহাকে আমীর বলা যায় না, যে মালীকের দশজন অনুগামী আমীর নাই, তাহাকে মালীক নাম দেওয়া নিরর্থক। তেমনি দশজন যোগ্য মালীকের আনুগত্যের অধিকারী ব্যতীত কাহাকেও খান বলিয়া ডাকা যায় না। অনুরূপ-ভাবে কোন বাদশাহের সভাসদদের মধ্যে যদি দশজন খান না থাকে, তবে বাদশাহীর নাম তাহার মুখে আনা উচিত নহে। কারণ ইহা ছাড়া তাহার যে অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা যে কোন জমিদার ও প্রদেশ শাসকেরও রহিয়াছে। বাদশাহ ও বাদশাহীর মহত্বই এই যে, সৈন্যদল ও খান হিসাবে যাহারা তাহার অনুগামী হইবে, তাহারা যেন সুদক্ষ ও সৎ হয় এবং নীচমনা, অখ্যাত, কমজাত ও নি:স্বদের সেখানে যেন ছায়া না পড়ে।

এই সকল উপদেশ দিবার পর বাদশাহ জমশেদ তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন, কোন বাদশাহের সভাসদ ও সহচর যদি আমার উপরোক্ত বর্ণনার অনুযায়ী হয়, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যের সকল বিধি ব্যবস্থাই স্থায়িত্ব লাভ করিবে এবং বাদশাহী করিতে গিয়া তাঁহার পরিণাম কখনও অশুভ হইবে না। এই উপদেশ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ কিউমরচের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। কিউমরচের পূর্ববর্তী যে সকল উজির ও জ্ঞানী ব্যক্তি বাদশাহী সম্বন্ধে নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহাতে এই উপদেশটিও বিদ্যমান। বস্তুত: এই সকল নিয়মকানুন ব্যতীত কোন বাদশাহই যথার্থ বাদশাহ হইতে পারে না এবং হইলেও তাহার সকল প্রচেষ্টাই বৃথা ও নিষ্ফল হয়। কিউমরচের পরবর্তীকালে আমাদের বাদশাহীর সময় শাহী জাঁকজমক, আদবকায়দা ও বিধিব্যবস্থা যদিও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পূর্বোক্ত উপদেশ এক সাধারণ প্রথায় নামিয়া আসিয়াছে, তথাপি কিউমরচের এই উপদেশের অর্থ হইল — এই প্রকার লোক বল ছাড়া কোন বাদশাহই বাদশাহ হইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা বেশী হইলেত কথাই নাই—সোনায় সোহাগা। তাহা হইলে রাজ্যের সকল কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ লইয়া বাদশাহ কখনও বিব্রত বোধ করেন না।

বাদশাহ জমশেদের এই উপদেশ বর্ণনা করিবার পর সুলতান নাসির উদ্দিন পুত্র সুলতান মুইয উদ্দিনকে বলিলেন, হে পুত্র, তুমি আমার চক্ষের মণি, নয়নের জ্যোতি ; তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। কিন্তু তোমার আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিবার মধ্যে এমন অবসর কোথায় যে, তুমি এই সকল উপদেশের

প্রতি দৃষ্টি দিবে এবং যে সকল সুনীতি পূর্ববর্তী বাদশাহ বলিয়া গিয়াছেন, তদনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করিবে। তথাপি আমি 'আদাবুস সালাতীন' গ্রন্থে যে উপদেশটি পাঠ করিয়াছিলাম এবং যাহা ভাগ্যবান ও পুণ্যবান বাদশাহদের জন্য একাই একশত উপদেশের মূল্য বহন করে, তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি।

অতঃপর সুলতান নাসির উদ্দিন তাঁহার বর্ণনার শেষে বলিলেন, আমি 'আদাবুস্ সালাতীন' গ্রন্থের প্রারম্ভে পাঠ করিয়াছি যে, বাদশাহ জমশেদ বলিয়াছেন, কোন বাদশাহকে ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যশাসক বলা যায় না, যতক্ষণ না তাহার ভাণ্ডারে এই পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত হয়, যাহাতে সে তাহা দুশমনের মোকাবিলায় খরচ করিয়া সকলের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারে অথবা দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অবহেলায় সকল প্রজাকে প্রতিপালন করিতে পারে। তাহার ভাণ্ডারে এত অল্প পরিমাণ ধন থাকিলে চলিবে না, যদ্দরুন আকস্মিক বিপদ বা দুর্ভিক্ষে সভাসদ হইতে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলেই বলিতে থাকে, ছিঃ, ছিঃ, কী বাদশাহের অধীনে থাকি, সে নিজেকে রাজ্যের মালীক ও হর্তাকর্তা বলিয়া মনে করে, অথচ প্রজাদের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয় না। এমন বাদশাহের প্রজা না খাইয়া শুকাইয়া মরিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কী! বরং ন্যায় ধর্ম ও সাধুতার দিক হইতে বাদশাহ তাহাকেই বলা যায় ও মানা যায়, যাহার রাজ্যে একটি লোকও অনাহারে মরে না এবং কোন লোক বিনা পোশাকে ও বিনা গৃহে জীবন যাপন করে না। সে বাস্তবিকই তাহার রাজ্যে এমন সকল নিয়ম-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যাহা অতিক্রম করিয়া প্রজাদের অনাহারে মৃত্যু বা নিঃস্ব অবস্থায় বসবাস কোনটাই আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না।

সুলতান নাসির উদ্দিন এই সকল উপদেশ পুত্রের কানে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইতে ইচ্ছা করিলেন। পুত্র সুলতান মূইয উদ্দিন ইহার উত্তরে বলিলেন, আপনি জানেন যে আমার দাদার রাজ্যের কল্যাণকামী জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে এমন কোন অভিজ্ঞ লোক নাই, যিনি আমাকে সময়ে সময়ে উপদেশ দিয়া আমার এই প্রকার আলস্যনিদ্রা হইতে আমাকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন। কাজেই বাদশাহ যখন বাৎসল্য স্নেহে আমাকে উপদেশ দিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন যাহাতে আমার পরকাল ও ইহকালের মঙ্গল হয়, তেমন উপদেশ দিতে কখনই দ্বিধা করিবেন না এবং তাহা করিলে খুব অদ্ভুত বা বিচিত্র কিছু করা হইবে না। সুলতান নাসির উদ্দিন বলিলেন, হে পুত্র, তুমি আমার পিতার স্থলে তখতে বসিয়াছ এবং আমার জীবদ্দশাতেই আমার উত্তরাধিকার তোমাতে অর্পিত হইয়াছে। তুমি জানিয়া রাখ ও সাবধান হও যে, আমি জীবনের অনেক

কিছুই দেখিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসায় আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তোমাকে কিছু উপদেশ শুনাইব এবং সুনীতির তিক্ত কথায় তোমার আমোদ-প্রমোদের নেশাকে বিস্বাদ করিয়া তুলিব। কাজেই আমার অন্তরে যাহা কিছু আছে, তাহা বিদায়ের দিনে তোমাকে বলিয়া যাইব।

পিতা ও পুত্রের বিদায়ের নির্দিষ্ট দিনে সুলতান নাসির উদ্দিন খুব ভোরে পুত্রের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, তুমি দিনের আহারকে প্রহরেক বেলা পর্যন্ত বন্ধ রাখিতে বল। কারণ আজ নির্জনে তোমার সহিত কিছু কথা বলিব। তুমি মালীক নিযাম উদ্দিন ও কেওয়াম উদ্দিনকে এই খাস দরবারে হাজির হইতে বল। কারণ তাহারাই এখন রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তা। সেজন্য আমি তাহাদের সম্পর্কে যাহা কিছু বলিব, তাহাতে যেন তাহাদের মনে অন্য কোন ধারণার উদ্ভব না হয়। সুলতান মুইয উদ্দিন বলিলেন, মজলিসে তাহারা উপস্থিত হইলেও কোন প্রকার অযোগ্যতার পরিচয় দিবে না। সুতরাং মালীক নিযাম উদ্দিন আমীর দাদ ও মালীক কেওয়াম উদ্দিন এলাকা দবীরকে দরবারে ডাকাইয়া পাঠান হইল। তাহারা উপস্থিত হইলে সুলতান তাহাদিগকে বসিতে আদেশ দিলেন। এই খাস দরবারে সুলতান নাসির উদ্দিন তাঁহার পুত্রকে কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রথমে তিনি খুব কতক্ষণ বিভোর হইয়া কাঁদিলেন এবং পরে বলিলেন, হে পুত্র, যদিও তুমি আমার সন্তান, তথাপি তুমি আমার পিতার স্থলে তখতে বসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছ। কোন ব্যক্তিই নিজের অপেক্ষা পরের ভাল কামনা করে না। কিন্তু পিতা যেমন পুত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ কামনা করে, তেমনই আমি তদপেক্ষা শতগুণ অধিক কল্যাণ তোমার জন্য প্রার্থনা করি। যে সময় আমি শুনিয়াছিলাম যে, কতোয়ালগণ তোমাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়াছে এবং তোমার কল্যাণকামী হইয়াছে, আমি সুখী হইয়াছিলাম। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমি লক্ষণাবতীর অধীশ্বর; এখন দিল্লীও আমার নিজ গৃহে পরিণত হইল। আমি তোমার রাজ্য প্রাপ্তির শক্তি ও সমৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজনামে খোতবা ও মুদ্রার প্রচলন করিলাম। ইহার দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমি তোমার আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকিয়া রাজ্য সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার কথা এতবেশী শুনিয়াছি যে, আজ তোমাকে দিল্লীর তখতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি; তুমি এত দিন কী প্রকারে বহাল তবিয়তে রহিয়াছ! তুমি কী রূপে বাদশাহীর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইবে! কী উপায়ে বাদশাহী, বিলায়েত, আমীর, মালীক, কর্মচারী, প্রজা, খাজনা, আয়-ব্যয় প্রভৃতিকে তোমার আদেশ নিষেধ ও বিচার-বিবেচনার কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিবে! তুমি জাননা যে, আল্লাহ্ তাঁহার

সৃষ্টির মধ্যে দুনিয়া অপেক্ষা মধুর কোন বস্তু সৃজন করেন নাই। আবার এই দুনিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর ও প্রিয় হইল রাজত্বের নেশা। এই নেশা এমনই প্রিয় ও মিষ্ট যে, ইহার জন্য পিতা-পুত্রের রক্তের সম্বন্ধ পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই রাজত্বের মধুর নেশার লোভে পিতা পুত্রকে হত্যা করে, পুত্র পিতাকে হত্যা করে, বিষ দেয় এবং রাত্রিদিন পিতার মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন লোক নাই, যাহার দেমাগে এই নেশার লোভ অতি গোপনে হইলেও বিদ্যমান নাই। সেইজন্য যেদিন তোমার এই প্রকার আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হওয়ার কথা শুনিতে পাইলাম, সেই দিন হইতেই পিতার রাজ্য বিনাশের আশংকায় আমি শোক প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। তোমার নিজ প্রাণ ও রাজ্য এবং আমার নিজ প্রাণ ও রাজ্যকে আমি সমূহ বিনষ্টির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। যে দিন আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, তুমি আমার পিতার দাস ও শুভকামীদের অনেককেই হত্যা করিয়াছ, সেই দিন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাদিগকে হত্যা করিবার ফলে অন্যদের বিশ্বাসও তোমার উপর হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং সেইসঙ্গে রাজত্বের স্বপ্নও আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তুমিও জাননা; কিন্তু আমি জানি। আমার পিতা দিল্লীর এই রাজ্য হস্তগত করিবার জন্য কত রক্তপাত করিয়াছেন, কত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং কত বৎসর ধরিয়া ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কী ভাবে সুলতান শামস উদ্দিনের বহু বিশিষ্ট শাসক, ধনী ও খ্যাতিমান সভাসদদের নিকট হইতে ইহা ছিনাইয়া লইয়াছেন! তাহারা প্রকৃতপক্ষে সুলতান শামস উদ্দিনের রাজ্যের সর্বময় কর্তা এবং সর্বদিকে বাদশাহ হওয়ার যোগ্য ছিল। আমার পিতা এই সকল বিরোধী শক্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে কলে-কৌশলে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিজের কবলে আনিয়াছিলেন। কিন্তু তুমিত এই রাজ্য হঠাৎ বিনা পরিশ্রমে লাভ করিয়াছ, কাজেই ইহার মর্ম কী বুঝিবে! তুমি কী করিয়া জানিবে যে, আমার বড় ভাই, যিনি বাস্তবিকপক্ষে রাজ্য পরিচালনার সর্বাধিক গুণের অধিকারী ছিলেন, আমার পিতার জীবদ্দশায় শহীদ হইয়াছেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্রকে তুমি বিনাশ করিয়াছ। অন্যদিকে আমি লক্ষণাবতীতে আবদ্ধ হইয়া আছি। আমাদের এই চারিজন ব্যতীত এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী আর কেহ নাই। কাজেই এখন কেবল তোমাকে সরাইয়া দিলেই এই রাজ্য অন্য বংশ, অন্য জাতির মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে এবং তাহারা অবশ্যই ইহার পরে দুনিয়ার বুকে আমাদের নাম-নিশানা মিটাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। খোদাই ভাল জানেন যে, অন্য লোকেরা, তাহারা

ভাল হউক বা মন্দ হইক, আমাদের সৈন্য, চাকর-নফর ও দাসী-বাঁদীদের সহিত কী ব্যবহার করিবে এবং কীভাবে আমাদের পরিবারবর্গকে দেশের সম্মুখে অসম্মানিত করিবে।

আমার পিতা, যিনি মালীক, খান ও বাদশাহ অবস্থায় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, অনেকবারই বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয়, হারেম ও দাসীদের মধ্যে আমি অনেক সন্তান উৎপাদন করি ; কিন্তু জ্ঞানীদের নিকট শুনিয়াছি যে, বাদশাহের সন্তান অধিক থাকা উচিত নহে। কারণ সন্তান অধিক হইলে তাহাদের মধ্যে একজন সিংহাসনে বসিবে ; সে তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে হয় রাজ্যের অংশীদার মনে করিবে নতুবা সকলকে হত্যা করিবে। অথবা সকলে মিলিয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া রাজ্য টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। বাদশাহের জামাতাগণও শাহজাদীর স্বামী হওয়ার ফলে বাদশাহীর স্বপ্ন দেখিবে এবং তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। যে বাদশাহ প্রবৃত্তির তাড়নায় অধিক সন্তানের জন্ম দেয়, সে যেন নিজ সন্তানদিগকে নিজ হাতেই জবেহ করে, বলা যায়। আর যদি রাজ্য আদপেই বাদশাহের পুত্রের হাতে না যায় ; বরং অন্য কেহ উহা দখলে আনে, তবে তাহার পক্ষে পূর্ববর্তী বাদশাহের সকল আত্মীয়, চাকর-নফর ও হিতকামীকে হত্যা না করা পর্যন্ত নিজেকে যথার্থ বাদশাহ বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে না।

হে আমার পুত্র, তুমি ভাল করিয়া জানিয়া রাখ যে, তুমি দুই বৎসর ধরিয়া যে ভাবে দিল্লীর তখতে বসিয়া বাদশাহী করিয়া আসিতেছ, তাহা শুধু আমার পিতার শাসনের ভয়েই সম্ভব হইয়াছে। তিনিই রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থায় এমন একটা স্থায়িত্ব আনিয়া দিয়া গিয়াছেন, যদ্দরুণ বহু অঘটনেও তাহা এখনও টিকিয়া আছে। নতুবা তুমি যেভাবে বেপরোয়া হইয়া চলিয়াছ, এইভাবে কোন লোকের পক্ষে একদিনও দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া থাকা সম্ভব হইত না। হে পুত্র, তুমি নিজের সম্পর্কেও সম্পূর্ণ উদাসীন। তুমি কি আয়নায় কোন দিন নিজের মুখ দেখিয়াছ? তোমার সেই লাল রং আজ ফিকা হইয়া আসিয়াছে। যে ব্যক্তি নিজের সংবাদ নিজে রাখে না, তাহার পক্ষে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রাখা কী করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের জন্য চিন্তা করেনা, পরের চিন্তা তাহার কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। তোমার এহেন উদাসীন অবস্থা হইতেই বুঝা যায় যে, রাজত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রজাদের চিন্তা তোমার মনে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। আমি তোমার পিতা হওয়ার ফলেই তোমার এই সকল আচার-আচরণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। আমি জানিনা, আমি তোমার কানে এই সকল কঠোর উপদেশ ও সুনীতির কথা

পৌঁছাইতে পারিয়াছি কিনা। অবশ্য আমি ছাড়া তোমার রাজ্যে অন্য যে কোন লোক, তোমার প্রতি যত সদয়ই হোক না কেন, তোমার নিকট এই সকল সুপরামর্শ উপস্থিত করিতে সাহসী হইবে না। আমি ইহাও জানি যে, প্রথম পর্যায়ে বাদশাহীর যে নেশা, তাহা তোমার মগজে জমিয়া উঠিয়াছে; উহার ফলে ও সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী, এই কথা ভাবিয়া, তুমি আমার উপদেশ শুনিতে কিঞ্চিৎ কষ্ট অনুভব করিবে। কিন্তু কিছু দিন তুমি সচেতন থাকিতে চেষ্টা কর এবং চিন্তা কর যে, আমার পিতা কী বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে তুমি আমার কথার মর্ম উদ্ধার করিতে পারিবে।

হে পুত্র, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, রাজত্ব মোটামুটি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এই পাঁচটি বিষয়ে যথাযোগ্য চেষ্টা না করিলে রাজত্ব স্থায়ী হয় না। প্রথম ন্যায় বিচার ও ইনসাফ করা; দ্বিতীয় নিজের লোক ও প্রজাদিগকে প্রতিপালন করা; তৃতীয় কোষাগার পূর্ণ রাখা; চতুর্থ সভাসদ ও পাত্রমিত্রদিগকে পালন করা এবং পঞ্চম নিকট ও দূরের সর্বশ্রেণীর লোক সম্পর্কে অবহিত থাকা। কিন্তু তুমি এই পাঁচটি বিষয়ের কোনটি সম্পর্কেই সংবাদ রাখনা; কাজেই তোমার রাজ্য কীরূপে স্থায়ী হইবে! হে পুত্র, আমি তোমার চালচলনের যে ধারা লক্ষ্য করিয়াছি এবং এই দুই বৎসরে তোমার স্বভাব চরিত্রের যে চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, সে সম্পর্কে কিছু বলিলে, আশা করি, তুমি মনক্ষুণ্ণ হইবে না। তোমার দরবারে যে ধরণের আড্ডাবাজ, আমোদী, আলস্যপরায়ণ ও বাজে লোকের উঠাবসা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তাহারা তোমাকে ভোগ বিলাসের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিবে, তুমি রাজ্যের কোন কাজে হাত দিবার সময় পাইবে না এবং সভাসদ, পাত্রমিত্র, রাজকোষ ও প্রজাদের সম্পর্কে চিন্তা করিবার অবসর তোমাকে তাহারা দিবে না। অথচ তোমার সকল আনন্দই এই সকল কাজের উপর নির্ভর করিতেছে। তথাপি আমার বাৎসল্যবোধ আমাকে এই বিষয়ে উৎসাহী করিতেছে যে, তোমার কল্যাণের জন্য আমি তোমাকে সামান্য কিছু উপদেশ দান করি। অতঃপর তোমাকে বুকে চাপিয়া মুখে চোখে চুমা দিয়া বিদায় লইব এবং ফিরিয়া যাইব।

তোমার পিতার প্রথম কথা এই যে, নিজ রাজ্যকে প্রিয় মনে করিও এবং নিজের প্রাণকে তদপেক্ষা প্রিয়তর ভাবিও। জীবনের এই সামান্য সময় খোদা ও মানুষের ভয় তোমার অন্তরে না থাকিতে পারে, তথাপি নিজ প্রাণের হেফা-জতের জন্য আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ কর। যে আড্ডাবাজ, গায়ক ও অলস লোক তোমার আনন্দ বর্ধন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে দরবার হইতে দূর করিয়া দাও এবং নিজ আত্মার শুদ্ধি সম্বন্ধে চিন্তা কর। যে কাজের কথা উল্লেখ করিতে

আমি লজ্জা পাই এবং যাহা অতিরিক্ত মাত্রায় করিয়া তুমি এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দাও। নিজের জান বাঁচাইতে চেষ্টা কর; কারণ জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, দুনিয়ার সম্পদ অপেক্ষা প্রাণের মূল্য অনেক বেশী। প্রাণেই যদি না বাঁচ, তাহা হইলে এই দুনিয়া কোন কাজে লাগিবে! অথচ, হে পুত্র, তোমার প্রাণ বিপদের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তুমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মালীকদিগকে হত্যা করা বন্ধ কর। সভাসদ ও পাত্র-মিত্রদের মধ্যে কাহাকেও প্রাণদণ্ড দিওনা। তুমি যদি নিজ হাতে নিজের পাত্র মিত্রকে হত্যা কর, তাহা হইলে তোমার উপর কাহারও বিশ্বাস থাকিবে না। কোন বাদশাহদের উপর যদি প্রজাদের বিশ্বাস না থাকে, তবে তাহার রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না। বরং বিনয়, দয়া, বুদ্ধি ও কৌশলে শত্রুকে নিজের বন্ধু ও শুভকামী হিসাবে পাইতে চেষ্টা কর এবং প্রত্যেক বিষয়ে নিজে সচেতন থাক। তোমার সম্মুখে যে দুই ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন, আমি নিযাম উদ্দিন ও কেওয়াম উদ্দিনের কথা বলিতেছি, তাহারা উভয়েই তোমার দরবারের রত্ন, কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। তাহাদের ন্যায় আরও দুইজনকে নিজ দরবার ও রাজ্য হইতে পছন্দ করিয়া লও। অতঃপর এই চারিজনকে তোমার রাজ্যের চারিটি স্তম্ভে পরিণত কর। রাজ্যের সকল গুরুদায়িত্ব তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও। তাহাদের মধ্যে একজনকে উজিরের পদ দাও এবং অন্যদের অপেক্ষা তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি কর। দ্বিতীয় জনকে 'রেসালত' বিভাগের ভার দাও এবং তাহার বক্তব্য ও মতামতের মূল্য দান কর। তৃতীয় জনকে দেওয়ানে আরজের ভারার্পণ কর এবং লোকজনকে দেখা-শোনার দায়িত্ব তাহার উপর ছাড়িয়া দাও। চতুর্থ জনকে 'ইনশা' বিভাগে নিযুক্ত কর এবং বাহিরের সকল কর্মচারী কেতাব-দার ও অন্যান্য রাজ্যের আবেদন প্রভৃতির উত্তর দানের ব্যাপারে তাহার মতামত ও অভিজ্ঞতার উপর ভরসা কর। এই চারি জনকেই সমানভাবে নিজের সাথে ঘনিষ্ঠ করিয়া লও এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কে পরামর্শদানকারী হিসাবেও তাহাদের কথার মূল্য বজায় রাখ। রাজ্যশাসনে বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় দিওনা, একজনকে সকল কাজের ভার দিওনা এবং এই চারিজনের মধ্যে কোন একজনকে নিজের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসাবে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করিও না। মানুষের উপরও তাহার ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দিওনা এবং এমন কিছু করিওনা, যাহাতে তাহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে সুযোগ পায়।

তৃতীয় কথা এই যে, যখন এই চারিজন বিশ্বস্ত, কর্মতৎপর, সৎ ও সুনির্বাচিত লোককে রাজ্যের বিধিব্যবস্থা নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে, তখন এই চারিটি বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কে যে মত, আদেশ বা গোপন পরামর্শ দিবে, তাহা উক্ত চারিজনের সম্মুখে দিবে। যদিও তাহাদের মধ্যে উজিরের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী, তথাপি রাজ্যবিধির সুপ্রয়োগের প্রয়োজনে এই চারিজনের মধ্যে কোন একজনকে এমন বিশেষ মর্যাদা দেওয়া উচিত নহে, যাহাতে অপর তিনজনের মনে কষ্ট হয় এবং তাহারা দূরে সরিয়া যায়। তোমার কর্মচারীদের ভালমন্দ কাজ সম্পর্কে খবর রাখিও। তোমার পিতামহের অনুসৃত নিয়ম-কানুন ত্যাগ করিও না। নিজ মালীকদের নির্দেশাদি সম্পর্কে চিন্তা করিও এবং উহাকে নিজের ও নিজরাজ্যের কল্যাণের জন্য বিবেচনা সহ ব্যবহার করিও। বিচক্ষণ বাদশাহের নির্দেশাবলী অমান্য করিও না। মানুষের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া এতটা উদার হইওনা, যাহাতে সকলের তোমার কোন ভয় বা সম্ভ্রম বাকী না থাকে। কারণ বাদশাহীর ভয় মানুষের অন্তর হইতে চলিয়া গেলে রাজ্যের বিধি নিয়ম কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। যে সকল কথা বলিলাম, তাহা পালন করা তোমার পক্ষে ততক্ষণ সম্ভব হইবে না, যতক্ষণ না তুমি অধিক মাত্রায় শরাব পান ত্যাগ কর।

চতুর্থ কথা এই যে, শুনিতে পাইলাম তুমি নামাজ পড়না এবং রোজাও রাখনা। জ্ঞানীদের মধ্যে এমন অনেক কুশলী ব্যক্তি রহিয়াছেন ; যাহারা তুচ্ছ তঙ্কা ও চীতলের লোভে তোমার নিকট বলিয়াছেন যে, রমজানে আহার করিতে কোন অসুবিধা নাই। ইহার বদলে একজন গোলামকে আজাদ করা বা ষাইট জন মিছকীনকে আহার্য দান করাই যথেষ্ট। তুমি এই সকল কথা কুচক্রীদের নিকট হইতেও শুনিয়াছ। পুণ্যবান লোকদের মুখে শুনিলে বুঝিতে পারিতে যে, রোজার দিনে আহার করিলে যুবা বয়সেই মৃত্যু কবলিত হইতে হয়। হে পুত্র, তোমার পিতামহ অনেকবারই বলিয়াছেন যে, বাদশাহ ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলের উচিত প্রকৃত আলেমদের নির্দেশ অনুসরণ করা। সুতরাং কৌশলী ও অযথাভাষীদিগকে নিজ দরবারের নিকটেও আসিতে দিবে না এবং অধর্মী ও কুচক্রীদের কূটতর্কে আকৃষ্ট হইয়া কোন কাজ করিবে না। আমি আমার পিতার নিকট হইতে অনেকবারই শুনিয়াছি যে, আলেমগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; এক শ্রেণী আখেরাতের আলেম, আল্লাহ্ই তাহাদিগকে দুনিয়ার লোভ-লালসা ও আসক্তি হইতে রক্ষা করেন। অন্য শ্রেণী দুনিয়ার আলেম ; তাহারা লোভী কুকুরের ন্যায় দুনিয়ার লালসায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিপদ-আপদের কথা বলা এবং নানাবিধ কৌশল ও কুব্যাখ্যাই ইহাদের পেশা। কোন বিচক্ষণ ও ধার্মিক বাদশাহের পক্ষে তাহাদিগকে এই

বলিয়া বিদায় দেওয়াই শোভন যে, দুনিয়ার এই শ্রেণীর আলেমরা কোন কাজের যোগ্য নহে। যে আলেমের নিকট নিজের প্রাণাপেক্ষা দুনিয়া অধিক প্রিয়, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য শরিয়তের হুকুমকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা উচিত। হজরত মুহম্মদ মোস্তফা (দ:)-র শরিয়ত ইহাদের অন্তর্ধানে কোন প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হইবে না। এই প্রকার লোভী ও দুনিয়ার পূজারী আলেমদের নিকট হইতে ধর্মের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। যদি পরকালের মুক্তি নিজের কাম্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আখেরাতের এমন শ্রেণীর আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া হজরত মুহম্মদ মোস্তফার শরিয়তের অনুসরণ করা দরকার, যাহারা দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং তঙ্কা ও চীতল তাঁহাদের সাপ বিচ্ছুর ন্যায় বিষাক্ত বলিয়া মনে হইয়াছে। এই শ্রেণীর আলেমের নিকট ধর্ম সম্পর্কে নিজের প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে এবং খোদাভীরুদের কথা অনুসারে সমুদয় কাজ করিয়া যাইবে।

হে পুত্র, তুমি তোমার পিতামহকে দেখিয়াছ এবং তাঁহার খেদমতে থাকিয়াছ। অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছ যে, তিনি নামাজ রোজার কিরূপ পাবন্দ ছিলেন। কোন জ্ঞানী ও গুণীর পক্ষেও এত নামাজ রোজা আদায় করা সম্ভব ছিল না। যদি তোমার পিতামহ আমাদের দুই ভাইয়ের সম্পর্কে শুনিতেন যে, আমাদের কাহারও এক অক্ত নামাজ কাজা হইয়াছে, নামাজের সময় শুইয়া রহিয়াছি কিংবা জামাতের সহিত নামাজ আদায় করি নাই, তাহা হইলে একমাস পর্যন্ত আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। যাহার এক অক্ত নামাজ কাজা হইয়াছে বলিয়া শুনিতেন, খেদমতে থাকাকালে তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিতেন। আমি বহু বয়স্ক লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, রোজার সময় দিনের বেলা আহারকারীরা যৌবনেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে নামাজ পড়ে না, তাহাকে মুসলমান বলা যায় না এবং তাহার রক্তপাত শরিয়ত অনুসারে বৈধ। হে পুত্র, জানিয়া রাখ যে, মৃত্যু খুবই কঠিন বিষয়; বিশেষ করিয়া যে বাদশাহ নানাবিধ ভোগ সম্ভোগ করিয়াছে, তাহার জন্যত বটেই। কিন্তু যুবক বাদশাহের মৃত্যু তদপেক্ষাও কঠিন; কারণ সে প্রায় কিছুই ভোগ করিতে পারে নাই। সুতরাং মৃত্যুর সময় সে বুকভরা আক্ষেপ লইয়া মরিবে। যাহা হউক, আমার শেষ কথা এই যে, রোজার সময় দিনের বেলা আহার করিবে না এবং যেভাবে পার নামাজ আদায় করিতে চেষ্টা করিও। খোদাভীরু কোন জ্ঞানীকে সর্বদা নিজের কাছে রাখিও। হাজার লোক যদি তোমার দুনিয়াবী চিন্তা দূর করিতে ব্যস্ত থাকে, তবে তিনি একাই তোমার ধর্মের চিন্তা দূর করিতে সমর্থ হইবেন।

৯—

এই সকল উপদেশ দিবার পর সুলতান নাসির উদ্দিন খুব কাঁদিলেন এবং সুলতান মুইয উদ্দিনকে বুকে চাপিয়া বিদায় চাহিলেন। এই অবস্থায় পুত্রের চোখে মুখে চুমা দিবার কালে গোপনে বলিলেন, যত শীঘ্র পার নিযাম উদ্দিনকে দূরে সরাইয়া দাও। কারণ সে সুযোগ পাইলে একদিনও তোমাকে দিল্লীর তখতে রাখিবে না। এই বলিয়া বাদশাহ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। বিদায়ের বেলা এই পদটি তিনি আবৃত্তি করিতেছিলেন—

ছাড়িয়া দাও যেন আমি শ্রাবণের মেঘের ন্যায় অশ্রুপাত করিতে পারি ;
কারণ বন্ধু বিচ্ছেদের কালে নিতান্ত পাথরের চোখেও অশ্রু দেখা দেয়।

যাহারা পিতাপুত্রের এই বিদায় দৃশ্য, উহার সকল ক্রন্দন ও বিনয়কে দেখিয়াছিল, তাহারাও ইহাতে অভিভূত হইয়াছিল এবং বহুদিন দর্শকের মনে ইহার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাহারা বলিয়াছে যে, ফিরিবার সময় সুলতান নাসির উদ্দিন আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে এক মঞ্জিল অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তিনি যথাসময়ে আহার করেন নাই ; একান্ত অভিভূত অবস্থায় নিজ সভাসদ ও পাত্রমিত্রদেরকে বলিলেন, আমার মনে হয়, আমি নিজ পুত্র ও দিল্লী রাজ্যকে শেষ বিদায় দিয়া আসিয়াছি এবং ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, এইভাবে আর দিল্লী রাজ্য বা পুত্র কাহাকেও নিজের কাছে ফিরিয়া পাইব না।

সুলতান মুইয উদ্দিনও অযোধ্যা হইতে দিল্লীর দিকে ফিরিতে মনস্থ করিলেন। কিছুদিন তাঁহার পিতার উপদেশ অনুসারে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইতে বিরত রহিলেন, মদ্যপান করিলেন না, গান শুনিলেন না এবং সুন্দরীদিগকে নিজ সকাশে আহ্বান জানাইলেন না। কিন্তু সুলতানের দানধ্যান, আমোদ-প্রমোদ ও কুপ্রবৃত্তির লালসার কথা নিকটে ও দূরে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহার সৌন্দর্য প্রীতি ও প্রেমিকতার প্রতি আসক্তির কথা সকলে জানিয়া ফেলিয়াছিল। এইজন্য অর্থলোভী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা পুরস্কারের আশায় খুব সুন্দরী, রঙ্গ-চঙ্গী ও চালাক-চতুর মেয়েদিগকে বাদশাহের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিত। এই প্রকার মেয়েলোক গীতবাদ্য, তাসপাশা ও খোশগল্প খুব ভালভাবেই জানিত। এই সকল চন্দ্রমুখীকে যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্বেই বক্তৃতা, অশ্বারোহণ, বল্লম নিক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে অতীব দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহারা একাই একটি শহর বা জগতের প্রাণ চাঞ্চল্য ঘটাইতে সক্ষম ছিল। ইহাদিগকে আরও এমন সকল জ্ঞান ও গুণ শিক্ষা দেওয়া হইত, যাহার প্রভাবে দরবেশের গায়ে পৈতা উঠিত এবং অতি ধার্মিক মদের দিকে আকৃষ্ট

হইত। এমনিভাবে মূর্তিমতী বিপদ স্বরূপ ইহাদিগকে গড়িয়া তোলার বন্দ লওয়া হইত। হিন্দুস্তানের সুন্দর দাসপুত্র ও দাসকন্যাদিগকে ফারসী ভাষা ও গান-বাজনা শিখাইয়া, জরির পোশাক পরাইয়া এবং সুন্দরীদিগকে দরবারী আদব কায়দায় দোরস্ত করিয়া ও অকেজো যুবকদিগকে মণিমুক্তা দিয়া সাজাইয়া আনা হইত। সুন্দরীরা নব বিবাহিতার ন্যায় সাজসজ্জা করিত এবং যুবকরা ফারসী ও হিন্দী গজল গান দ্বারা উস্তাদদের করতনব মাত করিয়া দিত। এমনই ধরনের সুন্দর-সুন্দরীদিগের মুখে সুলতানের প্রশংসা ও গুণগানের গজল শুনাইতে যত রহস্যপ্রিয় ও ভাঁড় শ্রেণীর লোক এবং আরাম-আয়েশপ্রত্যাশী ভবঘুরের দল নানা দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অপরিমেয় বখশিশ লাভ করা। কোল ও মীরাটের মদ্যপায়ীরা নানাবিধ নবীন ও পুরাতন মদ আনিয়া সুলতানের খেদমতে উপস্থিত করিত। সুলতান মুইয উদ্দিন দিল্লী ফিরিবার কালে অযোধ্যা হইতে চারি পাঁচ মঞ্জিল অতিক্রম করিতে না করিতেই প্রতিদিন এই প্রকার সুন্দরী ও যুবকদের ভীড় জমিতে লাগিল। এই ধরনের মণি-মনলোভা রূপসিগণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিত এবং সুলতানের সোয়ারী উপস্থিত হইলে নিজেদেরকে প্রকাশ করিয়া গজল গান দ্বারা মন ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

সুলতান মুইয উদ্দিনের অভ্যাস অনুসারে এই সকল সুন্দরী ও রূপসীদিগের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ক্রমশ: বাড়িতেছিল। কিন্তু সৈন্যদলের সকলের মধ্যে প্রচারিত পিতার উপদেশাবলীর কথা স্মরণ করিয়া তিনি নিজেকে বিরত রাখিতেন। তথাপি কটাক্ষে ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিবার অভ্যাস তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কাজেই ইহাদের সহিত মিলনের বাসনা সকলের অলক্ষ্যে তাঁহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

দিল্লী আগমনকালে সুলতানের মানসিক অবস্থা এমনই এক পর্যায়ে, তখন একদিন এক চন্দ্রমুখী বহুতর রঙ্গঢঙ্গ সহ জরির পোশাক পরিয়া, কোমরে সোনার কোমরবন্দ আঁটিয়া, হাতের ধনুক বাঁকাইয়া, শাহী টুপিতে মস্তক আবৃত করিয়া, অতি সুসজ্জিত ও সুশোভিত এক সবুজ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া, একটি কাল নিশান দ্বারা অশ্বের বক্ষদেশ আচ্ছাদিত করিয়া শিকারীর ন্যায় বাদশাহের খাস ফৌজের মধ্যে আসিয়া উদয় হইল এবং সুলতানের সোয়ারীর দিকে স্বীয় অশ্ব দৌড়াইয়া দিল। খাস ফৌজের লোকদের মনে হইল, যেন কোন বাদশাহজাদী শিকারের পিছনে দৌড়াইতেছে। তাহারা ইহার রঙ্গঢঙ্গ ও ছলাকলা দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। অন্যদিকে এই সমূহ বিপদ তীরের ন্যায় সোজা সুলতানী ছত্রের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। জানদার,

চাণ্ডর্শা ও নকীব শ্রেণীর যে সকল রক্ষী অগ্নি পাথরসহ সুলতানী ছত্রের সহিত গমন করিত, তাহারা ইহার হাবভাবে এমনই মোহিত হইয়া পড়িল যে, নিষেধ করিতেও ভুলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সুন্দরী সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া সুলতানী সোয়ারীর সঙ্গে মিশিয়া গেল এবং সুকণ্ঠ গায়িকার ন্যায় এই পদটি আবৃত্তি করিল—

আমার নয়নের উপর চরণ ফেলিয়া তুমি যদি চলিতে চাও,
তাহা হইলে তোমার যাত্রা পথে আমার নয়ন বিছাইয়া দিব।

বাদশাহকে বলিল, জাঁহাপনার সম্মুখে এই পদটি যেভাবে আবৃত্তি করা দরকার, তেমনভাবে করিতে পারি নাই বলিয়া আশংকা করিতেছি।

সুলতান ইহার সৌন্দর্য দর্শনে বিগলিত এবং ইহার কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। নিজের অশ্ব থামাইয়া ইহাকে বলিলেন, ভয় নাই, আবৃত্তি করিয়া যাও। সাধুমন মোহিনীর কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল—

হে সবুজ দেবদারু, যদি মরুভূমিতে যাইতে চাও, উত্তম;
কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া নিতান্তই গর্হিত কাজ।

এই পদটি আবৃত্তির পর বাদশাহকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি এক দুঃখিনী, কত দূর দেশ হইতে সুলতানের দর্শনের আশায় ছুটিয়া আসিয়াছি; অথচ সুলতান আমার প্রতি দৃষ্টি না দিয়াই চলিয়া যাইতেছেন, একবার চাহিয়া দেখিবারও প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না।

সুলতান ইহার সৌন্দর্য, কথা বলিবার ঢঙ্গ ও চাতুর্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই চন্দ্রাবদনীর হাবভাব তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। আবেগের আতিশয্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ইহাকে বুকে টানিয়া লইবার ইচ্ছা হইল। সুতরাং রূপসীর রূপদর্শনে ও তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শ্রবণে সুলতান ভাসিয়া গেলেন এবং একান্ত নিরুপায় হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। তখনই মদ আনিতে আদেশ দিলেন। সুন্দরীর স্বাস্থ্য কামনা করিয়া মদের পাত্র কণ্ঠে ঢালিলেন এবং তাঁহার আবেগ কম্পিত কণ্ঠে এই পদটি ধ্বনিত হইল—

প্রিয়ার ছলা কলার ভয়ে রাত্রে শরাব হইতে তওবা করিয়াছিলাম,
কিন্তু এই সুন্দর চেহারা আবার সাকীর কথা স্মরণ করাইতেছে।

ইসলামের শত্রু ও ঈমানের দুশমন এই সুন্দর মুখ সুলতানের পদ আবৃত্তি শুনিবা মাত্র তদপেক্ষা সুস্বরে প্রাণ কাড়িয়া লইয়া গাহিল—

চোখের ইশারায় শত বছরের পোক্তা সাধুকে মোহিত করিয়াছি
এবং চুলে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া শরাব খানায় উপস্থিত করিয়াছি।

সে আরও অনেক পদ আবৃত্তি করিল এবং বহুবিধ রঙ্গঢঙ্গ প্রদর্শন করিল। দর্শকবৃন্দ তাহার সৌন্দর্যে, তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার কথার অভিনবত্বে অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িল এবং সকলেরই তাহাকে মাথায় লইয়া নাচিতে ইচ্ছা হইল। রূপসী তাহার অশ্বকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিল, ধনুক হাতে লইল এবং উহাতে তীর সংযোজন করিয়া পাথরের নীচে নিক্ষেপ করিল। তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া এবং তীর নিক্ষেপের চাতুর্য অবলোকন করিয়া খাস সৈন্যদলের লোকদের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহার অশ্বের বল্গা ত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিল এবং সকলের চক্ষু সুন্দরীর দেহ বল্লরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছিল। সুতরাং সুলতান অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দরবার আহ্বান করা মাত্রই এই সর্বনাশিনীর ডাক পড়িল। তিনি প্রাণের সকল আবেগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আজ আমার মন চাহিতেছে, তোমার হাত হইতে শরাব পান করি ; আজ তুমিই আমার সাকী। সুন্দরী ঠমকের সহিত সুলতানকে উত্তর দিল :

আমি চাঁদ অপেক্ষা সুন্দরী হইতে পারি, তথাপি
বাদশাহের দাসানুদাসদিগেরই আমি একজন।

এই পদটি আবৃত্তি করিয়া একটি পূর্ণ পেয়ালা লইয়া সুলতানের হাতে দিল। সুলতান পেয়ালা হাতে লইয়া এই ভুবন মোহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

পেয়ালা পরিবেশনের সময় নিকটে যাকে পাও, তাকেই দাও, হে সাকী।
আমাকে বাদ দাও, যেন আমি তোমার প্রতি অবাক চাহিয়া থাকিতে পারি।

ইহা শুনিয়া এই রূপবতী তন্বী সাকী চাতুর্যের সহিত মস্তক ভূমিতে ঠেকাইয়া, হাস্যে-লাস্যে ওড়নায় ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়া, নয়নের যাদুতে বিজলী চমকাইয়া অতি মধুর স্বরে বলিল, জাঁহাপানা, পান করুন। জাহাপানা পান করুন। সুলতান বলিলেন,—

হে সাকী। তুমি যদি আমার হইতে, তাহা হইলে বলিলেও
বলিতে পারিতে যে, শরাব পান করা একান্তই হারাম।

এই সময় সুলতানী সাকীরা উচ্চস্বরে আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিলে সুলতান নিজে হাস্য করিয়া জিয়া অহজীর দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, সাকীদের শাসন খুব খারাপ কিছু নহে। জিয়া উদ্দিন অহজী শির আভূমি নত করিয়া বলিল,

সাকীদের শাসন রাজ্যশাসন নহে ; রাজ্য হইল
আলাদা বস্তু, ইহারা উহার জন্য নহে।

সুলতানের আদেশে হাজার তঙ্কার চাঁদী আনিয়া এই রূপের রাণীর শিরে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। তখন এই তন্বী চোখে-মুখে বিজলী চমকাইয়া সহাস্যে

সুলতানের সম্মুখে আর্জি পেশ করিয়া বলিল, এই মুদ্রাবৃষ্টি কাহার উদ্দেশ্যে? কারণ আমার ন্যায় আরও বহু চন্দ্রমুখী আপনার শাহী জাঁকজমক দর্শনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। সুলতান বলিলেন, উহাদের মধ্যে তোমার ন্যায় আর কেহ আছে? সে উত্তরে বলিল, জাঁহাপানা, আমার ন্যায় আর কেহ তাহার মাতৃগর্ভে জন্মায় নাই; তথাপি আমার দলের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যাহাদের মুখ দেখিয়া চাঁদ লজ্জা পায় এবং যাহাদের গীত শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া মুনির মনেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যদি ইহাদিগকে জাঁহাপানার দৌলতখানায় আনিয়া হাজির করি, তাহা হইলে উহাদের সঙ্গীতে আকাশের পাখী নামিয়া আসিবে এবং দেয়ালও নৃত্য করিতে শুরু করিবে।

সুলতানের আদেশে এই দলকে দরবারে হাজির করা হইল। সকলে ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, ইহারা এক অপেক্ষা অন্য আরও সুন্দরী, আরও মনমোহিনী ও আরও মধুর। যখন উহারা গীত ও নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন দর্শকবৃন্দ এই চন্দ্রাননা হুরীদের চাতুর্যের মহিমা, এই তন্বী সুকুমারীদের দেহ-বল্লরীর আন্দোলন এবং এই প্রাণদায়িনী সুবেশিনীদের ভঙ্গিমা দর্শনে হতবাক্ হইয়া পড়িল। সুলতান এই সকল আশ্চর্য রূপিনীদের ভঙ্গিমা দর্শনে, জুয়া ও পাশায় লভ্য সম্মানীদের বাক্‌চাতুর্য শ্রবণে, সুচিক্কন পদধারিণীদের নৃত্য অবলোকনে এবং সুকণ্ঠীদের রবাব বাদ্য শ্রবণে পিতার উপদেশের কথা ভুলিয়া গেলেন। সকল সুনীতির মাথায় পদাঘাত করিয়া তিনি রাত্রিদিন এই সর্বনাশিনীদের সাহচর্যে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন। সেই যে কথায় বলে, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী; তিনিও সেই রূপ এই সকল সুকুমারীর অঙ্গ শোভা দর্শনে নিজের গলায় বিলাসিতার পৈতা ধারণ করিলেন এবং আবার নূতন করিয়া আমোদ-প্রমোদের মূর্তিপূজায় নিরত হইলেন। গীতবাদ্যের যথার্থ রস আস্বাদন করিলেন এবং এই সকল রূপজীবিনীর প্ররোচনায় জোয়ানির নেশা ও জুয়া খেলায় মত্ত হইয়া পড়িলেন। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মজলিসে একটি জলসা আহ্বান করিতেন এবং এই দলকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দিতেন। বিশেষ সময়ে ইহাদিগকে নিজের সম্মুখেও হাজির করিতে বলিতেন। সুলতান এই সকল রূপ বিলাসিনীদের প্রতি এমনই আসক্ত হইয়া পড়িলেন যে, ইহাদিগকে বিশ হাজার ত্রিশ হাজার তঙ্কা বখশিশ করিতেন। ইহাদের সঙ্গীসাথী যে সকল লোক সুলতানের বয়স্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সুলতানী দরবারীদের সহিত শতরঞ্জ খেলিত এবং নানাপ্রকার রহস্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বলিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিত। ইহার ফলে বহু বিশিষ্ট লোক ও নির্বাচিত জন সুলতানী বখশিশে তাহাদের থলি পূর্ণ করিয়া লইয়াছিল।

যে কোন মঞ্জিলে সুলতানী সোয়ারী পৌছিলে ইহার আশেপাশের সকল স্থান সুন্দরী রূপসীদের কল-গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিত এবং দর্শকদের হৃদয় ও তারকাদের প্রাণ সমানভাবে উচ্চকিত হইত। এই সকল সুকণ্ঠী রূপজীবিনীদের অঙ্গশোভা দর্শনে সকলেই বিমোহিত এবং তাহাদের গীতবাদ্য শ্রবণে, বিশেষতঃ চঙ্গ, রবাব, মুসকেল, বাঁশী, তানপুরা প্রভৃতির তানের আকর্ষণে আকাশের পাখী মাটিতে নামিয়া আসিত ও বনের জীবজন্তুও মোহিত হইয়া পড়িত। এই সকল সুবেশীদের গীতে, যাদুকরীদের নৃত্যে, লাবণ্যময়ীদের বাক্‌চাতুর্যে ও খঞ্জন নয়নাদের চপল কটাক্ষে সৈন্যদলের আমোদ বিলাসী এবং বাজারের সুযোগ প্রত্যাশী লোকেরা পাগল হইয়া উঠিল। তাহারা ইহাদের নামে নিত্য-নূতন গজল তৈরী করিতে লাগিল। প্রেম পাগল যুবক শ্রেণী নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও মাথার চুলের দুরবস্থার মাধ্যমে তাহাদের আসক্তির কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ তাহারা ইহাদের প্রেমে অস্থিরচিত্ত হইয়া শিক্ষা হাতে ইহাদের পূজা করিতে লাগিল। প্রতিটি খোজা ইহাদের রূপের সুধা পান করিবার জন্য তাহাদের যথাসর্বস্ব চালিয়া দিল এবং অনেকেই তাহাদের অশ্ব, অস্ত্র, গোলাম, বাঁদী, তাঁবু ও পোশাক পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া এই সমস্ত রূপজীবিনীদের পদতলে উৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিল। যখন আর দিবার মত কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন মাথার টুপি ও কোমরবন্দ ছাড়া আর যাহা কিছু তাহাদের হাতে পড়িল, তাহাই প্রেয়সীদের কুকুরের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে ছাড়িল না। এমনি-ভাবে এই সকল নিঃস্ব-প্রেমিক তাহাদের আহার নিদ্রার কথা ভুলিয়া বালক ও রূপসীদের জন্য দিনরাত্রি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া থাকিত। রাজ্যের চতুর্দিক হইতে যে সকল রহস্যপ্রিয়, ভবঘুরে ও আজেবাজে লোক শাহী দরবারে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা ঠাট্টা, চাতুরী ও রহস্যপ্রিয়তার চরম প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত। ইহারা শিবিরের আশে-পাশে খেলা দেখাইত এবং নানাবিধ কলা-কৌশল প্রদর্শন করিত। ইহার ফলে চতুর্দিক হইতে উচ্চহাস্যের ধ্বনি উঠিত এবং দর্শকবৃন্দ অবাক হইয়া এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিত।

মালীক নিযাম উদ্দিন দাদবেক কেতাদারদের উদ্বৃত্ত তহবিল, গণিমতের মাল, রাজাদের উপহার প্রভৃতি হইতে যে সম্পদ শাহী খাজনায় জমা করিয়াছিলেন, অযোধ্যা হইতে দিল্লী পেঁৗছিবার পথে সুলতান উহার সমুদয় নটনটীদের পদতলে নিঃশেষ করিয়া দিলেন। অযোধ্যা ও দিল্লীর মধ্যকার এই দূরত্ব তিনি সর্বদা আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিয়াই অতিক্রম করিয়াছিলেন। কেলুখড়ির প্রাসাদে পেঁৗছিলে রাজধানীতে ফিরিয়া আনন্দ উপলক্ষে দিল্লী শহরে গম্বুজ তৈয়ার করা হইল। নবীনা ও প্রাচীনা সকল গায়িকা, নটী সর্বপ্রকারের জাঁকজমকের সহিত

এই সমস্ত গম্বুজের নিকটে আসর জমাইয়া তুলিল। শহরের লোকেরা ইহাদের সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হইল। শহরবাসী বিশিষ্ট লোকেরা এই সকল রূপসী ও সৌন্দর্যময়ীদের জন্য পাগল হইয়া মাসের পর মাস কাটাইয়া দিল। ইহার ফলে অনেকের কেতা জায়গীর গেল; আবার অনেক ঘরবাড়ী বন্ধক দিয়া ইহাদের সন্তুষ্টি বিধান করিল। মালীকজাদারা পাগল হইল এবং খাজাজাদারাও তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিল। ধনীরা ক্রমশঃ নির্ধন হইতে লাগিল। মুলতানী মহাজনরা সুদের উপর সুদ চড়াইয়া তঙ্কার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইল। গৃহহীন, সহায়হীন বহু লোক লক্ষণাবতীর দিকে রওয়ানা দিল। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি লোপ পাইল, আলেমরা গুণাহগার হইল এবং দরবেশরা জপতপ ত্যাগ করিয়া শরাবখানায় আশ্রয় লইল। সুনামের কোন বালাই রহিল না; অমর্যাদা—অসম্মান সর্বত্র প্রসার লাভ করিল। গম্বুজে গম্বুজে শরাবের নহর প্রবাহিত হইল এবং শরাবের সোরাহী সর্বত্র প্রবেশ করিল। গম্বুজগুলি এমনভাবে সুসজ্জিত করা হইল, যাহা ইহার পূর্বে বা পরে আর কখনও দেখা যায় নাই। সুলতান মুইয উদ্দিনের সময় মানুষ যে প্রকার আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়াছে, তাহা পরবর্তী লোকেরা চক্ষেও দেখে নাই। এমন নিশ্চিন্ত বিলাস-ব্যসনের কথা ইতিপূর্বে বা পরে আর কখনও শোনা যায় নাই।

গম্বুজ তৈয়ার করিবার পর সুলতান মুইয উদ্দিন শহরে তশরিফ আনিলেন এবং যথারীতি সকল বিষয় পরিদর্শন করিয়া শাহীমহলে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে পুনরায় কেলুখড়িতে গেলেন এবং যথেচ্ছা আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া পড়িলেন।

আমি প্রায় ষাইট বৎসর পরে সুলতান মুইয উদ্দিনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে লিখিতেছি। এই সুলতানের সময়কার বিলাসী লোকদের কথা স্মরণ করিয়া এবং রূপজীবিনীদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের ব্যবহারের কথা মনে করিয়া আমার এই লেখায় তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া আমি আজিও বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া পড়ি। এখনও আমার এই বৃদ্ধ অবস্থায় শত্রুদের হীন-চক্রান্তে জর্জরিত হইয়াও যৌবনের সকল কথা আমার হৃদয়ে জাগরিত হইতে থাকে। মহান লোকদের সাহচর্যে যে সকল জলসায় শরীক হইয়াছি, যে ধরনের আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়াছি; আমাদের জলসায় যে সকল অতুলনীয় রূপসী, খোশগল্পকারী, রহস্যপ্রিয়, বাদক, গায়ক ও সাকীর সমাবেশ হইত, তাহারা ও সেইসব জলসা আজ কোথায়! আর আমি আজ সকল কিছু হইতে দূরে অসম্মান ও কায়িক পরিশ্রমের এক সংকীর্ণ গুহায় সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কালাতিপাত

করিতেছি। এই তারিখ আমি কাহার নিকট লইয়া যাইব এবং কাহার নিকট ইহার জন্য ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিব!

আমি সুলতান মুইয উদ্দিনের রাজত্বকাল সম্পর্কে কতিপয় পৃষ্ঠা লিখিয়াছি; ইহাতে তাহার সময়কার আমোদ-প্রমোদ ও সমসাময়িক লোকদের বিলাসিতার কথাও বর্ণনা করিয়াছি ইহার নাম রাখিয়াছি 'কুব্বাতুৎতারিখ'। তৎকালের নানা প্রকার গান ও গজলের অর্থ হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছি। যদি ইহা পূর্বকালীন জ্ঞানীদের নজরে পড়িত এবং বিশিষ্ট লোকেরা ইহা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও সুবিচারে আমার মনের কালি দূর হইত ও তাহাদের মহানুভবতায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। আমার বন্ধুবান্ধব হিসাবে যে সকল জ্ঞানী ছিলেন, যাহাদের অভাবে সমগ্র হিন্দুস্তানে জ্ঞানের পালা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাঁহারা থাকিলে আমি তাঁহাদের সম্মুখে এই তারিখ উপস্থিত করিয়া আমার মনের বাসনা পূর্ণ করিতাম। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, তাঁহাদের প্রশংসা লাভ করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিবার আর কোন উপায় অবশিষ্ট নাই। ইহার পরেও ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমার এই তারিখ এমন কোন ধনী ব্যক্তির সম্মুখে প্রেরণ করিব, যিনি ইহার প্রতি বাক্যের মাধুর্য ও বর্ণনার চাতুর্য উপলব্ধি করিয়া তাহার আন্তরিক আমোদ-প্রমোদের অভিলাষ চরিতার্থ করিবেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ মহানুভবতা প্রকাশ করিয়া আমার অন্তরে শান্তি প্রদান করিবেন। কিন্তু তেমন কোন মহানুভব, রহস্যপ্রিয় ধনী ব্যক্তিও আমার সম্মুখে উপস্থিত নাই। এই পরিস্থিতিতে আমার ইচ্ছা হইল যে, খানজাদা ও মালীক-জাদাদের ন্যায় আমোদবিলাসী উন্নতমনাদের খেদমতে ইহা লইয়া হাজির হইব। তাহারা ইহার দ্বারা নিজেদের আমোদ-প্রমোদকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করিবেন ও তাহাদের আশা-অনুরূপ চিত্তের শান্তি লাভ করিবেন এবং ইহার বিনিময়ে অন্য কিছু না হউক, অন্তত: সম্পদ দানে আমার আশা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু হায়! আমি যেমন রূপসীদের সঙ্গ পাই নাই; তেমনই তাহাদের এই বিবরণের দ্বারাও কোন ফল লাভ করিতে পারিতে পারি নাই। সেজন্যই অনন্যোপায় হইয়া সময়ের দৌরাত্মের কথাই বর্ণনা করিতেছি এবং আমার নিরাশার কথা স্মরণ করিয়া অন্তরের বেদনা অশ্রু হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। চক্ষু দিয়া যেমনভাবে বুকের রক্ত ঝরিতেছে, ঠিক তেমনি কলমের আগায় তাহাই অংকিত হইতেছে এবং কাগজের উপর উহারই চিহ্ন পড়িতেছে।

নিজের এই অপরিমেয় আক্ষেপের কথা ছাড়িয়া দিয়া সুলতান মুইয উদ্দিনের রাজত্বকালের আমোদ-প্রমোদের কথা পুনরায় আরম্ভ করিতেছি। এই সময়ে সাধারণ হইতে বিশিষ্ট সর্ব শ্রেণীর লোকই আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিল। দিল্লীর

উস্তাদ জ্যোতিষীবর্গের কথা মত মুইযী রাজত্বকাল তিন বৎসর ব্যাপী হইলেও এই সময়ে শুকতারা ছিল উন্নত আর শনি ছিল অবনত। এই সময়ের ঐতিহাসিকরা উহাকে বাহরাম গোরীর রাজত্বকালের সহিত তুলনা করেন। সুলতান মুইয উদ্দিনের সময় কালে বস্তুত: মানুষের আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত অন্য কোন কাজ ছিল না। এই তিন বৎসর ধরিয়া তাহারা গীতবাদ্য করিয়াছে, স্ফূর্তির জলসা জমাইয়াছে, মদ্যপান করিয়াছে, প্রেমের খেলা খেলিয়াছে, শতরঞ্জ ও জুয়ায় মাতিয়া রহিয়াছে, হাসি তামাসা করিয়াছে এবং সুন্দরীদের সঙ্গ উপভোগ করিয়াছে। এই তিন বৎসর মানুষের মনে কোন চিন্তা ছিল না; কোন প্রকার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয় নাই। মানুষ শুধু স্ফূর্তি করা এবং স্ফূর্তির জন্য যথেচ্ছ ব্যয় করাতেই ব্যস্ত ছিল। বিলাস ও সম্ভোগই ছিল তাহাদের একমাত্র কর্তব্য।

প্রাচীনকালের জ্ঞানীরা কী তাৎপর্যপূর্ণ কথাই না বলিয়া গিয়াছেন—প্রজাবৃন্দ বাদশাহের চরিত্রের দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ সকল কিছু অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া থাকে। বাদশাহের শাসন ও রাজ্যের অন্যবিধ কার্যে যে সকল ভুলভ্রান্তি বা হিত কল্যাণ হয়, তদ্বারা প্রজারা তেমন অনুপ্রাণিত হয় না; যেমন অনুপ্রাণনা তাহারা বাদশাহের চরিত্রের দ্বারা লাভ করে। মোট কথা রায়তগণ বাদশাহের দোষ-গুণের অনুসরণ করিয়া থাকে। সুলতান মুইয উদ্দিনের চরিত্র ছিল কোমল; তিনি সকল বিষয় সহজভাবে গ্রহণ করিতেন। বাদশাহের চরিত্রে সুলভ কঠোরতা, যদ্বারা উদ্ধত শির অবনত ও বিদ্রোহী অনুগত হয়; উহা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। তাঁহার রাজত্বকালে তিনি যথাসম্ভব কোমল ও সহজ ব্যবহারের দ্বারা কাজ লইয়াছেন। একটি পিপীলিকাও যাহাতে তাঁহার ব্যবহারে কষ্ট না পায়, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি যেমন আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিতেন, তেমনি সকল লোক আমোদ স্ফূর্তি করুক, ইহাই তিনি চাহিতেন। তিনি কাহাকেও কষ্ট দেন নাই। তিনি জানিতেন না যে, বাদশাহীর অর্থ কোমল কঠোরের একত্র মিশ্রণ। কঠোরতা ছাড়া শুধু কোমলতার দ্বারা কখনও রাজ্য শাসন করা যায় না। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিরা লিখিয়া ও বলিয়া গিয়াছেন যে, বাদশাহী আসলে খোদাতালার প্রতিনিধিত্ব। এই কাজের মহত্ত্ব আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের কাজের পশ্চাতেই স্থান পায়। এই প্রকার বিরাট কাজ কোমলতা ও কঠোরতা, দয়া ও শাস্তি, ক্ষমা ও শাসন, ধৈর্য ও ক্রোধ প্রভৃতি গুণ ব্যতীত হওয়া সম্ভব নহে। যতদিন না অনুগত ও বাধ্য রায়তবৃন্দ শাহী দয়ার ছত্রচ্ছায়ায় শান্তিতে বসবাস করিতে পারে এবং বিদ্রোহী ও প্রতিদ্বন্দ্বীরা যথাযোগ্য ভীতি ও শাস্তি লাভ করে, ততদিন বাদশাহীর মর্যাদা ও জাঁকজমক বৃদ্ধি পায় না। অথচ শাহী মর্যাদা অক্ষুণ্ন না থাকিলে ইসলামী হুকুম আহকাম জারী

করা সম্ভব হয় না এবং এই বাহাত্তুর ফেরকা বিশিষ্ট ধর্মমতের লোকেরাও একত্রে থাকিয়া কাজকর্ম করিতে পারে না। তাহা ছাড়া রাজ্যশাসনের কাজও স্থায়ী বা প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। রাজ্যশাসনের কাজ যেমন শুধু দয়া প্রদর্শনের দ্বারা হয় না, তেমনিই শুধু কঠোরতাও ইহার যোগ্য নহে। যেখানে দয়া দেখাইবার স্থান, সেখানে দয়া এবং যেখানে শাসনের স্থান, সেখানে শাসন অবশ্যই করিতে হইবে।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক, আমি জিয়া বারাণী সুলতান মুইয উদ্দিনের বিশিষ্ট সভাসদ মালীক নিযাম উদ্দিন ও মালীক কেওয়াম উদ্দিন সম্পর্কে কাজী শরফ উদ্দিন সরপায়ীর নিকট শুনিয়াছি যে, এই প্রকার আমোদ-প্রমোদের সুলতান মুইয উদ্দিনের রাজত্ব এক সপ্তাহও স্থায়ী হইত না, যদি না ইহার পশ্চাতে মালীক নিযাম উদ্দিন ও কেওয়াম উদ্দিনের ন্যায় লোক থাকিতেন। তাঁহারা উভয়েই সুলতান শামস উদ্দিন ও সুলতান বলবনের মালীকদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন এবং রাজ্যশাসন কৌশলে নিজের তুলনা রাখিতেন না। তাঁহারা বুদ্ধিমান ছিলেন এবং বুদ্ধিমানের আশ্রয়স্থল ছিলেন। তাঁহারা মানুষ চিনিতেন; এবং মানুষের সহিত ব্যবহারের নিয়ম কানুনও তাহারা ভাল করিয়া জানিতেন। মালীক নিযাম উদ্দিন খুবই উন্নতমনা ছিলেন। তিনি প্রতিদিন শাহী মহলে যাইবার কালে শত তঙ্কা এবং ফিরিবার কালে শত তঙ্কা দান করিতেন। শহরের আলেম ফাজেল, জ্যোতিষী, হেকিম, কাওয়াল ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাহারা বিশিষ্ট ছিলেন, সকলেই তাঁহার দরবারে স্থান পাইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেককেই তাহার মর্যাদা অনুসারে দয়া দাক্ষিণ্য করিতেন এবং চাহিতেন যে, প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যানুসারে খ্যাতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁহার ন্যায় লোক চিনিবার ক্ষমতা বহুকাল অন্য কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। কিন্তু শত আক্ষেপ এই যে, এহেন গুণ ও বিচক্ষণতা শুধু মাত্র রাজ্যলাভের লালসায় অধঃপাতে গেল। তাহার যে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা ছিল, তদ্বারা তিনি দরবারে উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে কার দোষ ও গুণ প্রথম দর্শনেই জানিয়া ফেলিতে পারিতেন। তাঁহার সম্মুখে দুই শত লোক বসিয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে প্রত্যেককে তিনি তাহার যোগ্য দোষগুণে ভূষিত করিয়া সেই অনুযায়ী কার্য প্রদান করিতেন। কখনও এই ব্যাপারে উল্টা-পাল্টা ব্যবহার এবং যোগ্যাযোগ্যের তারতম্য ঘটিত না। এই ব্যাপারে কোন বাজে কথা, অন্ধবিশ্বাস, স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা তাঁহার নিকট স্থান পাইত না। তাঁহার মুখ হইতে কোন প্রকার অশোভন কথা কখনও শোনা যায় নাই। শাহী জাঁকজমক ও চালচলনকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিতেন এবং ভাল বলিয়া জানিতেন।

মালীক কেওয়াম উদ্দিন এনাকা দবীরও মালীকদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি বহু বিষয়ে সম্মানিত এবং ভাষাজ্ঞান ও লিপি কুশলতায় আশ্চর্য দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। কাজের নিয়ম-কানুন জানিতেন এবং কাজ করাইবার দক্ষতাও তাঁহার ছিল অসাধারণ। লিপিকরদের মধ্যে তাঁহার দক্ষতার অতুলনীয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি বাহা উদ্দিন বাগদাদী, রশীদ ওতওয়াত ও মুইন আসেম প্রমুখ অতুলনীয় ভাষাজ্ঞানীরা তাঁহার দক্ষতা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই অবাক মানিতেন। তিনি লক্ষণাবতীর 'ফতেহনামা'র কী যাদুই না প্রদর্শন করিয়াছেন।

সুলতান মুইয উদ্দিনের রাজত্বের শেষ কাল বর্ণনায় আবার ফিরিয়া আসিতেছি। সুলতান অযোধ্যা হইতে দিল্লীতে ফিরিবার কিছুকাল পরেই তাঁহার স্বাস্থ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিতা তাঁহাকে দুর্বল ও পীড়িত করিয়া তুলিল। এতদ্‌সত্বেও তিনি মালীক নিযাম উদ্দিনকে পিতার উপদেশ অনুযায়ী দূরে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, নিযাম উদ্দিনের স্থলে 'উমদাতুল মুলক' হইবার যোগ্য অন্য কেহ নাই এবং ইহার ফলে রাজ্যে আরও বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিতে পারে। তিনি সংক্ষেপে নিযাম উদ্দিনকে বলিলেন, তুমি মুলতানে গিয়া তথাকার বিধিব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত কর। নিযাম উদ্দিন বুঝিতে পারিলেন যে, সুলতানের পিতা তাহাকে দরবার হইতে দূরে পাঠাইবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি আরও ভয় পাইলেন যে, দূরে গেলে তাহার শত্রু সভাসদরা তাহাকে বিনাশ করিবার সমূহ সুযোগ লাভ করিবে। সুতরাং তিনি মুলতানে যাওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে সুলতানের সভাসদ ও বয়স্যগণ বুঝিয়া লইলেন যে, সুলতান নিযাম উদ্দিনকে শেষ করিয়া দিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন। তাহারা সহায় হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই কাজ শেষ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহারা সুলতানের নিকট নিযাম উদ্দিনকে বিষ দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল এবং যথা নির্দেশ লাভ করিয়া বিষ প্রয়োগ করিল। নিযাম উদ্দিন সেই দিনই মারা গেলেন। সমগ্র দিল্লীর অধিবাসীরা জানিতে পারিল যে, তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে।

মালীক নিযাম উদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সুলতান মুইয উদ্দিনের রাজত্বের অবশিষ্ট স্থায়িত্বও লোপ পাইল। মানুষ বেকার হইয়া পড়িল। শাহী মহলের লোকের মধ্যে কর্মশূন্যতা দেখা দেওয়ার ফলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। এই সময়ে সুলতান জালাল উদ্দিন সামানার নায়েব ও দরবারের মের জানদার ছিলেন।

সুলতান তাহাকে সামানা হইতে ডাকাইয়া আনিয়া আরজে মুমালেকের পদে নিযুক্ত এবং 'বরণ'-এর কেত্তাদারী তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তাঁহাকে 'সিয়াসত খান' উপাধিও দান করিলেন। মালীক ইতমার কছন বারবেক এবং মালীক ইতমার সুরখা উকিলে দর হইলেন। তাঁহারা উভয়ে সুলতান বলবনের দাস ছিলেন। শাহী মহলের কাজও সকলের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে প্রায় সকলেই শাহী মহলের সরদারী লাভ করিল। সুলতান বলবনের যে সকল দাস মালীক নিযামের প্রতি বিরূপ ছিল, তাহারাও এই সুযোগে সুলতান মুইয উদ্দিনের দরবারে স্থান লাভ করিল। ফলে শাহী মহলের কাজে নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হইল; কোথাও স্থিরতা বলিতে কিছু রহিল না।

এই সময়ে সুলতান মুইয উদ্দিন একান্তই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অর্ধাঙ্গ ও অঙ্গ শৈথিল্য ব্যাধিতে দিন দিন তাঁহার কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক সময় এমন অবস্থা হইত যে, তিনি কোন কাজ করিবার যোগ্য থাকিতেন না। মালীকদের মধ্যে প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; যাহাতে তাহারা রাজ্যের বিধিব্যবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন। কিন্তু সকলেই একপ্রকার মর্যাদার অধিকারী হওয়ার ফলে কাহারও পক্ষেই সমস্ত বিষয়ে আধিপত্য লাভ করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণেই কেহই বেপরোয়া হইয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং সুলতানের পীড়ার উপশম হইবার যখন আর কোন আশা রহিল না, তখন সুলতান বলবনের মালীক, আমীর, বিশিষ্ট সভাসদ, অশ্বারোহী সরদার ও দলপতিগণ একত্র হইয়া একমত হইলেন যে, তাহারা সুলতান মুইয উদ্দিনের নাবালক পুত্রকে আনিয়া শাহী তখতে বসাইবেন এবং একজন নায়েব থাকিয়া রাজ্যশাসন পরিচালনা করিবেন। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাজ্য যেন সুলতান বলবনের বংশেই থাকে। অন্যথায় উহা অন্য জাতি বা বংশের হাতে চলিয়া যাইবে এবং তুর্কীদের হাত হইতে শাসন ক্ষমতা বিদায় লইবে। অতএব এই ঐক্যমত অনুসারে তাহারা সুলতান মুইয উদ্দিনের পুত্রকে শাহী মহল হইতে আনিয়া সুলতান শামস উদ্দিন উপাধি প্রদান করতঃ যথারীতি তখতে বসাইলেন। সুলতান বলবনের মালিক ও সভাসদ তাঁহার সহায় হইলেন। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, পদ ও কেতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। শাহী পরিবারের সকলকে নাসিরী প্রাঙ্গণে আনা হইল এবং সুলতানও এই স্থানে আসিলেন। সকল মালীক ও আমীর আসিয়া চতুর্দিকে জড় হইলেন। অন্যদিকে সুলতান মুইয উদ্দিনকে কেলুখড়ি প্রাসাদে রাখিয়া যথারীতি তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল।

আরযে মুমালেক সুলতান জালাল উদ্দিন এই সময়ে তাঁহার সৈন্যদল ও আত্মীয়-স্বজনসহ বিজারপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি যথারীতি সৈন্যদল সম্পর্কে অনুসন্ধান লইলেন এবং তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি শেষ করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভিন্ন জাতির লোক ছিলেন বলিয়া তুর্কীদের সহিত তাঁহার কোন সদ্ভাব ছিল না এবং তুর্কীরাও তাঁহাকে নিজের লোক বলিয়া মনে করিত না। ইতামর কছন বারবেক ও ইতামর সুরখা উকিলেদর একমত হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে যে কয়জন মালীক নূতন সুলতানের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে উদাসীন রহিয়াছে, তাহারা যে সুলতান জালাল উদ্দিনের প্ররোচনাতেই এই ব্যবহার করিতেছে, তাহা সকলের মধ্যে রটাইয়া দিলেন। এই রটনা শুনিয়াই সুলতান জালাল উদ্দিন হুশিয়ার হইয়া উঠিলেন এবং সকল খিলজী মালীককে একত্র হইতে আদেশ দিলেন। তিনি বিহারপুরেই সৈন্য শিবির স্থাপন করিলেন। কতিপয় বিশিষ্ট আমীরও তাঁহার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন। ইতামর কছন কিছু সংখ্যক সৈন্য লইয়া বিহারপুরে গেলেন, যাহাতে সুলতান জালাল উদ্দীনকে ফাঁকি দিয়া দিল্লীতে আনিতে পারেন এবং সুলতান শামস উদ্দিনের মহলে আনিয়া তাঁহার কাজ শেষ করিয়া দেওয়া যায়। সুলতান জালাল উদ্দিন সব কিছুই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; এই জন্যই তিনি সতর্ক হইয়া রহিলেন এবং ইতামর কছন তাঁহার সম্মুখে পৌঁছা মাত্রই ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার গলায় তরবারি চালাইয়া দিলেন। সুলতান জালাল উদ্দিনের পুত্ররাও বীরত্বে সিংহতুল্য ছিলেন। তাহারা জনপঞ্চাশেক সৈন্য লইয়া প্রকাশ্যে শাহী মহলে পৌঁছিলেন এবং সুলতান মুইয উদ্দিনের পুত্রকে তখত হইতে নামাইয়া তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইতামর সুরখাও নূতন সুলতানের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আহত করা হইল। মালীকুল উমারার পুত্ররা তাহাকে বিহারপুরে লইয়া গেল এবং কয়েদ করিয়া রাখিল। শহরের সর্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল এবং আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা শহরের বারটি সিংহদ্বার দিয়া সুলতান মুইয উদ্দিনের পুত্রের সাহায্যার্থে বাহিরে আসিতে লাগিল ও বিহারপুরের দিকেও যাত্রা করিল। শহরের সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট খিলজীদের আধিপত্য অসহ্য বলিয়া বোধ হইল এবং তাহারা সুলতান জালাল উদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া উঠিল। কিন্তু কতোয়াল নিজ পুত্রদের সাহায্যে শহরের হৈ চৈ অনেক পরিমাণে শান্ত করিলেন এবং বাহিরে গমনকারী শহরবাসীদেরকেও ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন। অবশিষ্ট লোকজনের একটি বিরাট মিছিল বাদাউনের সিংহদ্বারে পৌঁছিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তুর্কীদের বহু আমীর ও মালীক সুলতান জালাল উদ্দিনের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইব

এবং সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। অন্যদিকে খিলজীদের দল ক্রমশ: ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই ঘটনার দুই দিন পরে সুলতান জালাল উদ্দিন সুলতান মুইয উদ্দিনকে হত্যা করিবার জন্য একজন মালীককে কেলুখড়িতে পাঠাইলেন। উক্ত মালীকের পিতাকে সুলতান মুইয উদ্দিন হত্যা করিয়াছিলেন। সে কেলুখড়িতে পৌছিয়া মুমূর্ষু সুলতানকে কিছু লাথি গুঁতা দিয়া যমুনা নদীতে ভাসাইয়া দিল। মালীক গজ্জু ছিলেন সুলতান বলবনের ভাতিজা ও উত্তরাধিকারী; তাহাকে কোড়ের জায়গীর প্রদান করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পরে বন্ধু ও শত্রু সকলেই সুলতান জালাল উদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। বহু লোক-লস্কর সহ সুলতান বিহারপুর হইতে কেলুখড়িতে সুলতান মুইয উদ্দিনের মহলে পৌছিলেন। এই স্থলে শাহী তখতে বসিলেন এবং রাজ্যের সৌন্দর্য শোভা বাড়াইতে, দায়িত্ব ও পদ বণ্টন করিতে ও আত্মীয়-স্বজনকে নিজের নিকটে আনিতে সচেষ্ট হইলেন। দিল্লীর সর্বসাধারণ লোকের নিকট তাঁহার এই বাদশাহী অসহ্য মনে হওয়ায় তিনি সেখানে যাইতে ভয় পাইলেন ও বিলম্ব করিলেন। সেখানে গিয়া দিল্লীর শাহী মহলে প্রাচীন প্রথামত শাহী তখতে উপবেশনের লোভ আপাতত: তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল। কিছুদিন তিনি যেমন শহরে গেলেন না, তেমনি শহরবাসীরাও আন্তরিকতার সহিত তাঁহাকে মোবারকবাদ জানাইবার জন্য কেলুখড়িতে আসিল না। শহরের খিলজী মালীকগণ এই সময়ে খুবই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সাধারণ মানুষ তাহাদিগকে আমলে আনিত না। কারণ তখনও দিল্লীতে প্রচুর প্রাচীন সৈন্য, অশ্বারোহী ও তুর্কী বংশীয় লোক বাস করিত। কিন্তু সুলতান মুইয উদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে বাদশাহী খিলজীদের হাতে চলিয়া গিয়াছিল।

'বল, হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ, তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর; যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা কর, রাজ্য ছিনাইয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দাও, যাহাকে ইচ্ছা হয় অসম্মানিত কর; তোমার হস্তেই সমুদয় কল্যাণ; অবশ্যই তুমি সর্ব-বিষয়ে সক্ষম।'

চক্ষুষ্মানদের জন্য ইহাতে যথেষ্ট উপদেশ বিদ্যমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাহা বিদ্যমান থাকিবে।

"আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওস্‌সালাতু
আলা রসুলিহি মুহম্মদিও ও আলিহি আজমাঈন
ও সল্লম তসলীমান কসীরান কসীরা।"

সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরুজশাহী খিলজী

কাজী সদরে জাহান জিয়া উদ্দিন সাবী ; খানখানান—জ্যেষ্ঠ শাহজাদা ; আরকলি খান—মধ্যম শাহজাদা ; কদর খান—কনিষ্ঠ শাহজাদা ; ইয়াগরশ খান—সুলতানের ভাই ; শায়েস্তা খান—খানখানের পুত্র ; খাজা জাহান—খাজা খতীর ; মালীক কুতুব উদ্দিন—সৈয়দ মালীক ; মালীক আখবার উদ্দিন খোরম—উকিলে দর ; মালীক আহমদ চপ—নায়েব বারবেক ; মালীক ফখর উদ্দিন কুচী—দাদবেক। মালীক আলাউদ্দিন কেরশাক ; মালীক—ভাতিজা ও জামাতা ; মালীক মুইয উদ্দিন আলমাস বেগ—আখোর বেক ; মালীক তাজ উদ্দিন খুর্রামী ; মালীক কামাল উদ্দিন আবুল মুআলী ; মালীক নসরত জিনাহ—সের দোয়াতদার ; মালীক নসর উদ্দিন কহরামী—খাস হাজেব : মালীক আইন উদ্দিন আলিশা কুহে খোদী ; মালীক ইমাদ উদ্দিন—মিসকাল ; মালীক সাদ উদ্দিন—আমীর শহর ; মালীক আমীর আলী দেওয়ানা ; মালীক আমীর কেলান ; মালীক আমীর মুহম্মদ—আমীর কেলানের ভাই ; মালীক সানার খিলজী ; মালীক উসমান আমীর—আখোর বেক ; মালীক উমর সুরখা ; মালীক আবাহী—আমীর আহোয়াঘ ; মালীক হরিণমার—আমীর শিকার ; মালীক সুনজ—সের জানদার ; মালীক তুরসী—সের জানদার ; মালীক তাজু—সের সিলাহদার ; মালীক আলগচী—কেতাদার কোল ; মালীক নসির উদ্দিন—রানা সাহানা পীল ; মালীক মুইয উদ্দিন আলবী ; মালীক তাজ উদ্দিন আলবী—কেতাদার আস্ত্রহা ; মালীক জালাল উদ্দিন আলবী : মালীক নিযাম উদ্দিন—খরিতা-দার : মালীক কিরাণ—আমীর মজলিশ ; মালীক মইদ উদ্দীন জাজরী : মালীক সাদ উদ্দিন মন্তেকী ; মালীক তাজ উদ্দিন—যর শহরী।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ও আকিবাতু
লিল মুত্তাকীন ওস্‌সালাতু আলা রসুলিহি মহম্মদিও
ও আলা আলিহি আজমাঈন।

অতঃপর মুসলমানদের দোয়া প্রার্থী আমি জিয়া বারাণী বলিতেছি যে, আমি এই তারিখের শেষ পর্যন্ত খিলজী ও আলাই বংশীয় সুলতানদের যে সমস্ত কীর্তি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি, তাহা আমার অভিজ্ঞতা জাত।

৬৮৮ হিজরীতে* সুলতান জালাল উদ্দিন কেলুখড়ির প্রাসাদে শাহী তখতে উপবেশন করেন। সুদীর্ঘ আশি বৎসর যাবৎ শহরের অধিবাসীরা তুর্কীদের শাসনা-মলে থাকিবার ফলে খিলজীদের এই আধিপত্য তাহাদের নিকট সহজে গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় নাই। এই কারণে সুলতান জালাল উদ্দিন কিছুকাল শহরে প্রবেশ করেন নাই। কিন্তু শহরের সরদার শ্রেণীর বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য লোক, আলেম ফাজেল এবং সকল গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ, যাহারা ঐ সময়ে শহরের সমুদয় অঞ্চলে

* শুদ্ধ ৬৮৯ হিজরী। 'মেফতাহুল ফতুহ' গ্রন্থে আমীর খসরু বলেন, (অর্থ) ছয় শত উনান্নব্বই হিজরীর জমাদিউল উখরা মাসের তিন তারিখে সুর্যোদয়ের তিন ঘণ্টা পর চাশতের সময়ে শুভক্ষণে।

ছড়াইয়া ছিলেন, তাহারা সকলেই ক্রমশ: আসিয়া সুলতান জালাল উদ্দিনের হাতে বয়েত করিলেন এবং পোশাকাদি পাইলেন। এইভাবে রাজত্বের প্রথম দিকে শহরের সম্ভ্রান্ত লোক, সৈন্যদল ও বাজার অঞ্চলের অধিবাসীরা দলে দলে কেলু-খড়ির প্রাসাদে উপস্থিত হইতেন, সুলতান জালাল উদ্দিনের জাঁকজমক দেখিতেন এবং আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেন যে, কী উপায়ে খিলজীরা তুর্কীদের হাত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে। কেমন করিয়া তুর্কীদের অধিকার অন্যদের হাতে চলিয়া গিয়াছে।

সুলতান জালাল উদ্দিন শহরের ভিতরে না গিয়া কেলুখড়িতেই রাজধানী নির্মাণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন এবং এখানেই বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই উদ্দেশ্যেই সুলতান মুইয উদ্দিনের নির্মিত কেলু-খড়ির প্রাসাদকে সম্পূর্ণ করিয়া নানাবিধ নকশার দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন। প্রাসাদের সম্মুখে যমুনার তীরে একটি উদ্যান নির্মাণ করাইলেন। সুলতান মালীক, আমীর, সরদার ও শহরের বিশিষ্ট লোকদিগকে কেলুখড়িতে আসিয়া অট্টালিকা ও গৃহাদি নির্মাণের আদেশ দিলেন। শহর হইতে বহু বাজারী লোককেও আনাইলেন। এইভাবে কেলুখড়ির বাজার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেলু-খড়িকে 'নতুন শহর' নামকরণ করিয়া ইহার চতুর্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীরের ব্যবস্থা করিলেন। মালীক ও আমীরদের জন্য গৃহাদির ব্যবস্থা করা হইল এবং নূতন নির্মিত অট্টালিকাও তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইল। চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ গম্বুজ শোভা পাইতে লাগিল। আমীর খসরু কেলুখড়ির প্রশংসায় বলিয়াছেন,

বাদশাহ নতুন শহরে প্রাচীর তৈয়ার করাইলেন,
যাহার খিলানের উচ্চতা চাঁদকে গিয়া স্পর্শ করিল।

এই শহরে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অট্টালিকাদি নির্মাণ করাইতে যদিও কিছুটা বেগ পাইতে হইয়াছিল, তথাপি সুলতান এইস্থানে বাস করিবেন বলিয়া চতুর্দিকেই লোকে পূর্ণ হইতে লাগিল এবং বাজার ও গলি লোকজনের দ্বারা ভরিয়া গেল।

শাহী তখতে বসিবার পর সুলতান জালাল উদ্দিন শহরের ভিতরে যান নাই। এইভাবেই কিছুকাল কাটিল। ইতোমধ্যে সুলতানের আমীর ও মালীকরা শক্তি-শালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুলতানের স্বভাব চরিত্র, দয়া-মায়া ও ন্যায়নিষ্ঠা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। সকল মন হইতেই ঘৃণা ও বিরূপ ভাব দূর হইয়া যাইতেছিল। সকল শ্রেণীর প্রজাই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কেতা ও জায়গীরের লোভে রাজ্যের যথার্থ সহায়কে পরিণত হইতেছিল। সুল-তান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 'খানখানান', মধ্যম পুত্রকে 'আরকলি খান' ও কনিষ্ঠ

পুত্রকে 'কদর খান' উপাধি প্রদান করিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রাসাদ ও দরবারের ব্যবস্থা করা হইল। সুলতানের ভাইকে 'ইয়াগরশ খান' উপাধি দিয়া আরজে মুমালেকের পদ তাহাকে অর্পণ করা হইল। সুলতান আলাউদ্দিন ও উলুগ খানকে যথাক্রমে আমীর তুযক ও আখোর বেক পদ দেওয়া হইল। তাহারা উভয়েই সুলতানের ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। এইভাবে রাজ্যের সহায়কদের পদাদি সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মালীক কুতুব উদ্দিন কাথুলী, মালীক আহমদ চপ নায়েব বারবেক, মালীক খোরম উকিলে দর, মালীক তাজ উদ্দিন কুচী, মালীক কামাল উদ্দিন আবুল মুআলী, মালীক নাসির উদ্দিন খুর্রামী, মালীক নসরত সাবাহ, মালীক ফখর উদ্দিন, তাহার ভাই মালীক তাজ উদ্দিন কুচী, মালীক সুনজ, মালীক তাজ উদ্দিন খুর্রামী, মালীক তুরগী, মালীক আমীর কেলান, মালীক আমীর আলী দেওয়ানা, মালীক আবাহী, মালীক হরিণমার, মালীক কীর প্রমুখ মালীকদের প্রত্যেকেই প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী হইয়া, সময়ের ভালমন্দ দেখিয়া এবং বহু রাজ্যের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিয়া বহুতর মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দ্বারা মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করিলেন এবং সর্ববিধ ক্ষমতা সহ জালালী সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তিতে পরিগণিত হইলেন। বড় বড় পদমর্যাদা ও বিরাট বিরাট জায়গীর লাভ করিলেন। প্রসিদ্ধ খাজা খতীর উজির নিযুক্ত হইলেন। বহু দিনের অভিজ্ঞ মালীকুল উমারা শহর কতোয়ালের পদ লাভ করিলেন। সর্বসাধারণের মধ্যে শান্তি ও স্থিরতা দেখা দিল।

এইভাবে যখন শাহী দরবার মালীক, আমীর, বিশিষ্ট ও সম্রান্ত লোকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইল, তখন সুলতান জালাল উদ্দিন তাঁহার সকল মালীক, আমীর, সভাসদ, সৈন্যদল, চাকর নফর প্রভৃতি সহ শাহী ধুমধামের সহিত শহরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রাসাদে উপনীত হইয়া দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করিলেন। অতঃপর যথারীতি পূর্ববর্তী সম্রাটদের তখতে উপবেশন করিলেন। এই অবস্থায় মালীক ও আমীরদেরকে আরও নিকটে ডাকিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, আমি কী বলিয়া আল্লাহ্‌তালার শোকরিয়া আদায় করিব ; যে তখতের সম্মুখে মাথা নত করিয়া হুকুম তামিল করিয়াছি, তাহাতেই আজ পা রাখিয়া বসিতে পারিয়াছি এবং যথার্থই বাদশাহ হইয়াছি। যে সকল বন্ধুবান্ধব, তাশখন্দী খাজা ও সমবয়সীদের সঙ্গে শাহী খেদমত করিয়াছি, তাহারা আজ আমার সম্মুখে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান।

এই বলিয়া সুলতান প্রাসাদ হইতে অশ্বারোহণ করিয়া 'কওশকে লাল' নামক প্রাসাদে আসিলেন এবং সেখানে পূর্বের নিয়মমত প্রবেশ পথে অশ্ব হইতে নামিয়া

পড়িলেন। মালীক আহমদ চপ নায়েব বারবেক ছিলেন সুলতান জালাল উদ্দিনের মালীকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অদ্ভুত ধরনের বিচক্ষণতা ছিল। তিনি এই সময়ে নিবেদন করিলেন যে, এই প্রাসাদের মালীক সুলতান নিজে; সুতরাং ইহার প্রবেশ পথে সুলতানের নামিয়া পড়িবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুলতান বলিলেন, হে আহমদ, যে প্রাসাদ আমার পিতা ও পিতামহ তৈয়ার করাইয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহাদের সম্পত্তি ছিল, প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাসাদকে আমার নিজের বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু এই প্রাসাদ আসলে সুলতান বলবনের; তিনি 'খান' থাকা অবস্থায় ইহা তৈয়ার করান এবং যথার্থই তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের সম্পত্তি। আমি ইহা জোর করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছি। মালীক আহমদ পুনরায় বলিলেন, রাজ্যশাসনের ব্যাপারে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ও অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নহে। সুলতান তাহাকে বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমিও জানি। কিন্তু কী করিব, সামান্য কয়েক দিনের প্রয়োজনে আমি ইসলামের হুকুম অমান্য করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং আমার বিশ্বাসের বিপরীত কার্য করিয়াছি। তুমি জান যে, আমার বাপ-দাদাদের কেহ বাদশাহ ছিলেন না; সুতরাং বাদশাহী গর্ব ও অহংকার আমি তাহাদের নিকট হইতে ওয়ারীশ সূত্রে লাভ করি নাই। এইখানে আসামাত্র আমার ধারণা হইল যে, সুলতান বলবন এখনও এই প্রাসাদের ভিতরে বসিয়া আছেন এবং আমি তাঁহার সম্মুখে যাইতেছি। এই প্রাসাদে আমি বহুদিন তাঁহার খেদমত করিয়াছি; সে কথা আমার এখনও মনে হয় এবং আমি তাঁহার ভয় ও জাঁকজমকের কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই। এই বলিয়া সুলতান জালাল উদ্দিন পদব্রজে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং অহংকারী বিচক্ষণ মালীক আহমদ চপকে অনুরূপ উত্তর দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পর সুলতান জালাল উদ্দিন যে সকল স্থানে সুলতান বলবনের খেদমত করিয়াছিলেন, সে সকল স্থানে যথাপূর্বং সম্মান দেখাইলেন; কোথাও বসিলেন না। অতঃপর উক্ত স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মালীকদের বসিবার স্থানে বসিলেন এবং কাহারও সহিত কোন কথা বলিবার পূর্বে নিজ পাগড়ীর শামলায় মুখ ঢাকিয়া খুব করিয়া কাঁদিলেন। উপস্থিত মালীক ও আমীরদিগকে বলিলেন, বাদশাহীর সমস্তটুকুই ছলনা ও জাঁকজমক। বাহিরে সুন্দর হইলেও ইহার অভ্যন্তরভাগ দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত। ইতামর কছন ও ইতামর সুরখার সহায়-সম্পদ কিভাবে নষ্ট হইয়া গেল। আমাকে তাহারা হত্যা করিবে এই ভয়ে আমি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছি। আমি বহু বৎসর

আমীর ও মালীক হিসাবে কাটাইয়াছি ; সর্বদা আরাম-আয়েশ করিয়াছি। আজ বৃদ্ধ বয়সে এই চিন্তাই করিতেছি যে, সুলতান বলবন, যিনি চল্লিশ বৎসর খান ও বাদশাহ হিসাবে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, যাহার উপযুক্ত পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, মালীক ও গোলামবাঁদী এবং তদুপরি অতুলনীয় প্রভাব জাঁকজমক ছিল, তাহাদের সকলেই আজ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সহায়ক ও প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু ও মিত্র কাহারও কোন চিহ্ন এই রাজ্যের মধ্যে দেখা যায় না। তিন বৎসর অথবা উহার বেশী হয় নাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার পৌত্র সিংহাসনে বসিয়াছে। এই সময়ে আমি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি, তাঁহার অনুগামীদের সংখ্যা একান্তই বিরল এবং তাঁহার সেই জাঁকজমকের চিহ্নমাত্রও নাই। আমরা, যাহারা তাঁহার গোলাম ছিলাম, আমাদের পক্ষে তেমন দক্ষ আমীর ও মালীক লাভ করা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে ? সৈন্য-সামন্ত সহ তেমন বিশ্বস্ত কেহই আমাদের রাজ্যের সহায়ক পাত্রেমিত্রে পরিণত হইবে না ! তদুপরি এমন পরাক্রমশালী, সার্থক ও অমায়িক বাদশাহেরই যখন বাদশাহী থাকিল না, তাঁহার পুত্ররাও যখন তাহা রক্ষা করিতে পারিল না ; তখন আমাদের নিকট উহা কিভাবে থাকিবে ও আমাদের পুত্র পৌত্রদের নিকটেই বা উহা কিভাবে পৌছিবে ? আমি এই ক্ষণস্থায়ী হট্টগোলের প্রকৃত অবস্থা জানা সত্ত্বেও সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় নিজেকে, নিজ পুত্র-পরিজন ও অনুগামীদিগকে বাদশাহীর প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করিতে দিয়াছি ; কিন্তু এখনও পরিপূর্ণ বাদশাহ হইতে পারি নাই। বরং প্রতিপদে নিজেকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে বিপদের সম্মুখীন করিতেছি ও ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছি।

সুলতান জালাল উদ্দিন উপস্থিত সকলকে এই সকল কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অভিজ্ঞ আমীর উপস্থিত ছিলেন। সুলতানের এবংবিধ কথায় তাহাদেরও কান্না আসিল। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বয়সে নবীন ও নূতন পদমর্যাদার অধিকারী ; তাহাদের নিকট সুলতানের এই প্রকার কথা খুব ভাল বলিয়া মনে হইল না। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, বাদশাহীর অর্থই হইতেছে শাসন ও ত্রাসন ; 'আমিই উপযুক্ত, অন্য কেহ নহে'—এই ভাব মনে না থাকিলে বাদশাহী করা যায় না। বস্তুত: রাজ্যশাসন সুলতান জালাল উদ্দিনের ন্যায় লোকের কর্ম নহে। কারণ তিনি আরম্ভেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। সবে শুরু—এখনই রাজ্যের অন্তিম চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। শাসন ও ত্রাসন ইত্যাদির ব্যাপারে যেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে এইরূপ লোকের দ্বারা কিছুই হওয়া সম্ভব

নহে। অবশ্য শহরের বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা সকল ব্যক্তিই সুলতানের এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন, তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁহার রাজ্যের সহায়কে পরিণত হইলেন।

সুলতান জালাল উদ্দিন সেই দিনই বিকালে কেলুখড়ির প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

তারিখের লেখক হিসাবে আমার এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সুলতান জালাল উদ্দিনের ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্মিকতা ও বিশ্বাস তারিখে ফিরুজশাহীর সকল পাঠকের সম্মুকে সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরা এবং তাহাদিগকে এই কথাও জানাইয়া দেওয়া যে, সেই সময় দিল্লী শহর বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত, প্রাচীন বংশের লোক প্রাচীন সৈন্যদল ও কর্মদক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত ও পরিপূর্ণ ছিল যে, সুলতান বহুদিন যাবত তাহাদের বিরোধিতার ভয়ে শহরের অভ্যন্তরে পদার্পণ করেন নাই।

তখতে বসিবার বৎসর সুলতান জালাল উদ্দিন কেলুখড়িতেই রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং ইহার উন্নতি ও সভাসদ সহায়কদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহাদের মধ্যে জায়গীর ইত্যাদি বন্টনে সচেষ্ট রহিলেন। দ্বিতীয় বৎসর সুলতান বলবনের ভাতিজা মালীক সজু কোড়াতে ছত্র ধারণ করিয়া নিজ নামে খোতবা পাঠের ব্যবস্থা করিলেন। সুলতান বলবনের দাসপুত্র আমীর আলী সেরজানদার, যাহাকে হাতেম খান বলিয়া ডাকা হইত, তিনিও তাহার মিত্র হইয়া পড়িলেন। এমন অনেক বলবনী আমীর, যাহারা হিন্দুস্তানের দিকে দিকে কেতাদার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাহারাও মালীক সজুর পক্ষে যোগ দিলেন। মালীক সজু সুলতান মুগীস উদ্দিন নাম ধারণ করিয়া সমগ্র হিন্দুস্তানে তাঁহার নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার আশেপাশে বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য একত্র হইল। তিনি বহু সংখ্যক পদাতিক সহ, দিল্লীর অধিবাসীরা তাহার পক্ষাবলম্বন করিবে—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া দিল্লীর দিকে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। তাহার চাচার রাজ্য উদ্ধারের লোভে শহরের দিকে অগ্রসর হইলে, শহরের বহু সংখ্যক অধিবাসী এবং শহরতলী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু লোক, যাহারা পুরুষানুক্রমে সুলতান বলবনের চাকুরী করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই মনে মনে মালীক সজুর আগমন সংবাদ শুনিয়া তাহার মিত্র হইয়া পড়িলেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে আরম্ভ করিলেন যে, বলবনী সাম্রাজ্যে প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও তখতের আসল ওয়ারিশ মালীক সজু। কারণ তিনি সুলতান বলবনের সাক্ষাৎ ভাতিজা। খিলজীদের দিল্লীতে কোন আত্মীয়তা বা অন্য প্রকার দাবী নাই।

কোন খিলজী কখনও বাদশাহ ছিল না। সুলতান জালাল উদ্দিন বলবনের পুত্রদের নিকট হইতে এই রাজ্য জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছেন।

অন্যদিকে সুলতান জালাল উদ্দিন তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক অনুগত আমীর, লোকজন ও বিশ্বস্ত সৈন্যদল সহ কেলুখড়ি হইতে বাহিরে আসিলেন এবং মালীক সজুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হইলেন। বাদাউনে পৌঁছিবার পর আপন মধ্যম পুত্র আরকলি খানকে অগ্রগামী লশকরের সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। এই মধ্যম পুত্র তৎকালীন যুদ্ধবাজ বীরদের অন্যতম ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র খান খানানকে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লীতে পাঠাইলেন। আরকলি খান নিজ সৈন্যসহ সুলতানের সৈন্যদলের প্রায় দশবার ক্রোশ অগ্রে গমন করিলেন। সুলতান জালাল উদ্দিন বাদাউনে থাকিতেই আরকলি খান 'কালাইব' নগরের জলাভূমি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন।

মালীক সজুর সৈন্যদলের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রচুর। উহাতে হিন্দুস্তানী রায় ও পাইক সৈন্যরা পিপীলিকা ও পঙ্গপালের ন্যায় একত্র হইয়াছিল। তাহারা মালীক সজুর সম্মুখে 'পান' দেখাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সুলতান জালাল উদ্দিনের সৈন্যদলকে তাহারা মারিয়া হটাইয়া দিবে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত শিবিরে বসিয়া এই পান খাইবে। দুই লশকর পরস্পরের সম্মুখীন হইলে সুলতান জালাল উদ্দিনের অগ্রগামী সৈন্যরা বিপক্ষীয়দিগের উপর তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। হিন্দুস্তানী সৈন্যরা ইতোমধ্যে পানিতে ভিজিয়া, মাছু ও কহোয়ার শরাব খাইয়া শিথিল দেহ হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা কিছুক্ষণ হৈ চৈ করিল এবং হাত পা ছাড়িয়া দিল। সুলতান জালাল উদ্দিনের অগ্রগামী সৈন্য-দলের সিংহতুল্য বীররা এইবার তলোয়ার খুলিয়া মালীক সজুর সৈন্যদলের আক্রমণ করিল। মালীক সজু যে সমস্ত আমীর ও হিন্দুস্তানী সৈন্যকে সম্মুখের সারিতে দাঁড় করাইয়াছিলেন, তাহারা এই তীব্র আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। মালীক সজুও পলায়ন করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈন্যদের হাতে ধরা পড়িলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সুলতান জালাল উদ্দিনের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করা হইল। মালীক সজুর সকল আমীর এবং হিন্দুস্তানী রায় ও পাইক সৈন্যরাও অগ্রগামী সৈন্যদের হাতে কয়েদ হইল। আরকলি খান তাহাদের গলায় দুভালার সহিত শিকল পরাইয়া সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সুলতান জালাল উদ্দিন তখন সৈন্যদল সহ উক্ত মঞ্জিলে গিয়া পৌঁছিলেন।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি সুলতান জালাল উদ্দিনের ঘনিষ্ঠ সভাসদ আমীর খসরুর নিকট হইতে শুনিয়াছি যে বিদ্রোহী মালীক ও আমীরদিগকে

সুলতান জালাল উদ্দিনের নিকট পাঠাইলে তিনি আম দরবারের ব্যবস্থা করিলেন। সুলতান দরবারে 'মোদা'র বসাইয়াছিলেন এবং আমীর খসরু তাঁহার পার্শেই দাঁড়াইয়াছিলেন। সুলতানের সম্মুখে মালীক আমীর আলী শের জানদার, মালীক তুরগীর পুত্র মালীক আলগচী, মালীক তাজুদ্দর, মালীক আহজন ও অন্যান্য বিশিষ্ট আমীরদিগকে উপস্থিত করা হইল। তাহাদের গলায় দুভালা, হাত বাঁধা, জামা-কাপড় ছিঁড়া ও মাথায় মুখে ধূলিবালিতে একাকার অবস্থায় উটের পিঠে চড়াইয়া আনা হইয়াছিল। তাহাদের পাহারাদার সৈন্যদের ইচ্ছা ছিল অন্যান্য বন্দীদের ন্যায় তাহাদিগকেও সুলতানী সৈন্যদলের সম্মুখে লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের মুখের উপর সুলতানের দৃষ্টি পড়া মাত্র তিনি তাঁহার পাগড়ী মুখের উপর রাখিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, হায় হায়, এ কী হইল! তিনি তৎক্ষণাৎ বিশিষ্ট মালীক ও আমীরদিগকে উট হইতে নামাইয়া আনিয়া তাহাদের গলার দুভালা ও হাতের বাঁধন খুলিয়া দিতে বলিলেন। কয়েদী সৈন্যদের মধ্যে যাহারা সুলতান বলবনের সময়ে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাদিগকেও পৃথক করিয়া পৃথক স্থানে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। সুলতানের নিজস্ব চাকর নফররা তাহাদিগকে গোসল করাইয়া মাথায় ও গায়ে যথারীতি আতর মাখাইয়া শাহী পোশাক পরিধান করাইল। অতঃপর সুলতান খাস দরবারের ব্যবস্থা করিয়া সেখানে পানাহারের আয়োজন করিলেন এবং এই সকল কয়েদী আমীরকে সেখানে উপস্থিত করিতে আদেশ দিলেন। তাহাদিগকে সুলতান নিজের সহিত শরাব পানের এই যে সুযোগ দিলেন, ইহাতে তাহারা এমনই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, শরাব পানের বেলায় তাহারা সর্বদাই লজ্জায় মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং কোন কথা বলিতে সক্ষম হইলেন না। সুলতান তাহাদের সহিত কথা বলিতেন এবং তাহাদের প্রতি অতিশয় সহৃদয় ব্যবহার করিলেন। তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তোমরা কোন নিমক হারামীর কাজ কর নাই; বরং আশ্রয়দাতাদের পক্ষে যুদ্ধে নামিয়া তোমরা নিমক হালালীরই পরিচয় দিয়াছ।

সুলতান জালাল উদ্দিন বন্দী আমীরদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, খিলজী আমীরদের নিকট তাহা ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, সুলতান বাদশাহীর নিয়ম-কানুন জানেন না। এই জন্যই বিদ্রোহী আমীরদিগকে নিজের বন্ধু বলিয়া তুলিতে চাহিতে-ছেন। মালীক আহমদ চপ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, নায়েব আমীর হাজেব ও সুলতানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তিনি সেই দিনই সুলতানকে বলিলেন যে, সুলতানের জন্য বাদশাহী নিয়ম-কানুন মানিয়া চলা একান্তই প্রয়োজনীয়। নতুবা

যে মালিকী পদে তিনি অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন, উহাতেই তাঁহার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। জাঁহাপানা এই সকল হত্যার যোগ্য বন্দীদিগের প্রতি যে ভাবে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদিগকে সাথী বানাইয়া একসাথে শরাব পানের সুযোগ দিয়াছেন এবং যেভাবে তাহাদের হাতের বন্ধন খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা উচিত হয় নাই। যাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া দরকার তাহাদিগকে আপনি মুক্তি দিয়াছেন। যে মালীক সজুর নামে বেশ কিছুদিন এই দেশে খোতবা ও মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল, তাহাকে পালকী যোগে মুলতান পাঠাইয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহার চাহিদা অনুসারে আহার ও পোশাকের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন। রাজ্যশাসনের দিক হইতে তাহারা যে ধরনের গুরুতর অন্যায় করিয়াছে, উহার জন্য শাস্তি না দিয়া যদি তাহাদের প্রতি এইরূপ দয়া প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে অন্যান্য লোক কেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে না। তদুপরি তাহারা বাদশাহের শাস্তি ও শাসনের পরিচয়ই বা কিরূপে পাইবে এবং তাহা হইতে শিক্ষা লাভই বা কিভাবে করিবে? জাঁহাপানা সুলতান বলবনের শাস্তি ও শাসনের কথা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান নাই। এই প্রকার বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি কী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন এবং কিভাবে তাহাদের রক্তপাত করিতেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা যদি তাহাদের হাতে পড়িতাম, তাহা হইলে তাহারা খিলজীদের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক হইতে মুছিয়া ফেলিত।

সুলতান জালাল উদ্দিন আহমদ চপের এই সকল কথার উত্তরে বলিলেন, হে আহমদ, তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা আমিও জানি এবং বিদ্রোহের ব্যাপারে বাদশাহের শাস্তিদানের বহু ঘটনা আমি পূর্বেও দেখিয়াছি। কিন্তু কী করিব; আমি ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি এবং মুসলমানদের রক্তপাত করিবার অভ্যাসও আমার নাই। আমার বয়স সত্তর ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কোন মুসলমানকে আমি হত্যা করি নাই। এখন এই বৃদ্ধাবস্থায় দুই দিনের রাজত্বের জন্য, যাহা অন্যদের জন্য চিরস্থায়ী হয় নাই এবং আমাদের জন্যও হইবে না, এমন এক সম্পদের জন্য ইসলামের নিয়ম-কানুন পদদলিত করিয়া কি এই আদেশ দিব যে, মুসলমানদিগকে বিনা দ্বিধায় হত্যা কর। আজ না হয় আমি এই আদেশ দিয়া রক্ষা পাইলাম; কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন খোদার সম্মুখে আমি ইহার কি কৈফিয়ৎ দিব? যদি আমরা তাহাদের হাতে বন্দী হইতাম এবং তাহারা মুসলমানীর তোয়াক্কা না করিয়া আমাদিগকে হত্যা করিত, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন তাহাদের নিকট এই কাজের কৈফিয়ৎ তলব করা হইত ও এই অপরাধে তাহারা দোজখে গমন করিত। এখন যেহেতু

খোদাতালা তাহাদের উপর আমাদিগকে জয়ী করিয়াছেন, কাজেই খোদাও এই জয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাহাদিগকে হত্যা না করিয়া মুক্তি দেওয়া দরকার। অবশ্য রাজ্যশাসন সম্পর্কে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কারণ রাজ্য চালনার জন্য মানুষ অত্যাচার অবিচারের পথ গ্রহণ করে এবং বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া দুনিয়ার বুক হইতে বিদ্রোহীদের চিহ্ন মুছিয়া ফেলে। কিন্তু আমি ধর্মের আওতায় বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আজ জীবনের সত্তর বৎসর পরে উহার অবমাননা করিতে পারি নাই এবং নিজেকে অত্যাচারী ও কঠোর করিয়া তুলিতে সমর্থ হই নাই। আমি বন্দী বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, আমি যেমন তাহাদের রক্তপাত করি নাই ও এমন গুরুতর অপরাধেও শাস্তি দেই নাই, তেমনি তাহারাও মানুষ, তাহারাও মুসলমান; খোদা ও মানুষের কাছে তাহারাও লজ্জিত ও কৃতজ্ঞ হইতে পারে। আমার মনে হয়, ইহার ফলে তাহারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিয়া আমার রাজ্যে কোনপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিবে না এবং আমার রাজ্য ছিনাইয়া লইতে সচেষ্ট হইবে না।

আহমদ চপকে এই প্রকার উত্তর দানের পর সুলতান তাহাকে আরও বলিলেন, হে আহমদ, নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখ, আমরা কেমন ধরনের বাদশাহ; আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কে কে বাদশাহ ছিলেন। বিগত দিনগুলিতে আমি আমার বড় ভাই মালীক শিহাব উদ্দিন দিল্লীতে সুলতান বলবনের চাকুরী করিয়াছি। তাঁহার অনুগ্রহের জন্য আমরা যথার্থই কৃতজ্ঞ। এই অবস্থায় ইহা কেমন ধরনের ইনসাফ হইবে যে, আমরা তাঁহার রাজ্যও গ্রহণ করিব এবং তাঁহার মালীক, আমীর পারিষদ ও অনুগামীদিগকে শাস্তিও দিব। হে আহমদ, জোয়ানির নেশায় ও দৌলতের আশায় বুদ্ধিহারা হওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। কারণ তোমার বয়স অধিক হয় নাই। কিন্তু তোমার পিতা, যাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি দেখিয়াছেন যে, আজ আমি যে সকল মালীক ও আমীরের গলা হইতে দুভানার বন্ধন মুক্ত করিয়া আমার সহিত একত্র বসিয়া শরাব পানের সুযোগ দিয়াছি, তাহারা সুলতান বলবনের সময় কিরূপ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং কেমন জাঁকজমকের সহিত চলিতেন। আমি ও আমার ভাই উভয়ে সুলতান বলবনের মহলে এই আশায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, যেন আমীর আলী সের জানদার আমাদের সালামের উত্তর দান করেন। আজ যে সকল মালীক ও আমীরের প্রতি আমি দয়া প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাদের অনেকেই সুলতান বলবন ও মুইয উদ্দিনের সময় দাওয়াত দিয়া আমাদিগকে তাহাদের গৃহে লইয়া গিয়াছেন এবং তাহারাও আমাদের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার খাতিরে আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। একত্রে শরাব পান ও আমোদ ফুর্তি করিয়াছি। আজ

যখন তাহারা জিঞ্জিরে বাঁধা কয়েদী অবস্থায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং আল্লাহ পাক আমাকে তাহাদের তুলনায় এমন এক মর্যাদার অধিকারী করিয়াছেন, তখন আমি কি তাহাদের অতীতের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণ না করিয়া পারি। আমি কি খোদাতালার ভয়ভীতিহীন নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের ন্যায় এই কথা বলিতে পারি যে, তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হউক। আমি মুসলমান এবং মুসলমানীতে বৃদ্ধ হইয়াছি; কাজেই মুসলমানদিগকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। সেই জন্যই আমি অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা প্রদান করিতে পারি নাই। আমার পুত্র, ভাতিজা এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যদি এই অত্যাচার করিতে ও নিষ্ঠুরতা দেখাইতে সমর্থ হয়, তবে তাহার হাতে আমি এই রাজ্য ত্যাগ করিতে রাজী আছি। সে নিজ ইচ্ছামত অহেতুক রক্তপাত করিতে পারিবে; কেহ তাহাকে বাধা দিতে আসিবে না। আমি মুলতান চলিয়া যাইব। শেরখান যেমন মোগলের সহিত জেহাদ করিয়াছে এবং তাহাদের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিয়াছে, আমিও তেমনি জেহাদ করিব। মোগলরা যাহাতে মুসলমানদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তেমন অবস্থা গড়িয়া তুলিব। যদি মুসলমানদের রক্তপাত ছাড়া বাদশাহী করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে আমি এই বাদশাহী ত্যাগ করিব। কারণ আমি কখনও মুসলমানের রক্তপাত করি নাই এবং করিতেও পারিব না। খোদার ভয় মন হইতে দূর করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

সুলতান জালাল উদ্দিন বাদাউন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মালীক সজুর বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভাতিজা, জামাতা ও পোষ্য সুলতান আলাউদ্দিনকে কোড়া অঞ্চলটি কেতা হিসাবে প্রদান করেন। মালীক সজুর যে সকল সঙ্গীকে সুলতান জালাল উদ্দিন ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাহারা সুলতান আলাউদ্দিনের চাকুরী লাভ করিয়া তাঁহার সহিত কোড়ায় গমন করে। সুলতান জালাল উদ্দিন এই সকল কর্মচারীর কাজকর্ম সম্পর্কে খবর লইবার পূর্বেই সেই বৎসর উহারা সুলতান আলাউদ্দিনকে প্ররোচিত করিয়া কোড়ায় প্রচুর সৈন্যের সমাবেশ ঘটাইতে উৎসাহ দেয়। ইহার দ্বারা দিল্লীকেও তিনি তাঁহার অধীনে আনিতে পারিবেন বলিয়া তাহারা আশ্বাস দিয়াছিল। তাহারা আরও বলিয়াছিল যে, মালীক সুজুর যদি প্রচুর ধনসম্পদ থাকিত, তাহা হইলে দিল্লীর বাদশাহী তাহার হাতেই পড়িত। কাজেই কোনপ্রকারে প্রচুর সম্পদ হস্তগত করিতে পারিলে দিল্লী জয় করা খুবই সহজ। সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার শাশুড়ী, সুলতান জালাল উদ্দিনের বেগম মালেকা জাহানের ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রীর ব্যবহারও খুব সন্তোষজনক ছিল না। ইহার

ফলে অনেক সময় তিনি এই সবকিছু ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া যাইবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। এই প্রকার মানসিক অবস্থায় বিদ্রোহীদের এই প্ররোচনা তাঁহার মনে সম্রাট হওয়ার বাসনা জাগাইয়া তুলিল। ফলে কোড়ায় শাসক নিযুক্ত হওয়ার সময় হইতেই তিনি এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন এবং এমন একটি স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, যেখানে প্রচুর ধনরত্ন পাওয়া সম্ভব।

সুলতান জালাল উদ্দিন বাদাউন হইতে কেলুখড়িতে ফিরিয়া এবং সুলতান বলবনের ওয়ারিশদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া এমনভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে প্রজাদের কাহারও মনে কোনপ্রকার দুঃখ যাতনা না পৌঁছে। ইহার ফলে তাঁহার অধীনস্থ মালীক, আমীর, সভাসদ ও অন্যান্য লোকেরা অনেকটা অকৃতজ্ঞের মতই আলোচনা করিতে লাগিল যে, সুলতান রাজ্যচালনা সম্পর্কে একান্তই অনভিজ্ঞ। বাদশাহের উপযুক্ত কঠোরতা ও জাঁকজমক তাঁহার নিকট আশা করা যায় না। তিনি সারা জীবন মালীক হিসাবে খুব আরাম-আয়েশে কাল কাটাইয়াছেন। মোগলদের সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁহার যোগ্যতা আছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেও রাজ্যচালনা সম্পর্কে তাঁহার কোন জ্ঞান নাই। সুলতানের অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য মালীক, আমীর, অন্যান্য সভাসদ ও সঙ্গীদের দ্বারা যদিও তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তথাপি তাঁহার নিজের মধ্যে সঙ্গীদের কোন গুণ নাই। তাঁহার সভাসদরা প্রায়শঃ বলিতেন, যে দুইটি গুণ ছাড়া রাজ্যশাসন সম্ভবপর নহে, তাহার একটিও সুলতান জালাল উদ্দিনের মধ্যে নাই। কাজেই তাঁহার দ্বারা রাজ্যচালনা কী করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে!

সেই দুইটি গুণের একটি হইল, প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করা এবং অধীনস্থ লোকদিগকে নানাবিধ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা। ইহার ফলে একদিকে যেমন রাজ্যের নানাবিধ বিরাট কাজ সমাপ্ত হয়, অন্যদিকে অনুগামীরা অযাচিত পুরস্কার লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। অন্য গুণটি হইল বাদশাহের যোগ্য জাঁকজমক, কঠোরতা ও শাস্তি প্রদান। ইহার ফলে বিরোধী দল সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, বিদ্রোহীরা মাথা তুলিতে ভয় পায় এবং প্রজাদের মনে সর্বদা একটি শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত থাকে। অধীনস্থ লোক ও প্রজাদের মনে ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব জাগাইতে না পারিলে রাজ্যশাসন কখনও সহজ হয় না। কিন্তু সুলতান জালাল উদ্দিনের নিকট এই দুইটি গুণের একটিও নাই। প্রজাদের মনে শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিতে পারে এমন বেপরোয়া অর্থব্যয় করিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন এবং অনুগামী ও সভাসদদের জন্য চিত্তাকর্ষক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেও তিনি উদ্যোগী নহেন। তদুপরি শাহী জাঁকজমক ও কঠোরতার কোন নিদর্শন তাঁহার ব্যবহারে দেখা যায় না।

অনেক সময় তাঁহার সম্মুখে চোর ডাকাত ধরিয়া আনা হইয়াছে, তিনি তাহা-দিগকে ভবিষ্যতে অনুরূপ কার্য না করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া মুক্তি দিয়াছেন। বলিয়াছেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আনীত কোন লোককে হত্যা করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাত করিতে আমি দ্বিধাবোধ করি না, তথাপি এই সকল বন্দীকে হত্যা করিতে গিয়া আমার মনে পড়ে, হয়তো সে একাধিক দুগ্ধপোষ্য শিশুর পিতা ; তাহাকে হত্যা করিলে এই শিশুগুলি বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত কী দুঃখ কষ্টইনা ভোগ করিবে। যে অন্তর ইহাদের এই প্রকার দুঃখ উপলব্ধি করিতে না পারে, সে অন্তর কেমন।

সাধারণ মানুষ বলাবলি করিত যে, সুলতান জালাল উদ্দিন এমনই এক সুল-তান, যিনি তাঁহার অধীনস্থ কারখানাগুলির ব্যয়ভার বহন করিতেও অনিচ্ছুক। হাতীগুলির খোরাকের জন্য খরচ করিতেও তাঁহার আপত্তি ; তিনি বলেন, এত হাতী পালন করিয়া আমার কী কাজে আসিবে। এ কেমন লোক। হাতীর খোরাক লইয়াও যে কথাবার্তা বলে। সুলতান জালাল উদ্দিনের সময়ে শহরে বহু ঠগ ধরা পড়িত এবং তাহাদিগকে সুলতানের দরবারে আনা হইত। কিন্তু সুলতান তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে আদেশ দিতেন যে, তাহাদিগকে যেন নৌকায় চড়াইয়া লক্ষণাবতীর দিকে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে যেন তাহাদিগকে কোন না কোন কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হয় ; যাহাতে তাহারা পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া না আসিতে পারে।

এই সকল ঘটনা উল্লেখ করিবার তাৎপর্য এই যে, এইগুলির দ্বারা বুঝা যায় — হত্যা, উচ্ছেদ, শাস্তি, মুসলমানদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন, নিজের পোশ্যকে পরিত্যাগ, নিজ বন্ধু, অনুগামী ও কর্মচারীদের উপর অত্যাচার এবং অন্য লোককে কষ্ট দেওয়ার কোন প্রবৃত্তি সুলতান জালাল উদ্দিনের ছিল না। ইহার ফলে বহু নতুন যুবক ও অকৃতজ্ঞ শ্রেণীর লোক, যাহারা মুসলমানীর সম্মান করিতে জানিত না, তাহারা এহেন বাদশাহকে ভুল বুঝিল এবং তাহাদের বয়সের দোষ, বেপরোয়া ভাব ও অকৃতজ্ঞ মানসিকতার জন্য যাহা মুখে আসিত, তাহাই সুলতানকে বলিত ও তাঁহার দোষত্রুটির উল্লেখ করিতে দ্বিধা করিত না। আমীর উমরাহ ও সভাসদ-দিগকে তিনি অহেতুক অত্যাচার করিতেন না বা কোনপ্রকার কষ্ট দিতে চাহি-তেন না। ইহার ফলে কতিপয় অকৃতজ্ঞ ও অর্বাচীন আমীরের মনে বেপরোয়া ভাবের জন্ম হইল। তাহারা শরাবের মজলিসে সুলতান জালাল উদ্দিনকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিল। ইহা ছাড়াও তাহাদের মুখে যাহা আসিল তাহাই বলাবলি করিতে লাগিল। ইহাদের সমস্ত কথাই সুলতান জালাল উদ্দিনের কানে পৌঁছিত। তিনি কখনও শুনিয়াও শুনিতেন না ; আবার কখনও বলিতেন,

বেশী শরাব পানের ফলে লোকেরা কত বেহুদা কথাই বলিয়া থাকে, কত প্রতিজ্ঞাই করিয়া থাকে ; তাহা আমি নিজেও অনেকবার শুনিয়াছি।

এই সময়ে বিশিষ্ট মালীক তাজ উদ্দিন কুচীর গৃহে এক শরাবের মজলিসে বহু আমীর উমরাহ উপস্থিত হন। তাহারা সকলেই অতিমাত্রায় শরাব পান করিয়া বেহুশ অবস্থায় মালীক তাজ উদ্দিনকে বলিতে থাকেন, সুলতান হওয়ার উপযুক্ত একমাত্র তুমিই ; জালাল উদ্দিন নহে। অনেকে বলিতে আরম্ভ করেন, খিলজীদের মধ্যে বাদশাহী করিবার যোগ্যতা কোথায় ; তথাপি যদি তেমন যোগ্যতা কাহারও থাকিয়া থাকে, সে হইল আহমদ চপ ; জালাল উদ্দিনত অবশ্যই নহে। এইভাবে তাহারা আরও বহুবিধ কথাবার্তা বলিল এবং বহুতর প্রতিজ্ঞা করিল। যে সকল আমীর উমরাহ সেই মজলিসে উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মালীক তাজ উদ্দিনের হাতে বয়েত করিল এবং তঁাহাকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিল। তাহাদের মধ্যে এক অনভিজ্ঞ বলিয়া উঠিল যে, সে তলোয়ারের এক আঘাতেই জালাল উদ্দিনকে কাটিয়া ফেলিবে। এই উক্তিতে খুশী হইয়া সকলেই নিজ নিজ তলোয়ার কোষমুক্ত করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহারা সকলে মিলিয়া সুলতান জালাল উদ্দিনকে তরমুজের ফালির ন্যায় টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। ঐদিন এই প্রকার বহু কথাই সেখানে আলোচিত হইল এবং সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে সুলতান জালাল উদ্দিনকে গালাগালি দিল।

এই সকল কথাই যথা সময়ে প্রচুর টীকাটিপ্পনী সহ সুলতানের কানে পৌঁছিল। ইহার পূর্বেও সুলতান অনুরূপ বহু কথা শুনিয়াছেন এবং হজম করিয়াছেন। তজ্জন্য কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন নাই। কিন্তু মালীক তাজউদ্দিনের গৃহের বাড়াবাড়িকে তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। সংশ্লিষ্ট সকল আমীর উমরাহকে তঁাহার সম্মুখে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সকলকে তঁাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখিয়াই ভর্ৎসনা করিলেন ও নানাবিধ কঠোর কথা বলিলেন। যে সকল লোক মনে করিত যে, এই সকল আমীর উমরাহকে সুলতান কী করিবে, তাহাদিগকে দেখাইবার জন্যই সুলতান তঁাহার সম্মুখের তরবারি টানিয়া লইয়া উপস্থিত আমীরদের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সক্রোধে বলিলেন, বেশী পরিমাণে শরাব পান করিয়া মত্তাবস্থায় তোমাদের অনেকেই 'এইভাবে তলোয়ার মারিব, ঐভাবে তীর ছুঁরিব' বলিয়া লম্ফঝম্ফ করিয়া থাকে ; কিন্তু এখন এই স্থানে আমি বসিয়া আছি, দেখি তোমাদের মধ্যে কে এমন সাহসী পুরুষ আছে, যে এই ভূপতিত তলোয়ার উঠাইয়া লইয়া আমার প্রতি অগ্রসর হইতে পারে।

মালীক নসরত সাবাহ সের দোয়াতদার খুবই রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রায়শই খুব সুন্দর রসাল কথা বলিতেন।

তিনি সুলতানের এই কথার উত্তরে বলিলেন, জাঁহাপনা, আপনি এই কথা ভাল করিয়াই জানেন যে, মত্তাবস্থায় লোকে কত কথাই বলিয়া থাকে এবং কত প্রতিজ্ঞাই করিয়া ফেলে। কিন্তু আসলে আপনিই আমাদের সুলতান এবং আমরাও আপনারই অনুগামী। যেমন আপনি যাহাদিগকে পালন করিয়াছেন, তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারিবেন না; তেমনই আমরাও আপনার ন্যায় দয়ালু ও ধৈর্যশীল সুলতানও পাইব না। আপনি মত্তাবস্থায় উচ্চারিত আমাদের এই প্রকার কুকথাও কুপ্রতিজ্ঞার জন্য শাস্তি দিতে পারেন; কিন্তু আপনি এই কথা জানিয়া রাখুন যে, আমাদের ন্যায় মালীক ও মালীকজাদা আর কোথাও পাইবেন না।

সুলতান এই দরবারেই শরাব আনাইয়া পান করিতেছিলেন; তিনি মালীক নসরত সাবাহ্‌র এই প্রকার আবেগপূর্ণ বক্তব্য শুনিয়া চোখের পানি ফেলিলেন এবং তাহাদের এই ধরনের প্রাণঘাতী অপরাধও মার্জনা করিয়া দিলেন। তিনি নিজ হাতে শরাবের পিয়ালা নসরত সাবাহ্‌র হাতে দিয়া তাহাকে শরাব পানে নিজের সাথী বানাইলেন। কুকথার জন্য নির্বাসিত করিবার ইচ্ছায় তিনি যে সকল আমীর উমরাহকে তাঁহার সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিজ নিজ কেতা ও জায়গীরে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। সেখানে তাহারা বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিবেন এবং ইতিমধ্যে দিল্লীতে আসিতে পারিবেন না।

যে সকল দুর্মুখ ও বেপরোয়া মালীক আমীর সুলতানকে যাহা মুখে আসিত, তাহা বলিয়াই গালিগালাজ করিত, সুলতান তাহাদিগকে অনেকবারই বলিয়াছেন যে, তোমরা শরাব পান করিয়া মত্তাবস্থায় কী বলিতেছ, তাহা বুঝিতে পার না। তোমরা শরাবের জলসায় আমার প্রতি যে সকল কটূক্তি করিয়াছ, তাহা অন্য কোন বাদশাহের প্রতি করিলে বহুদিন পূর্বেই তোমাদের মস্তকগুলি ধূলিতে গড়াগড়ি যাইত। কিন্তু আমি মুসলমান; কোন নিষ্ঠুর বাদশাহ নহি। হত্যা, উচ্ছেদ, নির্বাসন প্রভৃতি শাস্তিদান আমার স্বভাব নহে; তথাপি আমি তোমাদের ন্যায় দুর্মুখদের কোন পরোয়া করি না। তোমাদের ন্যায় লোক, যাহারা একটি শিকারকেও ঘায়েল করিতে অক্ষম; রাত্র দিন শরাব পান, ব্যভিচার, জুয়াখেলা ও কুকথা বলা ছাড়া যাহাদের অন্য কোন কাজ নাই; তাহাদের মধ্যে এমন সামর্থ ও সাহস কোথায় যে, আমার সম্মুখে তরবারি লইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে। আমি যদি তরবারি ধরি, তাহা হইলে এই প্রকার বিশজন দুর্মুখকে ভূপাতিত করিতে আমার বেগ পাইতে হইবে না। আমি এক ময়দানে দণ্ডায়মান থাকিব; তোমরা, যাহারা সুলতানকে হেন করিব তেন করিব বলিয়া আস্ফালন

কর, তাহারা অস্ত্রাদিসহ যতবার ইচ্ছা আমার সম্মুখে আসিয়া দেখিতে পার যে, আমি তোমাদের কী করিতে পারি আর তোমরাই বা আমার কী করিতে পার। হে অকিঞ্চিৎকরগণ, তোমরা বলিয়া থাক যে, সুলতান বাদশাহী করিতে জানেন না; তিনি রাজ্যশাসনের উপযুক্ত নহেন। কী বলিব, ইহা শুনিয়া আমার অনেক সময় ইচ্ছা হয়, তোমাদিগকে শাহী মহলের সম্মুখে আনিয়া টুকরা টুকরা ফেলিবার আদেশ দেই। কিন্তু এই প্রকার হত্যা ও নির্বাসনকেই যদি বাদশাহী বলা হয়, তবে তাহা আমার দ্বারা হইবে না এবং আমি তাহা করিতেও চাহি না। আমি প্রতিদিন এক পারা কোরান শরীফ পাঠ করি, পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি এবং কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুররসুলুল্লাহ' পড়িয়া থাকি। আমি কোন আক্কেলে অন্য একজন কলেমা পাঠকারীকে হত্যা করিব। শরীয়তে খুনী, ধর্মদ্রোহী ও ব্যভিচারীকে হত্যা করিবার নির্দেশই শুধু রহিয়াছে। মানিলাম তোমরা আমাকে ভয় পাওনা এবং সেইজন্যই আমার সম্পর্কে যাহা মুখে আসে, তাহাই বল। কিন্তু আমার মধ্যম পুত্র আরকলি খানকেত তোমাদের ভয় করা উচিত। তাহার কঠোর মেজাজের কথা তোমরা সকলেই জান। আমার প্রতি যে ধরনের কটূক্তি তোমরা করিয়া থাক, সে যদি তাহা শুনিতে পায়, তাহা হইলে তোমাদিগকে জিন্দা ছাড়িবে না এবং শতপ্রকার লাঞ্ছনার সহিতই তাহা করিবে। আমি যদি তাহাকে এই ব্যাপারে শতবার নিষেধও করি, তথাপি সে উহা করিতে বিরত হইবে না।

এই প্রকারের আরও বহু সৎগুণ সুলতান জালাল উদ্দিনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই কারণে তিনি তাঁহার পাত্রমিত্র, সভাসদ ও অনুগামীদিগকে কখনও মন্দ বলিতেন না এবং কখনও কোন অন্যায়ের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিতেন না বা কয়েদ করিয়া রাখিতেন না। তাহাদের প্রতি অন্য কেহ দুর্ব্যবহার করুক, ইহাও তিনি পছন্দ করিতেন না। পিতা-মাতার ন্যায় তিনি নিজ সন্তানদের প্রতি যে ধরনের ব্যবহার করিতেন, তেমনি সদয়ভাবে নিজ অনুগামীদিগকে প্রতিপালন করিতেন। যদি কখনও সভাসদ ও পাত্র-মিত্রদের প্রতি রাগান্বিত হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি নিজ মধ্যম পুত্রের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে শংকিত হইয়া উঠিতেন। কারণ তাহার প্রকৃতি খুবই কঠোর ছিল। তাহার মালীকী ও বাদশাহী আমলে তিনি কোন অনুগামীকেই শাস্তি দেন নাই। কাহাকেও পদচ্যুত বা কাহারও জায়গীর ফিরাইয়া লন নাই। সুলতান জালাল উদ্দিন বলিতেন, কাহাকেও কোন পদে নিযুক্ত করিয়া বা কোন জায়গীর প্রদান করিয়া পুনরায় তাহা ফিরাইয়া লইতে এবং তাহাদিগকে দুঃখ দিতে আমার লজ্জা করে। আমি যদি আমার

অনুগতদের প্রতি দুর্ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমাকে তাহারা বিশ্বাস করিবে কী করিয়া।

সভাসদ, পাত্রমিত্র ও অন্যান্য লোকেরা যেহেতু সুলতান জালাল উদ্দিনের মর্যাদা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল, সেইজন্য তাহারা তাঁহার এই প্রকার ব্যবহারকে দুর্বলতা মনে করিয়া বিদ্রূপ হইয়া উঠিত এবং এইগুলিকে তাঁহার দোষ মনে করিয়া তজ্জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার কুকথা বলিত। এই সকল অকৃতজ্ঞ লোকেরা ভাবিত সুলতান জালাল উদ্দিন বাদশাহী করিবার যোগ্য নহেন। এইজন্যই আল্লাহ্তালা কঠোর প্রকৃতির সুলতান আলাউদ্দিনের হাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিলেন এবং তদ্দরুন দুনিয়ার বুক হইতে তাহাদের নাম নিশানা মুছিয়া গেল।

সুলতান জালাল উদ্দিনের বিখ্যাত চরিত্রগুণ সম্পর্কে পরিচিত একটি ঘটনা এই প্রকার :—যে সময় তিনি সুলতান বলবনের অধীনে সেরজানদার ছিলেন, তখন 'কথল' অঞ্চলটি জায়গীর হিসাবে প্রাপ্ত হন এবং তদনুযায়ী সামানার শাসক নিযুক্ত হন। সামানার জনৈক সিরাজ উদ্দিন সাবী বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি একটি গ্রাম নিকর ভোগ করিতেন। সুলতান জালাল উদ্দিন সামানায় যাওয়ার পর তাঁহার দপ্তর হইতে মাওলানা সিরাজ উদ্দিন সাবীর গ্রামটির খাজনা গ্রহণ করা হয়। ইহার ফলে তিনি অন্যান্য গ্রামের জায়গীরদারদের সঙ্গে মিলিয়া তজ্জন্য দু:খ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়াও তিনি সুলতান জালাল উদ্দিনের নামে প্রশংসা সূচক একটি কবিতা রচনা করিয়া উহা দরবারে পেশ করত: তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সুলতান জালাল উদ্দিন উহাতে তেমন কান না দেওয়ায় এবং খাজনা আদায়ের ব্যাপারে তাঁহার কর্মচারীদিগকে নিষেধ না করায় মাওলানা সাবী খুবই দু:খিত হইলেন। তিনি 'খিলজী নামা' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়া উহাতে সুলতানের প্রতি বিদ্রূপ করিলেন এবং তাহা অনেক ক্ষেত্রেই মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। সামানার শাসক থাকা কালেই এই পুস্তিকা সুলতান জালাল উদ্দিনের হাতে আসে। মাওলানা সিরাজ উদ্দিন যখন জানিতে পারিলেন যে, খিলজীনামা সুলতানের হাতে পড়িয়াছে এবং তিনি তজ্জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন সাবী প্রাণের ভয়ে সামানা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

অন্য একটি ঘটনাও এই সময়কার—তখন সুলতান সামানার শাসক ও কথলের জায়গীরদার। কথলের অন্তর্গত মুণ্ডারীদের একটি গ্রাম সুলতান আক্রমণ করেন। হাঙ্গামার সময় মুণ্ডারীরা তরবারি লইয়া প্রতিরোধ করে এবং সুলতান জালাল উদ্দিন মুখে আঘাত পান। সেই আঘাতের চিহ্ন তাঁহার মুখে শেষ জীবন

পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সুলতান জালাল উদ্দিন বাদশাহ হওয়ার এক বৎসর পর সেই মওলানা সিরাজ উদ্দিন সাবী ও মুওারী পুত্র সুলতানের প্রতিশোধের ভয়ে নিজেদের জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শাস্তি গ্রহণের জন্য গলায় দড়ি বাঁধিয়া দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। দরবারীরা তাহাদের আগমন এবং শাস্তি গ্রহণের জন্য দরবারে উপস্থিতির কথা সুলতানকে জ্ঞাপন করে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের উভয়কে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহারা সম্মুখে আসিলে মওলানা সিরাজ উদ্দিন সাবীকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া উত্তম পোশাক পরাইয়া নিজ পাত্র-মিত্রদের মধ্যে বসিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার জায়গীর প্রাপ্ত গ্রামটি বদস্তুর তাঁহার নিকট থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং অন্য একটি গ্রামও তাহাকে উপহার হিসাবে দান করিলেন। সেই সময়ই সুলতান উক্ত দুই গ্রামের দলিলপত্র ঠিক করিয়া উলুগ খানের মারফত মওলানার সন্তানদের নিকট সামানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। সেই মুওারী পুত্রকেও সুলতান নিজের সম্মুখে আনিয়া নানা-বিধ উপহার প্রদান করিলেন এবং একটি অশ্বও দিলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই জীবনে যুদ্ধক্ষেত্রে কত লোকের সঙ্গেই না তরবারি চালনা করিয়াছি ; কিন্তু এই মুওারী পুত্রের ন্যায় সাহসী আর কাহাকেও দেখিলাম না ! তিনি উক্ত মুওারীর জন্য এক লক্ষ চীতল তনখা নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে খোরম অঞ্চলের উকিলে দর করিয়া দিলেন। খোরমের অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এই মুওারী পুত্র ও সুলতানের দরবারের সম্মুখ দিয়া গমন করিবার দুর্লভ মর্যাদা লাভ করিল। এই ঘটনার কথা শুনিয়া দিল্লীর বিখ্যাত সকল লোকই সুলতানের সুখ্যাতি এবং তাঁহার জন্য নেক দোয়া করিলেন। তাঁহার এই প্রকার ক্ষমা প্রদর্শন একটি মহৎ আদর্শ হিসাবে টিকিয়া রহিল এবং এই সকল ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখ করিবার মত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।

সুলতান জালাল উদ্দিনের সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার উদাহরণ হিসাবে অন্য একটি বিখ্যাত ঘটনা এই :—বাদশাহ হওয়ার পর সুলতানের মনে হইল যে, বহু বৎসর তিনি মোগলদের সহিত যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে জুম্মার খোতবায় 'আল মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলা যথার্থ হইবে। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার সন্তানদের মাতা মালিকা জাহানকে বলিলেন যে, শহরের সর্দার ও কাজীরা যখন শুভ কাজে মোবারকবাদ জানাইবার জন্য হারেমে আসে, তখন বেগম যেন তাহাদের নিকট এই মর্মে একটি নির্দেশ পাঠান, যাহাতে তাহারা বাদশাহের নিকট তাঁহাকে খোতবায় 'আল মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া একটি দরখাস্ত পেশ করে। এই সময়ে

শাহজাদা কদর খানের সহিত সুলতান মুইয উদ্দিনের কন্যার শুভ পরিণয় উপ-লক্ষে শহরের নেতৃস্থানীয় লোক ও কাজী সাহেবেরা মোবারকবাদ জানাইতে হারেমে আসেন। এই সুযোগে মালিকা জাহান তাহাদের নিকট উপরোক্ত মর্মে একটি নির্দেশ পাঠান। শহরের গণ্যমান্য সকল লোকই মালিকা জাহানের এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, এমন এক বাদশাহ, যিনি বহু বৎসর মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে খোতবায় 'আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারী' বলিয়া সম্বোধন করা একান্তই যথার্থ।

অতঃপর চান্দ্রমাসের প্রথম দিনে প্রথা অনুযায়ী পাত্রমিত্র, আমীর, মালীক সকলে দরবারে উপস্থিত হইয়া বাদশাহের হস্তচুম্বন করিবার পর কাজী ফখর উদ্দিন নাকেলা, যিনি তৎকালের বিখ্যাত আলেমদের অন্যতম ছিলেন, বাদশাহের সম্মুখে প্রসঙ্গের উপযুক্ত বর্ণনা ও বিবরণসহ একটি আবেদন উপস্থিত সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং সকলের পক্ষ হইতে দরখাস্ত পেশ করিলেন, যাহাতে জুম্মার দিনে খোতবায় সুলতানকে' আল মুজাহিদ্‌ ফি সাবিলিল্লাহ' বলিবার অনুমতি দেওয়া হয়। সুলতান আবেদনের বিবরণ শুনিয়া এবং মালিকা জাহান তাহা-দিগকে এই প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন, এই কথা অবগত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমিই মালিকা জাহানকে এই ব্যাপারে তোমাদের প্রতি নির্দেশ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম। পরে তিন চারি দিন আমি এই ব্যাপারে অনবরত চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু আমার কিছুতেই মনে পড়িতেছে না যে, আমি কোন একদিনও বীরত্বের খ্যাতি ছাড়া শুধু আল্লাহ্‌র নামে তরবারি চালনা বা তীর নিক্ষেপ করিয়াছি। ভাবিয়া দেখিতে পাইয়াছি, আমি খোদার নামে জেহাদ করি নাই; এইজন্য আমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। মোগল-দের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধেই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বীরত্বের খ্যাতি লাভ করা। খোদার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হওয়ার বাসনা আমার ছিল না। সুলতানের এই প্রকার উত্তর শুনিয়া শহরের গণ্যমান্য অনেকেই এই ব্যাপারে অনেক কিছু বলিলেন এবং সুলতানকে খোতবায় 'আল্লাহর পথে জেহাদ-কারী' বলিবার অনুমতি দান করিতে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করিলেন; কিন্তু সুলতান কোনক্রমেই ইহাতে অনুমতি দিলেন না। সুলতান জালাল উদ্দিনের সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা এই একটি ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

সুলতান জালাল উদ্দিন বিদ্বান ও বুদ্ধিমানদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এমন একটি সুষম গঠন ছিল যে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও রসিকতা উভয়েরই স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন। আমীর খসরুর প্রতি তাঁহার ব্যবহার

হইতেই তাঁহার বিদ্বোৎসাহিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমীর খসরু বহু পূর্ব-বর্তী ও পরবর্তী বাদশাহের দরবারে কবিকুল শিরোমণি হইয়া বিরাজ করিয়াছেন। সুলতান জালাল উদ্দিন আরজে মুমালেক থাকাকালেই আমীর খসরুকে যোগ্য উপহার দানে সম্মানিত করেন। কবির পিতার প্রাপ্য বার শত তঙ্কার বেতন তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং অশ্ব, পোশাক ও অন্য বহুবিধ উপহারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। বাদশাহ হইবার পর আমীর খসরু তাঁহার দর-বারে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে 'মুসহাফ' দারের পদে নিয়োগ করা হয়। বড় বড় মালীক ও আমীররা যেরূপ পোশাক পাইতেন আমীর খসরুকেও তদ্রূপ পোশাক সাদা কোমরবন্দসহ প্রদান করেন। সুলতানের অন্যতম সঙ্গী সাদ উদ্দিন মন্তেকীকেও মোটা দরবেশী পোশাক ছাড়াইয়া আমীরদের দলে স্থান দেন। তাঁহার নৈকট্য লাভের সুযোগ দিয়া তবলা ও নিশান বরদারীর পদে নিয়োগ করিয়া যথাযোগ্য জায়গীর প্রদান করেন।

সুলতান জালাল উদ্দিনের রসগ্রাহিতা, সৎগুণ ও সরল অন্তঃকরণের এমন একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল যে, তিনি শরাবের মজলিসে কখনও জাঁকজমক দেখাই-তেন না। অতুলনীয় সহচর ও অনুগামী, সুরূপ সাকী, মনোমুগ্ধকর গায়ক এবং সুদক্ষ বাদকদের দ্বারা আমোদ প্রমোদের জলসা এমনভাবে সাজাইতেন যে, উহার তুলনা একমাত্র বেহেশতেই সম্ভবপর। তিনি উপস্থিত সকলকে পোশাকী জামাজোড়া ও জুতা মোজা খুলিয়া হালকা কাপড় পরিয়া আরামের সহিত বসিতে বলিতেন। সঙ্গীসাথীরাও নানাপ্রকার আমোদ ও হাসিঠাট্টার গল্প বলিতেন। সুলতান অনেকের সহিত শতরঞ্জ খেলিতেন এবং সঙ্গীরা তাঁহার সহিত বাজী ধরিতেও দ্বিধা করিতেন না। তাহারা কোনপ্রকার সংকোচ অনুভব করিতেন না; কারণ জলসা বা জলসার বাহিরে কোথাও সুলতানের কঠোর মেজাজের ভয় তাহাদের ছিল না। ক্রোধ বশে কাহাকেও হত্যা বা নির্বাসনের ব্যাপারে সুল-তানের তরফ হইতে কোনপ্রকার আশংকা তাহারা করিতেন না। তাঁহার জলসার সঙ্গীদের মধ্যে মালীক তাজ উদ্দিন কুচী, মালীক আআয উদ্দিন গোরী, মালীক কীর, মালীক নসরত সাবাহ, মালীক আহমদ চপ, মালীক কামাল উদ্দিন আবুল মুআলী, মালীক নাসির উদ্দিন মরামী, মালীক সাদ উদ্দিন মন্তেকী প্রমুখ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ছিলেন। এই সকল মালীকের ন্যায় সুকথক ও হাস্যরসিক তৎকালে বিরল ছিল। তাঁহারা সুলতানের জলসায় নানাপ্রকার হাস্যরসের অবতারণা করিতেন এবং রসপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বহুবিধ বিষয়ে এমন আলোচনা উপস্থিত করিতেন যাহার তুলনা হয় না।

সুলতানের দরবারের জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে ছিলেন তাজ উদ্দিন ইরাকী, আমীর খসরু, মুইজ জাজরমী, পেসর আইবক দোয়াগো, মুয়াইদ দেওয়ানা, সদর আলী, আমীর আরসালান কুলাহী, এখতিয়ার বাগ ও তাজ খতিব। রচনা, কথকতা, ইতিহাস জ্ঞান ও দরবারী অভিজ্ঞতায় তাঁহাদের তুল্য বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎকালে ছিলেন না। সুলতানের জলসায় গজল খানদের মধ্যে ছিলেন আমীর খাসা ও হামিদ রাজা। আমীর খসরু দরবারে প্রতিদিন নূতন নূতন গজলের আমদানী করিতেন। সুলতান তাঁহার গজল খুব পছন্দ করিতেন এবং ইহার বিনিময়ে তাঁহাকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিতেন। সুলতানী জলসার শরাব পরিবেশক সাকী ছিলেন হাযবত খানের পুত্রগণ, নিজাম খরিতাদারের পুত্র ও ইয়ালদুজ সের সাকী। সৌন্দর্য ও আচার-আচরণে তাহারা এমনই আকর্ষণীয় ছিলেন যে, যে কোন দরবেশ তাহাদের মুখ দর্শনে নিজের দরবেশী ভুলিয়া জায়নামাজকে শরাব খানার মাদুর করিয়া এই সকল অতুলনীয় বালকদের প্রেমে শরাবীদের সারিতে স্থান করিয়া লইতে দ্বিধা করিতেন না।

সুলতানের দরবারের গায়ক বাদকদের মধ্যে মুহম্মদ সানা চঙ্গীচঙ্গ বাজাইতেন এবং ফতুহা, দুখতর কেফায়ী ও নুসরত খাতুন গান গাহিতেন। তাহাদের সুকণ্ঠের এমনি আকর্ষণ ছিল যে, আকাশ হইতে পাখী নামিয়া আসিত এবং শ্রোতাদের মনপ্রাণ এক অনাবিল আনন্দে মোহিত হইয়া উঠিত। নুসরত বিবির বিশিষ্ট কন্যা ও মেহের আফরুজ সুলতানের জলসায় নৃত্য করিতেন। তাহাদের যেমন ছিল দৈহিক সৌন্দর্য, তেমনই ছিল নানাবিধ কলা কৌশলের অভিনবত্ব। এই সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপসিগণ জলসায় একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতেন এবং দর্শকগণ তাহাদের নৃত্য দর্শনে এমনই অভিভূত হইতেন যে, সম্ভব হইলে তাহারা তাহাদের অন্তরগুলি ছিঁড়িয়া ইহাদিগকে উপহার দিতেন ও তাহাদের দৃষ্টি সারাজীবন ইহাদের চরণতলে বিছাইয়া রাখিতেন। এই সকল জ্ঞানীগুণী ও রূপসীর সমবায়ে সুলতান জালাল উদ্দিনের জলসা এমনই এক আনন্দের খনি হইয়া উঠিতে যে, অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে উহা একান্তই স্বপ্নের ব্যাপার ছিল।

আমীর খসরু ছিলেন সুলতানের দরবারের জ্ঞানীগুণীদের মধ্যমণি। তিনি প্রতিদিন এই সকল সুন্দর সুন্দর বালক ও মনোহারিণী গায়িকার জন্য প্রশংসাসূচক গজলাদি রচনা করিয়া আনিতেন। শরাব পরিবেশনের সময় বালকেরা নানাবিধ কলা-কৌশলের সহিত এবং গায়িকা ও নর্তকীরা সুকণ্ঠের মধু ঢালিয়া এই সকল গজল আবৃত্তি করিত। সুলতানের এই প্রকার আমোদ-প্রমোদের

জলসা, যাহা দুনিয়ার আর কোথাও দেখা যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাহাতে শ্রোতারা অফুরন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। এইরূপ জলসায় উপস্থিত হইয়া যাহারা নিজেদের হারাইয়া ফেলিতে না পারিতেন এবং দুনিয়ার সবকিছু ভুলিয়া যাইতে না পারিতেন, তাহাদিগকে নিতান্তই বেরসিক ও পাষাণ হৃদয় বলিয়া মনে করিতে হইবে।

আজ আমি, এই তারিখের লেখক, বৃদ্ধ হইয়া একান্তই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছি; কিন্তু একদিন আমিও এই সকল জলসায় উপস্থিত ছিলাম। আমিও দুই চক্ষু ভরিয়া এই সকল মনোহর বালকের সৌন্দর্য দেখিয়াছি, সুকণ্ঠ গায়িকাদের গীত শুনিয়াছি এবং নর্তকীদের অপরূপ নৃত্য দর্শন করিয়াছি। তখন মনে হইয়াছে, সব কিছু ত্যাগ করিয়া, ললাটে যোগীদের ন্যায় বিভূতি লেপন করিয়া ও তদনুযায়ী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাজারে গলিতে পড়িয়া থাকি এবং ইহাদের প্রেমে সকলের নিকট নিজকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। আজ ষাইট বৎসর পরেও মনে হয়, ইহাদের জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদি, কাপড়-চোপড় দাড়ি-মোচ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি এবং জীবনের এই শেষ কয়টি দিন ইহাদের কবরের উপর হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকি। হায়, আক্ষেপ, শতসহস্র আক্ষেপ! আমি ধর্মের কোন কিছু যেমন লাভ করিতে পারি নাই, তেমনি আমার রসগ্রাহী মেজাজের অনুরূপ দুনিয়ার সুখভোগও করিতে সক্ষম হই নাই। আজ দুনিয়ার কষাঘাতে জর্জরিত হইয়া কুব্জ পৃষ্ঠে নুব্জ দেহে শুধু আক্ষেপ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নাই। আজ তাই দুনিয়ার সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া নিম্নের এই পদগুলি বারংবার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয়:

হায়, আমি কাফেরও নহি; মুসলমানও নহি।
আমার হৃদয় যেমন হস্তচ্যুত, তেমনি আমার ধর্মও।
হে খোদা, তুমি আমাকে বুঝিতে দাও, আমি কী!
আমার আশা শিথিল, আমার মোক্ষও সন্দেহযুক্ত;
আমার বিশ্বাসের পথে শত সহস্র ত্রুটি বিচ্যুতি বিরাজিত।
কোথায় যাইব, কী করিব, আমার অবস্থা কাহাকে বলিব!
বস্তুতঃ কোথাও যাওয়ার স্থান নাই, কোন আশ্রয় নাই।
পিপীলিকাতুল্য আমার হৃদয়, পূর্বে পশ্চিমে বিশাল দুনিয়া;
আকাশে মাটিতে আমার পরিবেশ অতিশয় সংকীর্ণ।
হে খোদা, দয়া কর, আমার মধ্যে প্রসারতা দাও;
অতি শোচনীয়, সহায়হীন এক দুঃস্থ ও আর্তকে বাঁচাও।

পুনরায় সুলতান জালাল উদ্দিনের চরিত্রগুণ বর্ণনায় ফিরিয়া আসিতেছি। ইতিপূর্বে সুলতানের জলসা ও দরবারী রেওয়াজ সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার রসজ্ঞ প্রকৃতি ও চরিত্রগুণের যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুণা মার্জনা করুন।

সুলতান জালাল উদ্দিনের শাসন আমলে প্রসিদ্ধ বহু জ্ঞানী ও গুণী বিদ্যমান ছিলেন। মালীকদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন। মালীক কুতুব উদ্দিন আলবী, মালীক তাজউদ্দিন ঘরামী, মালীক মুইদ জাজরামী, মালীক সাদ উদ্দিন আমীরে বহর, খাজা জালাল উদ্দিন আমীর চা নায়েব উজির, মওলানা জালাল উদ্দিন বাগুরী মুস্তাওফীয়ে মুমালেক প্রমুখ জ্ঞানী ও গুণিগণ বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ার পর ধর্মবিরোধী কোন আদেশ দিতে বা তৎসম্পর্কে কোন কথা বলিতে সুযোগ পান নাই। এই বাদশাহের শাসনকালে কোন রাজকর্মচারী প্রজাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন না। কোন শাহী কর্মচারীর কথায় ও কাজে যদি কোন ধর্ম বিরোধী হাবভাব প্রকাশ পাইত, তবে সকলেই তাহাকে হেয় ও নগণ্য মনে করিতেন। সুলতান জালাল উদ্দিনের রাজত্বকালে কতিপয় মালীক যথার্থই সাহস, বদান্যতা, উদারতা ও সম্রান্ত বংশ মর্যাদার জন্য সু-প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মালীক কুতুব উদ্দিন আলবী। তিনি ছিলেন সুলতানের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তাঁহার বদান্যতা ও সৎসাহস ছিল অতুলনীয়। প্রভুত জাঁকজমকের অধিকারী হইয়াও তিনি মানুষের সহিত যেরূপ উদার ব্যবহার করিতেন, উহার কোন তুলনা ছিল না। তাঁহার খরচের হাত এমনই দরাজ ছিল যে, যে কালে মানুষের টাকা-পয়সার অভাব ছিল, তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে দুই লক্ষ তঙ্কা খরচ করেন এবং বিবাহ পড়াইবার দিন তিনি জিনপোষ সহ একশত অশ্ব দান করেন। এক হাজার লোককে পোশাক ও টুপি পরান। এইভাবে সমস্ত জীবন তিনি দান খয়রাত ও সৎকাজে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

সুলতান জালাল উদ্দিনের অতুলনীয় বিশিষ্ট মালীকদের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন আহমদ চপ। পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন নায়েব আমীর হাজেব; কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপন ও শাসন পরিচালনায় তাঁহার কোন তুলনা ছিল না। রাজ্যের শাসনব্যবস্থা যেভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, ঠিক ঠিক তাহাই তাঁহার দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়িত। অশ্বারোহণ, গোলন্দাজী ও তীরান্দাজীতে তৎকালে তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। খাকানীর কাব্য সম্পর্কে তাঁহার প্রচুর

জ্ঞান ছিল এবং পূর্ববর্তী বাদশাহদের কীর্তিকাহিনী সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি শতরঞ্জ খেলিতে ভালবাসিতেন। বদান্যতার ক্ষেত্রেও তাঁহার উন্নতমানের পরিচয় ছিল। এক রাত্রে দরবারী গায়ক ও বাদকদিগকে দাওয়াত করিয়া এক লক্ষ তঙ্কা পুরস্কার দিয়াছিলেন। দুই তিনশত লোককে টুপি ও জিনপোষ সহ একশত অশ্ব দান করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ চরিত্রগুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই অন্যান্য বারবেকদের অপেক্ষা তাঁহার পদমর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার সকল গুণ লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সুলতান জালাল উদ্দিনের সকল কার্যই তাঁহার পরামর্শ অনুসারে নিষ্পন্ন হইত—এই ইঙ্গিতই তাঁহার জন্য যথেষ্ট।

মালীক তাজ উদ্দিন কুচী ও তাঁহার ভাই মালীক ফখর উদ্দিন কুচী উভয়েই জালালী আমলের উন্নতমনা মালীকদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদিতে নিয়োজিত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মালীক তাজ উদ্দিন পদমর্যাদা, নেতৃত্ব ও রসগ্রাহিতার দিক হইতে অদ্বিতীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁহার গায়ে নেতৃত্বের পোশাক পরাইয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বড় বড় মালীক আমীরদের মধ্যে মানুষ এই পর্যন্ত যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতা, মানুষ চিনিবার দক্ষতা, জ্ঞানীগুণীদের প্রতি সহৃদয়তা প্রভৃতি যত প্রকার গুণ দর্শন করিয়াছে, আল্লাহপাক বুঝি বা উহার সকলই তাঁহার মধ্যে দান করিয়াছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্য, জ্ঞানের পিপাসা ও রস গ্রহণের দক্ষতার সকল দিকই তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ছিল। জালালী আমলে অযোধ্যা প্রদেশটি তাঁহাকে জায়গীর হিসাবে দেওয়া হয়। তাঁহার ভাই মালীক ফখর উদ্দিন দাদবেকও সুলতানের বিশিষ্ট দরবারী ছিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই মালীক ও মালীকের পুত্র ছিলেন। তাঁহারা মালীক পদের উপযুক্ত ভদ্রতা ও শিষ্টাচারও জানিতেন। দুই ভাই বীরত্বে, বদান্যতায় ও রাজ্যশাসনে যে প্রকার দক্ষ ছিলেন, পরবর্তীকালে অনুরূপ দক্ষতা অন্য কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহাদের এই ধরনের সৎগুণাবলীর জন্যই শহরের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁহাদের সহিত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন এবং গণ্যমান্য ও জ্ঞানীগুণীদের সকলেই তাঁহাদের দৌলতখানার উপস্থিত থাকিতে আগ্রহ বোধ করিতেন। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাই এই সকল জ্ঞানীগুণী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেন। ইহার ফলে নেতৃত্ব ও পদমর্যাদায় তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষের নিকট সুখ্যাত হইয়াছিলেন।

মালীক নসরত সাবাহ ছিলেন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ গুণগ্রাহী ব্যক্তি। তিনিও ছিলেন মালীকের পুত্র মালীক। জ্ঞানীগুণীদের প্রতিপালন ও সন্তোষ-বিধানে তিনি জালালী আমলের রত্নস্বরূপ ছিলেন। দান খয়রাতের আধিক্য বশতঃ তাঁহাকে 'দ্বিতীয় কশলী খান' বলা হইত। তিনি যে মজলিসে আসন গ্রহণ করিতেন, রসালাপ ও আলোচনায় উহাকে এমনই জমাইয়া রাখিতেন যে, উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্য কাজে ব্যাপৃত হইতে সক্ষম হইতেন না। শহরের সকল শ্রেণীর গায়ক ও বাদক তাঁহার নিকট নিয়মিত যাতায়াত করিত। এমন সম্ভ্রান্ত মালীকজাদার নিকট যদি কেহ কোন বিষয়ে সাহায্য চাহিত কিংবা অর্থ প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে তিনি যে কোন কৌশলেই হউক উহা পূর্ণ করিতেন এবং মোটা সুদ সহ কর্জ করিয়া হইলেও তাহার অভাব দূর করিতেন। যেদিন তাঁহার পক্ষে কোন কারণে দানখয়রাত করা সম্ভব হইত না, সেদিন তাঁহার খুবই দুঃখ হইত। তাঁহার দ্বার হইতে বিফল মনোরথ হইয়া খুব কম লোকই ফিরিয়া আসিত। এই কারণেই সের দেওয়ানদার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, কনৌজ ও জওবালার কেতাদার হইয়া এবং সাত শত অশ্বারোহী সেনার মালীক থাকিয়াও তাঁহার ঋণ দূর হইত না। তাঁহার দ্বার হইতে মহাজনদের ভীড় কখনও দূর হইত না। যে জলসাতেই তিনি উপস্থিত হইতেন, জুয়া খেলিতেন এবং উপস্থিত লোকজন, গজল পাঠক ও গায়ক বাদকদের উপর তঙ্কা বৃষ্টি করিতেন। আমি এই অতিশয় দানশীল ব্যক্তিটিকে চাক্ষুষ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তিনি আমার পিতৃগৃহে অনেকবারই মেহমান হইয়াছেন।

আজ আমি অতীব দূরবস্থায় পতিত হইয়াছি। আমার ন্যায় অসহায়ের দ্বার হইতে বহু প্রার্থী ফিরিয়া যায়। আজ মনে হয়, ঐ সমস্ত দানশীল ব্যক্তির ন্যায় গৌরবের মৃত্যুবরণ করা একান্তই কাম্য বস্তু। কিন্তু কি করিব, আমার নিকট কোন বস্তুই নাই যে, আমি উহা দান করিব। আমি কর্জও পাইব না। দিনরাত তাই শুধু আক্ষেপ করিয়া কাটাইতেছি যে, এমন দিরহাম দীনারের স্তূপ আমার নিকট কোথায়, যাহা দান করিয়া বিলাইয়া দিয়া গৌরবের মৃত্যু অবলম্বন করিতে পারি। যদি এই তারিখ রচনায় আমার উদ্দেশ্য অন্যরূপ না হইত, তাহা হইলে বাপদাদাদের মুখে যে সকল দানশীল ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি এবং যাহাদিগকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহাদের পুণ্যকাহিনী বর্ণনা করিয়া মনকে প্রবোধ দিতাম। নিজের এই দৈন্যদশার মধ্যে তাঁহাদের নামের বরকতে আবার সৎসাহস সঞ্চয় করিতাম এবং মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকিতাম।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি জালালী আমলে কোরান শরীফ পাঠ শেষ করি এবং অতীতের নানান বিষয় ও লেখনপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করি। আমার পিতা মুইদুল মুলকের নিকট যাতায়াতকারী বহু খোদাভীরু ও জ্ঞানীলোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা আমার পিতার সম্মুখে বিভিন্ন বৈঠকে আলোচনা করিতেন যে, জালালী আমল যথার্থই অতুলনীয় ছিল। সে এমনই এক আমল, যে সময়ে ধনজনের অহংকার, অন্যের ধনদৌলতে হস্তক্ষেপ, মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল এবং অত্যাচার-অবিচার বন্দীও প্রহার করিয়া মুসলমানের নিকট হইতে সম্পদ ছিনাইয়া লওয়ার ঘটনা একেবারেই দেখা যায় নাই। এই সময়কার শাহী কর্মচারীদের আচার-আচরণ, কথাবার্তায় ধর্মবিরোধী কোন হাবভাব পাওয়া যায় নাই। তাহারা, এমনকি বাদশাহ স্বয়ং কোনপ্রকার অন্যায়-অবিচারের প্রশ্রয় দেন নাই। ইহার ফলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের মনে একটা শান্তি ও স্বস্তির ভাব বিদ্যমান ছিল। বাদশাহের মধ্যে খোদাভীরুতা ও সংযম এবং তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে জ্ঞান, দয়া ও ধর্মানুযায়ী কাজ করিবার প্রবৃত্তি পুরামাত্রায় বিরাজমান ছিল। নানাপ্রকার হীনমনা লোক ও হেয় পেশার অধিকারীরা এই আমলে কোনপ্রকার সুবিধা-সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। হঠাৎ ধনসম্পদ বা অন্যান্য সুযোগ লাভ করিয়া ছোট লোকেরা সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের অশান্তির কারণ ঘটাইবার মত কোন অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। হীন স্তরের লোকেরা যেমন সৌভাগ্যের অধিকারী হয় নাই, তেমনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরাও অহেতুক অপরের লোভের শিকারে পরিণত হয় নাই। বিধর্মী, অধর্মী, ভ্রান্তমতের অনুসারী ও বিপথগামীরা এই আমলে কোথাও স্থান পায় নাই। হিংসুকরা পরের ধনসম্পদ বিনাশে সুখ লাভ করিতে পারে নাই। অত্যাচার-অবিচার পরিপূর্ণ ন্যায়ের সংস্পর্শে আসিয়া ছিন্নমূল হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষ নির্ভয়ে নিজের সম্পদ প্রকাশ্যে বাহির করিতে পারিত এবং উহা দ্বারা সুখ শান্তি লাভের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইত। নিন্দা চর্চা ও মিথ্যা দোষারোপের দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আমি ঐ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট আরও শুনিয়াছি, তাঁহারা আমার পিতার দরবারে উপস্থিত হইয়া আক্ষেপের সহিত আলোচনা করিয়াছেন যে, এই সকল সদাচার ও সুখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও এই আমলের অকৃতজ্ঞ লোকেরা ইহাকে শান্তি সুখের সময় বলিয়া গণ্য করে নাই। আল্লাহ্তালা যে তাহাদের উপর এমন এক খোদাভীরু বাদশাহকে শাসক হিসাবে দান করিয়াছিলেন, উহার জন্য কোন কৃতজ্ঞতা তাহারা প্রকাশ করে নাই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাহারা সুলতান জালাল উদ্দিনের জন্য কোন দোয়াই খোদার দরগাহে জানায় নাই। বরং স্বার্থপর ও বক্র স্বভাবের লোকেরা বলিত, খিলজীদের বাদশাহী

করা সাজে না এবং সুলতান বাদশাহীর কোন কিছুই জানেন না। তাহারা বাদশাহের নামে শত প্রকার দোষ রটনা করিত এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে লোক-চক্ষে হেয় করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিত।

এই জন্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল অকৃতজ্ঞ লোক এবং তাহাদের দুর্ভাগ্যের ফলে সমগ্র শহরবাসী এমন এক অত্যাচারী, দুর্বিনীত; দুরাচার ও স্বার্থপর শাসকের হাতে উৎপীড়িত ও অবহেলিত হইয়াছিল, যাহার ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা তোয়াক্কা ছিল না। যখন এমনই এক বাদশাহ ও তাহার কর্মচারীদের হাতে সকল মানুষ অত্যাচারে জর্জরিত হইল এবং শান্তি ও স্বস্তির কোন নাম নিশানা রহিল না, তখন সকল মানুষ সুলতান জালাল উদ্দিন ও তাঁহার আমীর উমরাহদের কথা স্মরণ করিত। তাহারা আক্ষেপের সহিত বলিতে যে, প্রতারক সময় এমন এক ধৈর্যশীল ও দানশীল বাদশাহ এবং তাঁহার যোগ্য আমীর মালীকদিগকে বিদূরিত করিল; তাঁহাদের পরিবর্তে এমন এক জন আনিয়া দিল, যাহার বদৌলতে পূর্বের সেই অত্যাচার, স্বার্থপরতা, সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত শত্রুতা, জ্ঞানীদের দুরবস্থা, কুলোকের প্রাধান্য প্রভৃতি ঘৃণ্য কাজ আবার দেখা দিল। সময়ত সর্বদাই বাদশাহের বন্ধু; কিন্তু সেই বাদশাহেরই সে বন্ধু হয়, যে প্রকৃত পক্ষে নানা দোষে দুষ্ট, কুলোকের সঙ্গী, অত্যাচারী ও অসচ্চরিত্র। তাহার আমলে সম্ভ্রান্ত লোকেরা উৎপীড়িত ও জ্ঞানীরা অবহেলিত হয়। সময়ের পরিবর্তনে মূর্খতা, নীচতা ও অবিমৃষ্যকারিতার প্রকোপ ঘটে এবং তাঁহাদের সম্মুখে সর্বপ্রকার দুরবস্থা ও দুর্দিন আসিয়া মুখ ব্যাদান করে।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের এই রূপ আলোচনার পর কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই সুলতান জালাল উদ্দিনের ন্যায় এমন শান্তিকামী ও ধার্মিক একজন বাদশাহকে এই প্রতারক সময় সুলতান আলাউদ্দিনের ন্যায় একজন কুচক্রী ও অত্যাচারী বাদশাহের হাতে রাজাদার অবস্থায় প্রকাশ্যে হত্যা করাইল! সুলতান আলা-উদ্দিন তাঁহার প্রতিপালক মালীকদের সহিত যে ধরনের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কোন বিধর্মী কাফেরের পক্ষেও করা সম্ভব নহে। তিনি বহু রাজ্যশাসন করিয়াছেন এবং নিজ স্বার্থের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া সকলের সুখ শান্তি হরণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বেকার ব্যবহার সম্পর্কে সকল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ছিল; ফলে তাঁহার তখতে আরোহণের পর কাহারও মনে শান্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

সুলতান জালাল উদ্দিনের ন্যায় দয়ালু ও ধার্মিক বাদশাহের আমলেও একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহাতে সৈয়দী মওলা নামক এক দরবেশকে হাতীর

পায়ের তলায় পিষ্ট করিয়া হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর হইতে সুলতান জালাল উদ্দিনের বংশে একটা অস্থির ভাব ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

সৈয়দী মওলার হত্যার ঘটনাটি মোটামুটি নিম্নরূপ। দরবেশ সৈয়দী মওলা বলবনী আমলের প্রথম দিকে বালা রাজ্য হইতে দিল্লী শহরে আসেন। তাঁহার কাজকর্ম অনেকটা অদ্ভুত ধরনের ছিল। দান-খয়রাতেও তাঁহার তুলনা ছিল না। কিন্তু জুম্মার দিন তিনি মসজিদে নামাজ পড়িতে আসিতেন না। নামাজ পড়িলেও বুজর্গানে দীনের আচরিত জমাতের প্রতি তাঁহার কোনপ্রকার আকর্ষণ ছিল না। জিকির আজকার খুব বেশী করিতেন। জামা ও চাদর পরিতেন। সাধারণ তরিতরকারীসহ চাউলের রুটি আহার করিতেন। তাঁহার কোন স্ত্রী পুত্র ও দাসদাসী ছিল না। কোনপ্রকার আমোদ-প্রমোদেও তিনি যোগ দিতেন না। তিনি কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না এবং এত বেশী খরচ করিতেন যে, লোকজন অবাক হইয়া বলাবলি করিত, সৈয়দী মওলার যাদুবিদ্যা জানা আছে। তাঁহার আস্তানার সম্মুখের ময়দানে এক আলীশান দালান তৈয়ার করাইয়াছিলেন এবং উহাতে প্রচুর সম্পদ খরচ করিয়াছিলেন। সেই দালানে খানা পাকান হইত এবং বহু স্থান হইতে বহুতর মেহমান আসিয়া সেখানে জমায়েত হইত। আহারের সময় বিরাট দস্তরখান বিছান হইত। তেমন সামগ্রীপূর্ণ দস্তরখান আমীর উমরাহদের ভাগ্যেও জুটিত না। এই প্রাসাদোপম খানকাহ্‌তে সৈয়দী মওলা জলসা আহ্বান করিতেন। হাজার দুই হাজার মণ ময়দা, পাঁচ ছয় শত গাই বকরী, দুই তিন শত মণ চিনি, এক দুই শত মণ তরিতরকারী খরিদ করিয়া খানকাহের সম্মুখে গাদা করিয়া রাখা হইত। তাঁহার অধীনে কেতা বা জায়গীর হিসাবে কোন গ্রাম ছিল না, কোন উপহার পাইতেন না এবং কোন নজরানাও গ্রহণ করিতেন না। অথচ সর্বদাই এই সকল মালপত্র সরবরাহকারীদিগকে বলিতেন যে, অমুক স্থানে যাও, সেখানে ইট বা পাথরের নীচে তঙ্কা আছে, তাহা লইয়া যাও। তাহারা তাঁহার নির্দেশ মত যাইয়া ইট বা পাথরের নীচে প্রয়োজনীয় তঙ্কা পাইত এবং এই সকল তঙ্কা এমনই নূতন হইত যে, যেন এখনই টাকশাল হইতে আনা হইয়াছে।

অত্র তারিখের লেখক আমি জিয়া উদ্দিন, আমার পিতা সুলতান জালাল উদ্দিনের সময়ে আরকলি খান-এর নায়েব ছিলেন। কেলুখড়িতে তাঁহার প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা ছিল। আমি সেই স্থান হইতে আমার শিক্ষক ও সহপাঠীদিগের সহিত সৈয়দী মওলার দর্শনে আসিতাম এবং সেখানে আহারও করিতাম। সৈয়দী মওলার দরজায় সর্বদাই মানুষের ভীড় লাগিয়া থাকিত এবং

আমীর উমরাহদিগকেও সেই ভীড়ের মধ্যে দেখা যাইত। তখন আমি শুনিয়াছিলাম যে, সৈয়দী মওলা দিল্লী আসিবার পর একদিন 'অজুধানে' শায়খ ফরিদের নিকট গিয়াছিলেন এবং সেখানে দুই-তিন দিন ছিলেন। শায়খ ফরিদ তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনার সময় একবার বলিয়াছিলেন, হে সৈয়দী তুমি দিল্লীতে থাকিবে, সেখানে তোমার খানকাহ্‌তে লোকের ভীড় জমিবে, তোমার খুব সুনাম হইবে ; এই অবস্থায় তোমার যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই তুমি করিবে। তবু আমার একটি উপদেশ স্মরণ রাখিও, কখনও আমীর মালীকদের সহিত মেলামেশা করিও না। তোমার দরজায় তাহাদের আগমনকে সাক্ষাৎ বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিও। কারণ যে দরবেশ আমীর মালীকদিগের সহিত মেলামেশা করে, তাহার পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ হইয়া থাকে।

সুলতান বলবনের আমলে সৈয়দী মওলার পক্ষে এইরূপ খরচপত্র করা, তাঁহার খেদমতে আগত বিশিষ্ট লোকদিগকে দুই পাঁচ হাজার তঙ্কা দান করা এবং মালীক আমীরদের সহিত মেলামেশা করা সম্ভব হয় নাই। সুলতান মুইয উদ্দিনের সময় তাঁহার এই প্রকার খরচপত্রের ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং মালীক আমীরদের সহিত মেলামেশা করিবার সুযোগও তিনি লাভ করেন। জালাল উদ্দিনের আমলে তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খান খানান তাঁহার অনুগত ভক্ত ও পুত্রের ন্যায় হইয়া পড়েন। ইহার ফলে বহু মালীক ও আমীর উমরাহ সৈয়দীর খেদমতে আগমন করিতেন। কাজী জালাল কাশানীর সঙ্গেও তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে। কাজী সাহেব বিশিষ্ট প্রভাবশালী লোক হইলেও বাদশাহের খুব অনুগত ছিলেন না। তিনি একাদিক্রমে দুই তিন রাত্রি সৈয়দী মওলার খানকাহ্‌তে থাকিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বহু বিষয়ে আলোচনা চলিত। ইহা ছাড়া সুলতান বলবনের কর্মচারীদের পুত্রগণ, যাহারা একসময়ে মালীক আমীরের ন্যায় ছিল এবং বর্তমানে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাও সেখানে আসিয়া জুটিত। ইহাদের মধ্যে কতোয়াল বরঞ্জতন ও হাতিয়া পায়েকের ন্যায় পাহলোয়ান শ্রেণীর লোকও ছিল। ইহারা সুলতান বলবনের সময় এক লক্ষ চীতল করিয়া তনখা পাইত ; কিন্তু জালালী আমলে তাহাদের সহায় সম্পত্তি বলিতে প্রায় কিছুই ছিল না। কিছু সংখ্যক পদচ্যুত আমীরও এইখানে তাহাদের আশ্রয়স্থল স্থির করিয়া লইয়াছিল। এই সকল লোকের অনেকেই এইস্থলে রাত্রিবাস করিত এবং সৈয়দী মওলার নিকট হইতে সাহায্য পাইত। সকল মানুষ এই কথাই জানিত যে, সৈয়দী মওলার খানকাহ্‌তে লোকজনের এই প্রকার ভীড় একমাত্র দরবেশের তাবারুক লাভের জন্যই ; কিন্তু পরে এই প্রকার ভীড় ও তাহাদের রাত্রিবাসের কাহিনী ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল।

জানা গেল যে, কাজী জালাল কাশানী, পূর্বোক্ত আমীর ও মালীকজাদাগণ এবং কতোয়াল বরঞ্জতন ও হাতিয়া পায়েক রাতের পর রাত সৈয়দী মওলার সহিত বসিয়া বিদ্রোহ করিবার পরামর্শ করে। এইভাবে তাহারা ঠিক করে যে, জুম্মার দিনে সুলতান জালাল উদ্দিন মসজিদে যাওয়ার কালে কতোয়াল বরঞ্জতন ও হাতিয়া পায়েক জীবন বিসর্জন দিয়া সুলতানকে হত্যা করিবে এবং এই গোলযোগের মধ্যে সৈয়দী মওলাকে ডাকিয়া আনিয়া অন্য সকলে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিবে ও সুলতান নাসির উদ্দিনের কন্যাকে সৈয়দীর হস্তে ন্যাস্ত করিবে। কাজী জালাল কাশানী খান পদে নিযুক্ত হইয়া মুলতান রাজ্যটি কেতা হিসাবে লাভ করিবে এবং বলবনী মালীক ও আমীরজাদাদিগকে শাহী মহল ও অন্যত্র তাহাদের মর্যাদা অনুরূপ পদ ও জায়গীর প্রদান করা হইবে।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে দিল্লীর কোন এক বিশিষ্ট লোকও ছিলেন। সুলতান জালাল উদ্দিন তাহার নিকট হইতেই এই ষড়যন্ত্রের সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সৈয়দী মওলাসহ সকল ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেফতার করেন। তাহাদিগকে দরবারে উপস্থিত করা হইলে সুলতান প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এইরূপ ষড়যন্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু সকলেই একবাক্যে উহার সত্যতা অস্বীকার করে। তৎকালে কোন অপরাধ অস্বীকারকারীকে মারপিটের দ্বারা অপরাধ স্বীকার করাইবার রীতি ছিল না। তথাপি সুলতান ও অন্যান্য লোকের নিকট তাহাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি যেহেতু খুবই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেইজন্য অপরাধ স্বীকারের জন্য সুলতান তাহাদিগকে নির্যাতন করিবার আদেশ দিলেন। বিহারপুরের ময়দানে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করা হইল। সুলতান খান ও মালীকগণসহ সেখানে গমন করিলেন। একটি বিশেষ দরবারের উপযোগী তাঁবু খাটান হইল। শহরের সর্দার ও বিশিষ্ট লোকেরা সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। সাধারণ মানুষও তামাশা দেখিবার জন্য ভীড় জমাইল। সুলতান ষড়যন্ত্রকারীদিগকে তাহাদের সততা যাচাই করিবার জন্য এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উপস্থিত আলেমদের নিকট এই ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন যে, আগুনের স্বভাব যেহেতু যে কোন বস্তুকে জ্বালাইয়া দেওয়া, সেইজন্য এইরূপ পদার্থ দ্বারা কোন বিষয়ে সত্যমিথ্যা নির্ধারণ করা বৈধ হইবে না। তদুপরি ইহাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মাত্র এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে; এমন একটি মারাত্মক বিষয়ে একমাত্র ব্যক্তির সাক্ষ্য কোন প্রকারেই গ্রাহ্য নহে। সুতরাং এই সকল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত সুলতান বাধ্য হইয়া তাহাদের প্রতি নির্যাতনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা কাজী জামাল কাশানীকে বাদাউনের কাজীর পদে নিয়োগ করিয়া সেখানে পাঠাইয়াছেন। অন্যান্য মালীক ও আমীরজাদা-দিগকে চারিদিকে নির্বাসনে পাঠান এবং তাহাদের সহায় সম্বল বাজেয়াপ্ত করেন। কতোয়াল বরঞ্জতন ও হাতিয়া পায়েককে হত্যা করা হয় এবং সৈয়দী মওলাকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাঁহার সহিত এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হন। এই দরবারে শেখ আবু বকর তুসী হায়দরী নামক অন্য একজন দরবেশ তাঁহার দলবল সহ উপস্থিত ছিলেন। সুলতান তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সৈয়দীর বিচার করিতে বলিলেন। এই কথা শোনা মাত্রই তাহাদের একজন ছুরি বাহির করিয়া সৈয়দী মওলাকে আহত করে। আরকলি খান সেই সময় উপর হইতে হাতীর মাহুতদের প্রতি ইঙ্গিত করেন। সুতরাং রাজকীয় হাতী অগ্রসর হইয়া সৈয়দী মওলাকে পদতলে পিষ্ঠ করিয়া ফেলে।

এই ধরনের একজন ধৈর্যশীল বাদশাহও বিদ্রোহের একটি ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি এমন এক আদেশ দিলেন, যদ্দরুন দরবেশদের মর্যাদা ও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার কোন অবকাশই রহিল না।

আমি, বর্তমান গ্রন্থকার নিজ কর্ণে শুনিয়াছি যে, সৈয়দী মওলার নিহত হওয়ার দিন আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর হইতেই সুলতান জালাল উদ্দিনের বাদশাহীতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, দরবেশকে হত্যা করা ভাল কাজ নহে। এই প্রকার কাজ কোন বাদশাহের পক্ষেই কল্যাণকর হয় না। সৈয়দী মওলার নিহত হওয়ার পর হইতেই বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায় এবং দিল্লীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এক চীতলে এক সের শস্য বিক্রয় হইতে থাকে। এই বৎসর সাবালেকের জমিতে কোন প্রকার বৃষ্টিই হয় নাই। ইহার ফলে দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত তথাকার হিন্দু অধিবাসীরা দলে দলে স্ত্রী পুত্র সহ দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের বিশ ত্রিশ করিয়া একত্র হইয়া ক্ষুধার তাড়নায় যমুনার গর্ভে আত্মবিসর্জন করিতে আরম্ভ করে। সুলতান ও আমীরগণ এই সকল ভিক্ষুকদিগকে প্রতিদিন প্রচুর দানখয়রাত দিয়া সাহায্য করেন। এইভাবে বড়লোকদের সাহায্যকে সম্বল করিয়া দীনদুঃখীরা অতিকষ্টে দুর্ভিক্ষের কাল অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। পরের বৎসর উক্ত অঞ্চলে এমনই বৃষ্টি হয় যে, বিগত কিছুকালের মধ্যে এত প্রচুর বৃষ্টি কেহ কখনও দেখে নাই।

পুনরায় জালালী আমরের অবশিষ্ট সংবাদ লিখিতেছি।

৬৮৯ হিজরীতে সুলতান জালাল উদ্দিন রণথাম্বুরের দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খান খানানের মৃত্যু হইয়াছে এবং মধ্যম পুত্র আরকলি খানকে রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাকেই সুলতানের অনুপস্থিতিতে কেলুখড়ির প্রাসাদে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। সুলতান নিজে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। ঝাবনের পতন ঘটিল। সুলতান এখানে বহু মন্দির ধ্বংস করিলেন এবং বহু মূর্তি জ্বালাইয়া দিলেন। ঝাবন ও মালোয়ার বহু গ্রাম ও শহর লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত হইল। সৈন্যদল সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। রণথাম্বুরের রাজা বিশিষ্ট গণ্যমান্য সকল লোক স্ত্রীপুত্রাদিসহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুলতানের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি রণথাম্বুরকেও অধিকার করিবেন। সুতরাং তিনি সৈন্যদলকে 'মাগারেবী' শ্রেণীবদ্ধ এবং 'সাবাত' ও 'গরগচ' প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। সৈন্যরা দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিবার প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিল, এমন অবস্থায় সুলতান একদিন ঝাবন হইতে রণথাম্বুরে আসিলেন এবং যৎপরোনাস্তি মনোযোগের সহিত দুর্গের বিভিন্ন দিক নিরীক্ষণ করিয়া সেইদিনই পুনরায় চিন্তিত অন্তরে ঝাবনে ফিরিয়া গেলেন। পরদিন তিনি সঙ্গের সকল দরবারী ও সৈন্যাধ্যক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছা ছিল রণথাম্বুর-এর দুর্গটি অধিকার করি। এই উদ্দেশ্যে আরও কিছু সৈন্য ডাকিয়া পাঠাই এবং হিন্দুস্তানের গ্রামাঞ্চল হইতে আরও কিছু লোকজন আনাই। গতকাল এইজন্যই আমি দুর্গটি ভাল করিয়া দেখিয়াছি; আমার মনে হয়, বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান নিহত না হওয়া পর্যন্ত এই দুর্গটি জয় করা যাইবে না। যতক্ষণ না দুর্গ অবরোধের জন্য 'সাবাত'-এর নীচে পড়িয়া, 'পাশিব' ও 'গরগচ' বাঁধিতে গিয়া মুসলমানরা প্রাণ দিবে, ততক্ষণ এই দুর্গ হস্তগত হইবে না। এইজন্য আমি স্থির করিয়াছি যে, এইরূপ দশটি দুর্গ ও উহাদের ধনসম্পদ অপেক্ষা আমার নিকট একটি মুসলমানের একটি কেশও অধিক মূল্যবান। এই সকল মুসলমানের প্রাণের বিনিময়ে যে সম্পদ আমি লাভ করিব, উহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যদি এই সকল সম্ভাব্য নিহত মুসলমানের স্ত্রীপুত্ররা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আহাজারি আরম্ভ করে, তাহা হইলে যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল ধনসম্পদ আমার নিকট বিষতুল্য বিস্বাদ মনে হইবে। সুতরাং আমি আদেশ দিতেছি, দুর্গ অবরোধের সকল প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া পরদিনই যেন সকল সৈন্য ফিরিয়া আসে এবং শান্তি-মত কুচকাওয়াজ করিয়া যথারীতি রাজধানীতে গিয়া উপনীত হয়।

উপস্থিত সকলকে সুলতান এই নির্দেশ দেওয়ার পর মালীক আহমদ চপ তাঁহার খেদমতে আরজ করিলেন যে, কোন বাদশাহ যখন কোন কাজ করিবার

দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন কোন বাধাই তাঁহাকে সেই কাজ করা হইতে বিরত রাখিতে পারে না। তিনি যতক্ষণ না উক্ত কাজ সম্পন্ন করেন, স্থির হইয়া বসিতে পারেন না। কাজেই সুলতান যদি এই দুর্গ অধিকার না করিয়াই ফিরিয়া যান, তাহা হইলে রাজার মনে অহেতুক অহংকার জন্মিবে, এমনকি তাহার মগজে অন্যবিধ কুধারণাও প্রবেশ করিতে পারে। তদুপরি সাধারণ লোকের ধারণা খুবই খারাপ আকার ধারণ করিবে; তাহাদের মন হইতে বাদশাহীর ভয়ভীতি দূর হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে সুলতান তাহাকে বলিলেন, হে আহমদ, ইহা আমিও জানি যে, বাদশাহগণ তাহাদের অন্তরের কামনা পূর্ণ করিতে, তাহাদের বাদশাহীর শৃঙ্খলা বিধান করিতে এবং দেশে দেশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে হাজার হাজার মানুষকে মহাবিপদের মুখে ঠেলিয়া দেয়। এই প্রকার দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া তাহারা মুসলমানদের রক্তপাতকে কোনপ্রকার গুরুত্বই দান করে না। নিজের বাদশাহীর নাম রক্ষা করিতে গিয়া অতি দূরদেশে মানুষকে পাঠাইতে দ্বিধা করে না এবং যে সকল কার্য তাহারা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা মানুষের জন্য যত কঠিনই হউক না কেন, না করা পর্যন্ত তাহাদের গতি থামে না। তাহারা বৎসরের পর বৎসর এইরূপ কার্যোদ্ধারের জন্য বিদেশে বিপাকে পড়িয়া থাকে এবং লোকজনের কষ্টকে কষ্ট বলিয়া স্বীকার করে না। এই প্রকার সমুদয় ব্যাপারই আমি জানি; বহু বৎসর যাবৎ আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী বাদশাহদের কীর্তিকাহিনী পাঠ করা হইয়াছে; এমনকি বাদশাহ হওয়ার পর আমি নিজেও তোমার সম্মুখেই দৈনিক কয়েক পৃষ্ঠা ইতিহাস পাঠ করিয়া আসিতেছি। তুমি আমার পুত্রতুল্য, রাজ্যচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তুমি আমার সম্মুখে যেভাবে মতামত প্রকাশ কর, তাহাতে মনে হয়, এই ব্যাপারে তুমি যাহা জান, আমি তাহা জানি না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, খোদা ও তাঁহার রসুলের বর্ণিত মুসলমানী এক বস্তু আর এই সকল অত্যাচারী পরাক্রমশালী বাদশাহ নিজের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অন্য বস্তু। আমি বাদশাহীর জন্য অন্য কাহারও মতামতকে মোটেও পরোয়া করি না। কারণ আমি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি যে, পয়গম্বরগণ যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সবই সত্য; কিয়ামত অবশ্যই হইবে। এই দুনিয়ায় ভাল মন্দ যাহা কিছু করি, খোদার সম্মুখে উহার জবাবদিহি করিতে হইবে এবং এই সকল অত্যাচারী অবিবেকী বাদশাহ দুই দিনের বাদশাহীর জন্য, নিজের সম্মান প্রতিপত্তির জন্য যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা অবশ্যই ধ্বংস হইবে ও পরিণামে তাহাদিগকে দোজখের ঈন্ধন করিয়া ছাড়িবে। এই সকল বাদশাহের কাজের অনুসরণ

করিলে মানুষের মনে ভয়ভীতি উৎপাদন করা সম্ভব ; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া মুসলমানী হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিতে হইবে। সুতরাং আমি যাহা কিছু করিতে চাই এবং যাহা কিছু বলিতে চাই, তাহা কিছুতেই মুসলমানীর আয়ত্তের বাহিরে যাইবে না। তুমি আমার প্রতিপালিত, সন্তান তুল্য ; তবু রাজ্য ও দেশের মঙ্গলের জন্য অন্য বাদশাহের কার্যাবলীর উদাহরণ তুলিয়া ধরিয়া বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে সতর্ক করিতে চেষ্টা কর। কিন্তু তোমার জানা উচিত যে, তুমি এই বিষয়ে যাহা কিছু জানিয়াছ ও শুনিয়াছ, আমি তদপেক্ষা অনেক বেশী তোমার অনেক পূর্ব হইতেই জানিয়াছি ও শুনিয়াছি।

আহমদ চপ বলিলেন, আমি অবশ্যই গোস্তাখী করিয়াছি ; তবু বাদশাহের দয়ার ভরসায় এতটুকু বলিতে পারি যে, আমাকে সুলতান বহুবার নিজেই দেশ ও রাজ্য সম্পর্কে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করিবার আদেশ দিয়াছেন। আমিও সর্বদা সেই আদেশ পালনে সকল কিছু বলিয়াছি। এই কারণে বর্তমানেও আমার বক্তব্য এই যে, রণথাম্বুরের দুর্গ অধিকার করা ছাড়াই যদি বাদশাহ দেশে ফিরিতে চাহেন, তাহা হইলে মানুষের মনে তাঁহার শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ জাগিবে। ইহার জন্য আমি খুবই চিন্তিত ; সুতরাং এই দিক হইতে আমার যাহা কিছু ভাল মনে হইয়াছে, তাহাই সুলতানের সম্মুখে পেশ করিয়াছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, সুলতান উহাকে ঐ সকল অত্যাচারী ও নাফরমান বাদশাহের কার্যের অনুরূপ কার্য বলিয়া ভাবিয়াছেন, যাহারা যথার্থই ধর্মের দুশমন ছিল। অথচ তিনি ইচ্ছা করিলে আমার এই বক্তব্যকে সুলতান মাহমুদ ও সুলতান সঞ্জরের কার্যের অনুরূপ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন ! কারণ তাঁহাদের প্রত্যেকেই যেমন পরিপূর্ণভাবে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, তেমনি নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই।

আহমদ চপের এই প্রকার কথা শুনিয়া সুলতান হাসিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, হে আহমদ, তুমি দেখিতেছি জোয়ানী ও বাদশাহীর নেশায় সবকিছু গোলমাল করিয়া ফেলিতেছ। হে পুত্র, সুলতান মাহমুদ ও সঞ্জরের চাকর নফরেরাও আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু আমাদের ন্যায় দুর্বলদের পক্ষে এই দুই দিনের বাদশাহীর গর্বে কি এমন কথা বলা উচিত যে, আমরাও সেই মহাপরাক্রান্ত পুণ্যাত্মা বাদশাহের অনুরূপ কার্য করিতে পারিব। বাবা, তোমার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়াছে ; তুমি ভুল করিতেছ। এই সকল বাদশাহ যথার্থই ধর্মপোষক ও ধর্মপালক ছিলেন। তুমি শুন নাই যে, তাঁহার দৈর্ঘে প্রস্থে বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহাদের শাসনাধীনে কোন

বিধর্মীকে স্থান দেওয়া উচিত মনে করেন নাই। ধর্মের প্রতি তাঁহাদের সম্মানের জন্যই তৎকালে ধর্ম ও ধার্মিকদের স্থান সর্বোচ্চে ছিল এবং মূর্তিপূজা ও অধর্ম সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুলতান সঞ্জরের আদেশে তাঁহার অধীনস্থ মুসলমানগণ সুলতান আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে কয়েদ করিয়া সুলতান সঞ্জরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল। আমরা কোন শ্রেণীর মুসলমান এবং আমাদের শক্তিসামর্থ্যই বা কতটুকু যে, আমরা সুলতান মাহমুদ ও সুলতান সঞ্জরের অনুরূপ কার্য করিব। আরে বোকা, তুমি নিজেকে বুরজচ মেহের মনে কর, অথচ তুমি স্বচক্ষে দেখিতেছ যে, খোদা ও রসুলের মারাত্মক শত্রু এই সকল হিন্দু প্রতিদিন ঢাকঢোল বাজাইয়া আমাদের শাহীমহলের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছে এবং আমাদের ন্যায় তথা কথিত ধার্মিক ও ধর্ম-পরায়ণ বাদশাহদের সম্মুখে অধর্ম ও পৌত্তলিকতার বিষ ছড়াইতেছে এবং যমুনার তীরে উপস্থিত হইয়া মূর্তিপূজা করিতেছে! আমাদের শক্তি ও আমাদের বাদশাহীর দাপট তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছে না। আমরা যদি সত্যি-কারের ধর্মপালক বাদশাহ হইতাম কিংবা ঐসকল পুণ্যাত্মা বাদশাহদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতাম, তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুস্তানে খোদা ও রসুলের এই সকল ভয়ানক শত্রুকে শান্তিতে পানাহার, সুন্দর পোশাক পরিধান এবং মুসলমানদের সহিত সমান তালে চলাফেরা করার অধিকার কখনই দিতাম না। আমাদের ধার্মিকতা ও ধর্মপালনের উপর শতাধিক যে, জুম্মার দিনে খোতবায় আমাদের নাম ইসলামের রক্ষক বলিয়া উচ্চারিত হয় এবং অযথা আমাদের ধার্মিকতার প্রশংসা করা হয়। অথচ আমাদের সম্মুখেই খোদা ও রসুলের দুশমনরা অতি-শয় আমোদ আহ্লাদের সহিত দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করিতেছে, মুসলমানদের সহিত সমান তালে গর্ব করিয়া ফিরিতেছে এবং অধর্ম ও অন্যায়কে ঢাকঢোল বাজাইয়া সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছে। আমাদের ধার্মিকতা ও এমন ধর্মপালনের মুখে ছাই যে, আমরা তাহাদিগকে এই প্রকার শান্তির মধ্যে বসবাস করিতে দিতেছি, তাহাদের রক্তে নদনদী প্রবাহিত করিতেছি না এবং তাহাদের নিকট হইতে কিছু সম্পদ লাভ করিয়াই তাহাদের সকল অপরাধ ভুলিয়া বসিয়া আছি। হে পুত্র, বুদ্ধিমানের সম্মুখে এই প্রকার বালসুলভ চপলতা ত্যাগ কর এবং আমাকে সুলতান মাহমুদ ও সঞ্জরের সহিত তুলনা করা হইতে বিরত হও। আমরা গোলাম; বাদশাহ হইলেও ঐসকল বাদশাহের গোলাম হইতেই আমরা গর্ব অনুভব করি এবং সম্মান বলিয়া ভাবি। বাবা, তুমি দুনিয়ার খবর রাখ না এবং বুঝিতে পার না যে, কিয়ামতের দিন তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, উহার উত্তর তাঁহাদিগকে দিতে হইবে ও আমার কৃতকর্মের উত্তর আমি দিব। আমি বৃদ্ধ

হইয়াছি ; আমার বয়স আশি বৎসর হইতে চলিয়াছে। এখন আমার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা দরকার এবং এমন কাজ করা দরকার, যাহা মৃত্যুর পর আমার কাজে আসিবে। অথচ তুমি আমার সম্মুখে এমনভাবে কথা বলিতেছ, যেন আমি দুনিয়ার সকল রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছি।

এই সকল কথা শুনিবার পর আহমদ চপ উঠিয়া সুলতান জালাল উদ্দিনের পায়ের উপর পড়িলেন এবং বলিলেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও ধার্মিক আলেমগণ যাহা বলেন, তাহাই ঠিক। কারণ তাহাই খোদাতালা পছন্দ করেন এবং করিতে আদেশ দেন। আমি যুবক ; জাঁহাপনার কল্যাণে এই সামান্য পদমর্যাদার অধিকারী হইয়াছি। এইজন্য আমি ভাবি যে, যদি এমন করা হইত, তবে এমন ফল ফলিত এবং ঐরূপ করা হইলে ঐরূপ ব্যাপার দেখা যাইত।

ছয় শত একানব্বই হিজরী

দুর্মতি হলো খানের পুত্র আবদুল্লাহ এক দেড় লাখ মোগল সৈন্য লইয়া হিন্দুস্তান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। সুলতান জালাল উদ্দিন মুসলমান সিপাহীদিগকে একত্র করিয়া শাহী জাঁকজমকের সহিত শহরের বাহিরে আসিলেন এবং সকল সৈন্য সামন্তসহ মোগলদের দিকে অগ্রসর হইলেন। 'বররাম'-এর সীমান্তে পৌঁছিলে মোগল সৈন্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। উভয় সৈন্যদল নদীর দুই তীরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং নিজ নিজ সৈন্যদের শ্রেণীবিন্যাসে মনোযোগ দিল। তাহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধের জন্য দিন নির্ধারণ এবং সৈন্যদের যোগ্য আবাসাদি নির্মাণে নিয়োজিত হইল। ইতোমধ্যে উভয় দলের অগ্রগামী সৈন্যদের মধ্যে এখানে সেখানে কিছু সংখ্যক খণ্ডযুদ্ধও অনুষ্ঠিত হইল। এই সকল খণ্ডযুদ্ধে মুসলমানদের জয় হইল এবং তাহারা কিছুসংখ্যক মোগলকে বন্দী করিয়া আনিয়া সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ইহার পর মোগলদের অগ্রবর্তী সৈন্যরা নদী পার হইয়া আসিল এবং মুসলমানদের অগ্রবর্তী-দলও যথারীতি অগ্রসর হইল। উভয় দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। মুসলমানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিল এবং বহু মোগল হতাহত হইল। কয়েকজন হাজারী ও সদী মোগল মসনবদার বন্দী হইয়া সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই ঘটনার ফলে অবশেষে উভয়পক্ষের দূতেরা গমনাগমন করিয়া এই প্রকার ভীষণ যুদ্ধের মুখে সন্ধির প্রস্তাব আনয়ন করিল। সুলতান ও আবদুল্লাহ দূর হইতে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুলতান আবদুল্লাহকে পুত্র এবং আবদুল্লাহ সুলতানকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। উভয় পক্ষ যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে তোহফা ও উপহার বিনিময় করিল। এই

ভাবে সন্ধি স্থাপনের পর উভয় সৈন্যদল মিলিয়া ক্রয় বিক্রয় করিল এবং আবদুল্লাহ স্বীয় সৈন্যদলসহ ফিরিয়া গেল।

চেঙ্গিজ খানের পৌত্র আলগু খান কতিপয় সদী ও হাজারী আমীরসহ সুলতানের দরবারে উপস্থিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। সুলতান আলগু খানের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। আলগুর সহিত আগত অন্য মোগলরাও তাহাদের বালবাচ্চাদিগকে শহরে আনাইল। সুলতানের নিকট হইতে তাহারা নানাবিধ ভাতা ও দক্ষিণা লাভ করিল। খেলুখড়ি, গিয়াসপুর, ইন্দ্রপথ ও তালুকায় তাহারা গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। এই সকল মোগল আবাদী-গুলিকে মোগলপুর বলা হইত। তাহারা সুলতানের নিকট হইতে দুই এক বৎসর ভাতা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের জন্য হিন্দুস্তানের আবহাওয়া বিরূপ হওয়ায় তাহারা স্ত্রী পুত্রাদিসহ নিজেদের দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। অন্যদিক তাহাদের অনেকেই নিয়মিতভাবে এই সকল শহরে বসবাস করিয়া নানাবিধ ভাতা ও জায়গীর লাভ করিয়াছিল। তাহারা এতদ্দেশীয় মুসল-মানদের সহিত নানাভাবে আত্মীয়তা ও সম্বন্ধও স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদিগকে সাধারণভাবে নূতন মুসলমান বলা হইত।

এই বৎসরের শেষের দিকে সুলতান মন্দুরের দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। মন্দুর অধিকার এবং উহার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি লুন্ঠন করিয়া প্রচুর সম্পদসহ ফিরিয়া আসেন। অন্য একবার ঝাবনের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেখানেও প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত হয়। সৈন্যদল সহ বিজয়ীর বেশে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

সুলতান মন্দুর আক্রমণের সময় সুলতান আলাউদ্দিন কোড়ার কেতাদার ছিলেন। তিনি সেই অঞ্চল হইতে ভীলসা আক্রমণের জন্য সুলতানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই অভিযানে তাঁহার প্রচুর ধনসম্পদ লাভ হয়। তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপাস্য দেবতা 'রূঈ' মূর্তিটিকে তাহাদের কাঁধে চড়াইয়া জাঁকজমকের সহিত দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হন। পরে এই মূর্তিটিকে বাদাউনের শাহী দরজায় নিক্ষেপ করা হয়। এই সুলতান আলাউদ্দিন সুলতান জালাল উদ্দিনের ভাতিজা, জামাতা ও পুষ্য ছিলেন। তিনি এই সকল সামগ্রী লইয়া দিল্লী আসিলে সুলতান তাঁহাকে খুবই যত্ন করিলেন এবং আরজে মুমালেকের পদ সহ কোড়ার অতিরিক্ত অযোধ্যার কেতাটিও তাঁহাকে দান করিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন ভীলসা আক্রমণের সময় দেবগিরির সম্পদের কথা শুনিয়াছিলেন এবং দেবগিরির রাস্তাঘাটের খবরাখবরও লইয়াছিলেন। তিনি

মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, কোড়া হইতেই উক্ত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করিবেন এবং দিল্লীতে ইহার কোন খবর দিবেন না। সুতরাং এইবার দিল্লীতে আসার পর সুলতানকে নিজের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট দেখিতে পাইয়া কৌশলে কোড়া ও অযোধ্যার রাজস্ব হইতে মুক্তি চাহিলেন এবং বলিলেন, শুনিতে পাইলাম চান্দেরী ও ইহার আশে-পাশের বহু অঞ্চল এখনও দিল্লীর শাসন বহির্ভূত। আপনি যদি অনুমতি দান করেন, তাহা হইলে নিজের কেতাগুলির রাজস্ব দিয়া আমি আরও বেশী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিব এবং ঐসকল অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করিয়া দেখিতে পারিব। ইহার ফলে যে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ লাভ হইবে, উহার সহিত আমার কেতাগুলির রাজস্ব যোগ করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য দিল্লীর কোষাগারে জমা দিতে সক্ষম হইব। সুলতান নিজ সরল বিশ্বাসের জন্য এই বিষয়ে অনুমতি দিতে আপত্তি করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন না যে, সুলতান আলাউদ্দিনের তাঁহার বেগম মালিকা জাহান এবং স্বীয় কন্যা খুব ভাল ব্যবহার করেন না। ইহার ফলে আলাউদ্দিনের হৃদয় খুবই ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সেইজন্য তিনি কৌশলে দূরে কোথাও সরিয়া গিয়া নিজের মনোমত স্থান করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং সুলতান তাঁহার কথামত কেতা দুইটির রাজস্ব প্রদান আপাতত: বন্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন এবং অনেক নূতন সৈন্য ও চাকর-নফর দান করিলেন। সুলতান ভাবিয়াছিলেন, আলাউদ্দিন আরও প্রচুর পরিমাণ লুণ্ঠিত সামগ্রীসহ আবার দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবে। এইজন্য তাঁহাকে কোড়ায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন এবং আলাউদ্দিনও তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথারীতি কোড়ার দিকে ফিরিয়া গেলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার চাচা ও শ্বশুর সুলতান জালাল উদ্দিনের বিরোধী হইবার কারণ। সুলতান আলাউদ্দিনের দেবগিরি গমন এবং হাতী ও অনবিধ প্রচুর সম্পদ আনায়ন।

সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার শাশুড়ী মালিকা জাহানের নিকট হইতে বহু দুর্ব্যবহার পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার সহিত তাঁহার স্ত্রী, সুলতান জালাল উদ্দিনের কন্যার দুর্ব্যবহারও যোগ হইয়াছিল। কিন্তু সুলতানের উপর মালিকা জাহানের অসামান্য প্রভাবের দরুন আলাউদ্দিন সুলতানের নিকট কোন অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিতেন না। অন্যদিকে নিজের এই দুরবস্থার কথা অন্য কাহারও নিকট বলিবার

উপায়ও তাঁহার ছিল না। এই কারণে সর্বদাই তিনি মনে মনে পীড়িত ও উত্যক্ত হইতেন। ইহার ফলশ্রুতিতে তিনি কোড়াতে নিজ অন্তরঙ্গদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যে কোন মূল্যে হউক, তাহাদের অধীনতা পাশ তিনি ছিন্ন করিবেন এবং অন্যত্র গিয়া নিজের যোগ্য স্থান তিনি অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

সুলতান আলাউদ্দিন ভীলসা অভিযান কালেই দেবগিরির ধনসম্পদের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি উক্ত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুতিও লইতে-ছিলেন। এমতাবস্থায় দিল্লী আসিয়া দুইটি কেত্তার রাজস্ব তাঁহার হাতে আসিল। সুতরাং তিনি কোড়াতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি চারি হাজার অশ্বা-রোহী ও দুই হাজার পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং রাজস্বের সম্পদ দিয়া তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। এই সৈন্যদল সহ কোড়া হইতে দেব-গিরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন যে, তিনি চান্দেরী লুণ্ঠন করিতে যাইতেছেন। দেবগিরির কথা কেহ জানিতে পারিল না। নিজের অনুপস্থিতিকালে চাচা মালীক আলাউল মুলককে কোড়া ও অযোধ্যার ব্যাপারে নিজের প্রতিনিধি নিয়োজিত করিলেন। এই চাচা তাঁহার খুব বাধ্য ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন ধীরগতিতে সৈন্যদল সহ ইলিচপুর পৌছিলেন এবং তথা হইতে 'ঘাটিলাজুরা'তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় হইতে সকলের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিন্ন হইল। তাঁহার চাচা—প্রতিনিধি কোড়া হইতে এ যাবৎ যথা নিয়মে আলাউদ্দিনের সংবাদ দিল্লীতে পাঠাইতেছিলেন; কিন্তু এইবার তিনি মিথ্যা করিয়া জানাইলেন যে, সুলতান আলাউদ্দিন চান্দেরী লুণ্ঠনে ব্যস্ত রহিয়াছেন। আগামী কাল কিংবা পরশুই তাঁহার যথার্থ সংবাদ দিল্লীতে বাদশাহের নিকট পৌছিতে পারে।

আলাউদ্দিন যেহেতু সুলতানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং পোষ্য, সেইজন্য তাঁহার সঠিক অবস্থানের সংবাদ না পাওয়াতে সুলতান কোনপ্রকার সন্দেহ পোষণ করিলেন না। কিন্তু অন্যান্য জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আলাউদ্দিনের এই প্রকার নিরুদ্দেশ হওয়া কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, আলাউদ্দিন তাঁহার শাশুড়ী ও স্ত্রীর প্রতি বিরাগী হইয়া অন্য কোথাও বিদ্রোহ করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে রত হইয়াছে। এইরূপ অনুমানের ফলে শহরের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে তদনুরূপ গুজব রটিয়া গেল এবং উহা ক্রমেই মুখরোচক আলো-চনায় পরিণত হইল।

সুলতান আলাউদ্দিন যে সময়ে ঘাটিলাজুরাতে উপস্থিত হন, তখন রামদেব ও তাঁহার পুত্র দূরে অন্য কোথাও গিয়াছিলেন। দেবগিরির লোকেরা ইতিপূর্বে

কখনই ইসলাম ধর্মের নাম শুনে নাই। মহারাষ্ট্রের কোন অঞ্চলই তখনও কোন বাদশাহ, খান বা মালীকের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় নাই। ফলে দেবগিরিতে প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ, মনিমাণিক্য এবং অন্যবিধ বহুমূল্য সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। যথা সময়ে রামদেবের নিকট মুসলমান সৈন্যবাহিনীর আগমন সংবাদ পৌঁছিল। তিনি নিজ সৈন্যদল রাণাদের সহিত অতিক্রান্ত ঘটিলাজুরাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন অতি সহজেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দেবগিরিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রথম দিনেই রামদেবের পীলখানা হইতে তিনশত হস্তী ও আস্তাবল হইতে কয়েক হাজার অশ্ব আলাউদ্দিনের হাতে আসিল। রামদেব নিজেও বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার ফলে সুলতান আলাউদ্দিন দেবগিরি হইতে এত প্রচুর পরিমাণ ধনসম্পদ ও বহুমূল্য রত্নরাজি লইয়া আসিয়াছিলেন যে, ইহার পরে প্রায় ষাইট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ও প্রায় প্রতি যুগেই বাদশাহীর রদবদলের সময় বহু মূল্যবান সম্পদ খরচ হইয়াছে, তথাপি আজিও অনেক হাতী, ঘোড়া এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী দিল্লীর কোষাগারে মওজুদ রহিয়াছে।

জালালী আমলের শেষ অবস্থা

৬৯৫ হিজরীতে সুলতান জালাল উদ্দিন গোয়ালিয়রে সৈন্য প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি সৈন্যদল সহ কিছুদিন অবস্থানও করেন। সেই সময়ে সুলতানের সৈন্যদলে এই গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, সুলতান আলাউদ্দিন কোড়া হইতে দেবগিরিতে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছেন এবং প্রচুর পরিমাণ হাতী-ঘোড়া ও ধনসম্পদ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তিনি সৈন্যদল সহ ফিরিয়া আসিতেছেন এবং অচিরেই কোড়ায় আসিয়া পৌঁছিবেন। সুলতান জালাল উদ্দিন এই প্রকার সংবাদ শুনিয়া সরল বিশ্বাসে খুবই খুশী হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার অনুগত পোষ্য ও ভাতিজা এই সকল অমূল্য রত্নসম্ভার লইয়া আমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং তিনি সেই খুশীতে আমোদ-প্রমোদের জলসা বসাইলেন এবং সকলকে লইয়া মদ্যপান করিলেন। সুলতান জালাল উদ্দিন ও তাঁহার আমীর উমরাহদের নিকট উপর্যুপরি আগত সংবাদে এই কথা প্রায় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, সুলতান আলাউদ্দিন দেবগিরি হইতে যে পরিমাণ ধনসম্পদ লাভ করিয়াছেন, তাহা দিল্লীর কোন বাদশাহের কখনও ছিল না।

এই সময়ে একদিন সুলতান জালাল উদ্দিন খাস দরবার ডাকিবার আদেশ দিলেন। উহাতে রাজ্যের বিশিষ্ট পরামর্শদাতারা উপস্থিত হইলেন। সুলতান রাজ্যের বিশিষ্ট পরামর্শদাতা মালীক আহমদ চপ ও মালীক কখর উদ্দিন কুচীর

নিকট পরামর্শক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আলাউদ্দিন দেবগিরি হইতে অপরিমেয় হাতী-ঘোড়া ও ধনদৌলত লইয়া আসিবার যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি ? আমরা কি যেখানে আছি, সেখানেই থাকিব, না অগ্রসর হইয়া আলাউদ্দিনের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইব ? কিংবা এখান হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইব ? উপস্থিত মালীকদের মধ্যে মালীক আহমদ চপ নায়েব বারবেক, পরামর্শদাতা হিসাবে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অন্য কেহ এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, যেখানে হাতী ঘোড়া ও ধনসম্পদ বেশী হয়, সেখানে বিপদের সম্ভাবনাও বেশী থাকে এবং তাহা যাহার হাতে পড়ে, তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়। সে পাও ও হাতের পার্থক্য ভুলিয়া যাইতে থাকে। কোড়া অঞ্চলে মালীক আলাউদ্দিনের সহিত মালীক মজুর অনুগত বহু কুচক্রী ও বিদ্রোহমনা লোকের মিলন ঘটিয়াছে। তাহারাই আলাউদ্দিনকে সুলতানের বিনা অনুমতিতে দেবগিরিতে লইয়া গিয়াছে, বাহাদুরী দেখাইয়াছে এবং বেশুমার মাল দৌলত হস্তগত করিয়াছে। পূর্বেকার বাদশাহগণ বলিয়া গিয়াছেন, অর্থই অনর্থ ও অনর্থই অর্থ; অর্থাৎ অর্থ ও অনর্থ সর্বদা একসঙ্গে বিরাজ করে। খোদাই ভাল জানেন, তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, ইতোমধ্যেই আলাউদ্দিনের মনে বিকার দেখা দিয়াছে। এইজন্য আমার পরামর্শ এই যে, সুলতান যেন অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করিয়া চান্দেরী পৌঁছান এবং মালীক আলাউদ্দিন সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ান। তাহা হইলে সে শাহী সৈন্যদলের আগমন সংবাদ শুনিয়া ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সকল ধনসম্পদ বাদশাহের খেদমতে উপস্থিত করিতে বাধ্য হইবে। তখন সুলতান তাহার নিকট হইতে অনর্থ সৃষ্টিকারী সকল সম্পদ তথা হাতী ঘোড়া ও বহুমূল্য রত্নসম্ভার চাহিয়া লইবেন। অবশিষ্ট সম্পদ তাহাকে এবং তাহার সৈন্যদলকে ফিরাইয়া দিবেন। ইহার সঙ্গে আরও একটি অঞ্চলের জায়গীর প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবেন। ইহার পর সুলতান ইচ্ছা করিলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী লইয়া যাইতে পারেন কিংবা কোড়ায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

মোট কথা সুলতান যদি আলাউদ্দিনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দান না করেন এবং তাহার সহিত নিজের আত্মীয়তা ও সম্পর্কের উপর জোর দিয়া তাহাকে বিশ্বাস করেন, তবে উহা পূর্ববর্তী বাদশাহদের অভিজ্ঞতার প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রদর্শনের সামিল হইবে। বাদশাহ যদি তাহার নিকট হইতে ধনসম্পদ আদায় করা ব্যতীত দিল্লীতে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে আলাউদ্দিন ও তাহার অনুগামী হিন্দুস্তানী সৈন্যদল এই সকল ধনসম্পদ লইয়া বিনা বাধায় কোড়ায় পৌঁছিবে। সেখানে পৌঁছিলেই তাহাদের মনে রাজ্য লাভের ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে

এবং তাহারা সর্বতোভাবে আমাদের মূলোৎপাটনের চেষ্টায় নিয়োজিত হইবে। তখন তাহার নিকট হইতে হাতী ঘোড়া ও ধনরত্ন আদায় করিবার এমন সুযোগ আর অবশিষ্ট থাকিবে না। আলাউদ্দিনের সৈন্যদল বর্তমানে পরিশ্রান্ত; যুদ্ধের কোন প্রস্তুতি তাহাদের নাই। তদুপরি প্রচুর ধনসম্পদের ভারে মন্থর গতি। অথচ সুলতানের সৈন্যদল যে কোন ঝুঁকি লইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। এমতাবস্থায় আলাউদ্দিনের পক্ষে ধনরত্ন বাদশাহের খেদমতে উপস্থিত করা ছাড়া অন্যকোন উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হইবে না। এই অধমের সেই কথাও জানা আছে যে, বহু দিন যাবৎ আলাউদ্দিন মালিকা জাহান ও তাহার স্ত্রীর ব্যবহারে দু:খিত হইয়া আছে। কিন্তু মালিকা জাহানের ভয়ে সুলতানের খেদমতে তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই প্রকার বিরাগ ভাজনের নিকট হইতে কোন কারণেই বিশ্বস্ততর আশা করা যায় না। অধমের মনে রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা কিছু ভাল বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই বিনা দ্বিধায় সুলতানের খেদমতে উপস্থিত করিয়াছি। এখন সুলতান যাহা ভাল মনে করেন, তাহাই হইবে।

যেহেতু সুলতান জালাল উদ্দিনের মৃত্যু খুবই নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং রাজ্য তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, সেইজন্য তিনি আহমদ চপের এইরূপ পরামর্শ শুনিয়া খুবই দু:খিত হইলেন। তাহাকে বলিলেন, আমি কি ছোট শিশু যে, আমার নিকট তুমি এই প্রকার বাহাদুরী দেখাইয়া আমার পুত্র তুল্য জনকে বাঘের ন্যায় ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছ। আমি আলাউদ্দিনের এমন কী ক্ষতি করিয়াছি যে, সে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে এবং আমার নিকট ধনসম্পদ লইয়া উপস্থিত হইতে দ্বিধা করিবে।

সুলতান সেই খাস দরবারেই মালীক ফখর উদ্দিন কুচী, কামাল উদ্দিন আবুল মুআলী ও নাসির উদ্দিন ঘরামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরাত আহমদ চপের কথা শুনিয়াছ; এখন এই ব্যাপারে তোমাদের মতামত বিস্তারিতভাবে আমাকে জানাও। ইহার উত্তরে আল্লাহর ভয়শূন্য মালীক ফখর উদ্দিন কুচী আহমদ চপের কথা সত্য জানিয়াও, যেহেতু তাহা সুলতানের পছন্দ হয় নাই, সেইজন্য অনেকটা মোসাহেবী করিয়া বলিল, মালীক আলাউদ্দিনের দেবগিরি গমন ও ধনদৌলত আনয়নের সংবাদটি তাহার কোন দরখাস্ত বা পত্র হইতে প্রমাণিত হয় নাই। তাহার সৈন্য দল হইতেও এমন কেহ সংবাদ লইয়া আসে নাই, যাহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। গুজব কখনও সত্য হয়, আবার কখনও মিথ্যাও হয়। কথায় বলে, পানি না দেখিলে মোজা খুলিবার

প্রয়োজন কি ! কাজেই আমরা যদি সৈন্যসহ তাহার দিকে অগ্রসর হই এবং তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে সে শাহী সৈন্যদলের সংবাদ শুনিয়া ভড়কাইয়া যাইবে এবং অনুমতি ছাড়া অভিযান পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য শাস্তির ভয় পাইবে। ফলে যে যেখানেই থাকুক না কেন, সেখান হইতে অন্যত্র সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে এবং হাতীঘোড়া সহ পথে বিপথে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ইহার ফলে তাহার আনীত সমস্ত সম্পদ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং তাহার সঙ্গী সাথীরা উহা লইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত তাহাদের পিছনে পিছনে দেবগিরি যাওয়া এবং কৌশলে তাহাদিগকে শাহীলশকরের আয়ত্তে আনা। কারণ যতক্ষণ কোন সৈন্য-দলের নিকট হইতে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা না যায়, ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করা কখনই উচিত হইতে পারে না। এখন সম্মুখে রমজান মাস উপস্থিত এবং দিল্লীতে খরবুজার মৌসুম লাগিয়াছে। আমার মনে হয়, জাঁহাপনার এখন দিল্লীতে ফিরিয়া যাওয়া দরকার এবং রমজান মাস দিল্লীতেই অবস্থান করা উচিত।

যদি এই কথা সত্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া হয় যে, মালীক আলাউদ্দিন বহু হাতী ঘোড়া লইয়া আসিতেছে, তথাপি তাহাকে শান্তির সঙ্গে কোড়ায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া উচিত ; যেন ঐ সকল ধন সম্পদ লইয়া দূরে কোথাও পলাইয়া না যায়। ইহার পর তাহার পত্রাদি অবশ্যই সুলতানের খেদমতে আসিবে এবং উহা হইতে তাহাদের মনের অবস্থা—আনুগত্য ও বিদ্রোহের ভাব আবি-ষ্কার করিয়া লওয়া যাইবে। যদি বিদ্রোহের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সুলতানী সৈন্যের এক হামলাতেই তাহার ও তাহার সৈন্য দলের অবস্থা শোচ-নীয় করিয়া তোলা বড় কঠিন হইবে না। সে আমাদের হাত এড়াইয়া কোথায় পলাইবে ! কিছুদিন পূর্বেই ঐ অঞ্চলের হিন্দুস্তানী সৈন্যরা শাহী সৈন্যদলের প্রতাপ দেখিয়াছে ; তাহাদের মধ্যে এমন কে আছে যে শাহী সৈন্যদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে। কাজেই মালীক আলাউদ্দিনের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গেলে খুব সহজেই তাহাকে বাঁধিয়া সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে।

মালীক আহমদ চপ ফখর উদ্দিনের কথার উত্তরে বলিলেন, অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা জানিয়াও তোমার পক্ষে মোসাহেবী করা যথার্থই অন্যায়। কারণ আলাউদ্দিন এই সমস্ত ধনরত্ন ও হাতীঘোড়া লইয়া একবার কোড়ায় যাইতে পারিলে দুই তিন মাস দেরী করিবার কৌশলে সবকিছু সহ সরযূনদী পার হইয়া লক্ষণাবতীতে গিয়া পৌঁছিবে। তখন তুমি বা আমি কেহই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কিছুই করিতে পারিব না।

সুলতান আহমদ চপের এই বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন, তুমি সর্বদাই আলাউদ্দিন সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করিতেছ। আমি তাহাকে সকল অপেক্ষা অধিক আদর যত্নে পালন করিয়াছি এবং তাহার কাঁধে আমার ঋণের গুরুভার বিদ্যমান। এই সব ভুলিয়া গিয়া সে কি বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে? তাহা হইলে আমার পুত্রদের মধ্যে যে কেহ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে এবং আমার কিছুই থাকে না।

আহমদ চপ তথাপি জোর করিয়া বলিলেন, জাঁহাপনা যদি এখান হইতেই রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি নিজ-হস্তে আমাদিগকে হত্যা করিবেন মাত্র। এই বলিয়া আহমদ চপ দরবার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাহির হইয়া যাইবার সময় হাতে হাত মারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তখন বারংবার তিনি এই পদটি আবৃত্তি করিতেছিলেন—

যখন মানুষের দুর্ভাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়,
তখন সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুলতান জালাল উদ্দিন নিজ সরল অন্তঃকরণের আকর্ষণে সুলতান আলা-উদ্দিনের উপর একান্তভাবে বিশ্বাস করিলেন এবং ফখর উদ্দিন কুচীর মতানু-সারে গোয়ালিয়র হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়া কেলুখড়িতে পৌঁছিলেন। ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যেই পরপর সংবাদ আসিল যে, সুলতান আলাউদ্দিন অনেক হাতীঘোড়া ও ধনরত্ন সহ কোড়াতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইহার পরেই তাঁহার পত্রও সুলতানের খেদমতে আসিয়া পৌঁছিল। উহাতে আলাউদ্দিন লিখিয়াছিলেন, আমি প্রচুর ধনসম্পদ, হাতীঘোড়া ও মণিমাণিক্য শাহী খেদমতে উপস্থিত করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু যেহেতু বৎসরাধিক কাল আমি যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছি, বিনা অনুমতিতে অন্য রাজ্যে গমন করিয়াছি এবং ইতো-মধ্যে কোন সংবাদ দিতে পারি নাই, সেইজন্য ভয় হয়, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমার শত্রুরা বাদশাহের নিকট আমার বিরুদ্ধে কত কিছুই না বলি-য়াছে। এই কারণে আমি যেমন ভয় পাইতেছি, আমার সঙ্গীরা ততোধিক ভীত হইয়া পড়িয়াছে। যদি বাদশাহের নিকট অভয়সূচক বার্তা পাই, তাহা হইলে আমার সঙ্গিগণ সহ সকল সম্পদ বাদশাহের খেদমতে উপস্থিত করিতে সাহস করিব। সুলতান আলাউদ্দিন এই প্রকার প্রতারণাপূর্ণ পত্র বাদশাহের খেদমতে পাঠাইলেন এবং নিজে শক্তি সঞ্চয় করিয়া লক্ষ্ণণাবতীতে চলিয়া যাই-বার প্রস্তুতিতে নিরত রহিলেন। জাফর খানকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া সরযূ নদী পার হইবার উপযুক্ত নৌকাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। নিজ

সঙ্গী সাথীদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, যখনই বাদশাহ জালাল উদ্দিনের কোড়ায় আগমন সংবাদ শুনিব, তখনই সমস্ত সম্পদ, হাতীঘোড়া ও জন-পরিজন সহ সরযূনদী পার হইয়া লক্ষণাবতীতে গিয়া পৌঁছিব এবং সেখানেই বসবাসের ব্যবস্থা করিব। যাহাতে দিল্লী হইতে কেহই সেখানে গিয়া পৌঁছিতে না পারে।

সুলতান জালাল উদ্দিনের আমীর উমরাহ ও শহরের জ্ঞানীগুণীরা ব্যাপারটি যথাযথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতেন যে, মালীক আলাউদ্দিন আর দিল্লীতে আসিবে না এবং ধনসম্পদও বাদশাহের খেদমতে উপস্থিত করিবে না। পত্রে সে যাহা কিছু লিখিয়াছে, সমস্তই ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা। বরং সে যথা শীঘ্র সকল হাতীঘোড়া ও ধনরত্ন সহ লক্ষণাবতীতে গিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু তাহাদের কাহারও পক্ষে সুলতান জালাল উদ্দিনের নিকট এই সমস্ত কথা বলিবার উপায় ছিল না। সুলতানের কোন অন্তরঙ্গ সভাসদ যদি আলাউদ্দিন সম্পর্কে কোন কথা বলিতেন, সুলতান উহার জন্য রাগ করিতেন এবং বলিতেন, মানুষের ইচ্ছা আমার পুত্রতুল্য আলাউদ্দিন ও আমার মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হউক এবং আমরা একে অপরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ি।

সুতরাং সুলতান জালাল উদ্দিন নানাবিধ বাৎসল্যের উল্লেখ ও দয়া দাক্ষিণ্যের বর্ণনা করিয়া নিজ হস্তে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিলেন এবং নিজ অন্তরঙ্গ একজন আমীরের হাতে দিয়া তাহাকে কোড়ায় পাঠাইলেন। সুলতানের প্রেরিত আমীর অভয়পত্র সহ কোড়ায় পৌঁছিয়া দেখিলেন সেখানকার সবকিছুই বিপরীতমুখী হইয়া পড়িয়াছে। সুলতান আলাউদ্দিন ও তাঁহার সৈন্য সামন্ত সুলতান জালাল উদ্দিনের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আলাউদ্দিন ও তাহার সৈন্যদলের এই প্রকার মনোভাবের সংবাদ উক্ত আমীর সুলতানের নিকট পাঠাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাহা সম্ভব হইল না। এই অবস্থায় বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল এবং রাস্তাঘাট জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্যদিকে রমজান মাসও আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুলতান আলাউদ্দিনের এক ভাই আলমাস বেগ, তিনিও সুলতান জালাল উদ্দিনের জামাতা ছিলেন এবং সুলতানী দরবারে আখোর বেকের পদ অলংকৃত করিতেন। তিনি অনেকবারই সুলতানের নিকট বলিয়াছেন যে, আমি আমার ভাইয়ের চরিত্র খুব ভালই জানি। এইজন্য ভয় হয় যে, আমার ভাই সম্ভবতঃ সুলতানের শাস্তির ভয়ে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে কিংবা নিজেকে পানিতে ডুবাইয়া শেষ করিয়া দিবে। ইহার কিছুদিন পরেই আলমাস বেগের নিকট আলাউদ্দিনের এক পত্র আসিয়া পৌঁছিল। উহাতে আলাউদ্দিন লিখিলেন,

আমি সুলতানের নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, উহার ভয়ে বিষের পাত্র হাতে করিয়া বসিয়া আছি। যদি সুলতান শীঘ্র এখানে আসিয়া আমার হস্ত ধারণ না করেন, তাহা হইলে আমি কোন প্রকারেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না এবং হয় বিষ পান করিব নয়ত হাতীঘোড়া ও মালমাত্তা সহ কোন দূরদেশে চলিয়া যাইব। ভাইয়ের নিকট এইরূপ পত্র দিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এইরূপ একটি পত্র পাঠ করিয়া সুলতান জালাল উদ্দিন সম্পদের লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না এবং অতি অবশ্যই কোড়ায় আসিয়া পৌঁছিবেন। তখন তাহারা নিশ্চিন্তে তাঁহাকে শেষ করিয়া দিতে পারিবে। সুলতান আলাউদ্দিনের পরামর্শদাতারাই এই প্রলোভনের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাঁহার ভাইয়ের নিকট এই পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

যাহা হউক, আলমাসবেগ উক্ত পত্র পাঠ করিয়া এবং যথারীতি উহাতে মোহর লাগাইয়া সুলতানের হাতে দিলেন। সুলতানের মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ প্রতারণাপূর্ণ একটি পত্রকেও সত্য বলিয়া ভাবিলেন এবং বিনা দ্বিধায় আলমাস বেগকে তৎক্ষণাৎ দূত সহ কোড়ার পথে রওয়ানা করাইয়া দিলেন। তাহাকে বলিলেন, তুমি যথা সম্ভব শীঘ্র কোড়ায় পৌঁছিয়া আলাউদ্দিনকে কোনপ্রকার বিচলিত হইতে নিষেধ করিবে। আমি অতিশীঘ্র কোড়া পৌঁছিয়া তাহাকে নির্ভয় দান করিব। সে আমার পুত্র, আমার নয়নের মণি, তাহাকে আমি অবশ্যই সান্ত্বনা দিব। আলমাস বেগ নৌকাযোগে আলাগের পথে সাত আট দিনে কোড়ায় ভাইয়ের নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন তাহাকে দেখিয়া খুবই খুশী হইলেন এবং বলিলেন। আমার ভাই যখন আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন ভয় ও চিন্তার আর কোন কারণ নাই।

সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বলিলেন, আপনি লক্ষ্ণাবতী যাইবার আশা ত্যাগ করুন। সুলতান জালাল উদ্দিন ধনসম্পদের লোভে অন্ধ ও বধির হইয়া গিয়াছেন। তিনি এই বর্ষাকালেই কোড়ায় চলিয়া আসিবেন। তিনি এখানে আসিয়া পৌঁছিলে আপনি যাহা করিতে হয়, নির্ভয়ে করিতে পারিবেন।

আলমাস বেগকে কোড়ায় রওয়ানা করাইবার পর সুলতান জালাল উদ্দিন কাহারও কথা শুনিলেন না। তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছিল বলিয়াই সকল শ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া হাতীঘোড়া ও ধনরত্নের লোভে অন্ধ ও বধির হইয়া গেলেন। কয়েকজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও এক হাজার

সশস্ত্র সৈন্যসহ কেলুখড়ি হইতে ধামাই আসিয়া পৌছিলেন। এখানে আহমদ-চপকে অন্যান্য সৈন্যদের সেনাপতি করিয়া দিয়া স্থলপথে কোড়ায় যাইতে নির্দেশ দিলেন। নিজে বজরাতে চাপিয়া বসিলেন এবং কোড়ার দিকে নৌকা চালাইতে আদেশ করিলেন। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে চতুর্দিক জলমগ্ন হইয়াছিল। সেই থৈ থৈ করা পানির উপর দিয়া সুলতানের মৃত্যু চুল ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। রমজান মাসের সতের দিন যাইবার পর সুলতান বজরায় কোড়ার সন্নিকটে আসিয়া পৌছিলেন। গঙ্গা নদীতে তাঁহার বজরা পৌছিলে আলাউদ্দিন ও তাঁহার সঙ্গীরা জানিতে পারিয়া সুলতানের কাজ শেষ করিবার জন্য যাহা কিছু স্থির করিয়াছিল, তাহা কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। সুলতান কোড়ায় পোঁছিবার পূর্বেই আলাউদ্দিন গঙ্গানদী পার হইয়া হাতীঘোড়া ও সমুদয় মালমাত্তা এবং সৈন্যদলকে কোড়া ও মানিকপুরের মধবর্তী নদী তীরে লইয়া আসিলেন। গঙ্গার পানিতে চতুর্দিক প্লাবিত হইয়াছিল। সুলতান জালাল উদ্দিনের ছত্র দেখিতে পাইয়া আলাউদ্দিনের সৈন্যরা প্রস্তুত হইল এবং হাতী ঘোড়া সহ যথাস্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আলাউদ্দিন তাহার ভাই আলমাস বেগকে তৎক্ষণাৎ একটি ছোট নৌকায় করিয়া সুলতান জালাল উদ্দিনের নিকট পাঠাইলেন; যাহাতে সে যথাসম্ভব ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা করিয়া সুলতানের শক্তি হ্রাস করিতে পারে। যেন সুলতানের সহিত নৌকায় করিয়া যে এক হাজার সশস্ত্র সৈন্য আসিয়াছে, তাহারা সুলতানের কোন কাজে না লাগে। শুধু সাথে যে কয়জন অন্তরঙ্গ চাকর বিদ্যমান, তাহারাই সুলতানের সহিত নদী তীরের গন্তব্য স্থলে আসিয়া পোঁছে।

নিমক হারাম আলমাস বেগ অতিসত্বর ছোট নৌকা করিয়া সুলতানের খেদমতে গিয়া পোঁছিল। সে দেখিতে পাইল যে, সুলতানের চতুর্দিকের নৌকাগুলি সশস্ত্র সৈন্যে পূর্ণ। সুলতানকে বলিল, আমি জাঁহাপনার দয়ার কথা বলিয়া ভাইকে সান্ত্বনা দিয়াছি। যদি আমি সময় মত আসিয়া না পোঁছিতাম, তাহা হইলে, খোদা জানেন, সে পাগল হইয়া কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যাইত। যদি সুলতান এইরূপ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে দর্শনদান না করিতেন, তবে সে নিজকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত এবং সমুদয় ধনসম্পদও নষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। এখনও যদি সে সুলতানের সহিত সশস্ত্র সৈন্য রহিয়াছে বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে নির্ঘাৎ নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ইহা শুনিয়া সুলতান বলিলেন, তাহা হইলে সৈন্যবাহী নৌকাগুলি আমার সঙ্গে না গিয়া কিনারায় কোথাও নোঙর করিয়া থাকুক। ইহার পর সুলতান দুইটি মাত্র নৌকায় নিজ অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের সঙ্গে অপর তীরে

যাইতে মনস্থ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে নিমকহারাম প্রতারক আলমাস বেগ আবার বলিল, আপনার সঙ্গী মালীক ও চাকরদের নিকট যে সকল অস্ত্র আছে, উহাও তাহারা লুকাইয়া রাখুন ; কারণ আমার ভাই এইগুলি দেখিতে পাইলেও ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িবে। এই প্রকার অনুরোধের বিরুদ্ধেও সুলতান কিছু বলিলেন না ; বরং নিজ সঙ্গীদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন।

সুলতান জালাল উদ্দিনের নৌকা দুটি মাঝ গঙ্গায় পৌঁছিবার পর সঙ্গীরা দেখিতে পাইল যে, আলাউদ্দিনের সমস্ত সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র সহ নদীতীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহাদের সহিত হাতীঘোড়াও যথাস্থানে শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় দেখা যাইতেছে। সাথী সঙ্গীদের সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, আলমাস মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া নিজের চাচা ও প্রতিপালক সুলতানকে যথার্থই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষা সম্পর্কে একান্ত নিরাশ হইয়া কোরা-নের সূরা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মালীক খোরম উকিলেদর আলমাস বেগকে বলিলেন, তুমি আমাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে এবং নৌকাগুলিকে কিনারায় থাকিতে বলিলে ; অথচ তোমাদের সৈন্যরা দেখিতে পাইতেছি, অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এবং হাতীঘোড়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে ! এ কী অবস্থা ; দেখা সাক্ষাতের এ কোন ধরনের পন্থা ?

আলমাস বেগ মনে মনে বুঝিতে পারিল যে, মালীক খোরম তাহাদের প্রতারণার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, আমার ভাইয়ের ইচ্ছা, তাহার অধীনস্থ সৈন্যরা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সুলতানকে সালাম জানাইয়া ভূমি চুম্বন করিবে। আসন্ন মৃত্যু সুলতানকে এমনই অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতারণার সকল চিহ্ন স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াও মাঝ-গঙ্গা হইতে অপর তীরে ফিরিয়া গেলেন না কিংবা নৌকাগুলিকে নিজের নিকট আনিতে আদেশ দিলেন না। শুধু আলমাস বেগকে বলিলেন, আমি এত দূর হইতে রোজা রাখিয়া আসিয়াছি, আর আলাউদ্দিন কি এই ছোট নৌকায় চড়িয়া আমাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে আসিতে পারিল না ? আলমাস বেগ প্রতারণা করিয়া বলিল, আমার ভাইয়ের একান্ত ইচ্ছা, জাঁহাপনা তীরে পৌঁছিলে আমীর উমরাহ ও ধনরত্ন পূর্ণ সিন্দুকগুলি সহ খেদমতে উপস্থিত হইবে এবং শাহী আদব আরজ করিবে। আপনার ইপ্তারী প্রস্তুত করা হইয়াছে ; জাঁহাপনা সেখানে পৌঁছিয়া আপনার বান্দা, সন্তান ও প্রতিপালিত অনুগতদের সহিত ইপ্তার করিবেন এবং ইহার বদৌলতে আমরা সৌভাগ্য লাভ করিব। আলমাস বেগ এইভাবে

ধোকার পর ধোকা দিয়া যাইতে লাগিল এবং সুলতান সরল বিশ্বাসে তাঁহার উভয় জামাতা ও পালিত জনের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। এই সবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না বা সচেতন হইলেন না। নৌকা চলিতেছে; সুলতানের সম্মুখে রেহালের উপর কোরান শরীফ, তিনি উহা পাঠ করিতেছেন। যেন কোন পিতা তাহার পুত্রের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছে; এমনই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে সুলতান অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অথচ তাঁহার নৌকার অন্যান্য সঙ্গী সাথী সকলেই তাহাদের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া মৃত্যুকালে যেমন সুরায়ে ইয়াসীন পাঠ করিতে হয়, তেমনি করিয়া উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সুলতান জালাল উদ্দিন জোহরের নামাজের আউয়াল ওক্তে তীরে গিয়া পৌঁছিলেন এবং কয়েক জন অন্তরঙ্গ সঙ্গীসহ স্থলে নামিয়া আসিলেন। আলা উদ্দিন আমীর উমরাহগণ সহ ভূমি চুম্বনের নিয়ম পালন করিলেন। ইহার পর সুলতানের নিকট আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর পতিত হইলেন। সুলতান পিতার ন্যায় সমাদরে তাহাকে টানিয়া তুলিয়া তাহার চোখে মুখে চুম্বন করিলেন এবং তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া তাহার গালে সাদরে দুইটি ঠোনা মারিয়া বলিলেন, আলা, ছোটকালে তুমি আমার কোলে বসিয়া কতকিছু করিয়াছ, উহার গন্ধ এখনও আমার কাপড়ে-চোপড়ে লাগিয়া আছে; অথচ তুমি আমাকে ভয় পাও কেন, বুঝিতে পারি না! তোমার মনে এমন কী রহিয়াছে, যদ্দরুন তুমি এই কথা ভাবিত পার যে, আমি তোমার ক্ষতি করিব। তোমাকে আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে বর্তমানের এব যুবা কাল পর্যন্ত যথারীতি প্রতিপালন করিয়াছি এবং ক্রমান্বয়ে তোমাকে বর্তমান পদমর্যাদায় লইয়া আসিয়াছি কি এই জন্য যে, তোমাকে আমি নিজ হাতে হত্যা করিব? তুমি সর্বদা আমার নিকট পুত্রাপেক্ষাও প্রিয় ছিলে এবং এখনও তাহাই আছ। এই জন্যই তুমি আমাকে এই রোজাদার অবস্থায় এইখানে টানিয়া আনিতে পারিয়াছ। সুতরাং তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই এবং তোমার ও আমার মাঝে অন্য কাহারও কোন স্থান নাই। আজ যে সকল লোক ধনসম্পদের লোভে তোমার চতুর্দিকে জড় হইয়াছে, সম্পদের অভাবে তাহাদের একজনও তোমার নিকট বসিয়া থাকিবে না; কিন্তু পৃথিবী উলটাইয়া গেলেও তোমার প্রতি আমার দয়া ও স্নেহ কখনও হ্রাস পাইবে না। এইসব কথা বলিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের হাত ধরিলেন এবং তাহাকে নৌকার দিকে লইয়া আসিতে লাগিলেন। তখনও তিনি বলিতেছিলেন, আলা, তুমি আমাকে আর কত ভয় করিবে —তুমি যে ভয় পাইয়া আমাকেও ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছ।

এই সকল কথা বলিয়া সুলতান আলাউদ্দিন সহ নৌকায় উঠিবার কালে প্রতারকরা সচেতন হইয়া উঠিল এবং তাহাদের কুৎসিত প্রতারণা বাস্তবায়িত করিবার জন্য তৎপর হইল। এই সকল নির্দয় প্রতারকের ইঙ্গিতে সামানার এক কমজাতের পুত্র কমজাত মাহমুদ সালেম তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সুলতানকে আঘাত করিল। কিন্তু ইহাতে সুলতান তেমন আহত হইলেন না। সেই কমজাত পুনরায় তরবারির দ্বারা আঘাত করিল। এইবার সুলতান গুরুতর আহত হইয়া পানির দিকে দৌড়াইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, হায় দুর্ভাগা আলা, তুই একী করিলে। নিমক হারাম এখতিয়ার উদ্দিন হোদ সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিল এবং এমন একজন বীর্যবান, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুন্নী মুসলমান সুলতানের মস্তক কাটিয়া লইল। রক্তমাখা সেই মস্তক সুলতান আলাউদ্দিনের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

শুনিয়াছি যে, মস্তক কাটিবার সময় সুলতান জালাল উদ্দিন শাহাদত কলেমা পাঠ করিতেছিলেন। তিনি ইপ্তারের প্রায় নিকটবর্তী সময়ে শাহাদত বরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে যাহারা তীরে উঠিয়াছিলেন এবং যাহারা নৌকায় ছিলেন, তাহাদের সকলকেই এই প্রতারকরা হত্যা করিল। নিষ্ঠুর ও প্রতারক সময় ইহাদের নিকট হইতে এই প্রকার কুৎসিত প্রতারণা, নির্দয়তা, অন্যায় ও নিমকহারামী দেখিবার সুযোগ করিয়া দিল এবং সকলেই তাহা দেখিতে পাইল। এই অকিঞ্চিৎকর দুনিয়া, যাহা আদম (আ:) হইতে এই পর্যন্ত কাহারও জন্য স্থায়ী হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, এমন এক সদাচঞ্চল দুনিয়ার সম্পদের লোভে এই প্রতারক নিজ চাচা, শ্বশুর ও প্রতিপালকের সর্বপ্রকার উপকারের কথা ভুলিয়া গিয়া রমজান মাসের সতের তারিখে রোজাদার সুলতানকে প্রকাশ্যে হত্যা করিল। এমন এক মহান সুলতানের শির শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বর্শাগ্রে বিদ্ধ করিয়া রাখিল। এই শির কোড়া ও মানিকপুরের সকল বিদ্রোহীদের নিকট উপস্থিত করিবার পর তাহা অযোধ্যায় প্রেরণ করা হইল।

এইসব করিতে গিয়া এই সকল নির্দয় প্রতারকের নিকট নিমকের দাদ, দয়াদাক্ষিণ্য ও মুসলমানী সকলেই পরাভূত হইল। এমন পুণ্য রমজান মাসে ইপ্তারের সময় এতগুলি সুন্নী মুসলমানের রক্তে ইহারা নদী তীর সিক্ত করিল। এই প্রকার কুকাজ ও নিমকহারামীর দাগ ইহাদের মুখ হইতে দুনিয়া, কিয়ামত ও কিয়ামতের পরেও দূর হইবে না। দুনিয়ার আড়াই দিনের ভোগ সম্ভোগের লোভে ইহারা এমন এক পাপে লিপ্ত হইল, যাহার ভার আকাশ ও মাটি কেহই বহন করিবে না।

হায় আফসোস, হাজার আফসোস। এমন নির্দয় প্রতারকরা যখন এই প্রকার জঘন্য কুকাজে লিপ্ত হইয়াছিল, তখন আকাশ হইতে কেন খোদার গজব তাহাদের মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল না। মাটি হইতে কেন দোজখের লকশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল না। নিমকহারামদের এই গোষ্ঠী কেন নেস্তনাবুদ হইল না। দুনিয়ার সকল বিপদ আপদ কেন ইহাদিগকে আক্রমণ করিল না। ইহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ছিন্নবিছিন্ন করিয়া ফেলিয়া কেন দুনিয়ার জন্য উপদেশের সৃষ্টি করিল না।

সুলতান জালাল উদ্দিনের কর্তিত শির হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল—সেই রক্তাক্ত হাঙ্গামার মধ্যেই এই সকল অদূরদর্শী যুবকেরা সুলতানের মুকুট আনিয়া আলাউদ্দিনের শিরে বসাইল এবং সকল লজ্জার মাথা খাইয়া ও সমস্ত মুসলমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ আলাউদ্দিনের সুলতান হওয়ার সংবাদ হাতী ঘোড়ার সাহায্যে চতুর্দিকে প্রচার করিল। যদিও এই সকল ধোকাবাজরা অতি অল্প দিন এবং সুলতান আলাউদ্দিন কয়েক বৎসর পর্যন্ত সুখে শান্তিতে ছিল; তথাপি তাহাদিগকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তিন চারি বৎসরের মধ্যেই প্রতারক উলুগ খান, হত্যার জন্য ইঙ্গিতকারী নসরত খান, বিদ্রোহের মূল পরামর্শদাতা জাফর খান, আমার চাচা আলাউল মুলক কতোয়াল, মালীক আসগরী সের দোয়াতদার, মালীক জুনা দাদবেক ও যাহারা এই হাঙ্গামায় শরীক ছিল এবং যাহারা সুলতান আলাউদ্দিনকে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপকর্মী কমজাত সালেমের পুত্র, যে, প্রথম সুলতানকে আঘাত করিয়াছিল; এক দুই বৎসর পরেই তাহার গুপ্ত স্থান পচিয়া খসিয়া যায়। এখতিয়ার উদ্দিন, যে এমন একজন সুলতানের শির কাটিয়াছিল, খুব শীঘ্রই পাগল হইয়া যায় এবং মৃত্যুর সময় চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে, ঐ যে সুলতান জালাল উদ্দিন, তরবারি হাতে আমার মাথা কাটিতে আসিতেছে।

সুলতান আলাউদ্দিন অন্যের প্ররোচনায় রাজ্য হস্তগত করিলেও খুব অল্প দিনই তাঁহার ইচ্ছামত সবকিছু ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধনজন ও সহায় সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এমন একজন বদান্য পৃষ্ঠপোষকের অন্যায্য রক্তপাতে তাঁহার দ্বারা আরও এত অন্যায্য রক্তপাত ঘটিয়াছিল যে, তাহা কোন ফেরাউনের দ্বারাও সম্ভবপর হইত না। অন্তিমে প্রতারক সময় তাঁহাকেও শিকারে পরিণত করিল এবং তাঁহার সকল ধনজন ও সহায় নিজ হস্তে নষ্ট করাইল। নিষ্ঠুর প্রতারক তাঁহার নিজ হস্তে তাঁহার সন্তান-দিগকে বন্দী করাইল এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকেও তাঁহার দ্বারা হত্যা করাইয়া

ছাড়িল। তাঁহার প্রতিপালিত গোলামরা তাঁহার পুত্রদিগকে অন্ধ করিল এবং তাঁহার গোলাম পুত্ররাই তাঁহার পুত্রদিগকে হত্যা করিল। তাঁহার কন্যাদিগকে হিন্দু ও অন্যান্য অকৃতজ্ঞ লোকের হাতে দান করিয়া দিল। সুলতান জালাল উদ্দিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার দরুন, তাঁহার পুত্র কন্যা ও ধন দৌলত যেভাবে নষ্ট হইয়াছে, কোন অসভ্য দেশেও এমনটি কখনও হয় নাই।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমী এই গ্রন্থের ভুমিকায় বলিয়াছিলাম যে, এই গ্রন্থে যাহা লিখিব, তাহা সত্য হইবে এবং যাহাদের সম্পর্কে লিখিব, তাহাদের সুকীর্তি ও কুকীর্তির সকল দিকই উল্লেখ করিব। তবে যতদূর সম্ভব হয়, মানুষের সুখ্যাতির দিকটা বিস্তারিত বলিয়া অখ্যাতির দিকটা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি সোজাসুজি সকলের সুখ্যাতি ও প্রশংসার কথাই শুধু লিখি অর্থাৎ মোসাহেবীর পথ ধরি এবং অখ্যাতিগুলি সম্পূর্ণ গোপন করিয়া যাই, তাহা হইলে গুণীদের নিকট আমার এই প্রচেষ্টার কোন মূল্য থাকিবে না। ইহা ছাড়াও আল্লাহর নিকট প্রাপ্য শাস্তি হইতে আমি মুক্তি পাইব না। এই কারণে সুলতান আলাউদ্দিনের রাজ্য লাভের সময় তাঁহার পৃষ্ঠপোষককে হত্যা করিবার বিষয়ে যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা এই স্থলে বর্ণনা করিলাম। পরে তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যাপারে যাহা কিছু লক্ষ্য করিয়াছি, যথাস্থানে তাহা বর্ণনা করিব।

সুলতান জালাল উদ্দিনের শাহাদতের সংবাদ স্থলপথে আগমনকারী সৈন্যদলের সেনাপতি আহম্মদ চপের নিকট পৌঁছামাত্র তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। এই সময়ে সুলতান জালাল উদ্দিনের বেগম মালিকা জাহান একাকী কাজ করিতে গিয়া বোকামির পরিচয় দিলেন। তিনি এমনিতেই কিছুটা স্বাধীনচেতা ছিলেন। এই সময় তিনি দিল্লীর জ্ঞানীগুণীদের বলা সত্ত্বেও মুলতান হইতে আরকলি খানের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন না। আরকলি খান শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিলেন। বেগম তাঁহার পরিবর্তে সুলতান জালাল উদ্দিনের কনিষ্ঠ পুত্র রুকন উদ্দিন ইব্রাহিমকে তখতে বসাইয়া দিলেন। ইহা করিতে গিয়া বেগম কাহারও পরামর্শ বা ইচ্ছা অনিচ্ছার পরোয়া করিলেন না। ইব্রাহিম একান্ত অল্প বয়সী যুবক, দুনিয়ার ছল চাতুরী সম্পর্কে তাহার কোন ধারণাই জন্মে নাই। তখতে বসাইবার পরই বেগম সাহেবা মালীক ও আমীর উমরাহগণ সহ কেলুখড়ি হইতে দিল্লীর সবুজ মহলে আসিলেন এবং দরবার

ডাকিয়া দিল্লীতে উপস্থিত মালীক ও খানদের মধ্যে জায়গীর ও পদাদি বন্টন করিয়া দিলেন। মালিকা জাহান নিজেই শাহী কাজকর্ম দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখেই আবেদন নিবেদন পেশ করা হইত এবং তিনিই উপযুক্ত আদেশ নির্দেশ প্রদান করিতেন।

আরকলিখান মায়ের এই প্রকার অনুদার ও অনিয়মিত কার্যের সংবাদ শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং মুলতানেই বসিয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে মহলে মাতা-পুত্রের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল এবং শাহী কাজকর্ম বেশ কিছুটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল।

আরকলি খানের দিল্লীতে না আসিবার খবর এবং মহলে মাতাপুত্রের মধ্য-কার সর্বপ্রকার মতান্তরের সংবাদ যথারীতি সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট কোড়ায় গিয়া পৌঁছিল। তিনি শত্রু পুরীর এই বাদবিসম্বাদে খুশী হইলেন এবং আরকলি খানের মুলতানে অবস্থানকে সৌভাগ্য বলিয়া ভাবিলেন। তাঁহার প্রতারণার কোন অভাব ছিল না। সুলতান জালাল উদ্দিনের নিহত হওয়ার সময় হইতে ধন বিতরণ করিয়া তিনি বহুলোককে নিজের দলে টানিয়া লইয়া-ছিলেন। তাহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া এক বিরাট সৈন্যদল সহ তিনি যমুনার তীরে পৌঁছিলেন। সুলতান জালাল উদ্দিনের আমীর-উমরাহদের মধ্যে ধন বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে বশীভুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারও ধনের লোভে নিমক হালালী ও নিমক হারামীর সর্বপ্রকার মূল্য বোধ ভুলিয়া গিয়া মালিকা জাহান এবং সুলতান পুত্র ইব্রাহিমকে ত্যাগ করিয়া আলাউদ্দিনের দলে ভিড়িতে লাগিলেন। এইভাবে সুলতান আলাউদ্দিন পাঁচ মাস ধরিয়া পথে পথে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অগণিত লোক লশকর সহ দিল্লীর দুই তিন ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া মালিকা জাহান পুত্র ইব্রাহিমকে সঙ্গে লইয়া মুলতানের দিকে পলাইয়া গেলেন। সুলতান জালাল উদ্দিনের অন্তরঙ্গ কিছু সংখ্যক আমীর-উমরাহ্ ও তাঁহাদের ধনজন দিল্লীতে ফেলিয়া রাখিয়া মালিকা জাহানে সঙ্গে গিয়া নিমকহারামীর পরিচয় দিলেন।

সুলতান জালাল উদ্দিনকে হত্যা করিবার পাঁচ মাস পর সুলতান আলা-উদ্দিন দিল্লীতে আসিয়া শাহী তখত দখল করিলেন। সুলতানের খুন ও নিজের নিমকহারামীর কথা চাপা দিবার জন্য তিনি এখানেও প্রচুর ধন বিতরণ করি-লেন। ইহাতে কাজ হইল; জালালী আমীর উমরাহ্‌রা তাঁহার বাধ্য হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ববর্তী সুলতানের সকল বদান্যতার কথা বেমালুম ভুলিয়া গেলেন।

সুলতান জালাল উদ্দিনের এই দুর্ঘটনা হইতে দিল্লীর জ্ঞানী অজ্ঞানী নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধ বুঝিতে পারিল যে, ধনের লোভেই সুলতান নিজেকে অপরের তরবারির মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দিনও এই ধনের লোভেই নিজ প্রতিপালককে হত্যা করিবার জঘন্য কুকাজে লিপ্ত হইলেন। জালালী আমীর উমরাহগণ যে ধরনের নিমকহারামীর পরিচয় দিলেন, তাহাও এই ধনের লোভেই সংঘটিত হইল।

"সম্পদই রক্তপাতে মূল কারণ, অথচ সে নির্বিকার;
এমন কেহ নাই যে এই সম্পদের নিকট হইতে-
রক্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে।"

সুলতান আলাউদ্দিন মুহম্মদ শাহ খিলজী

সদরে জাহান কাজী সদর উদ্দিন আরিফ : কাজী মুগিস উদ্দিন বয়ানা ; কাজী হামিদ উদ্দিন মুলতানী ; শাহজাদা খিজির খান ; শাহজাদ—মুবারক খান ; শাহজাদ শাদিল খান ; শাহজাদা ফরিদ খান ; শাহজাদা উসমান খান ; কনিষ্ঠ শাহজাদার পুত্র মালীক শিহাব উদ্দিন ; ভাই উলুগ খান আলমা'স বেগ ; নুসরত খান—উজির ; জাফর খান—আরজে মুমালেক ; আলপ খান—আমীর মুলতানী ; মালীক আলাউল মুলক—কতোয়াল ; মালীক ফকর উদ্দিন জুনা—দাদবেক ; মালীক বদর উদ্দিন আসগরী—সের দোয়াতদার ; মালীক তাজউদ্দিন কাফুরী ; খাজা উমদাতুল মুলক—আলাদবীর ; মালীক আআয উদ্দিন জয়শ ; নাসিরুল মুলক খাজা হাজী ; মালীক মুইন উদ্দিন ; সৈয়দ মালীক তাজ উদ্দিন জাফর : মালীক আআয উদ্দিন—দবীর ; মালীক কামাল উদ্দিন—দবীর ; মালীক হামিদ উদ্দিন—নায়েব উকিলেদর গাজী ; মালীক শায়খেক বারগাহ—অর্থাৎ সুলতান তুগলক ; মালীক নাসির উদ্দিন কুলাহযর ; মালীক মুহম্মদ শাহ ; মালীক হামিদ উদ্দিন—আমীর কুহ ; মালীক আলাউদ্দিন—আবার—কতোয়াল ; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন মিল আফগান ; মালীক আইনুল মুলক মুলতানী ; মালীক হাসান বেগী—খাস হাজেব ; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন নকীন ; মালীক আসাদ উদ্দিন সালারী ; মালীক সৈয়দ জহির উদ্দিন ; মালীক জব্বার উদ্দিন তমর ; মালীক কামাল উদ্দিন কুযক ; মালীক কাফুর হাজার দিনারী অর্থাৎ মালীক নায়েব ; মালীক কাফুর মারহাট্টা—নায়েব উকিলেদর ; মালীক দিনার—শাহানা-পীল, মালীক আ:বেক—আখোর বেক ; মালীক শাহীন—নায়েব বারবেক ; মালীক ফকর উদ্দিন খণ্ডা—নাসির খানের ভ্রাতষ্পুত্র। মালীক আলবেক খোদাওন্দ জাদা হাশীঘর ; মালীক কীরবেক, মালীক কীরান—আমীর শিকার ; মালীক রুকন উদ্দিন আম্বা ; মালীক আআয উদ্দিন রেজায়া খান ; হালবী কিতাব খান।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওস্সালাতু আলা
রসুলিহি মুহম্মদিও ও আলিহি আজমাঈন ও সল্লম—
তসলীমান কাসীরান কাসীরা বেরহমতিকা ইয়া আরহামার
রাহেমীন।

দোয়াপ্রার্থী জিয়াউদ্দিন বারাণী, আমি বলিতেছি, ৬৯৫ হিজরীতে সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। নিজ ভাইকে উলুগ খান, মালীক নুসরত জালিশরীকে নুসরত খান, মালীক হিযবর উদ্দিনকে জাফর খান ও নিজ দরবারের আমীর সনজর খসরু পুরাকে আলপখান খেতাব প্রদান এবং নিজ বন্ধু-বান্ধবদিগকে আমীর পদ দান করিলেন। যাহারা আমীর ছিলেন তাহাদিগকে মালীকের দলে স্থান দিলেন। তাঁহার প্রাচীন অনুগামী ও অনুচর-দিগকে যথাযোগ্য পদাদি দান করিলেন। নিজ আমীর, মালীক ও খানদিগকে প্রচুর তনখা দিলেন ; যাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত নতুন লোক ও চাকর-নফর গ্রহণ করিতে পারেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের হাতে যেহেতু অগণিত ধনদৌলত জমা হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি অনেক ধর্মবিরোধী কাজে উৎসাহ যোগাইলেন। পরিস্থিতির প্রয়োজনে, লোকজনকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে এবং সুলতান জালাল উদ্দিন হত্যার অখ্যাতিকে ঢাকা দিবার জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককেই দান ধ্যানে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। অন্যদিকে দিল্লীতে আগমনের জন্যও প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। শরৎকালের দিকে দিল্লীতে যাইতে মনস্থ করিলেন।

সুলতান জালাল উদ্দিনের মধ্যম পুত্র তৎকালের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আরকলি খান সম্বন্ধে সুলতান আলাউদ্দিনের যথেষ্ট আশংকা ছিল। কিন্তু দিল্লী হইতে সংবাদ আসিল যে, তিনি তথায় আসেন নাই। তাঁহার না আসাকে সুলতান আলাউদ্দিন সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, রুকন উদ্দিনের পক্ষে দিল্লীর তখতে টিকিয়া থাকা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কারণ সুলতান জালাল উদ্দিনের ভাণ্ডারে এত সম্পদ নাই যে, তদ্দ্বারা নূতন সৈন্যদল গঠন করা যাইতে পারে। এইজন্য সুলতান এই সুযোগটি কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিলেন এবং বর্ষাকালেই দিল্লী যাইতে উদ্যত হইলেন।

ঐ বৎসর অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে গঙ্গাযমুনা সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং ছোট নদীনালা মাত্রই গঙ্গা যমুনার ন্যায় দেখাইতেছিল। জল কাদায় রাস্তাঘাটও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দিন এহেন অবস্থায় হাতীঘোড়া, লোকলস্কর ও মালমাত্তা সহ কোড়া হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার খান, মালীক ও আমীরদিগকে বলিলেন, তাহারা যেন নতুন নতুন সোয়ারী সংগ্রহ করিতে যত্নবান হয় এবং চাকর-নফরের মাহিনা নির্দিষ্ট করিতে দ্বিধা সংকোচ না করে। যেন অর্থ ব্যয় করিতে কার্পণ্য দেখাইয়া এই সকল কার্যে অধিক সময় ব্যয় না করে। কারণ একমাত্র নি:সংকোচ অর্থব্যয় করিলেই মানুষ সুলতানের চতুর্দিকে ভীড় জমাইবে।

সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লী আসিবার সময় সহজে নড়াচড়া করা যায়, এমন একটি 'মিঞ্জিনিক' সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মিঞ্জিনিক চালকের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, রাত্রিবাসের জন্য সুলতানের তাঁবু যে কোন স্থানেই টানানো হউক না কেন, সে প্রতিদিন উক্ত মিঞ্জিনিকে পাঁচমণ স্বর্ণরৌপ্যের তারা ভরিয়া উপস্থিত লোকদের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। লোকেরা চতুর্দিকে ভীড় করিয়া এই সকল তারা কুড়াইয়া লইবে। ইহার ফলে সুলতানী তাঁবুর চতুর্দিকে মানুষের হাট বসিয়া

গেল। দুই তিন সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই হিন্দুস্তানের সকল পল্লী ও শহরে এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লী জয়ের জন্য যাইতেছেন, তিনি মানুষের মধ্যে বেশুমার ধনদৌলত বিলাইয়া দিতেছেন এবং অসংখ্য লোক-কে চাকর-নফর হিসাবে নিজের দলে গ্রহণ করিতেছেন। এই সংবাদে চতুর্দিক হইতে ফৌজী ও সাধারণ লোকেরা সুলতানের সৈন্যদলের দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। সুলতান আলাউদ্দিন বাদাউন পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই ছাপ্পান্ন হাজার অশ্বারোহী ও ষাইট হাজার পদাতিক তাঁহার চতুর্দিকে জমা হইয়াছিল। সাধারণ লোকের ভীড় ছিল প্রায় সংখ্যাতীত। সুলতান আলাউদ্দিন বরণ পৌঁছিলে নুসরত খান বরণের ঈদগাহ ময়দানে স্থানীয় লোকদের মধ্যে খান্দানী ও শরীফজাদাদিগকে কর্মচারী হিসাবে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের বেতন নির্ধারণের কোন প্রকার হিসাব করিলেন না। বরং উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলেন যে, যদি দিল্লীর রাজ্য আমাদের হাতে আসে, তাহা হইলে এখন যে ধনদৌলত বিতরণ করিতেছি, উহার শতগুণ প্রথম বৎসরেই সংগ্রহ করিয়া শাহী খাজনায় জমা করিব। আর যদি দিল্লীর সাম্রাজ্য আমাদের হাতে না আসে, তবে যে ধনদৌলত আমার বুকের রক্ত পানি করিয়া দেবগিরি হইতে আনিয়াছি, তাহা শত্রুদের হাতে পড়া অপেক্ষা মানুষের হাতে যাওয়াই ভাল।

সুলতান আলাউদ্দিন বরণ পৌঁছার সময় জাফর খানকে কোলের রাস্তা হইয়া সসৈন্যে আসিবার কথা বলিলেন। সুলতান যে সময় বাদাউন ও বরণ আসিবেন, ঠিক তখনই জাফর খানও যেন কোলের পথে সমপরিমাণ দূরত্ব অগ্রসর হইয়া আসেন। দিল্লীর যে সকল আমীর ও মালীক সুলতান আলাউদ্দিন ও জাফর খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন ; যেমন মালীক তাজউদ্দিন কুচী, মালীক আমাজী আখোরবেক, মালীক আমীর আলী দেওয়ানা, মালীক উসমান আমীর আখোর, মালীক আমীর কেলান, মালীক উমর সুরখা, মালীক হরিণ মার—সকলেই বরণে আসিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং প্রত্যেকে বিশ ত্রিশ মণ, এমন কি অনেকে পঞ্চাশ মণ সোনারূপা লাভ করিলেন। এই সকল আমীর মালীকের সঙ্গে যে লোকজন আসিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে তিন শত মুদ্রা করিয়া নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। সুলতান জালাল উদ্দিনের সৈন্যবল ক্রমশঃ এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দিল্লীতে যে সকল আমীর মালীক অবশিষ্ট ছিলেন, তাহারাও নিরাশ ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। যে সকল আমীর মালীক সুলতান আলাউদ্দিনের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়া-ছিলেন, তাহারা উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, শহরের লোক আমাদের নিন্দা করিতেছে যে, আমরা নিমকহারামী করিয়া নিজ মালীকের পুত্রকে ত্যাগ

করিয়াছি এবং শত্রুর সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ এমনই অবিবেচক, তাহারা ইহাও জানে না যে, জালালী সাম্রাজ্য সেই দিনই শেষ হইয়া গিয়াছে, যে দিন সুলতান জালাল উদ্দিন কেলুখড়ির প্রাসাদ হইতে বিদায় লইয়া বেপরোয়া হইয়া কোড়ায় গমন করিয়াছেন এবং জানিয়া শুনিয়া নিজের ও সঙ্গীদের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা সুলতান আলাউদ্দিনের পক্ষাবলম্বন না করিয়া অন্য কী করিব!

এইভাবে সুলতান আলাউদ্দিনের পক্ষে মালীকগণ চলিয়া যাওয়ায় জালালী সৈন্যদল যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন অল্পমতি মালিকা জাহান মুলতান হইতে আরকলি খানকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে পত্রে লিখিলেন, আমি ভুল করিয়াছি ; তোমার ন্যায় উপযুক্ত পুত্র থাকা সত্ত্বেও কনিষ্ঠ পুত্রকে তখতে বসাইয়াছি। মালীক আমীরদের কেহই তাহাকে চাহিয়া দেখে না। অধিকাংশ মালীকই আলাউদ্দিনের পক্ষে যোগদান করিয়াছে। সাম্রাজ্যের বাগডোর আমাদের হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে। এমন অবস্থায় যথাসম্ভব সত্বর তুমি আস এবং তোমার পিতার তখতে আরোহণ কর। আমার অনুরোধ মাত্র এইটুক যে, তোমার যে ছোট ভাই তখতে বসিয়াছিল, তাহাকে যথাযোগ্য স্থান দিও। সে যথারীতি জোড় হস্তে তোমার খেদমতে উপস্থিত থাকিবে। আমি অল্প বুদ্ধি মেয়ে লোক, মেয়েলোকেরা সাধারণত: অল্প বুদ্ধিই হইয়া থাকে ; ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। নিজ মায়ের ভুল ধরিও না। তোমার পিতার রাজ্য গ্রহণ কর। যদি তুমি রাগান্বিত হইয়া না আস, তবে আলাউদ্দিন যেরূপ দলবলসহ আসিয়াছে, অবশ্যই দিল্লী জয় করিয়া লইবে। তখন আমাকে যেমন রেহাই দিবে না, তেমনই তোমাকেও বিনাশ করিতে ছাড়িবে না। কিন্তু আরকলি খান তাঁহার মায়ের ডাকে দিল্লী আসিলেন না ; বরং লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যেহেতু আমাদের আমীর মালীকরা শত্রুর সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে, সেইজন্য বর্তমানে আমার দিল্লী আসায় কোন লাভ হইবে না।

সুলতান আলাউদ্দিন যখন শুনিলেন যে, মায়ের ডাকে আরকলি খান সাড়া-দেন নাই, তখন তিনি সৈন্যদলকে আনন্দ করিতে আদেশ দিলেন। যমুনার অতিরিক্ত পানি ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য সুলতান তখন যমুনার ঘাটগুলিতে সৈসন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। এই অবস্থায় শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যমুনার পানি বহুলাংশে কমিয়া গেল। এই সময় সুলতান আলাউদ্দিন সমুদয় সৈন্যসহ গুদারা পার হইয়া জোদা প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

সুলতান রুকন উদ্দিন ইব্রাহিমও শাহী জাঁকজমকের সহিত তাঁহার সৈন্যদল সহ শহর হইতে বাহির হইয়া সুলতান আলাউদ্দিনের সম্মুখীন হইলেন এবং

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে রাত্রি আসিল এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রুকন উদ্দিনের সৈন্যদলের বামপার্শ্বের সকল সৈন্য সশব্দে অশ্বারোহণ করিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের দলে আসিয়া যোগদান করিল। ইহার ফলে সুলতান রুকন উদ্দিনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। তিনি শেষ রাত্রেই বাদাউনের দরজা খুলিতে আদেশ দিলেন এবং কোষাগার হইতে প্রচুর মুদ্রা, কয়েক জোড়া সোনারূপা এবং বাছা বাছা ঘোড়ার উপর আপনমাতা ও পরিবারবর্গকে উঠাইয়া 'গরনাইন' দরজা দিয়া শহরের বাহিরে আসিয়া মুলতানের দিকে রওয়ানা হইলেন। মালীক কুতুবউদ্দিন তাঁহার পুত্রগণসহ এবং মালীক আহমদ চপ তাঁহার তুর্কী দাসদাসী সহ মালিকা জাহান ও সুলতান রুকন উদ্দিনের সঙ্গে মুলতানে চলিয়া গেলেন।

পরদিনই সুলতান আলাউদ্দিন শাহী জাঁকজমকের সহিত সিরি ময়দানে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার বাদশাহী সর্বত্র গৃহীত হইতে চলিল। সিরিতেই তিনি সৈন্যদেরকে অবস্থান করিতে বলিলেন। শহর হইতে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ, হস্তীসহ হস্তীপালগণ, দুর্গগুলির চাবিসহ কতোয়ালগণ, কাজী এবং অন্যান্য প্রখ্যাত ও প্রধান শহরবাসীরা সুলতানের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শাহী কায়দা কানুনের অন্য এক জগৎ সৃষ্টি হইল এবং সংসারী কাজ কারবার সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিল। সুলতান আলাউদ্দিনের ধনসম্পদ ও লোকজনের প্রাচুর্য হেতু তাঁহার সমীপে কেহ আসুক বা না আসুক, তাঁহার নামে দিল্লীতে খোতবা পড়া এবং তাঁহার নামে টাকশালে মুদ্রা তৈরী হইতে লাগিল।

৬৯৫ হিজরীর শেষের দিকে সুলতান আলাউদ্দিন বিরাট জাঁকজমক ও প্রচুর লোকজন সহ শহরে প্রবেশ করিয়া দিল্লীর তখতে উপবেশন করিলেন। সেখান হইতে 'কওশকে লাল'-এ আসিলেন এবং উহাকেই শাহী মহল বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন। যেহেতু সুলতান আলাউদ্দিনের কোষাগারে বেশুমার ধনদৌলত ছিল, সেইজন্য তাহা লোকজনের মধ্যে নানা ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল। তঙ্কা ও চীতল পূর্ণ তোড়াতোড়া সম্পদ লাভ করিয়া লোকজন নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও মদ মাদকতায় বিভোর হইয়া পড়িল। শহরের নানা জায়গায় বিরাট বিরাট গম্বুজ তৈরী করা হইল। লোকজন আনন্দ উৎসবে মত্ত হইল। প্রতি গৃহে ভূরিভোজের ব্যবস্থা করিয়া আমীর, মালীক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একে অপরকে দাওয়াত করিলেন এবং এইভাবে গান বাজনা, মদ মাদকতা ও আনুষঙ্গিক হাসি-তামাশার সহিত অফুরন্ত ধুমধাম চলিতে লাগিল।

সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার যৌবন, অফুরন্ত ধনসম্পদ, লোকজন ও হাতী-ঘোড়ার নেশায় মত্ত হইয়া মহাভোগের জীবন যাপন করিতে লাগিলেন এবং ধন বিলাইয়া ও পুরস্কার দিয়া সকলকেই তাঁহার সাম্রাজ্যের কল্যাণকামী ও সমর্থক বানাইয়া ফেলিতে সক্ষম হইলেন। রাজ্যের সুবিধার জন্যই যে সকল জালালী আমীর আলাউদ্দিনের সাথে ভিড়িয়াছিলেন, তাহাদিগকে নানাপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ পদ ও জায়গীর দেওয়া হইল। তৎকালীন উজিরদের মধ্যে প্রসিদ্ধ খাজা খতীরকে উজির, দাওর মুলকের পিতা কাজী সদরে জাহান সদর উদ্দিন আরিফকে কাজী এবং সৈয়দ আজলী; যিনি প্রাচীন সৈয়দ, শায়খুল ইসলাম ও খতিব ছিলেন, তাঁহার উপর শায়খুল ইসলামী ও খোতবা পাঠের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। মালীক আমীর উদ্দিন ও আআয উদ্দিনের পিতা প্রবীণ উমদাতুল মুলকের উপর দেওয়ানে ইনশার ভার দিলেন। সুলতান উমদাতুল মুলকের দুই পুত্র মালীক হামিদ উদ্দিন ও মালীক আআয উদ্দিনকেও উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহাদের উভয়ের বিচার বিবেচনা, জ্ঞানগুণ ও লোক চেনার ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। তাহাদের একজন দরবারী হিসাবে নিযুক্ত হইলেন এবং অন্যজন দেওয়ানে ইনশার কাজে বিশেষ পদ লাভ করিলেন। নুসরত খান যদিও প্রথম দিকে নায়েব মুলক ছিলেন, তথাপি সিংহাসন আরোহণের বৎসরেই তাহাকে কতোয়ালের পদে নিযুক্ত করা হইল। মালীক ফকর উদ্দিন কুচী দাদ বেকী পদ লাভ করিলেন। জাফর খান আরজে মুমালেক, মালীক আবাচী জালালী আখোর বেক এবং মালীক হরিণমার নায়েব বারবেক পদ পাইলেন। সুলতান জালাল উদ্দিনের মালীক আমীর ও নিজস্ব লোকজন দ্বারা সুলতান আলাউদ্দিনের দরবার এমনই সুসজ্জিত হইল যে, অন্য কাহারও সময়ে অনুরূপ শোভা দেখা যায় নাই।

লেখকের চাচা মালীক আতাউল মুলক তখতে বসার বৎসরেই কোড়া ও অযোধ্যার জায়গীর লাভ করিলেন। মালীক জুনা সাবেক নায়েব উকিলদরী পাইলেন। লেখকের পিতা মালীক মুয়াইয়েদুল মুলককে সুলতান বরণের খাজা ও নায়েবের পদ দান করিলেন। অন্যবিধ আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ও জায়গীর বিখ্যাত ও বিচক্ষণ লোকদের হাতে সোপর্দ করা হইল। দিল্লীসহ সমুদয় শহর ও রাজ্যগুলি ফুলবাগানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। লাখেরাজভোগীদের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি, অজিফাভোগীদের জন্য অজিফা, দানখয়রাতভোগীদের জন্য দানখয়রাত ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে নির্ধারণ করা হইল। যাহা ছিল, তাহা হইতেও বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং সংশ্লিষ্ট লোকজনকে নূতন নূতন কাজ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইল। টাকা-পয়সা পাইয়া লোকজন এমনই

বেহুশ হইয়া পড়িল যে, তাহারা ভুলেও সুলতান আলাউদ্দিনের কুকীর্তি ও অকৃতজ্ঞতার কথা মুখে আনিত না এবং আমোদপ্রমোদে তাহারা এমনই মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনকিছুরই পরোয়া করিত না। সুলতান আলাউদ্দিনের তখতে বসিবার বৎসরেই তাঁহার মালীক আমীরের সংখ্যা প্রচুর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সকলকেই এক বৎসর বা ছয় মাসের তনখা অগ্রিম দিয়া দিলেন। ইহার ফলে এই বৎসর লোকজনের মধ্যে স্ফূর্তির ভাব এত বেশী দেখা গিয়াছিল এবং তাহারা ভোগবিলাসে এত বেশী মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এমনটি আমি আর কোন সুলতানের সময়ে দেখি নাই। এমন কি যাহারা বয়সে আমার অনেক বড়, তাহারাও এমন দৃশ্যের কথা স্মরণ করিতে পারেন নাই।

সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লীর তখতে বসিয়াই সুলতান জালাল উদ্দিনের পুত্রদের ক্ষমতা লোপ করিবার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং উলুগ খান ও জাফর খানকে বহুসংখ্যক মালীক আমীর ও ত্রিশ চল্লিশ হাজার সৈন্য সহ মুলতানে পাঠান। তাহারা মুলতানে পৌঁছিয়া শহর অবরোধ করিলেন। এক দুই মাস অবরোধে থাকিবার পর শহরের কতোয়াল ও অন্যান্য মুলতানী লোকজন জালাল উদ্দিনের পুত্রদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল এবং বহু আমীর বাহিরে আসিয়া উলুগ খান ও জাফর খানের দলে যোগদান করিল। সুলতান জালাল উদ্দিনের পুত্ররা শায়খুল ইসলাম শায়খ রুকনউদ্দিনের মধ্যস্থতায় উলুগ খানের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল এবং নিজেদের রক্ষার জন্য নানাবিধ শর্ত ও প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল। ইহার পর তাহারা শায়খ রুকন উদ্দিনের সহিত বিশিষ্ট আমীর ও মালীকগণ সহ উলুগ খানের নিকট উপস্থিত হইল এবং উলুগ খান উপস্থিত মত তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন ও তাঁহার তাঁবুর নিকটে তাহাদিগকে থাকিতে দিলেন।

দিল্লীতে এই যুদ্ধ জয়ের সংবাদ পৌঁছিলে যেখানে সেখানে বিরাট বিরাট গম্বুজ তৈরী করা হইল। সকলে মিলিয়া বাদ্যবাজনা সহ আনন্দ প্রকাশ করিল। মুলতান বিজয়ের সংবাদ উচ্চস্থান হইতে ঘোষণা করা হইল এবং এই সংবাদ সর্বত্র পাঠানো হইল। এই বিজয়ের ফলে হিন্দুস্তানী সাম্রাজ্য স্থায়ী ভাবে সুলতান আলাউদ্দিনের করতলগত হইল এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ রহিল না।

সুলতান জালাল উদ্দিনের পুত্রদ্বয় উভয়েই শাহী ছত্রের অধিকারী ছিলেন। উলুগ খান ও জাফর খান উভয়কে তাহাদের আমীর মালীক সহ নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই দিকে দিল্লী হইতে নুসরত

খানকে পাঠান হইল ; তিনি পথের মাঝে উলুগ খানের নিকট উপস্থিত হইয়া সুলতান জালাল উদ্দিনের উভয় পুত্র, তাঁহার জামাতা আলগু, নায়েব আমীর হাজেব আহমদ চপ প্রমুখকে দূরে সরাইয়া লইলেন এবং তাহাদের পুত্রপরিজন, দাসদাসী ও ধনদৌলত যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নুসরত খানের হাতে পড়িল। সুলতান জালাল উদ্দিনের পুত্রকে হাঁসী কেল্লায় আটকাইয়া রাখা হইল। আরকলি খানের পুত্রদেরকে হত্যা করা হইল। তাঁহাদের পরিবারবর্গ, মালিকা জাহান ও আহমদ চপকে দিল্লীতে আনায়ন করা হইল এবং তাঁহাদিগকে নুসরত খান নিজ গৃহে আটক করিয়া রাখিলেন। এইভাবে তাহাদের সমুদয় ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করা হইল।

দিল্লীর তখতে বসিবার দ্বিতীয় বৎসরে নুসরত খান উজির হইলেন। লেখকের চাচা মালীক আলাউল মুলককে সুলতান কোড়ায় যে সকল আমীর মালীক ও ধনদৌলত দিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সহ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনা হইল এবং অতিশয় স্থূলদেহ ও অথর্ব হওয়া সত্বেও প্রাচীন মালীকুল উমারার নিকট হইতে কতোয়ালীর পদ ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল। সমস্ত বন্দীকে তাঁহার নিকট সোপর্দ করা হইল। এই বৎসরেই সুলতান জালাল উদ্দিনের আমীর মালীকদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং নুসরত খান এই প্রকার সম্পদ সংগ্রহে একান্ত আতিশয্য প্রদর্শন করেন। ইহার ফলে তাঁহার হাতে প্রচুর ধনদৌলত আসিয়া জমা হইয়াছিল। তিনি সর্ব প্রকারে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সমস্ত ধনসম্পদ শাহী খাজনায় একত্র করিলেন এবং অতীত ও বর্তমানের সকল বিধি ব্যবস্থায় অনুসন্ধান চালাইবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইলেন।

এই (৬৯৬ হি:) বৎসরেই মোগলদের তরফ হইতে আক্রমণের আশংকা দেখা দিল। কিছু সংখ্যক মোগল সিন্ধের কাছাকাছি আসিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিল। সুলতান বহুসংখ্যক সৈন্য এবং জালালী ও আলাই উভয় শ্রেণীর আমীর মালীক সহ উলুগ খান ও জাফর খানকে মোগলদের পথরোধ করিবার জন্য পাঠাইলেন। মুসলমানরা জলন্ধরের সীমানায় শত্রুদের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মুসলমানদের জয় হইল এবং বহুসংখ্যক মোগল নিহত ও বন্দী হইল। বহু মোগলের শির দিল্লীতে আনা হইয়াছিল। মুলতান বিজয় এবং সুলতান জালাল উদ্দিনের পুত্রদিগকে পরাজিত করিবার ফলে আলাউদ্দিনের রাজত্ব স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল ; বর্তমানে মোগলদের পরাজয়ের পর উহা আরও দৃঢ় হইল। তাঁহার শক্তি ও প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইল। শহরের সবত্র বিজয় সংবাদ পাঠ করা হইল। শহরবাসীরা ঢাকঢোল পিটাইয়া গম্বুজ তৈরী করিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসব পালন করিল। সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বে এক নতুন জীবন দেখা দিল।

যে সকল আমীর মালীক সুলতান জালাল উদ্দিনকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা অগণিত সম্পদ, নানাবিধ উচ্চপদ ও জায়গীর লাভ করিয়া শহর ও সৈন্যদলে অবস্থান করিতেছিল। এইবার তাহাদিগকে ধরা হইল। অনেককে দুর্গে বন্দী, অনেককে অন্ধ এবং বহুসংখ্যক আমীর মালীককে হত্যা করা হইল। তাহারা যে সমস্ত সম্পদ আলাউদ্দিনের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল, তৎসমুদয় সহ সর্বপ্রকার সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। তাহাদের ঘরবাড়ী ও জায়গীর প্রাপ্ত গ্রামসমূহ সম্পূর্ণভাবে সুলতানের আয়ত্তাধিকারে আনা হইল। তাহাদের স্ত্রীপুত্র ও ধন-সম্পদের কোন কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তাহাদের চাকর-নকর ও অন্যান্য লোকজনকে আলাই আমীরদের খেদমতে নিযুক্ত করা হইল এবং হাতী ঘোড়া-গুলি সকলের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। জালালী আমীরদিগকে এইভাবে নির্মূল করার বিভীষিকা হইতে মাত্র তিন আমীর রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দিনের রাজ্যের শেষকাল পর্যন্ত তাহাদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করা হয় নাই। তাঁহাদের প্রথম জন হইলেন মালীক কুতুব উদ্দিন আলবী, দ্বিতীয় জন নাসির উদ্দিন রাণা শাহনাপীল এবং তৃতীয় জন কদর খানের পিতা মালীক আমীর দামালী খিলজী। কারণ এই তিন জনের কেহই সুলতান জালাল উদ্দিন কিংবা তাঁহার পুত্রদের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই এবং সুলতান আলা উদ্দিনের সম্পদের লোভেও পতিত হন নাই। এইজন ইঁহারা সকলেই শান্তিতে ছিলেন এবং অন্যান্য জালালী আমীরদের সকলকেই সমূলে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছিল। এই বৎসর নুসরত খান জবরদস্তি ও জরিমানা বাবদ এক কোটি মালশাহী খাজানায় জমা করিতে সক্ষম হন।

সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের প্রথম দিকে মালীক উলুগখান ও নুসরত খান বহু সংখ্যক আমীর উমরাহ ও সৈন্য সহ গুজরাটের দিকে গমন করেন এবং নহর ওয়ালা ও গুজরাট রাজ্যের চারিপার্শ্ব আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। ইহার ফলে করণ রায় নহরওয়ালা হইতে পলাইয়া দেব-গিরিতে রামদেবের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার পরিবার-পরিজন, ধনদৌলত ও হাতী-ঘোড়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। সমগ্র গুজরাট রাজ্য লুণ্ঠনের সামগ্রীতে পরিণত হয়। সুলতান মাহমুদের সোমনাথ আক্রমণ ও লুণ্ঠনের পর যে মূর্তিটিকে নতুনভাবে সোমনাথ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা যাহাকে দেবতা হিসাবে পূজা করিত, তাহা দিল্লীতে আনিয়া টুকরা টুকরা করিয়া সাধারণ লোকের চলাচলের পথে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই সময় নুসরত খান 'কফারেৎ' (থাম্বারেৎ ?)-এ অভিযান পরিচালনা করেন। তথাকার রাজারা খুবই সম্পদশালী ছিলেন। তিনি তাহাদের নিকট হইতে বহুমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করেন। মালীক নায়েব কাফুর হাজার দিনারী যাহার সৌন্দর্যের প্রতি আলাউদ্দিনের আসক্তি ছিল, নুসরত খান তাহাকে তাহার খাজার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া এই সময় দিল্লীতে সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট আনিয়াছিলেন।

উলুগখান ও নুসরত খান ও গুজরাটের লুণ্ঠিত সম্পদ লইয়া দিল্লীতে ফিরিবার পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাহারা লোকজনের নিকট লুণ্ঠিত মালের যথার্থ হিসাব চাহেন এবং এই কারণে অনেককে শাস্তিও দেন। সৈন্য দলের লোকেরা যে হিসাব দাখিল করিয়াছিল, তাহা তাহাদের মনঃপুত হয় নাই। ইহার ফলে তাহারা লোকজনের নিকট আরও বেশী দাবী করেন এবং সর্বপ্রকার লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে তাহাদের উপর অযথা জবরদস্তি করা হয়। অনেকেই এই অন্যায্য অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়। ইহার ফলে সৈন্য দলে অস্থিরতা দেখা দেয়। এই সৈন্য দলে নতুন মুসলমান আমীর ও অশ্বারোহী ছিল প্রচুর। তাহারা সকলে একমত হইয়া দুই তিন হাজার অশ্বারোহী একত্র জমা হয় এবং বিদ্রোহ করিয়া বসে। নুসরত খানের ভাই ও উলুগখানের আমীর হাজেব মালীক আআয উদ্দিনকে তাহারা হত্যা করে এবং তুমুল হৈ চৈ সহকারে উলুগখানের দরবারে উপস্থিত হয়। কিন্তু উলুগখান কলে কৌশলে নিজ তাঁবু হইতে পলাইয়া নুসরত খানের নিকট উপস্থিত হইতে সক্ষম হন। বিদ্রোহীরা উলুগখানের তাঁবুতে শায়িত সুলতান আলাউদ্দিনের ভাগিনেয়কে উলুগখান মনে করিয়া হত্যা করে। তাহারা সমগ্র সৈন্যদলকে অনুরূপ অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হইতে উৎসাহিত করে। ইহার ফলে সৈন্যদলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং আলাই সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ করিয়া আরও রক্তপাত ঘটায়। ইহাতে বিদ্রোহের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব কমিয়া যাইতে থাকে এবং পরিশেষে সৈন্য দলের অধিকাংশ লোক নুসরত খানের দরবারে আসিয়া একত্র হয়। নতুন মুসলমান আমীর ও অশ্বারোহীরা সৈন্য দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং যাহারা বিদ্রোহের মূল হোতা ছিল, তাহারা পলায়ন করে। তাহারা অন্য অঞ্চলের বিদ্রোহী রাজন্যবর্গের সহিত গিয়া মিলিত হয়। এই অবস্থার পর নুসরত খান সৈন্যদের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির হিসাব লইবার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেন এবং উলুগ খান ও নুসরত খান লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীসহ দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন।

এই বিদ্রোহের সংবাদ সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট দিল্লীতে পৌঁছামাত্রই তিনি তাঁহার অস্বাভাবিক ধারণার বশবর্তী হইয়া বিদ্রোহীদের পরিবারবর্গকে

গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দিলেন। ফলে এই সময় হইতে পুরুষদের অন্যায়ের জন্য স্ত্রীপুত্রদেরকে গ্রেপ্তার করিবার প্রথা চালু হইল। অন্যথায় ইহার পূর্বে দিল্লীতে পুরুষের অন্যায়ের জন্য স্ত্রীপুত্রকে অত্যাচার বা বন্দী করা হইত না। তাহাদের ধনসম্পদে হস্তক্ষেপ করা হইত না। এইভাবে নির্বিচারে বিদ্রোহীদের পুত্র পরিজনের গ্রেপ্তার হওয়ার পরপরই দিল্লীর অধিবাসীরা নুসরত খানের অত্যাচার দেখিয়া বিস্মিত হইল। এমনিতেই তাঁহার অত্যাচারে দিল্লী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইবার তাঁহার ভাইয়ের খুনের বদলা লইবার জন্য নুসরত খান তাঁহার ভাইকে হত্যাকারীর পুত্র পরিজনকে প্রকাশ্যে কুঠার হস্তে অপমান করিলেন এবং তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দিবার জন্য জল্লাদের হাতে দিয়া দিলেন। ছোট ছোট বাচ্চাদিগকে মায়ের সম্মুখে মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। এইভাবে তিনি যাহা করিলেন, তাহা কোন ধর্মে কেহ কখনও করে নাই। এই উপলক্ষে তাঁহার আচরণ দেখিয়া দিল্লীর লোকজন হতবাক ও বিস্মিত হইল এবং সকলেই মনে মনে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

উলুগ খান ও নুসরত খানের গুজরাট অভিযান কালে জাফর খান সিমস্তান আক্রমণ করিতে প্রেরিত হন। সিমস্তান বহু পূর্ব হইতেই সলদী, তাহার ভাই ও অন্যান্য মোগলেরা দখল করিয়া রাখিয়াছিল। জাফর খান বহুসংখ্যক লোকজনসহ সিমস্তানের দুর্গ অবরোধ করেন এবং তরবারি, কুঠার ও বল্লমের সাহায্যে এমন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হন। কোন প্রকার 'মুরাব', 'মিঞ্জিনিক' ও 'গারাদা' কাজে না লাগাইয়া এবং 'সাবাত', 'পাশীব' ও 'গার্গচ' ব্যবহার না করিয়া তিনি সলদী, তাহার ভাই ও অন্যান্য মোগলদিগকে দুর্গ ছাড়িয়া দিতে বলেন। ইহার উত্তরে তাহারা চতুর্দিক হইতে এমনভাবে তীর বর্ষণ করিতে থাকে যে, একটি পাখীর পক্ষেও তখন দুর্গের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব ছিল না। এই সত্বেও জাফর খান তরবারি ও কুঠারের সাহায্যে এই দুর্গ জয় করেন এবং সলদী, তাহার ভাই ও অন্যান্য মোগলদিগকে তাহাদের পুত্র-পরিজন সহ নিজ আয়ত্তে আনেন। তাহাদের সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দিল্লীতে পাঠান। এই দুর্গ জয়ের ফলে জাফর খানের প্রভাব প্রতিপত্তি পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণ বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার এইপ্রকার রুস্তমতুল্য বীরত্ব ও সাহসিকতাকে নিতান্ত সামান্য ব্যাপার বলিয়া মনে করিলেন এবং তাঁহার ভাই উলুগ খানের মগজে যেহেতু অদ্বিতীয় বীরের খ্যাতি লাভ করিবার পোকা কিলবিল করিতেছিল, সেইজন্য জাফর খানের সহিত তাহার মনোমালিন্য দেখা দিল। ঐ সময় জাফর খান সামানার জায়গীরদার ছিলেন। অতিশয় আত্মমর্যাদা বোধে ভারাক্রান্ত সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার এই প্রকার সুখ্যাতি শ্রবণে চিন্তান্বিত

হইলেন। ইহার ফলে তাঁহার বিষয়ে সুলতান দুইটি দিক চিন্তা করিলেন; হয় তাঁহার সহিত মেলামেশা বন্ধ করিবেন, নতুবা কয়েক হাজার সৈন্যসহ তাহাকে লক্ষণাবতীর দিকে পাঠাইবেন এবং জাফর খান ঐ দেশ জয় করিয়া সেখানেই অবস্থান করিবেন। অত্যাচারপ্রিয় সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট হইতে জাফর খান এইভাবেই তাঁহার বীরত্বের প্রতিদান পাইলেন। সুলতান তাঁহাকে বিষ দেওয়া বা অন্ধ করিয়া ফেলা হইতে অব্যাহতি দিয়া কৌশলে নিজের সন্মুখ হইতে তাঁহাকে বিদায় করিতে সচেষ্ট হইলেন।

এই বৎসরের শেষের দিকে যুদুল আইনের পুত্র কতলুগ খাজা দুই লক্ষ মোগলসৈন্য সহ হিন্দুস্তান আক্রমণ করিতে আসে। তাহারা 'মাওরায়ান্নাহার' হইতে নানাভাবে সুসজ্জিত হইয়া বিরাট যুদ্ধের উপকরণ সহ সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ দিল্লীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বৎসর যেহেতু তাহাদের মূল লক্ষ্য ছিল দিল্লী, তাহারা পথে কোনপ্রকার লুঠতরাজ করে নাই এবং পথের দুর্গগুলিতেও তাহারা কোন আঘাত হানে নাই। মোগলদের এই প্রকার পঙ্গপালের ন্যায় আসা ও পথে কোনপ্রকার লুঠতরাজ না করার ফলে দিল্লীর লোকজনের মধ্যে খুবই আতঙ্ক দেখা দিল। চতুর্দিকের শহরতলীর সর্ব-শ্রেণীর লোকজন দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দিল্লীর পুরাতন দুর্গ তখন খুব সুরক্ষিত ছিল না। মানুষ এই প্রকার আতঙ্ক ইতিপূর্বে কখনও অনুভব করে নাই বা এমন কিছু কখনও হইয়াছে বলিয়াও শুনে নাই। ফলে শহরের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই খুব অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অন্য-দিকে শহরে লোকজনের সমাগম এত বেশী হইয়াছিল যে, বাজার, গলি, মসজিদ, কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। শহরের সর্বপ্রকার দ্রব্য দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ ব্যবসায়ী ও সওদাগরদের আগমনের সকল পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইজন্য মানুষ অভাবের কারণে খুবই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল।

সুলতান আলাউদ্দিন অতিশয় জাঁকজমকের সহিত শহর হইতে বাহির হইলেন। সিরি প্রান্তরে উপনীত হইয়া সুলতান তাঁবু ফেলিলেন। চতুর্দিক হইতে সর্বশ্রেণীর আমীর, মালীক ও সম্ভ্রান্ত লোকজনকে সিরিতে ডাকা হইল। লেখকের চাচা মালীক আলাউল মুলক তখন দিল্লীর কতোয়াল ছিলেন। তিনি সুলতানকে সকল ব্যাপারে একজন অন্তরঙ্গ সভাসদ হিসাবে পরামর্শ দিতেন। তাঁহার নিকট এই সময়ে সুলতান দিল্লী শহর, শাহীমহল ও শাহী খাজনা খানার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সুলতানকে বিদায় জানাইবার জন্য তিনিও

দিল্লিতে রাখিয়াছিলেন। তিনি এক গোপন মজলিসে সুলতান আলাউদ্দিনকে বলিলেন, পূর্বকালের যে সকল বাদশাহ ও উজির প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও বিরাট বিরাট যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু জানিতে পারেন নাই; কখন কী হয়, কাহার জয় হয়, কিছুই বলা যায় না। এই জন্য ই তাহারা এইসব ব্যাপারে খুব সতর্ক হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। কারণ সমকক্ষ প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করায় দেশ, প্রজা ও ধনসম্পদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এই যুদ্ধের ব্যাপারটি যতই দূরে সরাইয়া রাখা যায়, ততই মঙ্গল। বাদশাহদের অছিয়ত নামায় লিখিত আছে, যুদ্ধ হইল এমন একটি দাঁড়িপাল্লা, সামান্য তারতম্যের ফলে যাহার একদিক ভারী ও অন্যদিক হালকা হইয়া পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সকল ক্ষমতা হাত হইতে চলিয়া যায় এবং যাওয়ার পর তাহা পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া বা সেই ব্যাপারে কোন কিছু করিবার কল্পনা করা যায় না। সেনাপতিদের মধ্যে যুদ্ধ হইলে ভয় করিবার তেমন কিছু নাই। কিন্তু বাদশাহদের মধ্যে যুদ্ধ আর জুয়াখেলা একই কথা। এই জনাই বাদশাহগণ এই ব্যাপারে খুবই চিন্তা করেন এবং যতদূর সম্ভব যোগ্য উপায় ও যথার্থ পরামর্শের মাধ্যমে এই বিপদ দূর করিতে চেষ্টা করেন। যেহেতু অন্যান্য বাদশাহ এই সকল কাজ কৌশলে সারিয়াছেন, সেইজন্য বর্তমান বাদশাহ কেন বিনা চিন্তা ভাবনায় এমন একটি বিপদের ঝুঁকি মাথায় লইবেন। জাঁহাপনা ইচ্ছা করিলে 'কোহান শতরী'কে মোগলদের সম্মুখে পাঠাইতে পারেন। তাহার অধীনে এক লক্ষ অশ্বারোহী রহিয়াছে। তাহাকে পাঠাইয়া পঙ্গপালের ন্যায় অগণিত মোগল বাহিনীকে কিছুদিনের জন্য ঠেকাইয়া রাখা যাইবে এবং বাদশাহ নানা কৌশলে যুদ্ধ এড়াইয়া যাইতে পারিবেন। ইহার দ্বারা লক্ষ্য করা যাইবে যে, উহারা কতদূর কী করে এবং কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। অতঃপর যদি যুদ্ধ একান্তই জরুরী হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাও যথাসময়ে করা যাইবে।

অন্যদিকে মোগলদের এই ভারী সৈন্যদল কোথাও লুটের মাল পায় নাই। বাদশাহের প্রস্তুতির সংবাদ শুনিয়া সমস্ত সৈন্য একত্রে অবস্থান করিতেছে এবং এই ভয়েই অন্যত্র দশটি অশ্বারোহীকেও পাঠাইতে চাহিবে না। এমতাবস্থায় এই অগণিত লোকজনের রসদ ইহারা কয়দিন চালাইয়া যাইতে পারিবে। তদুপরি বাদশাহ যদি দূত পাঠাইয়া ইহাদের প্রকৃত ইচ্ছা জানিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও আরও কিছুদিন চলিয়া যাইবে। ততদিনে উহারা নিশ্চয়ই অধৈর্য হইয়া পড়িবে এবং রসদের অভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। কিংবা রসদ সংগ্রহ করিবার জন্য অন্যত্র লুটতরাজ আরম্ভ করিবে। এই সময় যদি জাঁহাপনা কয়েক মঞ্জিল পিছনে ধাওয়া করেন, তবে খুবই উত্তম হইবে।

এইভাবে নিজ আবেদন পেশ করিয়া মালীক আলাউল মুলক বলিলেন, আমি আপনার অতি পুরাতন ভৃত্য। নানা সময়ে আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত হুজুরের খেদমতে নানা কথা বলিয়া থাকি। বর্তমানের এই বিরাট ব্যাপারেও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে, হুজুরের সমীপে নিবেদন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে সত্য উহাই, যাহাই জাঁহাপনা বিবেচনা করিবেন। কারণ জাঁহাপনার বিবেচনাই সকল মতামতের সারবস্তু। মোগলদের এই অবাঞ্ছিত হাঙ্গামা দূর করিবার উপায় হিসাবে বান্দার মনে আরও কিছু কথার উদয় হইয়াছে; যদি অবসর হয় তবে উহাও জাঁহাপানার নিকট নিবেদন করিতে ইচ্ছা রাখি। মোগলরা পঙ্গপালের ন্যায় অগণিত সৈন্য লইয়া আসিয়াছে। অবশ্য আমাদের সৈন্য সংখ্যাও তুচ্ছ করিবার মত নহে; তথাপি আমাদের অধিকাংশ সৈন্যই হিন্দুস্তানী। ইহারা হিন্দুরাজাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে বটে; কিন্তু মোগলদের সহিত একবারও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। এই কারণে ইহারা, বলিতে গেলে, মোগলদের যুদ্ধ কৌশলের কিছুই জানে না। কাজেই যদি এইবার উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করিয়া মোগলদিগকে বিতাড়িত করা যায় তাহা হইলে অনুসন্ধানের দ্বারা দিল্লীর সৈন্যরা এমনভাবে সুসজ্জিত হইয়া উঠিবে, যাহাতে তাহারা স্বেচ্ছায় মোগলদের সম্মুখীন হইতে দ্বিধা করিবে না।

সুলতান আলাউদ্দিন আলাউল মুলকের নিকট হইতে এই প্রকার নিমকহালাল ও সুবিধাবাদী পরামর্শ শুনিবার পর তাঁহাকে খুব বাহবা দিলেন। বড় বড় খান ও মালীকদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সম্মুখে বলিলেন, তোমরা সকলেই জান, আলাউল মুলক উজির এবং উজিরের পুত্র। সে আমার একান্ত বাধ্য ও কল্যাণকামী আপনজন। আমার মালীক থাকার সময় হইতে এই পর্যন্ত সে নানা বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিয়া আসিয়াছে। আমি তাহার দেহের স্থূলতার জন্যই শুধু তাহাকে কতোয়াল পদে নিযুক্ত করিয়াছি; নতুবা সে উজির হওয়ার যোগ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে যাহাতে আমি স্বয়ং মোগলদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ না হই, তজ্জন্য সে বহু যোগ্য পরামর্শ দিয়াছে এবং নানাবিধ প্রমাণও পেশ করিয়াছে। এখন আমার রাজ্যের সভাসদ তোমাদের সকলের সম্মুখে আমি ইহার উত্তর দিতে চাই; তোমরা সকলেই শোন। অতঃপর সুলতান আলাউল মুলকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, হে আলাউল মুলক, তুমি নিজেকে আমার পুরাতন খেদমতগার ও পরামর্শদাতা বলিয়া মনে কর এবং আমি তোমার মালীক ও এই দেশের বাদশাহ, ইহাও তোমার জানা আছে। এইজন্য যাহা যথার্থ ও সত্য, আজ তাহাই তোমাকে শুনাইব। কারণ পূর্বেও তুমি একদিন উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলে যে, উট

চুরি করা ও বাঁকা পথে চলা কখনও সম্ভব হয় না ; তেমনি দিল্লীর বাদশাহী করা ও আত্মগোপন করিয়া থাকা সম্ভব নহে। তুমি যেভাবে 'কোহান শতরী'র পিছনে চলা, মোগলদিগকে তুচ্ছ করা ও যুদ্ধ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেছ, তাহাও আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। সুবিধা থাকিলেও আমার জন্য মোগলদের এই যুদ্ধ কতকগুলি ভীরুর সাহায্যে দূরে সরাইয়া রাখা উচিত নহে। তুমি যেমন বলিতেছ, যদি আমি তেমন কিছু করি, তাহা হইলে এই যুগের মানুষ ও ভবিষ্যতের লোকজন আমাদের ভীরুতায় হাসিবে। বিশেষ করিয়া যে ক্ষেত্রে আমাদের দুশমনরা তাহাদের নিজ দেশ হইতে দুই হাজার ক্রোশ দূরে আসিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে কি আমি আলস্য করিয়া ভীরুতা দেখাইতে পারি কিংবা কোহান শতরীকে সম্মুখে রাখিয়া কলে-কৌশলে তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য কূট চক্রান্তের ডিমে তা দিবার জন্য বসিতে পারি ! তুমি যেমন বল, যদি আমি তেমনি করি, তবে আমি এই মুখ কাহাকে দেখাইতে পারিব, শাহী মহলেইবা কেমন করিয়া যাইব, আমার রাজ্যের লোকজনই বা আমাকে কী বলিয়া ভাবিবে এবং আমার রাজ্যের বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারীরাইবা আমাকে কী বলিয়া গণ্য করিবে।

তাই, যাহা কিছুই হউকনা কেন আগামী কাল আমি কেলি প্রান্তরে পৌঁছিব এবং কতলুগ খাজা ও তাহার সৈন্যদলের সম্মুখীন হইব। উহাদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দেখিব—খোদাতালা কাহাকে সাহায্য বা জয়ী করেন। হে আলাউল মুলক, তোমাকে আমি শহরের কতোয়াল করিয়াছি। বর্তমানে শাহী হারেম, খাজানা খানা ও শহরের যাবতীয় বস্তু তোমার হাতে তুলিয়া দিয়াছি। আমি ও আমার প্রতিপক্ষের মধ্যে যে কেহই জয়ী হইয়া ফিরুক না কেন, তুমি শহরের দরজা ও খাজানা খানার সকল কুঞ্জী তাহার হাতে তুলিয়া দিবে এবং তাহার অনুগত হইয়া থাকিবে। তোমার এত বুদ্ধি ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তুমি এই কথা কেন বুঝিতে পারিতেছ না যে, কৌশলে যুদ্ধ জয় করা তখনই সম্ভবপর হয়, যখন শত্রু শহর হইতে বহু দূরে অবস্থান করে। কিন্তু যখন শত্রু শহরের নিকটে আসিয়া মুখোমুখী দাঁড়ায়, তখন তাহার সম্মুখীন হইয়া নিজের প্রাণ হাতের মুঠায় লইয়া হইলেও তীর ও তরবারির সাহায্যে তাহার দর্পচূর্ণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না। তুমি যাহা বলিতেছ, উহা ঘরের কেচ্ছা ; বাজারে উহা শোভা পায় না। যে কথা জোব্বা পরিয়া অতি বিচক্ষণতার সহিত ঘরের মধ্যে বলা যায়, তাহা রক্ত প্লাবণে নিমজ্জিত যুদ্ধের ময়দানে বলা যায় না। তুমি বর্তমান সংকট সম্পর্কে বেশ কিছু চিন্তা করিয়াছ বলিয়া যাহা

জানাইয়াছ, আমি এই যুদ্ধ শেষ করিয়া যদি সময় পাই, তাহা হইলে যথাস্থানে উহা তোমার নিকট হইতে শুনিব। তুমি লেখাপড়া জান ও লেখাপড়া জানা লোকের সন্তান। আমার মনে হয়, এই সকল কথা শুনিবার পর তোমার পূর্বের ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইবে।

আলাউল মুলক বলিলেন, জাঁহাপনা, আমি আপনার অতি পুরাতন খেদমতগার। বিভিন্ন ব্যাপারে আমার মনে যাহা উদয় হয়, তাহাই মাত্র আপনার খেদমতে উপস্থিত করি। সুলতান বলিলেন, তোমার আন্তরিকতায় আমার কোন সন্দেহ নাই এবং সর্বদাই তোমার পরামর্শকে আমি মোবারকবাদ জানাইয়াছি। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমনই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, বুদ্ধিকে লুকাইয়া রাখিয়া প্রাণপণে তলোয়ার হাতে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়া এবং শত্রুর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই।

আলাউল মুলক অতঃপর বিদায় জানাইয়া বাদশাহের হস্তচুম্বন করিলেন এবং দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। শহরের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; শুধু বাদাউনী দরজা খোলা রহিল। শহরের লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া অনবরত দোয়াদরুদ পাঠ করিতে লাগিল।

কতলুগ খাজার সহিত আলাউদ্দিনের যুদ্ধ, মোগলদের পরাজয় এবং জাফর খান ও অন্যান্য আমীরদের শহীদ হওয়ার বিবরণ

সুলতান আলাউদ্দিন মুসলিম সৈন্যবাহিনী সহ সিরি হইতে কেলি প্রান্তরে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। কতলুগ খাজাও মোগল বাহিনী সহ সুলতানের সম্মুখীন হইল। কোনকালে কোথাও এত বিরাট দুইটি সৈন্যদলের পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সাধারণ লোকের মধ্যে তাই বিস্ময় ও আতঙ্কের সীমা পরিসীমা রহিল না। অতঃপর উভয় বাহিনী সারিবদ্ধভাবে একে অপরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মুসলিম সৈন্যদলের দক্ষিণ ভাগে ছিলেন জাফর খান। তিনি নিজ অধীনস্থ আমীর উমরাহ সহ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া আক্রমণ করিলেন এবং অতি দ্রুত মোগল বাহিনীর মধ্যে মিশিয়া গেলেন। মোগলরা তাঁহার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। মুসলিম বাহিনী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। জাফর খান ছিলেন সেই যুগের রুস্তম। তিনি অব্যাহত গতিতে মোগলদের পিছনে ধাওয়া করিয়া চলিলেন। তরবারির আঘাতে মোগল বাহিনীকে জর্জরিত করিয়া তাহাদিগকে আঠার ক্রোশ দূর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। মোগলদের

পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিবার পর্যন্ত সাহস ছিল না এবং তাহারা এমনই আতংক-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, লাগাম ও ঘোড়ার লেজের পার্থক্যও তাহারা ভুলিয়া বসিয়াছিল। মুসলিম বাহিনীর বাম ভাগে ছিলেন উলুগ খান। তাহার অধীনে বড় বড় যোদ্ধা আমীর ও অধিক সৈন্য ছিল। কিন্তু জাফর খানের সহিত তাঁহার শত্রুতার জন্য তিনি যুদ্ধের ময়দান ছাড়িয়া খুব অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না এবং জাফর খানকে সাহায্য করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। মোগলদের তুরগী বেগ নিজ সৈন্যদলসহ বুরুজীর পথে লুকাইয়া বসিয়াছিল। তাহার সৈন্যরা গাছে চড়িয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতেছিল; কিন্তু তাহাদের কেহই জাফর খানকে দেখিতে পায় নাই। শুধু তুরগী বেগ লক্ষ্য করিয়াছিল যে, জাফর খান মোগল সেনাদের পিছু ধাওয়া করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া চলিয়া-আসিয়াছে; অথচ কোন সৈন্যদল তাঁহার সাহায্যে আসে নাই। এই সুযোগে সে নিজ সৈন্যদল সহ জাফর খানের পিছন দিক ঘিরিয়া ফেলিল। ফলে চতুর্দিক হইতে মোগল সৈন্যদ্বারা জাফর খান বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। তাহারা এইভাবে জাফর খানকে বেষ্টন করিয়া অনবরত তীর চালাইতে লাগিল। এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে জাফর খান ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন এবং যুগের এই মহাবীর ভূমিতে দাঁড়াইয়া তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রতিটি তীরে একেকটি মোগল সৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। এই সময় কতলুগ খাজা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া বলিল, তুমি আত্মসমর্পণ কর; আমি তোমাকে পিতার নিকট লইয়া যাইব এবং তিনি দিল্লীর বাদশাহের প্রদত্ত মর্যাদা অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করিবেন। কিন্তু জাফর খান তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মোগল সৈন্যরা দেখিল জাফর খানকে জীবিত বন্দী করা অসম্ভব। তাহারা চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া শহীদ করিল। জাফর খান শহীদ হওয়ার পর তাঁহার দলের সকল আমীর ও সৈন্য শহীদ হইল। হাতীঘোড়াগুলি আহত হইল এবং হাতীর মাহুতরাও মোগলদের হাত হইতে নিস্তার পাইল না। মোগলরা রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ গ্রহণ করিল। জাফর খানের আক্রমণের তীব্রতায় তাহারা আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শেষরাত্রে নানা ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া ত্রিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গেল এবং সেখানেও না থামিয়া আরও বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সীমান্ত পার হইল ও নিজেদের দেশে গিয়া পৌঁছিল। জাফর খানের ভয় তাহাদের অন্তরে বহুদিন পর্যন্ত ছিল; যেমন তাহাদের পশুগুলি পানি খাইতে ইতস্ততঃ করিলে তাহারা বলিত, পানি খাস না কেন, জাফর খানকে দেখিয়াছিস না কি? ইহার পর আর কখনও এত বড় সৈন্যদল যুদ্ধের ইচ্ছায় দিল্লীর প্রান্তে আসিয়া একত্র হয় নাই।

সুলতান আলাউদ্দিন কেলি হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মোগলদের পরাজয় এবং বিশেষ করিয়া জাফর খানের ন্যায় এমন একজন নির্ভীক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিনাশকে তিনি বিরাট জয় বলিয়া গণ্য করিলেন। তখতে বসিবার পরবর্তী তিন বৎসর আলাই দরবারে আমোদ-প্রমোদ, নানাবিধ জলসা ও উৎসব ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। সুলতান আলাউদ্দিনের সকল বিরাট কাজ একের পর এক সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য চতুর্দিক এই বিজয় বার্তায় মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রত্যেক বৎসরই সুলতান আলাউদ্দিনের দুই তিনটি করিয়া পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিত এবং প্রত্যেক বৎসরই তিনি গম্বুজ তৈরী করিয়া আনন্দ উৎসব করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা মতই রাজ্যের সর্ববিধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। তাঁহারা খাজানাখানা অগণিত ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রতিদিন তাঁহার সংগৃহীত মণিমানিক্যের প্রদর্শনী চলিতে লাগিল। হাতীশালায় প্রচুর হাতী এবং ঘোড়াশালায় সত্তর হাজারের অধিক ঘোড়া জমা হইল। শহর ও শহরের আশে-পাশে যেখানে বাদশাহের দৃষ্টি পড়িত, সেখানেই শত সহস্র লোক তাঁহার হুকুম তামিল করিবার জন্য জোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিতে পাইতেন। রাজ্যের কোথাও তাঁহার কোন অংশীদার বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

এইভাবে সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য হইয়া নানাবিধ সুখের নেশায় মত্ত হওয়ার ফলে তাঁহার অন্তরে এমন সব ধ্যান ধারণার উদয় হইত, যাহার কোন মাথা মুণ্ড ছিল না এবং যাহা কখনও কোন বাদশাহের অন্তঃকরণে উদিত হয় নাই। ইহার সহিত তাঁহার ভোগেচ্ছা, মূর্খতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা মিলিত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি অসম্ভব কিছু করিবার ও অসম্ভব কিছু হইবার ধারণা পোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখাপড়া সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না এবং আলেমদের সহিত মেলামেশাও করিতেন না। চিঠিপত্র লেখা বা পুস্তকাদি পাঠ করা তাঁহার দ্বারা হইত না। মেজাজ রুক্ষ্ম, প্রকৃতি কঠিন এবং তাঁহার অন্তঃকরণে কোমলতার লেশ মাত্র ছিল না। যতই দুনিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল, তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল ও সম্পদ হস্তগত হইল, ততই তিনি আরও বেশী মত্ত ও উদাসীন হইয়া উঠিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের অবস্থা সম্পর্কে এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার এ হেন মত্তাবস্থায় তিনি শরাবের মজলিসে বলিতেন, আমার সম্মুখে দুইটি বিরাট কাজ রহিয়াছে। সাথী সঙ্গীদের সহিত এই দুইটি বিরাট কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা যায়, তজ্জন্য পরামর্শ করিতেন। প্রায়শঃ বলিতেন, এই

ব্যাপারটি এইরূপ হইলে কেমন হইবে। যে দুইটি বিষয় সম্পর্কে তিনি আলোচনা করিতেন, তাহা হইল :

প্রথমটি সম্পর্কে তিনি বলিতেন, খোদাতালা তাঁহার নবীকে চারিজন বন্ধু দান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের শক্তি ও সামর্থের ফলে একদিকে খোদার ধর্ম সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি নবীর নাম চিরদিনের জন্য লোকের মনে অংকিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলেই নবীর ওফাতের পরও যত লোক নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া মনে করে, তাহারা সকলেই সেই সঙ্গে নিজেদেরকে নবীর উম্মত বলিয়াও মানিয়া লয়। খোদাতালা আমাকেও চারিজন বন্ধু দান করিয়াছেন; প্রথম উলুগ খান, দ্বিতীয় জাফর খান, তৃতীয় নুসরত খান এবং চতুর্থ আলপ খান। আমার ধনদৌলতে ইহারা সকলেই বাদশাহদের সমতুল্য শক্তি সামর্থের অধিকারী হইয়াছে। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে এই চারিজনের সাহায্যে একটি নতুন ধর্মের জন্ম দিতে পারি এবং তরবারির সাহায্যে সকল লোককে উক্ত ধর্মমত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারি। এইরূপ করিতে পারিলে এই ধর্মের মাধ্যমে আমি ও আমার বন্ধুবর্গের নাম তেমনিভাবে চিরস্থায়ী হইবে, যেমন নবী ও তাঁহার সহচরদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিবে। যৌবন ও দৌলতের নেশায় মত্ত আলাউদ্দিনের অন্য কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। তাই তিনি অতিশয় অযৌক্তিকভাবে শরাবের মজলিসে এই সকল কথা বলিতেন। একটি নতুন ধর্ম তৈরী করিবার জন্য আমীর মালীকদের সহিত পরামর্শ করিতেন এবং বারংবার বলিতেন, এই বিষয়ে কী কী করা যায়; যাহাতে আমার নাম কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে এবং আমি যাহা কিছু করি, আমার মৃত্যুর পর যেন মানুষ উহা নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে উৎসাহী হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বন্ধুদের সহিত বলিতেন, আমার ধনদৌলত, হাতী ঘোড়া ও লোকলস্কর প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমার ইচ্ছা এই দিল্লী শহর কাহারও হাতে সমর্পণ করিয়া সেকান্দর শাহার ন্যায় দেশ জয় করিতে বাহির হই এবং অধিকাংশ পৃথিবী আমার করতলগত করিয়া লই। যেহেতু কয়েকটি যুদ্ধ তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী অতি সহজে জয় হইয়াছিল, এইজন্য খোতবাতে তিনি নিজকে দ্বিতীয় সেকান্দর বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং পত্রাদিতেও লিখাইতেন। শরাবের মজলিসে আস্ফালন করিয়া বলিতেন, এক একটি দেশ জয় করিব আর এক একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে উহার ভার দিয়া আমি অন্য একটি দেশ জয় করিতে অগ্রসর হইব। এমন কে আছে যে, আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে। উপস্থিত শ্রোতারা যেহেতু জানিত যে, অতিরিক্ত ধনদৌলত, হাতী-

ঘোড়া ও চাকর-নফরের জন্য তাঁহার বুদ্ধি ঘোলাইয়া গিয়াছে, সেইজন্য তাহারা সুলতানের এই দুইটি বিষয়কেই তাঁহার বাজে খেয়াল বলিয়া ভাবিত এবং এই প্রকার উক্তির নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করিয়া লইয়াও প্রয়োজনের জন্য তাঁহার মেজাজের রুক্ষতা ও চরিত্রের দৃঢ়তাকে তাহারা সমীহ করিত। এই কারণে তাঁহার যথেচ্ছাচারের ভয়ে তাহারা এই প্রকার আলোচনার সময় খুবই বাহবা দিত এবং নানাবিধ উদাহরণ দিয়া সত্য মিথ্যা মিশাইয়া তাঁহার মর্জি মত আলোচনা করিত। ইহাতে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মত্ত অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া যাহা বাহির হয়, তাহা যতই অসম্ভব হউক না কেন, তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে।

সুলতান আলাউদ্দিনের শরাবের মজলিসের এই প্রকার বাজে খেয়াল শহরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই এই সকল কথা শুনিয়া হাসিতেন এবং ইহাকে তাঁহার নির্বুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতেন। অনেক বুদ্ধিমানই এইসব কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেন এবং একে অন্যকে বলিতেন, এই লোকটি ফেরাউনের ন্যায় দুর্মতি; লেখাপড়া সম্পর্কে তাঁহার কোন জ্ঞান নাই। তদুপরি তাহার হাতে এত ধনদৌলত জমা হইয়াছে, যাহা যে কোন জ্ঞানীকেও অন্ধ করিয়া দিতে পারে। এই অবস্থায় যদি শয়তান তাঁহার মনে সত্যই কোন ধর্ম প্রচারের কুমন্ত্রণা দেয় এবং সেই বদ খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য এই ব্যক্তি ষাইট সত্তর হাজার সৈন্য লইয়া চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই দেশে মুসলমান ও মুসলমানীর অবস্থা কী ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

আমার চাচা মালীক আলাউল মুলক তাঁহার শারীরিক স্থূলতার জন্য চান্দ্র মাসের প্রথম তারিখে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং তাঁহার শরাবের মজলিসে শরীক হইতেন। এইবার তিনি যথাসময়ে উক্ত শরাবের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন; সুলতান তাঁহাকেও উক্ত দুইটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আলাউল মুলক অন্যান্য লোকের নিকটও শুনিয়াছিলেন যে, সুলতান শরাবের মজলিসে এই সকল কথা বলিয়া থাকেন এবং উপস্থিত শ্রোতারা তজ্জন্য তাঁহাকে খুব বাহবা দিয়া থাকে। তাঁহার রুক্ষ মেজাজের ভয়ে কেহই সত্য কথা বলিতে সাহস করে না। সেইদিনও সকলেই সুলতানের মুখে ঐ সকল কথা শুনিল এবং আলাউল মুলকের নিকট যথার্থ উপায় জানিতে চাহিল। তিনি উত্তরে বলিলেন, যদি জাঁহাপানা এই মজলিস হইতে শরাব দূর করিতে রাজী হন এবং চারিজন মালীক ব্যতীত অন্য সকলকে চলিয়া যাইতে আদেশ দেন, তাহা হইলে উক্ত দুইটি বিষয় সম্পর্কে আমার মনে যে উপায় ও কৌশলের উদয় হইয়াছে, তাহা সুলতানের খেদমতে পেশ করিতে পারি। সুলতান সেই মত আদেশ দিলেন। মজলিস হইতে শরাব দূর করা হইল এবং উলুগ খান, জাফর

খান, নুসরত খান ও আলপ খান ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেখানে স্থান দেওয়া হইল না। আমীররাও বাহির হইয়া গেলেন। সুলতান আলাউল মুলককে বলিলেন, উক্ত দুইটি বিষয় সম্পর্কে তোমার মনে যে কলা-কৌশলের উদয় হইয়াছে, তাহা আমি ও আমার এই চারিজন বন্ধুর সম্মুখে প্রকাশ কর, যাহাতে তদনুপাতে কাজ হইতে পারে।

আলাউল মুলক প্রথমে নিজ অক্ষমতার কথা বলিলেন এবং পরে সুলতানের খেদমতে আরজ করিলেন, জাঁহাপনার কখনও ধর্মপ্রচারের কথা মুখে আনা উচিত নহে। কারণ ধর্ম প্রবর্তন করা নবীদের কাজ; বাদশাহদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ধর্ম আসমানী ওহীর দ্বারা প্রচারিত হয়; কোন মানুষের বুদ্ধির জোরে তাহা প্রবর্তন করা যায় না। হজরত আদমের সময় হইতে নবী ও রসুলরাই ধর্ম প্রচার করিয়াছেন এবং বাদশাহরা রাজ্যশাসন করিয়া আসিয়াছেন। এই প্রথাই এতদিন চলিয়া আসিয়াছে এবং যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত চলিবে। কোন বাদশাহই নবী হন নাই; অবশ্য অনেক নবী বাদশাহী করিয়াছেন। হুজুরের খেদমতে আমার আরজ এই যে, এইজন্যই যাহা একান্তভাবে নবীদের কাজ এবং যাহা আমাদের নবীর সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই ধর্ম ও শরিয়তের কথা সুলতান যেন শরাবের মজলিসে ও উহার বাহিরে অন্যত্র কোথাও মুখে না আনেন। যদি সাধারণ ও বিশেষ তথা সর্বশ্রেণীর লোক জানিতে পারে যে, সুলতান একটি নতুন ধর্ম তৈরী ও উহা প্রচার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে এবং একটি মুসলমানও তাঁহার নিকট আসিতে চাহিবে না। চতুর্দিকে বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং এই প্রকার কথার জন্যও রাজ্যের ব্যবস্থাদিতে ভাঙ্গন ধরিতে পারে। জাঁহাপনা অবশ্যই শুনিয়াছেন যে, চেঙ্গিজ খান মুসলমানদের শহরগুলিতে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়াছে; কিন্তু কোথাও একটি মুসলমানের দ্বারা মোগলী ধর্ম ও আইন কবুল করাইতে পারে নাই। বরং বহু মোগল মুসলমান হইয়াছে এবং মুসলমানী আইন গ্রহণ করিয়াছে। কোন মুসলমান মোগল হয় নাই বা মোগলী ধর্ম গ্রহণ করে নাই।

আমি জাঁহাপনার একান্ত অনুগত নফর। আমার জান মাল, ধনদৌলত, যাহা কিছু আছে সকলই হুজুরের মঙ্গলের সহিত জড়িত। যদি সুলতানের রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবে আমার পরিবারবর্গ ও ধনদৌলত কোন কিছুই অক্ষত থাকিবে না। কাজেই আমি যদি সুলতানের রাজ্যশাসনে কোন ত্রুটির সন্ধান পাই, তাহা হইলে উহা দূর করিবার উপায় সুলতানের খেদমতে পেশ না করা পর্যন্ত আমার বালবাচ্চা, চাকর-নফর ও ধনদৌলত কোন কিছু সম্পর্কেই

আমাকে ক্ষমা করার আশা করিতে পারি না। এইজন্যই বলি, জাঁহাপনার মুখে উচ্চারিত এই সকল কথার দ্বারা রাজ্যে এমন ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে, যাহা শত বুরজচ মেহেরের পরামর্শেও দূর হইবে না। যাহারা বাদশাহের চাকর ও অনুগত সঙ্গী হওয়ার দাবী করে এবং একাধিক মজলিসে এই সকল কথা শুনিবার পর যাহারা উহাকে সত্য বলিয়া বাহবা দিয়াছে, তাহারা মোসাহেবী করিয়াছে মাত্র। সুলতানের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্রও কৃতজ্ঞতাবোধ নাই।

সুলতান আলাউদ্দিন আলাউল মুলকের এই সকল কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাঁহার চারি সহচরের নিকট আলাউল মুলকের কথা খুবই আনন্দদায়ক হইল। তাঁহারা সুলতানের উত্তরের আশায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুলতান আলাউল মুলককে বলিলেন, আমি তোমাকে গোপন পরামর্শে ডাকি এবং তোমার প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকি ; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমি তোমাকে নিমকহালাল বলিয়া জানি। কারণ অনেকবার আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, আমার সম্মুখে কথা বলিবার সময় তুমি যাহা সত্য, তাহাই বল এবং কোন কারণেই সত্যকে গোপন করিতে চেষ্টা কর না। আমি এই কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, তোমার কথাই ঠিক। আমার পক্ষে এই ধরনের কথা বলা উচিত নহে। ইহার পর আমার মুখ হইতে এইরূপ কথা আর কোথাও কেহ শুনিবে না। তোমার উপর ও তোমার পিতামাতার উপর খোদার রহমত বর্ষিত হউক। তুমি আমার সম্মুখে সত্য কথা বলিয়াছ এবং আমার নিমকের যথার্থ দাদ দিয়াছ। দ্বিতীয় ব্যাপারটি সম্পর্কে তোমার মত কি ? ইহাও কি ভুল, না যথার্থ বলিয়া তোমার মনে হয় ?

আলাউল মুলক সুলতানের দ্বিতীয় খেয়াল অর্থাৎ দিগ্বিজয় সম্পর্কে বলিলেন, জাঁহাপনার দ্বিতীয় বিষয়টি যথার্থই উন্নতমনা বাদশাহদের কাজ। কারণ বাদশাহের প্রকৃত ইচ্ছাই এই যে, সমস্ত পৃথিবী তাহার করতলগত হউক এবং সবকিছু তাহার আয়ত্তাধীনে চলিয়া আসুক। জাঁহাপনা ইচ্ছা করিলে এই অগণিত ধনদৌলত, হাতীঘোড়া ও চাকর-নফরের দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া দিল্লীর বাহিরে যাইতে পারেন এবং দেশ জয়ের বাসনা পূরণ করিতে পারেন। এই কারণে আমি দ্বিতীয় বিষয়টির যৌক্তিকতা অস্বীকার করি না। কারণ জাঁহাপনার হাতীশালা হাতীতে, ঘোড়াশালা ঘোড়ায় এবং খাজানাখানা ধনরত্নে পরিপূর্ণ। আপনি ইচ্ছা করিলে দুই তিন লাখ অশ্বারোহী সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া দিগ্বিজয়ের সাধ পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহার পূর্বে বাদশাহের চিন্তা করা উচিত যে, এমন ধনরত্নে পরিপূর্ণ দিল্লী শহর, যাহা বহু লোক ক্ষয় ও রক্তপাতের পর হাতে আসিয়াছে, তাহা কাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া যাইবেন ? কে সেই ব্যক্তি, যাহাকে

কিছু সংখ্যক লোকজন দিয়াও নিজে কিছু সংখ্যক লোকজন লইয়া এই প্রকার দিগ্বিজয়ে বাহির হইবেন এবং সেকান্দর শাহার ন্যায় দেশ জয় করিতে থাকিবেন। যাহাকে তিনি দিল্লী শহর বা অন্য কোন দেশের ভার দিয়া যাইবেন, এমন বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার যুগে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সেই লোক ও সেই দেশকে সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় পাইবেন কিনা সন্দেহ। সেকান্দর শাহার সময় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই যুগের লোকের অভ্যাসই ছিল এই যে, বহু বৎসর অতীত হইলেও তাহারা নিজেদের কথার মূল্য বজায় রাখিত। সেই যুগে ধোকাবাজী, মিথ্যা বলা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অভ্যাস খুব কম ছিল। যদি কোন দেশের লোক বা শাসক সেকান্দর শাহার সহিত কোন কথা বলিত বা প্রতিজ্ঞা করিত, তবে সাক্ষাতে হউক বা অসাক্ষাতে হউক, সকল অবস্থাতেই উহা রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিত। তদুপরি অ্যারিস্টটলের ন্যায় উজির কোথায় পাওয়া যাইবে! তখনকার সেই বিরাট রাজ্যের অগণিত লোক তাহাদের অফুরন্ত ধনদৌলত ও শক্তিসামর্থ থাকা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটলের একান্ত অনুগত ছিল। তাঁহার জ্ঞান, রচনাশক্তি ও ধার্মিকতার উপর তাহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। কোনপ্রকার লোকবল ব্যতীত এবং শাসন ও ত্রাসন ছাড়াই তাহারা অ্যারিস্টটলের আদেশের এমন বাধ্য ছিল যে, বাদশাহ সেকান্দরের অনুপস্থিতির সময় কোন শক্তিমান বা স্বভাববিদ্রোহী ব্যক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহস করে নাই। বত্রিশ বৎসর পরে যখন সেকান্দর শাহ আবার নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, তখন উহাকে পূর্বের ন্যায় আপন রূপেই পাইলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁহার রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। কিন্তু আমাদের যুগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষ করিয়া হিন্দু জাতি; স্বভাবগত ভাবেই তাহাদের মধ্যে কথা বা প্রতিজ্ঞা পালনের কোন অভ্যাস নাই। তাহারা যদি নিজেদের উপর কোন শক্তিশালী বাদশাহের শাসন দেখিতে না পায় এবং তাহাদের ধনজনের উপর মুক্ত তরবারি হস্তে কোন সৈনিককে প্রহরা দিতে না দেখে, তাহা হইলে তাহারা কোন আদেশ মান্য করিতে বা খাজনা দিতে চাহে না এবং নানাবিধ কুকার্যে লিপ্ত হইয়া অরাজকতার সৃষ্টি করে। অথচ জাঁহাপানার রাজ্য হইল এমনই কুখ্যাত এই হিন্দুস্থান! জাঁহাপানা দেশ জয়ে বাহির হইলে তাহা এক দুই দিনের কাজ নহে; বহু বৎসর লাগিবে। কাজেই যদি এই ধরনের অকৃতজ্ঞ ও অসজ্জন লোকদিগকে দীর্ঘকালের ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া যায়, তবে তাহারা যে কী করিবে ও কী করিবে না, উহার কোন ইয়ত্তা নাই।

সুলতান আলাউদ্দিন আলাউল মুলককে বলিলেন, আমার হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ লোক লস্কর ও হাতীঘোড়া জমা হইয়াছে; ইহাদের দ্বারা আমি যদি অপর রাজ্য হয় না করিয়া শুধু দিল্লীর উপরই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা

হইলে এতসব কিছু দিয়া আমার কী লাভ এবং আমার দিগ্বিজয়ের খ্যাতিই বা কেমন করিয়া প্রসার লাভ করিবে ?

আলাউল মুলক বলিলেন, আমি বাদশাহের অতি পুরাতন নফর। আমার মনে হয়, বাদশাহ দুইটি বিষয়কে সকলের উপরে স্থান দিবেন এবং এই দুইটি বিষয় শেষ হইলে অন্য ব্যাপারে হাত দিতে উৎসাহী হইবেন। সুলতান এই দুইটি বিষয় জানিতে চাহিলেন। আলাউল মুলক বলিলেন, উহাদের একটি হইল, সমগ্র হিন্দুস্তানের রাজ্যগুলিকে জয় করিয়া নিজ আয়ত্তে আনা। যেমন রণথাম্বুর, চিতোর, চান্দেরী, মালোয়া, ধারা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি ও পূর্বদিক হইতে সরযূ নদীর তীর পর্যন্ত এবং সোয়ালেক হইতে জালুর, মুলতান হইতে মরিলা পালম হইতে লাহোর ও দেবপালপুর পর্যন্ত সমুদয় রাজ্য এমনই বাধ্য ও অনুগত হইবে যে, কোথাও অরাজকতা বা বিদ্রোহের কোন নাম নিশানা থাকিবে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। মোগলদের আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য সুলতানের রাস্তার সমুদয় দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া উপযুক্ত কতোয়াল মোতায়েন করা, ভাঙ্গা দুর্গগুলি মেরামত, পরিখা খনন, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ মজুদ রাখা এবং প্রয়োজনীয় মিস্ত্রিনিক ও গার্রাদার দ্বারা উহাদিগকে সুসজ্জিত করা। এইগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানী লোক ও আজাদ করা গোলামদিগকেও সেখানে রাখিতে হইবে। এইভাবে প্রচুর লোকজন সহ সামানা, দেবপালপুর ও মুলতানে একজন করিয়া সেনাপতি সর্বদা নিয়োজিত থাকিবে। একমাত্র তাহা হইলে মোগলদের আগমন পথ বন্ধ হইবে। পরে মোগলরা হিন্দুস্তান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িলেও এই সকল লোকজন কাজে লাগিবে এবং সময়ে ইহারা একটি সুনির্বাচিত ও সুসজ্জিত বাহিনীতে পরিণত হইতে পারিবে।

এইভাবে এই দুইটি বিষয়—হিন্দুস্তানের সকল রাজ্যের বিদ্রোহী হিন্দুদিগকে দমন এবং মোগলদের আগমন পথে নির্বাচিত আমীর ও মালীকদিগকে নিয়োজিতকরণ, বাদশাহ তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী করিতে পারিবেন। ইহার ফলে বাদশাহ নিশ্চিত হইয়া রাজধানী দিল্লীতে বাস করিতে পারিবেন এবং তাঁহার অধীনস্থ সকল রাজ্যের স্থায়িত্ব সাধনে সক্ষম হইবেন। কারণ অধীনস্থ রাজ্যগুলির সুশাসন দ্বারাই রাজধানীর সুখ সমৃদ্ধি বিধান করা সম্ভব হয়। এইভাবে সর্ব বিষয়ে স্থায়িত্ব আসিলে বাদশাহ রাজধানীতে বসিয়াও রাজ্য জয় করিতে পারিবেন। তিনি চতুর্দিকে তাঁহার অনুগত চাকর-নফরদিগকে রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী আমীরদের অধীনে প্রচুর লোকজনসহ দূরদেশে পাঠাইবেন। তাহারা হিন্দুস্তানের সীমান্তের রাজ্যগুলি আক্রমণ করিয়া জয় করিবে। তথাকার ধনদৌলত,

হাতীঘোড়া ও লোকজনকে বাদশাহের খেদমতে লইয়া আসিবে। বিশেষ শর্তে সেই সকল বিজিত রাজ্যের শাসনভার তথাকার রায় বা রাণাদের উপর ছাড়িয়া দিবে ; যাহাতে তাহারা প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ হাতীঘোড়া ও ধনসম্পদ বাদশাহের খেদমতে প্রেরণ করে।

মালীক আলাউল মুলক বাদশাহের খেদমতে এই সকল মতামত পেশ করিয়া আরও আরজ করিয়া বলিলেন, জাঁহাপানার সম্মুখে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা ততদিন সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইবে না, যত দিন না বাদশাহ প্রচুর মদ্য পান, জলসা আহ্বান, আমোদ-প্রমোদে যোগদান ও শিকারে গমনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন। ইহার জন্য বাদশাহকে রাজধানীতে স্থির হইয়া বসিতে হইবে এবং অন্তরঙ্গ ও অনুগত বান্দাদের সুযুক্তি অনুসারে রাজ্যের সর্ববিধ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে বাদশাহের সকল কাজে শৈথিল্য আসিবে এবং যথাযোগ্য বিবেচনার সহিত তিনি কোন কাজ করিতে পারিবেন না। তেমনই অতিরিক্ত শিকারের নেশা ধোকাবাজ ও স্বভাব বিদ্রোহী-দের সম্মুখে সুযোগ আনিয়া দিবে এবং বাদশাহও সঠিকভাবে উহাদের খোঁজ-খবর লইতে পারিবেন না। যখন রাজ্যের সর্বশ্রেণীর লোক জানিতে পারিবে যে, বাদশাহ রাত্রিদিন শরাব ও শিকারে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তখন রায়তের মন হইতে ভীতি ও শ্রদ্ধার ভাব উঠিয়া যাইবে এবং প্রতারকরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে সর্বপ্রকারে তৎপর হইয়া উঠিবে। যদি বাদশাহ শরাব ও শিকার একান্তই ত্যাগ করিতে না পারেন, তবে এশার নামাজের পর কোন জলসা বা সঙ্গী ছাড়া সামান্য শরাব পান করিবেন। তাহাও এতটুক, যাহাতে কোনপ্রকার মত্ততা না আসে। শিকারের জন্য সিরিতে একটি মহল তৈরী করাইবেন। ইহার চতুর্দিকে প্রশস্ত ময়দান থাকিবে। উহাতে শিকরা পাখী উড়াইবেন ও তদ্বারা শিকারের খায়েশ পুরণ করিবেন। ইহার ফলে লোভী ও প্রতারকদের মনে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি দেখা দিবার অবকাশ থাকিবে না। আমার সকল বক্তব্যের সারবস্তু হইল বাদশাহের জীবন ও রাজ্যের স্থায়িত্ব। কারণ আমাদের সকল ধন-সম্পদ ও লোকজনের কল্যাণ বাদশাহ ও রাজ্যের স্থায়িত্বের সহিত জড়িত। খোদা না করুন, যদি এই রাজ্য অন্য কাহারও হাতে পড়ে, তাহা হইলে আমাদের ধনসম্পদ ও লোকজন কোন কিছুই রেহাই পাইবে না।

সুলতান আলাউদ্দিন আলাউল মুলকের এই সকল বক্তব্য শুনিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই যথার্থ পথ। খোদা তোমার মুখ দিয়া যে সত্যের সন্ধান দিয়াছেন, আমি তাহাই অনুসরণ

করিব। সুলতান আলাউল মুলককে একটি স্বর্ণ খচিত পোশাক ও কোমর- দশ হাজার তঙ্কা, দুইটি ভাল জাতের ঘোড়া এবং দুইটি গ্রাম উপহার দিলেন। যে চারিজন মালীকের সম্মুখে আলাউল মুলক শাহী বেদমতে তাঁহার মতামত এক প্রহর বেলা পর্যন্ত নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেই তিন চারি হাজার তঙ্কা এবং দুই তিনটি করিয়া সুসজ্জিত ঘোড়া আলাউল মুলকের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। এই সকল যুক্তির কথা শহরের বিশেষ জ্ঞানী, উজির ও উজির শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রচারিত হইলে তাঁহারা আলাউল মুলকের এই প্রকার পরামর্শের খুবই প্রশংসা করিলেন।

সুলতানকে পরামর্শ দানের এই ঘটনা সেই সময়ের, যখন জাফর খান জীবিত ছিলেন। সিসস্তানের যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি তখন দিল্লীতে সুলতানের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। কতলুগ খাজা মোগলের বিরুদ্ধে তখনও তাহাকে নিয়োজিত করা হয় নাই।

সুলতান আলাউদ্দিন প্রথমেই রণথাম্বুর বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। কারণ এই দুর্গটি দিল্লীর নিকটেই অবস্থিত ছিল এবং তৎকালে ইহার অধিকারী ছিলেন পৃথ্বিরাজের পৌত্র রাজা হাম্মির। সুলতান বয়ানার জায়গীরদার উলুগখানকে এই কার্যে নিয়োগ করিলেন এবং কোড়ার শাসনকর্তা নুসরত খানকে কোড়া ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত সৈন্যসহ রণথাম্বুরে আসিয়া উলুগ খানকে সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন। উলুগ খান ও নুসরত খান সম্মিলিত ভাবে ঝাবন অধিকার করিয়া রণথাম্বুর দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গ জয়ের চেষ্টায় একদিন নুসরত খান দুর্গপ্রাচীরের নিকট 'পাশিব' বাঁধা ও 'কিরগিচ' ঠিক করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় দুর্গের ভিতর হইতে শত্রুরা প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই প্রস্তরাঘাতে নুসরত খান গুরুতররূপে আহত হইলেন। কয়েকদিন পরে তিনি সেই আঘাতেই মারা গেলেন। সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি শাহী জাঁকজমকের সহিত রণথাম্বুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের রণথাম্বুর যাত্রা, তিলপথে অবস্থান ও তথায় আতক খানের বিদ্রোহের বিবরণ

সুলতান আলাউদ্দিন রণথাম্বুর দুর্গজয়ের উদ্দেশ্যে দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া তিলপথে উপনীত হইলেন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করিলেন। সেখানে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করেন। এইরূপ অবস্থানকালে প্রতিদিন শিকারে যাইতেন এবং লোকজন লইয়া জঙ্গল বেড় দিতেন। একদিন অভ্যাসমত শিকারে

গিয়াছেন ; পথে রাত্রি হওয়ার ফলে সেদিন আর শিবিরে ফিরিলেন না, সেখা-নেই তাঁবু টানাইয়া রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন ভোর হইতেই লোকজনকে জঙ্গল বেড় দিতে বলিলেন। সাথের সমস্ত লোক জঙ্গল বেড় দিতে আরম্ভ করিল এবং সুলতান মাত্র কয়েক জন সঙ্গীসহ ঘেরাও দেওয়ার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত ময়দানে একটি ঘোড়ার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় আতক খান সেখানে উপস্থিত হইল। সে সুলতানের ভাতিজা ; সুতরাং তাহার ধারণা হইয়াছিল যে, সুলতান আলাউদ্দিন যেমনভাবে তাঁহার চাচাকে হত্যা করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছেন, তেমনি সেও তাহার চাচাকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে কয়েক জন নতুন মুসলমান চাকর সহ সুলতানকে হত্যার জন্য আক্রমণ করিল। তাহার পুরাতন চাকর এই নতুন মুসলমানদিগকে সুলতানের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিল। তখন শীতের সময় ছিল ; সুলতান গায়ে জোব্বা ও চাদর জড়াইয়া ঘোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াই-লেন এবং ঘোড়াটিকেই ঢাল হিসাবে সামনে ধরিলেন। ইহার ফলে প্রায় সমস্ত তীরই ঘোড়ায় আটকাইয়া গেল। শুধু দুইটি তীরের ফলা ঘোড়ার বেষ্টনী ভেদ করিয়া সুলতানের বাজুতে আঘাত করিয়াছিল। ইহাতে সুলতান গুরুতররূপে আহত হইলেও তাঁহার দেহের অন্য কোথাও তীরের আঘাত লাগে নাই। সুলতানের মানিক নামে একটি চাকর ছিল ; সে সুলতানকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ফলে তাহার দেহেও তিন চারিটি তীর আসিয়া বিঁধিল। যে কয়জন পদাতিক সৈন্য সুলতানের আশেপাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও নিজেদের ঢাল দিয়া সুলতানের চতুর্দিকে আবরণের সৃষ্টি করিল। আতক খান নিজ সঙ্গীসহ আরও আগাইয়া আসিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল ঘোড়া হইতে নামিয়া সুলতানের শির কাটিয়া লয়। কিন্তু কাছে আসিয়া দেখিল পদাতিক সৈন্যরা সুলতানের চতুর্দিকে খোলা তরবারি হাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে এত বড় দুঃসাহসী কাজে হাত দিয়া সুলতানকে আহত করিয়াও এই কয়জন পদাতিক সৈন্যের সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। এমন সময় পদাতিক সৈন্যরা চীৎকার করিয়া উঠিল যে, সুলতান মরিয়া গিয়াছেন। আতক খানের বয়স অল্প এবং সে বোকা ও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ছিল। তাহার সহিত বেশ কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং সে সুলতানের নিকটেও পৌঁছিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু নিজের বোকামির জন্যই নিজের বিদ্রোহের পথ নিষ্কণ্টক করিতে পারিল না। সুলতানের শির কাটিয়া অন্য কাজে হাত দেওয়ার ধৈর্য তাহার ছিল না। সে পদাতিক সৈন্যদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ফিরিয়া গেল এবং যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি

তিলপথের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইল। সে বরাসরি সুলতানী দরবারে উপস্থিত হইয়া সুলতানের আসনে উপবেশন করিল। চতুর্দিকে সমবেত লোকজনকে উচ্চস্বরে বলিল, আমি সুলতান আলাউদ্দিনকে হত্যা করিয়াছি। লোকজনেরও ধারণা জন্মিল যে, সুলতানকে সে যদি হত্যাই না করিবে, তবে সুলতানী দরবারে আসিয়া তাঁহার আসনে বসিবার সাহস সে কোথায় পাইল! সৈন্যদলে ভীষণ শোরগোল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মাহুতরা হাতীর উপর হাওদা সাজাইয়া দরবারের সম্মুখে আসিল। চাকর-নফরেরা দরবারে আসিয়া নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইল। নকীবরা উচ্চস্বরে নানাবিধ সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিল। দরবারীদের অনেকে কোরআন পাঠ করিতে এবং বাদকরা বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিল। সৈন্যদলে যে সকল প্রবীণ লোক ছিলেন, তাহারা আতক খানকে মোবারকবাদ জানাইয়া তাহার হস্তচুম্বন করিলেন এবং নানাভাবে তাহার খেদমতে নিযুক্ত হইলেন। চাকর-নফররা বিসমিল্লাহ বলিয়া নতুন কাজ আরম্ভ করিল। কিন্তু নির্বোধ ও আহাম্মক আতক খান তখনই শাহী হারেমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল। মালীক দীনার হারেমী ইহাতে বাধা দিলেন। তিনি তাহার কতিপয় সঙ্গীসহ খোলা তলোয়ার হাতে হারেমের দ্বাররোধ করিয়া বসিলেন এবং আতক খানকে বলিলেন, তুমি সুলতান আলাউদ্দিনের কর্তিত শির দেখাও, তাহা হইলে হারেমে প্রবেশ করিতে আর কোন বাধা থাকিবে না।

ঐদিকে সুলতান আলাউদ্দিন যেখানে আহত হইয়াছিলেন, সেখানে তুর্কী অশ্বারোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং নানা দলে বিভক্ত হইয়া গেল। সুলতানের নিকট মাত্র যাইট সত্তর জন সৈন্য ছিল। আতক খান ফিরিয়া আসিবার পরই সুলতানের জ্ঞান ফিরিল। তাঁহার হাতের দুইটি জখম হইতে প্রচুর রক্তপাত হইয়াছিল। তিনি তাহা ধোয়াইয়া বাঁধাইলেন এবং আহত হাতটি দড়ির সাহায্যে গলার সঙ্গে লটকাইয়া দিলেন। সুলতানের ধারণা হইল অবশ্যই আতক খানের সঙ্গে বড় বড় আমীর মালীক ও অধিকাংশ সৈন্যের ষড়যন্ত্র রহিয়াছে; নতুবা তাহার পক্ষে এমন দুঃসাহসিক কার্য কখনও সম্ভবপর হইত না। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া তিনি সৈন্যদল হইতে সরিয়া গিয়া-রাত্রিদিন পথ চলিয়া অতি সত্বর নিজ ভাই উলুগ খানের নিকট ঝাবনে যাইতে মনস্থ করিলেন। পরে সেখানে থাকিয়া সম্ভব হইলে নিজ রাজ্য উদ্ধার অথবা অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি এই বিষয়ে তৎপর হইতে আরম্ভ করিলে প্রাচীন উমদাতুল মুলকের পুত্র মালীক হামিদ উদ্দিন নায়েব উকিলেদর তাঁহাকে বাধা দিলেন। হামিদ উদ্দিন বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে সেই যুগের বুরচজ মেহের ও অ্যারিস্টটল ছিলেন। তিনি বলিলেন,

সুলতানের এখনই শিবিরের দিকে তিলপথে যাওয়া উচিত। কারণ যাহাই ঘটুক না কেন, সৈন্যদল ও চাকর-নফর সকলেই সুলতানের নিমক খাইয়াছে; তাহারা শাহীছত্র দেখিবা মাত্র এবং সুলতান জীবিত আছেন, ইহা জানিবা মাত্র দলে দলে দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। মাহুতরা হাতী লইয়া আসিবে এবং অন্যান্য লোকজন তৎক্ষণাৎ নিমকহারাম আতক খানের শির নিজেরাই কাটিয়া বল্লমের আগায় বিদ্ধ করিয়া লইয়া আসিবে। যদি জাঁহাপনা রাত্রি এইখানে কাটান এবং লোকজন জানিতে না পারে যে, বাদশাহ সুস্থ রহিয়াছেন, তাহা হইলে ধীরে ধীরে তাহারা সেই বদবখতের বন্ধুতে পরিণত হইবে। একবার তাহার হাতে বয়েত করিলে জাঁহাপনার ভয় তাহাদিগকে তাহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করিতে বাধ্য করিবে।

মালীক হামিদের এইমত সুলতান আলাউদ্দিনের পছন্দ হইল। তিনি তখনই অশ্বারোহণ করিয়া শিবিরের দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে যে সৈন্যই সুলতানকে সুস্থ দেখিল, সেই আসিয়া সুলতানের সঙ্গে মিলিত হইল। এই ভাবে সুলতান সৈন্যদলের নিকট পৌঁছিতে পৌঁছিতে পাঁচ ছয় শত সৈন্য তাঁহার সঙ্গী হইয়া গিয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দিন সৈন্যদলে পৌঁছিয়া একটি উচ্চস্থান হইতে সর্বসমক্ষে নিজকে প্রকাশ করিলেন। অধিকাংশ লোকজনই শাহী ছত্র দেখিতে পাইল। ইহার ফলে দরবারের লোকজন সরিয়া পড়িল এবং চাকর-নফররা হাতীসহ সুলতানের চতুর্দিকে সমবেত হইল। আতক খান এই অবস্থা দেখিতে পাইয়া সত্বর তাঁবুর বাহিরে দণ্ডায়মান একটি অশ্বে চাপিয়া আফগানপুরের দিকে চলিয়া গেল। সুলতান আলাউদ্দিন সেই উচ্চস্থান হইতে শাহী জাঁকজমকের সহিত দরবারে আসিলেন এবং নিজ তখতে বসিলেন। দরবারী সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন। মালীক আযায উদ্দিন ইগানখান ও মালীক নাসির উদ্দিন নুরখান সুলতানের আদেশে আতক খানের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং আফগানপুর গ্রামে পৌঁছিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার শির সুলতানের দরবারে উপস্থিত করিলেন। সুলতান উক্ত শিরকে বল্লমে বিদ্ধ করিয়া সমগ্র সৈন্যদলেও দিল্লীতে দেখাইবার জন্য আদেশ দিলেন। দিল্লী হইতে বিজয় সংবাদ সহ এই শির উলুগ খানের নিকট ঝাবনে পাঠান হইল এবং আতক খানের ছোট ভাই কতলগ খাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইল।

সুলতান আলাউদ্দিন আরও কিছুদিন সৈন্যদলে অবস্থান করিলেন। যাহারা আতক খানের বিদ্রোহ সম্পর্কে কোনপ্রকার খবর জানিত তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করা হইল। তাহাদের অধীনস্থ লোকজনকে সুলতান

নিজের ক্ষমিয়া লইলেন এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া চতুষ্পার্শ্বের দুর্গগুলিতে পাঠাইয়া দিলেন।

এইভাবে আতক খানের বিদ্রোহের সর্বপ্রকার চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করিয়া সুলতান আলাউদ্দিন অবিরাম চলিয়া সৈন্যদল সহ রণথাম্বুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে শিবির স্থাপন করিয়া আতক খানের বিদ্রোহের সহিত যুক্ত অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেও শাস্তি দিলেন। রণথাম্বুর দুর্গ বহু দিন পূর্ব হইতেই অবরোধ করা হইয়াছিল, সুলতান সশরীরে তথায় আগমনের ফলে তাহা আরও সুদৃঢ় হইল। চতুর্দিক হইতে 'হাশিব' আনা হইল এবং মোটা মোটা থলিয়া সৈন্যদলে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা এইগুলি বালি পূর্ণ করিয়া দুর্গের চারি-পার্শ্বের গর্তে নিক্ষেপ করিল। এইভাবে তাহারা 'পাশিব' বাঁধিয়া 'গরগচ' নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইল। দুর্গের অধিবাসীরা বড় বড় পাথর দুর্গ প্রাকারে জমা করিয়া রাখিয়াছিল; তাহারা ইহা দ্বারা পাশিব নষ্ট করিয়া দিত এবং উপর হইতে অগ্নি নিক্ষেপ করিত। ইহার ফলে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হইল। ঝাবন হইতে ধার পর্যন্ত সর্বত্র এই প্রকার আক্রমণের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল।

সুলতানের ভাগিনেয় মালীক উমর খান ও মঙ্গু খান যথাক্রমে বাদাউন ও অযোধ্যার জায়গীরদার ছিলেন; তাহারা তথায় বিদ্রোহ করেন এবং তাহাদের সংবাদ সুলতানের নিকট রণথাম্বুরে আসিয়া পৌঁছায়

সুলতান আলাউদ্দিন যখন আতক খানের বিদ্রোহ দমন করিয়া সবেমাত্র রণথাম্বুর দুর্গজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং সমস্ত সৈন্যদলকে সেই কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, তখন মালীক উমর ও মঙ্গু খানের বিদ্রোহের খবর তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা সুলতানের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি এবং রণথাম্বুর দুর্গজয়ে তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টার সংবাদে উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা হিন্দুস্তানী কিছুসংখ্যক সৈন্যকে তাহাদের পক্ষে টানিতে সমর্থন হইয়াছিল। সুলতান কতিপয় হিন্দুস্তানী আমীরকেই তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। যেহেতু মালীক উমর ও মঙ্গু খান শুধু বিদ্রোহ ঘোষণাই করিয়াছিল, উহা রক্ষা করিবার কোন বন্দোবস্তই তাহারা করে নাই, সেইজন্য আমীররা অতি সহজেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের দরবারে হাজির করিতে সমর্থ হইলেন। সুলতান অত্যন্ত কঠোর চিত্তের পরিচয় দিয়া এই উভয় ভাগিনেয়কেই তাঁহার সম্মুখে শাস্তি দিলেন। তাহা-দের দেহগুলিকে ছুরি দিয়া তরমুজের ফালির ন্যায় টুকরা টুকরা করিয়া ফেলি-

লেন। তাহাদের লোকজন ও হাতী ঘোড়াকে নিজের করিয়া লইলেন। যে সকল সৈন্য তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই পলাইল এবং অবশিষ্ট হিন্দুস্তানী আমীরদের হাতে পড়িয়া বন্দী হইল ও শাস্তি পাইল।

মালীকুল উমার ফখর উদ্দিন কতোয়ালের আজাদকৃত গোলাম হাজী মওলার বিদ্রোহ

সুলতান আলাউদ্দিন সমস্ত সৈন্য সহ রণথাম্বুরের দুর্গজয় ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় দিল্লীতে প্রাক্তন কতোয়াল মালীক ফখর উদ্দিনের আজাদকৃত গোলাম হাজী মওলা বিদ্রোহ করিয়া বসিল এবং সে এক বিরাট অরাজকতার সৃষ্টি করিল। তাহার বিদ্রোহ সংবাদ তৃতীয় দিনে রণথাম্বুরে সুলতানের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। এই বিদ্রোহে দিল্লীর লোকজন ও সৈন্যদলে যথেষ্ট বিশৃ-ঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। হাজী মওলা নামে প্রাক্তন কতোয়ালের এই গোলাম-টির চরিত্রে নিয়ম কানুনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও বেপরোয়া যথেচ্ছাচারের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দিনের রণথাম্বুর দুর্গ অবরোধ ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করিতেছিল। এই কারণে তিনি সেখানে প্রায় সমুদয় সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেখানে বহু লোক হতাহত হইতেছিল এবং এই ব্যাপারটি দীর্ঘায়িত হইবার ফলে সৈন্যরা ক্রমে অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছিল। হাজী মওলা এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিল।

উল্লিখিত হাজী মওলা শিকারী কুকুরের খান শাহনকের পদে অধিষ্ঠিত ছিল। শহরের জনৈক কতোয়ালের নাম ছিল তিরমদী। তাহার অত্যাচারে লোকজন অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। সে বাদাউনী দরজার নিকট নিজের দালান তৈরী করাইয়া ভিতরের দিকে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং সেখা-নেই থাকিত। নিজ উজারতের দরবার হিসাবে সে সিঁড়িতে কয়েকটি ঘর তুলিয়াছিল। সেখানে বসিয়া লোকজনের কাজকর্ম চালাইত ও অভাব অভি-যোগ শুনিত। আহমদ আয়াজের পিতা আলাউদ্দিন আয়াজ নতুন দুর্গের কতোয়াল ছিলেন। হাজী মওলা দেখিল যে, শহরের জবরদস্ত কোন শাসক নাই; তদুপরি শহরের বাশিন্দারা কতোয়ালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠি-য়াছে। রণথাম্বুরে দুর্গ অবরোধের ফলে সৈন্যদল সেখানেই নিযুক্ত রহিয়াছে। দুর্গ জয়ের প্রচেষ্টায় তাহারা অবিরত নিহত হইতেছে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, যতদিনই লাগুক সুলতান দুর্গ জয় না করা পর্যন্ত একটি সৈন্যকেও দেশে ফিরিতে দিবে না। এইজন্য স্বাভাবিক কারণেই তাহাদের মনে অসন্তোষ জমিয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে হাজী মওলার ধারণা জন্মিল যে, অধৈর্য শহরবাসী ও সৈন্যদলের লোক তাহার সহায়ক হইয়া উঠিতে পারে। সে প্রাক্তন সকল কতোয়ালকে নিজের দলে টানিয়া লইল এবং এমন এক শোরগোলের সৃষ্টি করিল যে, উহার প্রভাবে সকলকেই কাঁপিয়া উঠিতে হইল। বস্তুতঃ দিল্লীতে তাহার বিদ্রোহের আগুন খুব শোরেই জ্বলিয়া উঠিল।

সময়টা ছিল রমজান মাসের মধ্যভাগ। সূর্য তখন মিথুন রাশিতে অবস্থান করিতেছিল। দিল্লীতে গরম হাওয়ার জন্য লোকজন ঘরে ঘরে বসিয়া আছে। অনেকে দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন নাই বলিলেও হয়। এমন সময় হাজী মওলা একটি মিথ্যা ফরমান বগলদাবা করিয়া জন কয় পদাতিক সৈন্যসহ খোলা তরবারি হাতে বাদাউনী দরজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কতোয়ালের বাসগৃহের সম্মুখে হৈচৈ শুরু করিয়া বলিল, আমি সুলতানের নিকট হইতে এক বিশেষ ফরমান লইয়া আসিয়াছি। কতোয়াল তখন দিবা নিদ্রা দিতেছিল। তাহার নিকটে কোন লোকজনও ছিল না। সে হৈচৈ শুনিয়া দুপায়ে জুতা গলাইয়া কোন প্রকারে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। হাজী তাহাকে ফরমান শুনাইবার পরিবর্তে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সাথীদিগকে আদেশ দিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিল। ফলে কোন কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই কতোয়ালের শির দেহচ্যুত হইল। তখন হাজী বগলের তলা হইতে সেই মিথ্যা ফরমান পাঠ করিয়া লোকজনকে বুঝাইল যে, সে ইহার বলেই কতোয়ালকে হত্যা করিয়াছে। উক্ত কতোয়ালের অধীনে শহরের যে সকল দরজা ছিল, উহার নকীবরা পূর্বেই হাজীর পক্ষে যোগ দিয়াছিল। তাহারা সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ফলে শহর ও উহার মধ্যকার সকল গৃহই তাহাদের আয়ত্তে আসিয়া পড়িল।

হাজী মওলা এইভাবে উক্ত কতোয়ালকে হত্যা করিবার পর নতুন দুর্গের কতোয়াল আলাউদ্দিন আয়াজকেও ডাকিয়া পাঠাইল। তাহাকেও হত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বিদ্রোহীদের মধ্যে কেহ তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়ায় তাহা আর হইল না। নতুন দুর্গের কতোয়াল হাজী মওলার এই বিশেষ ফরমান শুনিতে আসার পরিবর্তে লোকজন জড় করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিল এবং দুর্গের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পূর্বের কতোয়ালকে হত্যা করিবার সংবাদও সে পাইয়াছিল; সুতরাং কোন ছলা-কলাতে সে হাজীর ডাকে সাড়া দিল না। অগত্যা হাজী মওলা 'কওশকেলাল' নামক শাহী মহলে আসিয়া শাহী তখতে বসিল। সুলতান আলাউদ্দিনের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিল। বন্দীদের মধ্য হইতে অনেকেই তাহার পক্ষে যোগ দিল। হাজী খাজানা খানা হইতে তোড়া তোড়া

তঙ্কা বাহির করিয়া আনিয়া লোকজনের মধ্যে মুদ্রা বৃষ্টি আরম্ভ করিল। অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র ও অশ্বশালা হইতে অশ্ব আনিয়া বিদ্রোহীদের মধ্যে বাঁটিয়া দিল। যে কোন লোক তাহার পক্ষে যোগদান করুক না কেন, সে তাহার নিকট হইতে প্রচুর তঙ্কা ও চীতল পাইল। দিল্লীতে হজরত আলীর বংশধর বলিয়া পরিচিত এক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করিত। লোকেরা তাহাকে শাহ নজফের নাতি বলিয়া ডাকিত। মায়ের দিক হইতে সে সুলতান শামস উদ্দিনের নাতি হইত। হাজী মওলা কওশকেলাল হইতে একদল অশ্বারোহী সহ উক্ত গরীবের ঘরে গমন করিল এবং তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া শাহী তখতে বসাইয়া দিল। এই আলী বংশীয়কে সুলতান স্বীকার করিয়া তাঁহার হাতে বয়েত করিবার জন্য মালীক শ্রেণীর ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোকজনকে জোর করিয়া শাহী মহলে লইয়া আসিল। যাহাদের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছিল, এমন অনেকেই তঙ্কার লোভে ইচ্ছাপূর্বক শাহী মহলে আসিয়া তাঁহার হাতে বয়েত করিল। হাজী বিদ্রোহীদের মধ্যে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ পদও বণ্টন করিল। এই সময়ে দিল্লীর অধিবাসীরা সুলতান আলাউদ্দিন ও হাজী মওলার ভয়ে আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিল। রাত্রিদিন তাহারা গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাইত। সাত আট দিন ব্যাপী হাজী মওলার এই গোলমালের সংবাদ দুই তিনবার সুলতানের নিকট পৌছিল; কিন্তু সৈন্যদল ইহার বিশেষ কিছুই জানিতে পারিল না। ফলে তাহাদের মধ্যে তেমন কোন গোলমালও দেখা দিল না।

হাজী মওলার বিদ্রোহের তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে মালীক হামিদউদ্দিন আমীরে কূহ তাঁহার বীর পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সহ দিল্লীর পশ্চিম দরজা খুলিয়া শহরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাণ্ডার কূল দরজায় পৌছিলে সেখানে বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষ ঘটিল। উভয় পক্ষ হইতে প্রচুর তীর নিক্ষিপ্ত হইল। বিদ্রোহী-দের অনেকেই শুধু প্রচুর তঙ্কা লাভের আশায় প্রাণপণ যুদ্ধ করিল। দুই তিন দিনের মধ্যেই হামিদ উদ্দিন বহু নিমকহালাল লোকের সহায়তায় বিদ্রোহী-দিগকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া ফেলিলেন। এই সময় জাফর খানের কিছু লোক আরজ গোজারীর জন্য আমরূহা হইতে দিল্লীতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আমীরে কূহের পক্ষাবলম্বন করিল।

মালীক আমীরে কূহ পুনরায় ভাণ্ডার কূল দরজার সন্নিকটে হাজী মওলার সম্মুখীন হইলেন এবং কিছুক্ষণ সংঘর্ষের পর তিনি সুযোগ পাইয়া ঘোড়া হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাজীর বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন। হাজীর সমর্থক কিছু লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কিছুটা আহতও করিল, তথাপি তিনি হাজীর

বুক ছাড়িয়া পড়িলেন না। অবশেষে তাঁহার হাতেই হাজীর মৃত্যু ঘটিল। হাজীকে হত্যা করিবার পর সুলতান আলাউদ্দিনের অনুসারীরা সমবেত হইয়া কওশেক লালের সেই আলীর বংশধর গরীবের শির দেহচ্যুত করিল এবং উহা বল্লমে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত শহরে দেখান হইল। হাজীর মওলার হত্যা ও বিজয় সংবাদ সহ সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট রণথাম্বুরে লোক পাঠান হইল।

হাজী মওলার বিদ্রোহ দিল্লীকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল এবং ইহার ভয়াবহতার বহু সংবাদ একের পর এক সুলতানের নিকট পৌঁছিয়াও ছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু রণথাম্বুরের দুর্গজয়ে অতিশয় দৃঢ় চিত্ততার সহিত নিযুক্ত ছিলেন, সেইজন্য তথা হইতে দিল্লী আগমনের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করিলেন না। যে সকল সৈন্য দুর্গজয়ে নিযুক্ত ছিল, তাহারা যদিও সর্ববিষয়ে অধৈর্য ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সুলতান আলাউদ্দিনের শাস্তির ভয়ে তাহাদের কাহারও পক্ষে দিল্লী যাইবার কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। যাহা হউক পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই দিল্লীতে হাজী মওলা পক্ষীয়দের নিকট হইতে ধনসম্পদ আদায় করিবার জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল। খাজানা খানা হইতে যে পরিমাণ সম্পদ লোকজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সম্পূর্ণ সেই পরিমাণ আদায় করিয়া যথারীতি খাজানা খানায় জমা দেওয়া হইল। সাত আট দিন পর রণ-থাম্বুর হইতে উলুগ খান দিল্লীতে আসিলেন। মুইযউদ্দিনের শাহী মহলে বসিয়া তিনি বন্দী সকল বিদ্রোহীকে নিজের সম্মুখে আনাইলেন এবং যথোপযুক্ত শাস্তি দিলেন। রক্তের নদী প্রবাহিত হইল। মালীকুল উমারা প্রাক্তন কতো-য়ালের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাঁহার অনুসারী সকলকেও হত্যা করা হইল; অথচ তাহারা এই বিদ্রোহের কোন খবরই রাখিত না। তাহাদিগকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হইল যে, তাহা জনসমক্ষে বিদ্রোহের পরিণামকে দর্শনীয় করিয়া তুলিল।

গুজরাটে নতুন মুসলমানদের সহায়তায় আতকখানের বিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া হাজী মওলার বিদ্রোহ পর্যন্ত উপর্যুপরি চারিটি বিদ্রোহ দর্শনে সুলতান আলাউদ্দিনের চৈতন্য উদয় হইল। তিনি নানাবিধ অদ্ভুত খেয়ালের মোহ হইতে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। রণথাম্বুরের দুর্গ জয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং রাত্রি দিন গোপন পরামর্শ সভা ডাকিয়া এই সকল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। আলা দবীরের দুই পুত্র মালীক হামিদ উদ্দিন ও মালীক আআয উদ্দিন এবং মালীক আইনুল মুলক মুলতানী, এই তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই বিচার বিবেচনার দিক হইতে আস্নেক বুরজচ মেহেরের গুণে ভূষিত ছিলেন। সুলতান ইহাদিগকে ছাড়াও বহু গুণী লোককে তাঁহার পরামর্শ সভায় ডাকিতেন। সুলতান তাহাদিগকে বলিতেন যে, যদি এই সকল

বিদ্রোহের কারণ স্থির করা যায়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কারণ এমনভাবে সমূলে উৎপাটিত করা হইবে, যাহাতে পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর বিদ্রোহ ঘটিতে না পারে। কয়েকদিন আলোচনার পর স্থির হইল যে, বিদ্রোহের কারণ মূলতঃ চারিটি: এক—লোক চরিত্রের ভালমন্দ সম্পর্কে বাদশাহের খবর না রাখা। দুই—শরাব পান; কারণ শরাবের জলসাতে বেপরোয়াভাবে প্রত্যেকেই নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকে। ইহাতে পরস্পর মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায়। তিন মালীক ও আমীর উমরাহদের পরস্পর মিল মহব্বত; ইহার ফলে একজনের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইলে তাহা সহজেই আরও শতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহারা সেই মহব্বতের জন্যই তাহার সহায়ক হইয়া দাড়ায়। চার—সম্পদ; কারণ ইহার জন্যই সর্বপ্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে। যদি উহাদের নিকট প্রচুর না থাকে, তবে উহারা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হইয়া সেই অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করিবে এবং বিদ্রোহ করিবার অবকাশ পাইবে না। যে সকল বিদ্রোহ এই পর্যন্ত ঘটিয়াছে, তাহাও সম্পদের প্রাচুর্যের জন্যই; নতুবা তাহাদের মাথায় বিদ্রোহ করিবার কল্পনাও ঠাঁই পাইত না।

হাজী মওলার বিদ্রোহ দমনের পর সুলতান আলাউদ্দিন আপ্রাণ চেষ্টা ও বহুতর রক্তের বিনিময়ে অবশেষে রণথাম্বুরের দুর্গ জয় করিলেন। গুজরাটের বিদ্রোহের পর বহু নতুন মুসলমান এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সুলতান রাজা হাম্বির দেবসহ সকলকে হত্যা করিলেন এবং দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকা উলুগ খানের শাসনাধীনে অর্পণ করিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন রণথাম্বুর হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। শহরবাসীদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহের সময় নিষ্ক্রিয় ছিল বলিয়া সুলতান তাহাদের প্রতি রাগান্বিত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য প্রধান ব্যক্তিদের অনেকেই শহর হইতে নির্বাসিতও করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি শহরে প্রবেশ না করিয়া শহরতলীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সুলতানের চারি পাঁচ মাস কালীন অনুপস্থিতিতে উলুগ খান বহু সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তেলেঙ্গানায় অভিযান পরিচালনা করিবার আগে একবার দিল্লীতে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যেই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার লাশ শহরে আনিয়া তাঁহার গৃহে দাফন করা হইল। তাঁহার মৃত্যুতে সুলতান খুবই দুঃখ পাইলেন। তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য নানাভাবে তিনি প্রচুর দান খয়রাত করিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন বিদ্রোহের কারণ ও উহার প্রতিরোধ হিসাবে যে সকল উপায়ের কথা চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি ধনসম্পদ গ্রহণ

করাকেই প্রথমে স্থান দিলেন। রাজ্যের অন্তর্গত লাখেরাজ, জায়গীর ও পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত যত গ্রাম ছিল, সকলই সম্পূর্ণ ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ জারী করিলেন। জোর জবরদস্তি ও নানাবিধ জরিমানা ধার্যের দ্বারা যে কোন উপায়ে হউক লোকজনের নিকট হইতে ধনদৌলত আদায় করিতে ব্যাপৃত হইলেন। বহু লোকই বারংবার ধনসম্পদ দিল। অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, মালীক, আমীর, কারকুন, মুলতানী ও যাহাদের ঘর ছাড়া কোথাও তঙ্কার কোন চিহ্ন রহিল না। তাহাদের অবস্থাও তুলনামূলকভাবে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ সুলতান সর্বপ্রকার জায়গীর, লাখেরাজ ও পুরস্কারের সম্পদ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে সমস্ত রাজ্যব্যাপী লোকজনের নিকট মাত্র কয়েক হাজার তঙ্কা অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং মানুষ বাধ্য হইয়া ধনসম্পদ উপার্জনে এমনই ব্যাপৃত হইয়া পড়িল যে, কাহারও জন্য বিদ্রোহের নাম উচ্চারণ করিবার অবকাশ পর্যন্ত রহিল না।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্রোহের কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য চর ছড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে কোন ভালমন্দ সংবাদই সুলতানের অগোচরে রহিল না। কাহারও পক্ষে যথেচ্ছা মুখ খুলিবার অবকাশ ছিল না। মালীক, আমীর, কারকুন, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শহরবাসীদের ঘরে যে সকল আলোচনা হইত, সকলই চরদের কল্যাণে সুলতানের কানে আসিয়া পৌঁছিত। তেমন কিছু হইলে সুলতান ক্ষমা করিতেন না; তৎক্ষণাৎ উহার জবাব চাহিয়া পাঠাইতেন। এই অবস্থা এমনই চরমে পৌঁছিল যে, মালীক আমীররাও চরদের উৎপাতের ভয়ে মুখ খুলিয়া কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। অনেক সময় ইশারা ইঙ্গিতে কাজ চালাইয়া লইতেন। রাত্রিদিন তাহাদের ভয়ে ভয়ে কাটিত। যাহাতে সুলতানের বিরাগ ভাজন হইতে না হয়, সেইভাবে কথা বলিবার বা কাজ করিবার দিকে পূর্ণমাত্রায় তাহারা খেয়াল রাখিতেন। চরদের মারফৎ বাজারের সবপ্রকার বেচা কেনা ও অন্যবিধ কাজকর্মের সংবাদও সুলতানের নিকট পৌঁছিতে লাগিল এবং প্রয়োজন অনুসারে যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয়তঃ বিদ্রোহের কারণ দূর করিবার জন্য সুলতান শরাব পানও বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। পরে ক্রমশঃ পচাই মদ, ভাঙ্গ ও জুয়া খেলাও নিষিদ্ধ হইল বিশেষ করিয়া শরাব ও পচাই সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। এইজন্য নতুন কয়েদ খানাও খোলা হইল। সুলতান শরাব ও পচাই প্রস্তুতকারী এবং জুয়াড়ীদিগকে শহর হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। নিজ দপ্তরেও এই সকল পদার্থ হইতে আগত সবপ্রকার খেরাজের নাম কাটিয়া দিলেন।

এই ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখাইবার জন্য সুলতান প্রথমেই নিজের খাস শরাবী জলসার কাচ ও অন্যধাতুর সর্বপ্রকার সোরাহী ও পিয়ালা ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিলেন এবং এই সকল টুকরা বাদাউনী দরজার সম্মুখে আনিয়া স্তূপকৃত করা হইল। মদপূর্ণ সকল সোরাহী ও জালা খাস দরবার হইতে এখানে আনিয়া ঢালা হইল। ফলে বর্ষাকালের নদীনালার ন্যায় মদের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুলতান শরাবের জলসা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। মালীক ও আমীরদিগকেও এই ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা হাতীতে চড়িয়া শহর ও শহরতলীর সর্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, কেহ যেন কোথাও শরাব বিক্রয় ও পান না করে; এমন কি শরাবের নিকটেও না যায়। ইহার ফলে সম্ভ্রান্ত ও লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সুফল প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া গেল।

কিন্তু শরাব নিষিদ্ধ হওয়ায় এই ঘোষণা শুনিয়া শহরের গুণ্ডা বদমায়েশ ও চরিত্রহীন লোকেরা ভাঁটিখানায় প্রবেশ করিল। তাহারা তথায় গোপনে শরাব তৈরী, বিক্রয় ও পান করিত। কিন্তু কড়াকড়ি বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা নানা উপায়ে বাহির হইতে শরাব আনাইবার ব্যবস্থা করিল। কখনও পানির ন্যায় মশকের মধ্যে করিয়া, আবার কখনও লাকড়ীর বোঝার মধ্যে সোরাহী লুকাইয়া শহরে শরাব আনা হইত। কিন্তু সুলতানী চরেরা সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিত এবং ইহার ফলে এই সকল গোপন আমদানীও দরজার নকীব ও বারিদদের হাতে ধরা পড়িত। তাহারা এই শ্রেণীর লোকদিগকে বমাল গ্রেপ্তার করিয়া দরবারে হাজির করিত। শাস্তিস্বরূপ শরাব বিক্রয়কারী, পানকারী ও আমদানীকারী এই শ্রেণীর লোকজন প্রচুর লাথি গুঁতা খাইত এবং হাতে পায়ে জিঞ্জির পরাইয়া তাহাদিগকে কিছুদিন কয়েদ করিয়া রাখা হইত।

এই শ্রেণীর অপরাধের মাত্রা বাড়িয়া উঠিলে বাদাউনী দরজার নিকট কয়েদখানা স্বরূপ কতকগুলি কূপ খনন করা হইল। বহু অপরাধীকে সেই কূপে নিক্ষেপ করা হইত। ইহার ফলে কূপের সংকীর্ণতা ও অনাহারের দাপটে অনেকেই সেখানে প্রাণ হারাইত। কিছুদিন পরে যাহাদিগকে বাহির করা হইত, তাহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত এবং তাহাদের পক্ষে ঔষধপত্র ব্যবহার করিয়া পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইতে বহুদিন লাগিত। এই প্রকার কূপের কয়েদের ভয়ে অনেকেই শরাব পান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। যাহারা একান্তই নিরুপায়, তাহারা শহর হইতে দূরে যমুনার নানা ঘাটে এবং দশ বার ক্রোশ দূরের গ্রামাঞ্চলে গিয়া শরাব পান করিত। গিয়াসপুর, ইন্দ্রপথ, কেলুখড়ি এবং চারি-পাঁচ ক্রোশ দূরের গঞ্জ বন্দরেও প্রকাশ্যে শরাব পান ও বিক্রয় কাহারও পক্ষে

সম্ভব ছিল না। তথাপি এমন বহু লোক ছিল, যাহারা প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়া নিজেদের গৃহে শরাব তৈরী, পান ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিত। নানাভাবে অপমানিত ও কূপের কয়েদখানায় বারবার আবদ্ধ হইয়াও তাহারা এই কাজ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

এইভাবে শরাবের ব্যাপারে সুলতানী নির্দেশ ও শাস্তি চরমে পৌঁছিবার পর উহা কিছুটা শিথিল হইয়াছিল। সুলতান আদেশ দিলেন যে, যাহারা গোপনে নিজেদের গৃহে শরাব তৈরী ও পান করিবে, কিন্তু কোনপ্রকার জলসায় ব্যবস্থা বা বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে না, তাহাদের গৃহের কোণে হানা দিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইভাবে যে সময় হইতে শরাব পান করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল, তখন হইতেই বলিতে গেলে বিদ্রোহের জল্পনা কল্পনায়ও অবসান ঘটিল। সুলতানের উদ্দেশ্য সফল হইল।

চতুর্থতঃ বিদ্রোহের কারণ দূর করিবার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন আদেশ দিলেন যে, মালীক, আমীর ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা যেন একে অপরের গৃহে না যায় এবং কোন প্রকার জলসা না বসায়। তাহারা শাহী দরবারকে না জানাইয়া কোন প্রকার খানাপিনা বা বিবাহ শাদীর ব্যবস্থা করিতে এবং লোক-জনকে দাওয়াত দিতে পারিবে না। এই ব্যাপারেও যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করা হইল। ইহার ফলে মালীক আমীররা কেহ কাহারও গৃহে আসিত না এবং যাহাতে অধিক লোকজন হয়, এমন কোন খানাপিনা বা মেহমানদারীর প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। মালীক ও আমীররা সুলতানী চরের ভয়ে সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিত এবং পারতপক্ষে কেহ কোনপ্রকার জলসা বা খানাপিনার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইত না। তাহারা বেশী কথা বলিত না, শুনিতে চাহিত না এবং বিদ্রোহ করিতে চাহে, কুখ্যাতি আছে বা গুণ্ডামী করিয়া বেড়ায়, এমন কোন লোককে নিজেদের কাছে ঘেঁষিতে দিত না। দরবারে গেলে তাহারা কানাকানি করিয়া কোন কথা বলিত না এবং একে অপরের পাশাপাশি একত্রে বসিত না। তাহারা অপরের দুঃখের কথা শুনিত না এবং নিজের দুঃখের কথাও অপরের নিকট বলিতে সাহস করিত না। তাহাদের মধ্যকার সকল কথাই ইশারা ইঙ্গিতে চলিত। এই প্রকার অবস্থার ফলে বিদ্রোহ অরাজকতার নাম নিশানাও কোথাও রহিল না এবং কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হইল না।

এই সকল কাজ শেষ করিবার পর সুলতান আলাউদ্দিন জ্ঞানীদের নিকট এমন একটি পন্থা বা নিয়ম জানিতে চাহিলেন, যদ্বারা হিন্দুদিগকে শায়েস্তা করা যায়। যে ধনসম্পদ বিদ্রোহের কারণ হইয়া থাকে, উহার বিন্দু মাত্রও যেন

তাহাদের নিকট না থাকে এবং ক্ষত্রিয় ও শূদ্র উভয়ের নিকট হইতে সমানভাবে যেন খেরাজ আদায় করা হয়। অবশ্য এই ব্যাপারে যাহাতে সক্ষম ও অক্ষমের খেরাজ একপ্রকার না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শুধু হিন্দুদের নিকট যেন এই পরিমাণ মাল দৌলত না থাকে, যাহাতে তাহারা ভাল অস্ত্র কিনিয়া, পোশাক পরিয়া ও মনোমত ভোগ সম্ভোগ করিয়া দিন কাটাইতে পারে। রাজ্যশাসনের অন্তর্গত এই বিশেষ ব্যাপারটির জন্য দুইটি কানুন তৈরী করিতে হইবে। প্রথমটি হইল যাহারা কৃষিকাজ করে, তাহাদের জমির শ্রেণী, পরিমাণ, দূরত্ব ও তারতম্যের হিসাবে তাহারা অর্ধেক খেরাজ দিতে বাধ্য থাকিবে। এই ব্যাপারে 'খওতা' (ক্ষত্রিয়) ও 'বুলাহার' (শূদ্র) একই প্রকার নিয়মের অধীন হইবে। তদুপরি ক্ষত্রিয়ের নিকট প্রাপ্য খেরাজের কোন অংশই মাফ করা হইবে না। দ্বিতীয়টি হইল যে সকল গরু, মহিষ ও বকরী দুধ দেয় ও মাঠে চরিয়া বেড়ায়, উহাদের জন্য নির্দিষ্ট চারণভূমি রাখিতে হইবে এবং যত্রতত্র ইহাদের রাত্রিবাসের স্থান না করিয়া প্রকাশ্য ও নির্দিষ্ট স্থানে উহা করিতে হইবে। যাহাতে খেরাজ ধরিবার সময় উহাদিগকে একস্থানে পাওয়া যায় এবং কোনপ্রকার তারতম্যের সৃষ্টি না হয়। অবশ্য খেরাজের ব্যাপারে কাহাকেও রেহাই দেওয়া হইবে না।

এই ব্যাপারে যাহাতে যথাযথ কাজ করা হয়, তজ্জন্য সুলতান কর্মচারী, লেখক 'মুসরিফ' ও কারকুনদের মধ্যে যাহারা ঘুষ খাইত ও তহবিল তছরুফ করিত, তাহাদের সকলকে পদচ্যুত করিলেন এবং শরফ কাইকে এই দপ্তর পরি· চালনার দায়িত্ব দিলেন। শরফ কাই নায়েব উজির মুমালেকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং জ্ঞানগুণ ও অভিজ্ঞতা দক্ষতায় তিনি সেই যুগে রাজ্যে প্রায় অতুল-নীয় খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত কয়েক বৎসর এই দায়িত্ব পালন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। শহরের আশেপাশের সমস্ত গ্রামাঞ্চল, দোয়াব অঞ্চল, বয়ানা হইতে ঝাবন, পালাম হইতে দেবপালপুর ও লাহোর, সামানা ও সানামের সমদুয় অঞ্চল, রেউড়ী হইতে নাগুর, কোড়া হইতে কানুদী, আমরূহা, আফগানপুর ও কাবেরের গ্রামগুলি ধরিয়া বাদাউন, খরক ও কুয়েলা পর্যন্ত এবং কাথিয়াড়ের সমুদয় অঞ্চল-কে খেরাজের হিসাব অনুসারে ভাগ করিলেন। সমুদয় অঞ্চলকে দূরত্ব, পরিমাণ, কৃষি ও চারণ ভূমির মানানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। এই হিসাব মত খেরাজ আদায়ের ব্যাপারটি এতই মজবুত হইল যে, চৌধুরী, খওতা ও মুকদিমদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার হাতে লওয়া, ভাল কাপড় পরা, পান খাওয়া প্রভৃতি আয়েশের কাজ একবারে বন্ধ হইয়া গেল। ইহার

সঙ্গে তাহাদের মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার অভ্যাসও দূর হইল। খেরাজ আদায়ের ব্যাপারে ইহারা সকলে একই আদেশের অধীন ছিল। ইহাদের আনুগত্য এমন চরম আকার ধারণ করিল যে, গ্রাম-গঞ্জের একজন খেরাজ আদায়কারী বিশ জন চৌধুরী, খওতা ও মুকদ্দিমকে একত্র বাঁধিয়া খেরাজের জন্য মারপিট করিত; অন্যান্য হিন্দুরা ইহা দেখিয়াও উচ্চবাচ্য করিত না। বস্তুতঃ হিন্দুদের ঘরে এমন কোন সোনা চান্দি ও তঙ্কা চীতল অবশিষ্ট ছিল না, যাহার বলে তাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। এই প্রকার অসহায় অবস্থার ফলে হিন্দুদের জনবাচ্চারা মুসলমানদের ঘরে চাকুরী করিয়া দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

নায়েব উজির শরফ কাই খেরাজ আদায়কারী কর্মচারীদের ব্যাপারেও যথেষ্ট কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জরিমানা ও জবরদস্তি করিয়া যে সকল মুসরিফ, আমলা, দপ্তরী উহদাদার, গোমস্তা ও তহশিলদার ধন সম্পদ আদায় করিত, তাহারা উহার একটি চীতলও তসরুফ করিতে পারিত না। পাটোয়ারীরা হিসাব মত তাহাদের নিকট হইতে এক এক চীতল আদায় করিত এবং তজ্জন্য প্রয়োজন মত লাঠি, জিঞ্জির ও কয়েদের সাহায্য লইতেও তাহারা কসুর করিত না। অথচ এই ব্যাপারে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার ঘুষ লওয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না। অনেক সময় হাজার বা পাঁচশত তঙ্কার জন্য এই সকল আমলা, মুসরিফ ও উহদাদার বৎসরের পর বৎসর কয়েদ থাকিত। এই ব্যাপারে তাহাদের উপর জবর দস্তিও করা হইত। ফলে আমলা, উহদাদার ও মুসরিফের চাকুরী মানুষের নিকট শত্রুর তোপের ন্যায় ভীতির বিষয় হইয়া দাঁড়াইল এবং হিসাব লেখার কাজ শিক্ষিত লোকদের জন্য দোষ হিসাবে গণ্য হইতে লাগিল। এই কারণে হিসাব লেখকদের নিকট কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে চাহিত না আর মুসরিফের কাজ কেহ গ্রহণ করিলে সকলেই তাহার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া পড়িত। কারণ মুসরিফ ও আমলারা অহরহ কয়েদ হইয়া লাথি গুঁতা খাইত এবং কয়েদখানায় বাস করিত।

সুলতান আলাউদ্দিন লেখাপড়া জানিতেন না এবং জ্ঞানী ও আলেমদের সহিত মেলামেশা করিবার অভ্যাসও তাঁহার ছিল না। তখতে বসিবার পর তাঁহার ধারণা জন্মিল যে, লেখাপড়া ও শরাশরিয়তের ব্যাপার এবং বাদশাহী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। বাদশাহী বাদশাহের কাজ এবং শরাশরিয়ত মুফতী ও কাজীদের কাজ। এইজন্য রাজ্যশাসনের ব্যাপারে যে বিষয় তাঁহার নিকট রাজ্যের নিমিত্ত মঙ্গলজনক ও যোগ্য বলিয়া মনে হইত, তাহা শরিয়ত অনুযায়ী ভাল হউক বা না হউক, তিনি তাহা করিতে দ্বিধা করিতেন না। এই ব্যাপারে আলেমদের পরামর্শ লওয়াও তিনি দরকারী বলিয়া ভাবিতেন না। জ্ঞানীগুণীরাও

তাঁহার দরবারে খুব কম যাওয়া আসা করিতেন। কাজী জিয়া উদ্দিন বয়ানা, মওলানা জহির উদ্দিন লঙ্গ ও মওলানা মুশিদ কহরামী সুলতানের দরবারে প্রায় প্রায়শঃ যাইতেন। কাজী মুগিস উদ্দিন বয়ানাও সুলতানের দরবারে যাইতেন এবং আমীর উমরাহদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিতেন।

একদিন কাজী মুগিস দরবারে আসিয়াছেন ; ইহা সেই সময়ের কথা, যখন খেরাজের আতিশয্য ও জরিমানার কড়াকড়ি চরমে পৌঁছিয়াছিল। সুলতান তাঁহাকে বলিলেন, আপনার নিকট আমি কয়েকটি মসলা জিজ্ঞাসা করিব, ইহার উত্তরে আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলিবেন। ইহা শুনিয়া কাজী মুগিস সুলতানকে বলিলেন, মনে হয়, আমার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। সুলতান বলিলেন, আপনার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, তাহা জানিলেন কী করিয়া। কাজী মুগিস বলিলেন, খুব সম্ভব জাঁহাপনা আমাকে শরাশরিয়তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন এবং আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি, তাহাই বলিব। ইহার ফলে জাঁহাপনা, খুব সম্ভব, রাগান্বিত হইয়া আমাকে হত্যা করিবেন। সুলতান বলিলেন, না সে ভয় নাই ; আমি আপনাকে হত্যা করিব না। সুতরাং আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানেন, তাহাই আমার সম্মুখে পেশ করিতে পারেন। কাজী মুগিস বলিলেন, জাঁহাপনা যেমন বলিলেন, যদি তাহা হয়, তবে আমি প্রশ্ন অনুসারে কিতাবে যাহা পাইয়াছি, সেইমত উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

সুলতান কাজী মুগিসকে প্রথম যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইল এই যে, হিন্দুদের নিকট হইতে খেরাজ লওযার ব্যাপারে শরিয়তে কিরূপ নির্দেশ আছে এবং তাহারা কিভাবে এই খেরাজ আদায় করিবে ? কাজী বলিলেন, শরিয়তে আছে, যখন দেওয়ানের তহশিলদার তাহাদের নিকট খেরাজ চাহিবে তৎক্ষণাৎ তাহারা বিনা দ্বিধায় অত্যন্ত তাজিমের সহিত তাহা আদায় করিবে। যদি কোন কারণে তহশিলদার তাহাদের মুখে থুথুও দেয়, তবে তাহা প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং আরও বেশী করিয়া তহশিলদারের খেদমত করিতে থাকিবে। এই প্রকার তাজিম তোয়াজ ও থুথু গিলিয়া ফেলিবার তৎপর্য এই যে, জিম্মীরা সর্বদাই অসম্মানের মধ্যে থাকিবে। কারণ ইহার মধ্য দিয়া সত্য ধর্ম ইসলামের সম্মান ও মিথ্যা ধর্মের অসম্মান প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আল্লাহ্ তা'লা ইহাদিগকে হেয় করিয়া রাখিবার জন্য বলিয়াছেন, 'তোমরা এমনভাবে তাহাদের হাত হইতে গ্রহণ কর, যাহাতে তাহারা হেয় হইয়া থাকে।' বিশেষ করিয়া হিন্দুদিগকে অসম্মানকর অবস্থার মধ্যে রাখা ধার্মিকতার অংশ বলিয়া গণ্য। কারণ ইহারা হজরত মুহম্মদ মোস্তফার ধর্মের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু। এই জন্য হযরত ইহাদিগকে হত্যা করা, ইহাদের ধনসম্পদ লুট করা এবং ইহাদিগকে দাসদাসী

হিসাবে গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। আমরা যে ইমামের মজহাব মানিয়া চলি, সেই ইমাম আজম আবু হানিফাই শুধু ইহাদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা অথবা ইহাদিগকে মারিয়া কাটিয়া ধনসম্পদ লুট করিয়া দাসদাসী হিসাবে গ্রহণ করিবার কথা বলিয়াছেন। অন্যান্য ইমাম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাদের জন্য দুইটি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন—হয় ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে ; নতুবা ইহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে।

কাজী মুগিসের উত্তর শুনিয়া সুলতান আলাউদ্দিন বলিলেন, আপনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, উহার একটিও আমি জানিতাম না। কিন্তু অন্যদিকে আমার নিকট অনেক সংবাদই পৌছিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, খওতা ও মুকদিমরা খুব সুন্দর ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়, সাফসুতরা কাপড় পরে, ফারসী ধনুকে তীর চালায়, পরস্পর যুদ্ধ করে, শিকারে যায় ; এই সমুদয় কার্যই করে, কিন্তু তাহাদের নিকট প্রাপ্য খেরাজ ও জিজিয়া আদায় করিতে চাহে না। গ্রামাঞ্চল হইতে তাহারা তাহাদের খওতীর ভাগ আলাদাভাবে উসুল করে, ইহা দ্বারা শরাবের জলসা বসায় এবং আমোদ স্ফূর্তি করে। দেওয়ান হইতে তলব হউক বা না হউক, তাহারা উহার ছায়া মাড়াইতে চাহে না এবং তহশিলদার-দিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। এই সকল সংবাদ শুনিয়া আমার খুব রাগ হইল। মনে মনে বলিলাম, আক্ষেপ, আমি আরও রাজ্য জয় করিয়া আমার সীমা বাড়াইতে চাহিতেছি ; অথচ আমার অধীনে যে সকল দেশ আছে. উহাই আমার অনুগত নহে ! এমন অবস্থায় আমি আরও রাজ্য জয় করিয়া কী করিব ! সুতরাং প্রথমে এমন কোন উপায় অবলম্বন করা দরকার, যাহাতে রায়তরা আমার যথার্থ অনুগত ও বাধ্য হয় এবং তাহা এমন এক পর্যায়ে পৌছে, যেন আমার আদেশ মাত্র উহারা ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করিতেও দ্বিধা না করে। এখন আপনার মুখে শুনিলাম যে, হিন্দুদিগকে এমনভাবে একান্ত বাধ্য ও অনুগত করিয়া রাখাই শরিয়তের হুকুম।

ইহার পর সুলতান আলাউদ্দিন বলিলেন, মওলানা মুগিস, আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি হইলেও আপনার অভিজ্ঞতা অল্প। আমি লেখাপড়া না জানিলেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। ইহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, যতদিন হিন্দুরা নিঃস্ব ও অসহায় না হইবে, ততদিন উহারা মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করিতে রাজী হইবে না। এইজন্য আমি হুকুম দিয়াছি যে, ইহাদের নিকট এই পরিমাণ জমি ও সম্পদ রাখা উচিত, যাহাতে কৃষি কাজ করিয়া কোন প্রকারে বৎসরের আয়ের দ্বারা বৎসর চালাইতে পারে ; কোন প্রকার বাড়তি সঞ্চয় যেন ইহাদের ভাগ্যে না জুটে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি সুলতান আলাউদ্দিন কাজী মুগিসের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা হইল এই যে, তহশিলদারও কারকুনরা লেখাপড়ায় যে প্রকার কম বেশী করিয়া থাকে এবং যেভাবে তহবিল তসরুপ করে, উহার শাস্তি বিধানের জন্য শরিয়তে কোন হুকুম আছে কিনা। ইহার উত্তরে কাজী মুগিস বলিলেন, এইরূপ কার্য শরিয়ত কখনও অনুমোদন করে না। আমি যাহা কিছু কিতাবে পড়িয়াছি, তাহা এই যে, আমলারা যদি তঙ্কা চিতলের অনটনের জন্য তহবিল তসরুপ করে অথবা লোকজনের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া খেরাজ কম করিয়া ধরে, তাহা হইলে শাসকের ইচ্ছায় যাহা ভাল মনে হয়, তেমনভাবে তাহাদিগকে হয় জরিমানা, না হয় কয়েদ করিয়া শাস্তি দান করিবেন। অবশ্য খাজনা হইতে এই প্রকার চুরির জন্য হাত কাটিবার কোন আদেশ কিতাবে লিখিত নাই। সুলতান আলাউদ্দিন বলিলেন, আমি দেওয়ানের কর্মীদিগকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, খেরাজের ব্যাপারে মুসরিফ, আমলা ও কারকুনদের মধ্যে যদি কোনপ্রকার গোলমাল দেখা যায়, তবে লাঠি, কয়েদ, জিঞ্জির ও শেকেঞ্জার দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইবে। তাহারা এই ব্যাপারে কিছুটা বাড়াবাড়ি করিবার ফলে শুনিয়াছি যে, এই সময়ে ঘুষ রেখোয়াতের ব্যাপারটা অনেকাংশেই কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য দেওয়ানের কর্মীদিগকে আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, তাহারা যেন আমলাদিগকে এই পরিমাণ বেতন দেয়, যাহাতে তাহারা তদ্বারা সসম্মানে দিন গুজরান করিতে পারে। ইহা সত্ত্বেও যাহারা চুরি করিবে বা ঘুষ খাইবে; তাহাদিগকে যথারীতি লাঠি ও কয়েদের দ্বারা শায়েস্তা করিতে হইবে। এইজন্যই আপনি দেখিতে পাইতেছেন যে, মুসরিফ ও আমলাদের উপর কী পরিমাণ শাস্তিমূলক জবরদস্তি চলিতেছে।

ইহার পর সুলতান কাজী মুগিসকে তৃতীয় প্রশ্নটি করিলেন। তাহা এই যে, যে সকল ধনদৌলত তিনি দেবগিরি হইতে মালীক থাকা অবস্থায় প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের সম্পত্তি অথবা বয়তুল মালের সম্পদ? কাজী মুগিস বলিলেন, আমি জাঁহাপনার নিকট যাহা সত্য, তাহাই বলিব। জাঁহাপনা দেবগিরি হইতে যে ধনসম্পদ আনিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান সৈন্যদের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছিল; সুতরাং মুসলমান সৈন্যদের সাহায্যে যে সম্পদ অর্জিত হইয়াছে, উহা অবশ্যই বয়তুল মালের প্রাপ্য। যদি জাঁহাপনা একাকী কোন স্থান হইতে কোন সম্পদ আহরণ করিয়া থাকেন এবং তাহা যদি বৈধ উপায়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে শরিয়ত অনুসারে তাহা অবশ্যই জাঁহাপনার প্রাপ্য। এই উত্তর শুনিয়া সুলতান কাজী মুগিসের

প্রতি রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনি এইসব কী বলিতেছেন ; আপনার মাথা ঠিক আছে ত ? এই ধনদৌলত আমি নিজের জান এবং আমার চাকর-নফরদের জান বিপন্ন করিয়া দেবগিরির হিন্দুদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। উহা এমন এক স্থান, যাহার নামও দিল্লীর লোকেরা জানিত না। তদুপরি উহা আমি মালীক থাকা অবস্থায় আনিয়াছি এবং বয়তুল মালে জমা না দিয়া নিজের অধীনে রাখিয়াছি। এমন সম্পদ কী করিয়া বয়তুল মালের হইতে পারে ? কাজী মুগিস বলিলেন, জাঁহাপনা আমার নিকট শরিয়তের হুকুম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সুতরাং এই সম্পর্কে আমি কিতাবে যাহা পড়িয়াছি, তাহাই বলিব। জাঁহাপনা ইচ্ছা করিলে এই মত পরীক্ষা করিবার জন্য এতদ্বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ; তাহারাও ইহাই বলিবেন। আমি যদি জাঁহাপনার মন রক্ষার্থে এই সময়ে মিথ্যা বলি, তবে তিনি কি করিয়া আমার উপর বিশ্বাস রাখিবেন এবং কেনই বা আমার নিকট শরিয়তের মসলা মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিবেন।

চতুর্থ যে প্রশ্নটি সুলতান কাজী মুগিসের নিকট করিয়াছিলেন, তাহা এই যে, বয়তুলমাল হইতে বাদশাহ ও বাদশাহী পরিবারের প্রাপ্যের পরিমাণ কি ? কাজী মুগিস বলিলেন, এইবার অবশ্যই আমার মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। সুলতান বলিলেন, আপনি কী করিয়া জানিলেন যে, আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে ? কাজী বলিলেন, জাঁহাপনা যে প্রশ্ন আমাকে করিয়াছেন, যদি উহার যথাযথ উত্তর দেই, তাহা হইলে জাঁহাপনা অবশ্যই রাগান্বিত হইয়া আমাকে হত্যা করিবার আদেশ দিবেন। আর আমি যদি সত্য গোপন করি, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন বিচারের ফলে আমাকে দোজখে যাইতে হইবে। সুলতান বলিলে, আপনি যথাযথ উত্তর বলুন, আমি আপনাকে হত্যা করিব না। কাজী বলিলেন, তাহা হইলে সুলতান যদি খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় আদর্শ জীবন যাপন করিয়া আখেরাতের মুক্তি লাভ করিতে চাহেন, তবে তিনি দরবেশদের জন্য যে দুইশত চৌত্রিশ তঙ্কার অজিফা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের জন্য তদ্রূপ কিছু গ্রহণ করিতে পারেন। যদি সুলতান মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে চাহেন, তবে তাঁহার খেদমতগারেরা যে পরিমাণ পায়, সেই পরিমাণ তাঁহারও গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদি ইহাতে তিনি অসুবিধা বোধ করেন এবং তাঁহার বাদশাহীর ইজ্জত রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সুলতানী দরবারের গণ্যমান্য আমীর মালীক ; যেমন মালীক কীরান, মালীক কীরবেগ, মালীক নায়েব উকিলেদর ও মালীক হাজেব খাস যে পরিমাণ তনখা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুলতানকেও নিজের ও নিজ পরি-

খাস বর্গের জন্য সেই পরিমাণ খরচ করা উচিত। কিংবা সুলতান যদি একান্তই আলেম উলামাদের কথামত নিজের খরচ বয়তুল মাল হইতে লইতে চাহেন, তবে দরবারে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী গ্রহণ করিতে পারেন; যাহাতে সুলতানের বিশিষ্টতা রক্ষা পায় এবং খরচের ব্যাপারেও সম্মান থাকে।

ইহার পর কাজী মুগিস বলিলেন, জাঁহাপনা, আমি যে তিনটি পন্থার কথা বলিলাম, আপনি যদি ইহা অপেক্ষা অধিক ধন-লাখ লাখ কোটি কোটি তঙ্কা জরির পোশাকাদি, লাল জওহর খচিত বস্ত্রাদি বয়তুল মাল হইতে হারেমের জন্য খরচ করেন বা কাহাকেও উপহার দেন, তবে কাল কিয়ামতে ইহার জন্য আল্লাহ্‌তালার নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করিতে হইবে। সুলতান ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, কাজী মুগিস আপনি কি আমার তরবারির ভয় করেন না? আপনি কী করিয়া বলিলেন যে, বয়তুল মাল হইতে আমি আমার পরিবারবর্গের জন্য যে সম্পদ খরচ করি, তাহা শরিয়ত অনুযায়ী সিদ্ধ নহে? কাজী মুগিস বলিলেন, আমি যথার্থই সুলতানের তরবারিকে ভয় করি আর সেই জন্যই পাগড়ীরূপে আমার কাফনের কাপড় সর্বদা আমার সঙ্গে বহন করি। কিন্তু জাঁহাপনা আমার নিকট শরিয়তের মসলা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; যদি তিনি রাজ্যের মঙ্গলজনক কোন বিষয় এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে আমি বলিতাম, নিজ রাজ্যের জন্য সুলতান যাহা ব্যয় করেন, তদপেক্ষা হাজার গুণ অধিক ব্যয় করা দরকার। কারণ ইহাতেই লোকজনের নিকট শাহী ইজ্জত বৃদ্ধি পায় এবং বাদশাহের সম্মান ও শাহী হারেমের ইজ্জত বৃদ্ধি বাদশাহীর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

এই সকল প্রশ্নোত্তরের পর সুলতান আলাউদ্দিন কাজী মুগিসকে বলিলেন, আপনি এই পর্যন্ত আমার অনেক কাজই শরিয়তের বিরোধী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহা হইলে আমি অন্য যে সকল কাজ করিবার আদেশ দিয়াছি; যেমন যে সিপাহী সুলতানী অশ্ব অবহেলায় বিনাশ করিবে, তাহার তিন বৎসরের বেতন কাটিয়া রাখা হইবে; শরাব খোরদিগকে কূপের কয়েদখানায় বন্দী করা হইবে; পরস্ত্রীতে গমনকারী পুরুষাঙ্গ কাটিয়া লওয়া হইবে ও স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করা হইবে; বিদ্রোহীদের মধ্যে ভালমন্দ সকলকেই হত্যা করা হইবে; তাহাদের পরিবার পরিজনকে নিঃস্ব করিয়া ধ্বংস করা হইবে; প্রাপ্য খেরাজ জোর জবরদস্তি করিয়া আদায় করা হইবে; যদি একটি চীতলও বাকী থাকে তাহাও কয়েদ করিয়া লাঠির আঘাত করিয়া আদায় করা হইবে;

রাজ্যের বন্দীদিগকে যতদূর সম্ভব শাস্তি দেওয়া ও অত্যাচার করা হইবে। তাহা হইলে এই সকল কাজকেও কি আপনি শরিয়ত বিরোধী বলিবেন? কাজী মুগিস এই প্রশ্ন শোনা মাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তখতের নিকটে গিয়া মাটির উপর মাথা রাখিয়া অতি উচ্চস্বরে বলিলেন, জাঁহাপনা ইচ্ছা করিলে আমার প্রাণদান করিবেন, নতুবা এখনই আমাকে দুই টুকরা করিয়া ফেলিবার আদেশ দিবেন; অবস্থা যাহাই হউক না কেন, আমি বলিব এই সমুদয়ই শরিয়ত বিরোধী কাজ। হজরত মুহম্মদ মোস্তফার হাদীসে বা আহমদের বাণীতে কোথাও এমন কিছু নাই যে, বাদশাহ নিজের সুবিধার জন্য যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সুলতান আলাউদ্দিন এই কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না; তিনি নিজের জুতা পায় দিলেন এবং উঠিয়া হারেমের দিকে চলিয়া গেলেন। আর কাজী মুগিস শংকিত চিত্তে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন কাজী মুগিস নিজ পরিবারবর্গের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইলেন, সদকা দিলেন, গোসল করিলেন এবং সুলতানের তরবারিতে দ্বিখণ্ডিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দরবারে আসিলেন। সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া লইলেন এবং নিজের সম্মুখস্থ তশতরী হইতে একহাজার তঙ্কা দান করিলেন। বলিলেন, কাজী মুগিস, যদিও আমি কোন বই পুস্তক পড়ি নাই, তবুও কয়েক পুরুষ হইতে আমরা মুসলমান এবং মুসলমানের পুত্র। যাহাতে বিদ্রোহ না হয়, সেইজন্য আমি নানাবিধ হুকুম জারী করিয়াছি। কারণ বিদ্রোহ হইলে বিনা কারণে কয়েক হাজার লোকের প্রাণনাশ ঘটিবে। কিন্তু এই সত্ত্বেও লোকেরা আমার হুকুমের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া থাকে এবং উহা যথাযথভাবে পালন করিতে চাহে না। এইজন্য ইহাদের ব্যাপারে কঠোর হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। যাহাতে উহারা আমার আদেশ পালন করিতে কখনও অবাধ্য না হয়। এই সকল ব্যাপার শরিয়তে আছে কিনা, তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই। যাহা রাজ্যের জন্য মঙ্গলজনক এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে একান্ত দরকারী, আমি তাহাই করিয়াছি। আমি জানি না, এইজন্য খোদাতালা কিয়ামতের দিন আমাকে কী শাস্তি দিবেন।

কিন্তু হে মওলানা মুগিস, আমি মোনাজাতে আল্লাহ্‌র নিকট এই একটা কথাই বলিব, হে আমার খোদা, তুমিত জান যদি কোন লোক পরস্ত্রীর সহিত কুকর্ম করে, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই; যদি মদ্য পান করে, আমার কোন লোকসান হইবে না; যদি চুরি করে, আমার বাপ দাদার ধন নষ্ট হইবে না আর যদি খেরাজ আদায় করিয়া তসরুপ করে, তবে এই প্রকার দশ

বিশ্ব জনের উপলক্ষে কিছু যায় আসে না। এইজন্য আমার ইচ্ছা হয়, এই চারি শ্রেণীর লোক জনকে, নবী রসুলরা যে ধরনের শাস্তি দিবার কথা বলিয়াছেন, সেই ধরণের শাস্তি দেই। কিন্তু এই যুগে এমন একশ্রেণীর লোক হইয়াছে, যাহারা শুধু শতে শতে হাজারে হাজারে লাখে লাখে কথাই বলিয়া থাকে। বড় বড় কথা বলা আর দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে গা আলগা করিয়া ভাসিয়া বেড়ান ছাড়া তাহাদের অন্যকোন কাজ করিবার নাই। আমি অতি মুর্খ; কোনপ্রকার লেখাপড়া জানি না। একমাত্র 'আলহামদু', 'কুল-হুআল্লাহু', 'দোয়া কুনুত' ও 'আত্তাহিয়াতু' ছাড়া অন্য কিছু পড়িতে পারি না। আমি রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই আদেশ দিয়াছি যে, যদি কেহ পরস্ত্রীর সহিত কুকর্মে লিপ্ত হয়, তবে তাহাকে খাসী করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রকার কঠোর আদেশের ফলে এই শ্রেণীর বহু লোককে দরবারে আনিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। আমি আদেশ দিয়াছি, যাহারা তনখা খায়, অথচ কাজের বেলায় অনুপস্থিত থাকে, তাহাদের নিকট হইতে তিন বৎসরের বেতন আদায় করা হইবে। ইহার ফলে কাজের সময় নিজেদের নাম লিখায় নাই, এইরূপ এক-শত দুইশত লোকের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা হইয়াছে। যাহারা টাকা দিতে পারে নাই, তাহারা কয়েদ হইয়া শাস্তি ভোগ করিতেছে। যে সকল খেরাজ লেখক ও আমলা চুরি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কম হইলেও দুই হাজার লোককে আমি ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছি। তাহাদের পশ্চাদ্দেশে চিরদিনের জন্য মোহর আঁকিয়া দিয়াছি। তথাপি ইহাদের চুরির স্বভাব যায় নাই। এইজন্য লোকে বলে, খেরাজ লেখকের কাজ ও চুরি করা একই মায়ের সন্তান। যাহারা শরাব খায় ও বিক্রি করে, এইরূপ বহু লোককে কূপের কয়েদখানায় ফেলিয়া হত্যা করিয়াছি। তথাপি ইহাদের লজ্জা হয় নাই; সেই কূপের মধ্যে বসিয়াও ইহারা মদ খাওয়া ও বিক্রি করার কাজ চালায়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে কেহ কখনও শাস্তি দিয়া সুপথে আনিতে পারে নাই; আমিই বা তাহা কিরূপে পারিব।

যে কালে সুলতান আলাউদ্দিন কাজী মুগিসের নিকট এই সকল শরিয়তী মসলা মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন মওলানা শামস উদ্দিন তুর্ক নামে এক অদ্বিতীয় আলেম চারি শত হাদীসের কিতাব লইয়া মুলতানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, সুলতান নামাজ পড়েন না ও জুম্মার নামাজে শরীক হন না, তখন তিনি তাঁহার খেদমতে উপ-স্থিত হইতে ইতস্তত: করিলেন। শায়খুল ইসলাম সদর উদ্দিনের পুত্র শায়খ শামস উদ্দিন ফজলুল্লাহর হাতে বয়েত করিয়া মুরীদ হইলেন এবং একটি

হাদীসের কিতাবের ব্যাখ্যা লিখিয়া উহাতে খুব সুচারুভাবে সুলতানের প্রশংসা করিলেন। এই হাদীস গ্রন্থটি সহ অন্য একটি ফারসী গ্রন্থ সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই ফারসী গ্রন্থে তিনি লিখিলেন—, আমি মিশর হইতে আসিয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল দিল্লীতে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিছুদিন থাকিব এবং সেখানে এলমে হাদীসের চর্চা যাহাতে স্থায়ী হয় ও মানুষ তদনুসারে জীবনযাপন করিতে পারে, উহার ব্যবস্থা করিব। কিন্তু পথের মধ্যে শুনিতে পাইলাম যে, সুলতান নামাজ পড়েন না ও জুম্মার নামাজে উপস্থিত থাকেন না। ইহার ফলে আমি ফিরিয়া এখানে আসিয়াছি। অবশ্য সুলতানের ব্যাপারে এমন অনেক কথা শুনিয়াছি, যাহা একমাত্র ধার্মিক বাদশাহদের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্যদিকে এমন অনেক কথাও আমার কানে আসিয়াছে, যাহা ধার্মিক বাদশাহদের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। ধার্মিকতার কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা এই যে, সুলতান হিন্দুদিগকে অতিশয় দুরবস্থার মধ্যে রাখিয়াছেন। এমনকি তাহাদের পুত্র পরিজন মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহা যথার্থই ধার্মিকতার কাজ। ইসলামের এই সম্মান ও ধর্মকে এইভাবে উচ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য সুলতানের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। হে সুলতান, আপনি যেভাবে হজরত মুহম্মদ মোস্ত-ফার ধর্মকে সম্মান দান করিয়াছেন, এই একটি কাজের জন্য আপনার পর্বত প্রমাণ পাপও মার্জনা হইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তবে কিয়ামতের দিন আপনি আমার জামা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

দ্বিতীয়তঃ খাদ্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যবিধ আসবাবপত্র এত সুলভ ও সস্তা হইয়াছে যে, উহার অধিক কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। এই ব্যাপারটিও সর্বসাধারণের জন্য একটি উত্তম ব্যবস্থা। শুধু বলিতে হয়, মুসলমান বাদশাহরা বিশ ত্রিশ বৎসর চেষ্টা করিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই, বর্তমান সুলতান তাহা কিভাবে সম্ভব করিলেন। তৃতীয়তঃ শুনিয়াছি যে, আপনি সর্ব প্রকার মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং সকল কুকর্ম ও ব্যভিচারের জন্য এমন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উহার ফলে এই সকল কাজ মানুষের নিকট বিষবৎ মনে হইতেছে। বাহবা, বাহবা, হে সুলতান, আপনি এমন একটি গুণের অধিকারী হইয়াছেন। চতুর্থতঃ আপনি বাজারী ও সাহিত্যিক শ্রেণীর লোকদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে ইহাদের মধ্যে কুকথা ও মিথ্যা সৃষ্টির সাহস একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। এই ব্যাপারটিও তুচ্ছ করিবার মত নহে। কারণ বাজারী লোকদের ব্যাপারে আপনি যাহা করিয়াছেন, হজরত

আদম হইতে এই পর্যন্ত তাহা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। হে সুলতান, আপনাকে মোবারকবাদ জানাই। কারণ এই চারিটি কাজের দ্বারা আপনি নবী রসুলদের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছেন।

আমি পূর্বে লিখিয়াছিলাম যে, সুলতান সম্পর্কে আমি এমন কিছু কথা শুনিয়াছি, যাহা আল্লাহ্, তাঁহার রসুল, ওলী আল্লাহ্ বা কোন ধার্মিক মুসলমানের পছন্দসই নহে। তাহা এই যে, আপনি কাজীর পদটি হামিদ মুলতানীকে দান করিয়াছেন ; অথচ ধর্মের দিক হইতে এই পদটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। যাহার বাপ দাদা সুদ খাইয়া আসিয়াছে এবং সে নিজেও ধর্মের ব্যাপারে একান্তই অপরিপক্ক ; আপনি এমন এক ব্যক্তিকেই এই পদটি অর্পণ করিয়াছেন। কোন কাজীর ব্যাপারেই আপনি ধর্মের দিকটির গুরুত্ব দেন নাই এবং অধিকাংশ স্থলে লোভী ও প্রতারকদিগকে এই সকল দায়িত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন। হায় আল্লাহ্, কিয়ামতের দিন ইহাদের সমস্ত গুণাহ্ই আপনার উপর আসিবে এবং আপনি এই গুরুভার বহন করিবার শক্তি কোথায় পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ আমি শুনিয়াছি যে, আপনার শহরে হাদীসের কোন চর্চা নাই ; লোকেরা জ্ঞানীদের কথামত দুনিয়া চালায়। আমি জানি না, যে শহরের হাদীস কুরআন জানে না, শুধু জ্ঞানীর বচন অনুসারে কাজ করে, সেই শহরে কেন খোদার গজব পড়িবে না। তৃতীয়তঃ শুনিয়াছি যে, আপনার শহরের কুখ্যাত জ্ঞানীরা তাহাদের কদর্য ফতোয়া ও কিতাব লইয়া মসজিদে বসিয়া থাকে এবং মানুষের নিকট হইতে তঙ্কা আদায় করে। তাহারা নানাবিধ ব্যাখ্যা ও যুক্তি দ্বারা মুসলমানদের হক নষ্ট করে, ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের কাজ নষ্ট করে এবং নিজেদের পরকালের পথও নষ্ট করে। অবশ্য এই কথাও শুনিয়াছি যে, আপনার দরবারের কাজী সাহেবের জন্য শেষের এই দুইটি বিষয় আপনার কানে পৌঁছায় না। নতুবা বুঝিতে পারি, সুলতান কিছুতেই এমন অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দিতেন না।

উক্ত মুহাদ্দিসের হাদীসের কিতাব ও এইরূপ উপদেশমূলক গ্রন্থটি বাহাউদ্দিন দবীরের নিকট পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ দবীর শুধু হাদীসের কিতাবটি সুলতানকে দিল এবং অন্য পুস্তকটি গোপন করিয়া ফেলিল। কাজী হামিদ মুলতানীর ব্যাপারটি যাহাতে প্রকাশ না পায়, উহার ব্যবস্থা করিল। তারিখের লেখক আমি মালীক কীরান বেগের নিকট শুনিয়াছি, সুলতান সাদ মন্তেকীর নিকট শুনিতে পাইলেন যে, এই প্রকার একটি পুস্তক আসিয়াছে। তিনি উহা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং বাহা উদ্দিনের এই ব্যবহারের জন্য তাহাকে ও তাহার পুত্রকে দূরে সরাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মওলানা শামস উদ্দিন তুর্কের ফিরিয়া যাওয়ার জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিলেন না।

সুলতান আলাউদ্দিন রণথাম্বুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই মানুষের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জোর জবরদস্তি ও জরিমানা করিয়া লোকজনকে উত্যক্ত করায় কিছুদিনের মধ্যেই উলুগ খানের দুর্ঘটনা দেখা দিল। দিল্লী আসিবার পথে উলুগ খান মারা গেলেন। এই দিকে নতুন শহরে মালীক আআয উদ্দিন বুরখান উজির হইলেন। এই নতুন শহরের খেরাজ ও জমির দূরত্ব ও পরিমাণ অনুসারে ধার্য করা হইল। সুলতান পুনরায় সৈন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। চিতোর দুর্গ অবরোধ ও তাহা খুব তাড়াতাড়ি জয় করিবার পর তিনি আবার শহরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় পুনরায় মুগলদের গোলযোগ দেখা দিল। মাওরায়ান্নাহারে অবস্থানরত মোগলরা শুনিল যে, সুলতান আলাউদ্দিন বহু দূরে একটি দুর্গ জয় করিতে সৈন্যদলসহ চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই কাজ ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিয়াছে এবং রাজধানী দিল্লী এইক্ষণে খালি পড়িয়া আছে। তুরগী খান এক লাখ বিশ হাজার সৈনসহ ক্রমান্বয়ে পথ চলিয়া যথা সময়ের পূর্বেই দিল্লীর সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়া গেল।

সুলতান আলাউদ্দিনের চিতোর অবরোধ করিবারকালে মালীক ফখর উদ্দিন জুনা দাদ বেগ হজরত ও নুসরত খানের ভাতিজা কোড়ার জায়গীরদার মালীক জহজু হিন্দুস্তানী সকল আমীর ও সৈন্যসহ অরণ্যকুল অভিযানে গিয়াছিলেন। তাহারা অরণ্যকুলে পৌঁছিলে বৃষ্টিতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং হিন্দুস্তানী সৈন্যরা সেখানে কিছুই করিতে পারিল না। শীতের প্রারম্ভে এই সৈন্যদল ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সমুদয় আসবাব পত্র হারাইয়া হিন্দুস্তানে ফিরিয়া আসিল। এই সময় সুলতানও চিতোর হইতে আসিলেন। তাঁহার সহিত যে সৈন্যদল গিয়াছিল, তাহারাও ক্ষতবিক্ষত ও আসবাবপত্রহীন অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। দুর্গজয় ও বর্ষাকালের আক্রমণে তাহাদের অবস্থা যথার্থই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদিকে সুলতান দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার পর একমাসও যায় নাই; সৈন্যদলে নতুন লোক নিয়োগ ও তাহাদের আসবাবপত্রও তৈরী হয় নাই, এমন সময় তুরগী খান ত্রিশ চল্লিশ হাজার অশ্বারোহীসহ অতি দ্রুত আসিয়া যমুনার তীরে শিবির স্থাপন করিল এবং শহরে যাতায়াতকারী লোকজনের রাস্তা বন্ধ করিয়া ফেলিল।

এই বৎসর সৈন্যদলে লোকজন সংগ্রহ করিবার ব্যাপারে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। চিতোর হইতে যাহারা ফিরিয়াছিল, তাহাদের অবস্থা ভাল নহে। সুলতানও প্রয়োজনীয় লোকজন ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করিতে

সময় পাইলেন না। মালীক ফখর উদ্দিন জুনা দানবেগ অরণ্যকুল হইতে ক্ষতবিক্ষত সৈন্যদল সহ ফিরিয়া আসিলেও মোগল সৈন্যরা পথরোধ করিয়া থাকায় একটি হিন্দুস্তানী সৈন্যও দিল্লীতে পৌঁছিতে পারিল না। মুলতান, সামানা ও দেবপালপুরেও এমন কোন শক্তিশালী সৈন্যদল ছিল না যে, তাহারা মোগলের সম্মুখীন হইতে পারে। এমতাবস্থায় সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার সামান্য সংখ্যক সৈন্যসহ সিরিতে শিবির স্থাপন করিয়া হিন্দুস্তানী সৈন্যদিগকে আনাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোগলরা যমুনার সকল গুদারা ঘাট দখল করিয়া বসিয়াছিল। ফলে হিন্দুস্তানী সৈন্যরা কোল ও বরণ পর্যন্ত আসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। ইহার ফলে সুলতান সিরিতে অবস্থানরত সৈন্যদের চতুর্দিকে পরিখা খনন করাইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। যাহাতে মোগলরা সহজে সৈন্যদলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। পরিখার মুখে তক্তা দ্বারা পাটাতন করিয়া সৈন্যদের থাকিবার স্থান করা হইল। ইহার ফলে পরিখাবেষ্টিত শিবির অঞ্চলটি দুর্গের ন্যায় হইয়া উঠিল এবং মোগলদের আক্রমণের পথ বন্ধ হইল। এইরূপে প্রতিটি আলঙ্গে বা প্রহরার স্থানে সৈন্যরা রাত্রিদিন সশস্ত্র হইয়া সতর্কতার সহিত পাহারা দিতে লাগিল। কোন প্রকার বড় আক্রমণ বা যুদ্ধের আশা তাহারা ত্যাগ করিয়াছিল প্রতিটি আলঙ্গে পাঁচটি হাতী সুসজ্জিত রাখা হইল এবং কিছু সংখ্যক পদাতিক সর্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিল। এইভাবে তাহারা সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করিল।

মোগল সৈন্যরা নানাদিক হইতে আসিয়া সুলতানী সৈন্য শিবিরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিত। ইহার ফলে এই বৎসর দিল্লীতে মোগলদের ভয় ও হৈচৈ এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, এমনটি আর কখনও দেখা যায় নাই। যদি তুরগী খান আরও একমাস যমুনার ঘাটগুলি বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে লোকজন যেরূপ ভয় পাইয়াছিল, অতি সহজেই কিছু সংখ্যক সৈন্য দ্বারা দিল্লী জয় করিয়া লইতে পারিত। কারণ এই আতঙ্কের ফলেই বাহির হইতে শহরের ঘাস, পানি ও লাকড়ী আনাইতেও বেশ বেগ পাইতে হইত। খাদ্যদ্রব্য লইয়া সওদাগরদের শহরে আসা একরূপ বন্ধই হইয়া গিয়াছিল। মোগলরাও বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অশ্বারোহীরা সুবহানী মুয়ী ও হদলী প্রাঙ্গন এবং সুলতানী চৌবাচ্চায় আসিয়া উপস্থিত হইত। সেখানে নামিয়া তাঁহারা মদ্যপান করিত এবং সুলতানী তোপখানা হইতে খাদ্য ও অন্যান্য আসবাবপত্র সস্তায় বিক্রয় করিত। খাদ্যদ্রব্যের খুব একটা সুরক্ষিত অবস্থা ছিল না। তথাপি দুই তিনবার উভয় পক্ষের অশ্বারোহীদের

মধ্যে সংঘর্ষ হইল। কিন্তু এই প্রকার বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে কোন পক্ষই জয়ী হতে পারিল না।

যাহা হউক আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় তুরগী খান কোন প্রকারেই সুলতানী লশকরের মধ্যে প্রবেশ করিতে বা তাহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইল না। অবশেষে শহরের অসহায় গরীবদের দোয়ার ফলে দুই মাস অবস্থানের পর সে তাহার নিজ দেশে গিয়া পৌঁছিল। যাওয়ার পথে লুটতরাজ ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করিয়া সে তাহার নিজ দেশে গিয়া পৌঁছিল। এই যাত্রায় যেভাবে মুসলমান সৈন্যরা নিরাপদ ও শহর অক্ষত রহিল, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কারণ মোগলরা সংখ্যায় বেশী ছিল এবং তাহারা এমন একসময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সুলতানী সৈন্যদলের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তদুপরি বাহির হইতেও কোনপ্রকার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এমন অবস্থায় মোগলদের জয়ী না হইয়া ফিরিয়া যাওয়া বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়।

মোগল তুরগী খানের আক্রমণের এই বিরাট ঘটনার পর সুলতানের চৈতন্য উদয় হইল। তিনি নানা স্থানে অভিযান ও দুর্গজয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সিরিতে একটি মহল তৈয়ার করাইয়া সেখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সিরিকে তিনি নতুন রাজধানী বানাইলেন এবং উহার চতুর্দিক নতুন বসতির দ্বারা পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। দিল্লীর দুর্গকে নতুন করিয়া সংস্কার করাইলেন। মোগলরা যে পথ দিয়া আসে, তথাকার পুরাতন দুর্গগুলি মেরামত করিতে এবং প্রয়োজন মত নতুন দুর্গ তৈরী করিতে আদেশ দিলেন। এই পথের সকল দুর্গে বিখ্যাত ও সতর্ক কতোয়াল নিযুক্ত করিলেন এবং মিস্ত্রি-নিক ও গার্দাদার দ্বারা সেগুলি সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন। বুদ্ধিমান ও কুশলী লোকজনকে সেই সকল দুর্গে চাকুরী দিয়া সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে তাহাদের প্রস্তুত থাকিবার এবং তাহাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। সামানা ও দেবপালপুরে যোগ্য লোকজনকে চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া সবদা প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দিলেন। মোগলদের আসিবার পথের সকল কেতা ও জায়গীর অভিজ্ঞ আমীর ও ওয়ালীদের হাতে অর্পণ করিয়া যথাসম্ভব সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

মোগলদের আগমন পথে এই প্রকার নানাবিধ সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পর সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার মন্ত্রণাদাতাদের সহিত রাত্রিদিন মোগল আক্রমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিবার জন্য আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা হওয়ার পর সকলের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এমন একটি সৈন্য দল গঠন করিতে হইবে, যাহারা সর্ববিষয়ে সুনির্বাচিত এবং তীরান্দাজী, তলোয়ার বাজী ও ঘোড়া দৌড়াইতে নিপুণ। এই একটি মাত্র উপায়, যদ্বারা মোগলদের আক্রমণ চিরতরে বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় সকল মন্ত্রণাদাতার সহিত আলোচনা করিলেন যে, এই শ্রেণীর একটি সৈন্যদল গঠন করিবার জন্য শাহী খাজানাখানায় প্রচুর ধনরত্ন থাকা প্রয়োজন এবং প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ খেরাজ বয়তুল মালে আসা দরকার। সুলতান বলিলেন, যদি সৈন্যদের নির্দিষ্ট বেতনের পরিমাণ বাড়াইয়া প্রতি বৎসর তাহা নগদ অর্থে পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে খাজানা খানায় প্রচুর অর্থ থাকা এবং পাঁচ ছয় বৎসরের খরচ একসঙ্গে জমা থাকা প্রয়োজনীয়। কারণ এইরূপ একটি শাহী খাজানাখানা ছাড়া রাজ্যশাসন করা সম্ভব নহে। অথচ আমার ইচ্ছা যে, সুযোগ্য তীরান্দাজ, তলোয়ারবাজ ও ঘোড় সোয়ারের একটি দল গড়িয়া উঠুক এবং তাহারা বৎসরের পর বৎসর স্থায়ী থাকুক। এইজন্য প্রত্যেক সৈনিককে দুই শত চৌত্রিশ তঙ্কা তনখা দিব এবং দুইটি ঘোড়ার জন্য দিব আটাত্তর তঙ্কা। এই হিসাব অনুসারে দুই ঘোড়ার অর্থ যাহারা গ্রহণ করিবে, তাহাদের নিকট দুইটি ঘোড়া ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সর্বদা মজুত রাখিতে বলিব। আর এক ঘোড়া যাহাদের, তাহাদিগকেও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনারাও এই কথাই বলিবেন। কিন্তু এই যে অধিক লোকজন দ্বারা সৈন্যদল ভারী করিবার পরিকল্পনা আমার মাথায় ঢুকিয়াছে, তাহা সম্ভব হইবার অর্থাৎ খাজানাখানা পূর্ণ রাখিবার এবং সৈন্যদলের স্থায়ী হইবার উপায় কী?

ইহার উত্তরে সুলতানী দরবারের আসেক তুল্য সকল জ্ঞানী ব্যক্তি সদবুদ্ধিকে কাজে লাগাইলেন এবং বহু চিন্তা ভাবনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সুলতানকে বলিলেন, জাঁহাপনার চিন্তায় অল্প খরচে সৈন্যদল গঠন ও উহার স্থায়িত্বের যে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, তাহা সম্ভব হইবার একমাত্র পন্থা হইল সৈন্যদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র এবং তাহাদের পুত্র পরিজনদের ভরণ-পোষণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অতি সুলভ ও স্বল্প মূল্যের হইবে। বাদশাহ যদি জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অতিশয় সস্তায় সরবরাহ করিতে পারেন, তবে সৈন্যদলের জন্য অন্য কোন চিন্তা থাকিবে না। ফলে সুলতান প্রদত্ত সামান্য তনখাও অধিক বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ কম খরচের ফলে সৈন্যরা সন্তুষ্ট থাকিবে এবং

সৈন্যদলে তাহাদের অবস্থান স্থায়ী হইয়া উঠিবে। আর এইরূপ একটি সৈন্য-দল গঠন করিতে পারিলেই মোগলদের আক্রমণের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সকল মন্ত্রণাদাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড ছাড়া অন্য কোন পন্থায় আমি আসবাবপত্রের মূল্য এমন এক পর্যায়ে আনিতে পারি, যাহাতে তাহা সকলের জন্যই সুলভ ও সস্তা হইবে? উজিরগণ সুলতানকে বলিলেন, এই বিষয়ে কতিপয় সুদৃঢ় নিয়ম কানুন তৈরী না করিলে জিনিসপত্রের সুলভ মূল্য আশা করা যায় না। এইজন্য প্রথমেই কতকগুলি নিয়ম-কানুন স্থির করা দরকার। অতঃপর তাহা দৃঢ়ভাবে প্রবর্তন করিতে পারিলে সর্বসাধারণের কল্যাণমূলক এই সুলভ মূল্যের ব্যবস্থা স্থায়ী হইবে এবং বৎসরের পর বৎসর একইভাবে চলিবে।

সেই নিয়ম-কানুনগুলি নিম্ন প্রকার:—প্রথম নিয়ম – দরবারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য স্থির হইবে। দ্বিতীয় নিয়ম—সুলতান প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য মজুত করিবেন। তৃতীয় নিয়ম—প্রতিটি বাজারে সর্বপ্রকার ক্ষমতাসহ উপযুক্ত 'শাহনা' কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে। চতুর্থ নিয়ম—বিদেশের সকল সওদাগরকে দপ্তরের খাতায় নাম লিখাইতে হইবে ও তাহারা বাজার শাহনার অধীন হইবে। পঞ্চম নিয়ম—দোয়াব ও শতক্রোশ দূরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলের খেরাজ এমন ভাবে ধার্য করিতে হইবে, যাহাতে কাহারও পক্ষে দশ মণ খাদ্য ও মজুত রাখা সম্ভবপর না হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা এমন কঠোর হইবে না যে, লোকজন ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী সওদাগরের খাদ্যশস্য বেচিয়া দিতে বাধ্য হয়। ষষ্ঠ নিয়ম—কারকুন ও অন্যান্য কর্মচারীরা ফসলের হিসাব রাখিতে এবং বাড়তি ফসল মওসুমের প্রথম দিকেই বেপারীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া ব্যবস্থা করিবে। সপ্তম নিয়ম—শাহনার সঙ্গে বাজারের সংবাদ আদান প্রদা-নের জন্য ডাক চৌকি বা বারিদের ব্যবস্থা করিতে হইবে; যাহাতে তাহারা যথাসময়ে বাজারের সংবাদ দরবারে পৌছাইতে পারে। অষ্টম নিয়ম—অনা-বৃষ্টির সময় বিনা প্রয়োজনে কেহ বাজার হইতে এক দানা শস্যও কিনিতে পারিবে না। সুলতানের দরবারে যে বাজারদর নির্দিষ্ট হইবে, উহার সহিত এই সাতটি নিয়ম পালন করিলে শীত গ্রীষ্ম সর্বদা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এক 'দাঙ্গ'ও কম বেশী হইবে না।

প্রথম নিয়ম অনুসারে বাজারদর নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছিল: গম প্রতি মণ সাড়ে সাত চীতল; যব প্রতি মণ চারি চীতল; শালি প্রতি মণ

পাঁচ চীতল ; মাশ প্রতি মণ পাঁচ চীতল ; নাখুদ (চিনা) প্রতি মণ পাঁচ চীতল এবং মেঠা প্রতিমণ তিন চীতল। বহু বৎসর এই বাজারদর স্থায়ী ছিল। যত দিন সুলতান আলাউদ্দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয় মও-সুমেই এই বাজারদরের কোন তারতম্য হয় নাই। বাজারদরের এই প্রকার স্থায়িত্বকে লোকে বিস্ময়ের বিষয় মনে করিত এবং ইহার কথা ভাবিয়া অবাক হইত।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সুলভ করিবার জন্য দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে দরবারের অন্তরঙ্গ, বুদ্ধিমান ও কুশলী মালীক কবুল উলুগ খানীকে বাজারের শাহনা পদে নিযুক্ত করা হইল। তাহাকে খুব বড় একটি কেতা বা জায়গীর প্রদান করা হইল এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা তাহার শক্তি বৃদ্ধি করা হইল। তাহার অধীনস্থ সকল কর্মচারী তাহার বন্ধু বান্ধবের মধ্য হইতে দেওয়া হইল এবং বাদশাহের অনুগ্রহভাজন এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে বারিদের পদে নিযুক্ত করা হইল।

তৃতীয় নিয়ম অনুসারে সুলতানের অধীনে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করিবার জন্য দোয়াবের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে খেরাজের পরিবর্তে শস্য আদায় করিয়া তাহা সুলতানী গুদামে জমা করিবার আদেশ দেওয়া হইল। নতুন শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতেও সুলতান অর্ধেক শস্য খেরাজ হিসাবে আদায় করিলেন এবং সমস্ত শস্য ঝাবন ও উহার অন্তর্গত অন্যান্য ছোট শহরে জমা করিলেন। এই সমস্ত যথাস্থানে পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিতে বেপারীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইল। এই প্রকার ব্যবস্থার ফলে দিল্লীতে এত প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য পৌঁছিত যে, প্রতি মহল্লার দুই তিনটি বাড়ী সুলতানী শস্যে পরিপূর্ণ থাকিত। যখন অনাবৃষ্টির কাল আসিত বা কোন কারণে সওদাগররা বাজারে শস্য আমদানী করিতে দেরী করিত, তখন এই সকল গুদাম হইতে সুলতানী শস্য বাজারে ছাড়া হইত এবং সুলতানী বাজারদরে তাহা বিক্রয় হইত; প্রয়োজন অনুসারে সকলেই খাদ্য শস্য পাইত। নতুন শহরেও বেপারীরা অনুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইত। এই দুইটি উপায় অবলম্বন করিবার ফলে বাজারে কখনও শস্যের অভাব হইত না এবং উহার মূল্যও সর্বদা একপ্রকার থাকিত।

খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য চতুর্থ নিয়ম অনুসারে বিদেশী সওদাগরদিগকে মালীক কবুল শাহনা মণ্ডির অধীন করা হইল। সুলতান আদেশ দিলেন যে, বিভিন্ন দেশের সওদাগরদিগকে শাহনা মণ্ডির প্রজা হিসাবে গণ্য করা হইবে। তাহাদের মধ্যে মুকদিম ও চৌধুরীদিগকে কয়েদ করিয়া রাখা হইবে।

শাহনা মণ্ডিকে হুকুম করা হইল যে, তিনি যেন চৌধুরীদিগকে কয়েদ করিয়া নিজের সম্মুখে বাজারে উপস্থিত রাখেন এবং তাহাও এমনভাবে করিবেন, যাহাতে উহারা একত্র হইতে বা পরস্পরের জামিন হইতে খত লিখিবার সুযোগ না পায়; পুত্র পরিজন, পশুপাখী, পোশাক পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র যেন সাথে লইয়া না আসে এবং যমুনার তীরবর্তী গ্রামগুলিতে বসবাস করিতে আরম্ভ না করে। শাহনার কানুন উহাদের উপর ও উহাদের পরিবারবর্গের উপর শাহনা মণ্ডির তরফ হইতে জারী করা না হয়; যাহাতে সওদাগররা শক্তি সঞ্চয় করিয়া শাহনা মণ্ডির নিকট হইতে চৌধুরীদিগকে মুক্ত করিয়া লইবার সুযোগ না পায়। এই নিয়মটি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিবার ফলে বাজারে এত প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শস্য পৌঁছিতে লাগিল যে, সুলতানী শস্যের প্রয়োজনই রহিল না এবং মূল্যের ক্ষেত্রেও কোন প্রকার তারতম্য দেখা দিল না।

পঞ্চম নিয়ম অনুসারে সর্বসাধারণের দ্বারা খাদ্যশস্য মজুত করিবার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। সুলতান আলাউদ্দিনের সময় এই ব্যবস্থা এত দৃঢ় হইয়াছিল যে, সওদাগর, জোতদার, সবজীওয়ালা এবং অন্য কোন লোকের পক্ষে এক মণ শস্য মজুত করা বা সুলতানী বাজারদর অপেক্ষা এক দাঙ্গ বেশী দরে এক আধমণ শস্য নিজ ঘরে বসিয়া বিক্রয় করা সম্ভব ছিল না। যদি কোন মজুতদারের খবর পাওয়া যাইত, তবে তাহার সমুদয় শস্য সুলতানের কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া আসিত এবং মজুতকারীকে জরিমানা করা হইত। দোয়াবের বিভিন্ন অঞ্চলের নওয়াব ও কারকুনরা দেওয়ানে আলাকে এই মর্মে লিখিয়া দিত যে, তাহারা উক্ত অঞ্চলের কাহাকেও শস্য মজুত করিতে দিবে না। যদি এইরূপ শস্য মজুত করার কোন খবর পাওয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য নায়েব ও মুসরিফ দায়ী হইবে এবং দরবারে ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। এইভাবে মজুত রাখার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে জন্মা ও অজন্মা উভয় সময়েই শস্যের বাজারদর একপ্রকার থাকিত।

খাদ্যশস্যের বাজারদর কমাইবার জন্য ষষ্ঠ নিয়ম অসনুারে শস্যের মুসরিফ ও কারকুনদের নিকট হইতে এই মর্মে চুক্তিপত্র লওয়া হইত যে, তাহারা যেন ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা যথা মূল্যে বেপারীদের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করে। সুলতান এই মর্মে নির্দেশ দেওয়ার ফলে দেওয়ানে আলা দোয়াব ও অন্যান্য অঞ্চলের শাহনা ও মুসরিকদের নিকট হইতেও খাত বা চুক্তিপত্র গ্রহণ করিত। ইহার ফলে তাহারা এমনভাবে খেরাজ আদায় করিত যে, প্রজারা ফসল তুলিয়া ঘরে আনা বা মজুত করিয়া রাখার ফুরসুতও পাইত না। অতঃপর তাহারা ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তি ফসল যথামূল্যে বেপারী-

দের নিকট বিক্রয় করিয়া দিত। এই নিয়ম প্রতি পালনের ফলে বেপারীদের জন্য যথাসময়ে বাজারে শস্য আমদানী করিতে কোনপ্রকার ওজর আপত্তি করিবার অবকাশ ছিল না। ফলে বাজারে অবিরত খাদ্যশস্যের আমদানী হইত। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে কৃষকরাও যতদূর সম্ভব শস্যাদি বাজারে লইয়া আসিত এবং সুলতানী দরে বিক্রয় করিত।

সপ্তম নিয়ম অনুসারে বাজারের সর্ববিধ খবর সংগ্রহ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের কাজ করা হইত। সুলতান আলাউদ্দিন প্রতিদিন তিন স্থান হইতে বাজারদর ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় তৎপরতার সংবাদ পাইতেন। প্রথমে শাহনা মণ্ডি বাজারদর ও বাজারের অবস্থার বর্ণনা সুলতানের নিকট পৌঁছাইত। ইহার পর বারিদ এই ব্যাপারে অন্যবিধ সংবাদ দিত। এই দুই জনের পর বাজারে যে সকল চর নিযুক্ত ছিল, তাহারা যথাবিধি আসিয়া সুলতানকে খবর দিয়া যাইত। যদি শাহনার বর্ণনা, বারিদের সংবাদ ও চরের খবরে কোন প্রকার পার্থক্য দেখা দিত, তাহা হইলে উহার জন্য সামান্য পরিমাণে হইলেও শাহনা মণ্ডি দায়ী হইত। আমলাদের যেহেতু জানা ছিল যে, বাজারের খবর তিনটি স্থান হইতে সুলতানের নিকট পৌঁছিয়া থাকে, সেই জন্য এই ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ তারতম্য করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিত না।

সুলতান আলাউদ্দিনের সময়কার সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই বাজারদরের এই প্রকার স্থিতাবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য হইতেন। যখন প্রচুর বৃষ্টির ফলে ভাল ফসল হইত, তখন শস্যের বাজারদর কম বা একই প্রকার থাকা তেমন আশ্চর্যের বিষয় নাও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হইত, যখন অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া উচিত, তখনও দিল্লীতে প্রচুর খাদ্যশস্য পাওয়া যাইত এবং তাহা সুলতানী বাজার দরে বিক্রয় হইত। দেশীয় বেপারী বা বিদেশী সওদাগর কাহারও পক্ষে এই ব্যাপারে কোনপ্রকার তারতম্য করা সম্ভবপর ছিল না। এই জন্যই এই বিষয়টি সকলে অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতেন। বস্তুত: এই বিষয় সুলতান আলাউদ্দিন ব্যতীত কোন বাদশাহের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

যদি কোন সময় মন্দা ফসলের দিনে শাহনা মণ্ডির অসতর্কতায় বাজারদর আধা চীতলও বাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে উহার শাস্তি স্বরূপ শাহনার জন্য একুশটি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল। মন্দা ফসলের দিনে প্রতিটি মহল্লার লোকের সংখ্যা অনুসারে যে পরিমাণ খাদ্য লাগিবার কথা, মহল্লার

দোকানীরা সেই পরিমাণ খাদ্য শস্য প্রতিদিন মহল্লায় সরবরাহ করিত। বাহিরের সাধারণ ক্রেতাদের জন্য আধ মণ করিয়া শস্য নির্দিষ্ট থাকিত। যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তির কোনপ্রকার জমি জিরাত ছিল না, তাঁহারাও বাজার হইতে শস্য পাইতেন। বন্যা ফসলের দিনে যদি মানুষের ভীড়ে কোন দুর্বল বা গরীব ব্যক্তি শস্য পাওয়ার বদলে মানুষের পায়ের তলায় পড়িয়া মারা যাইত এবং এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইত, যাহাতে মানুষের জান মাল বিপন্ন হইয়া পড়িত, তাহা হইলে চরদের মাধ্যমে সেই সংবাদ সুলতানের নিকট পৌঁছামাত্রই তিনি তজ্জন্য শাহনা মণ্ডিকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিতেন।

দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্য সামগ্রী যেমন জামা কাপড়, শাক-সব্জী, ফল, চিনি, পশুর চর্বি, বাতির তৈল ইত্যাদির মূল্য সুলভ করিবার জন্য পাঁচটি নিয়ম প্রতিপালন করা হয়। ইহার ফলে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য স্থায়ী হইয়াছিল এবং সুলতানী বাজারদরে কোনপ্রকার তারতম্য দেখা দেয় নাই। সকলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী পাইত। এই পাঁচটি নিয়ম হইল—আদেল সরাই নির্দিষ্ট বাজারদর, বিদেশী সওদাগরদের নাম তালিকাভুক্ত করা, সুলতানী ধনী-দিগকে শাহী খাজানা খানা হইতে সাহায্য ও আদেল সরাই তাহাদের দায়িত্বে অর্পণ করা এবং বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোকদের জন্য মূল্যবান কাপড় সংগ্রহ করিতে অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করা। এই পাঁচটি নিয়ম পালন করার ফলে সুলতান আলা-উদ্দিনের রাজত্বকাল পর্যন্ত দ্রব্যসামগ্রীর দর একই প্রকার ছিল; ইহা কখনও সুলতানী বাজারদর হইতে এক দাঙ্গ বা চীতল বেশী হয় নাই।

দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য কমাইবার জন্য প্রথম নিয়মটি হইল আদেল সরাই প্রতিষ্ঠা করা। কওশকে সবুজের দিকে বাদাউনী দরজার ভিতরে যে ময়দানটি ছিল তাহাই আদেল সরাইর জন্য নির্দিষ্ট করা হইল। সুলতান আলাউদ্দিন সর্বপ্রকার আসবাব বিক্রেতাকে তাহাদের মালামাল সহ আদেল সরাইতে উপ-স্থিত থাকিতে আদেশ দিলেন। ফলে দেশীবিদেশী সকল শ্রেণীর সওদাগর তাহাদের মালপত্র কোন গৃহে বা বাজারে তুলিবার পূর্বে আদেল সরাইতে জমা দিতে বাধ্য হইত এবং সেখানেই সুলতানী দরে বিক্রয় করিত। যদি কোন সওদাগর কোন গৃহে বা বাজারে সরাসরি মাল লইয়া যাইত কিংবা সুলতানী দর অপেক্ষা এক চীতল বেশী দরেও বিক্রয় করিত, তাহা হইলে তাহার সমস্ত মাল সুলতানের আওতাধীনে চলিয়া আসিত এবং তজ্জন্য সওদাগরকে নানা-বিধ জরিমানাও দিতেও হইত। এই নিয়মের ফলে কাপড় বিক্রেতারা এক

হইতে একশত ও হাজার হইতে দশ হাজার—যত তঙ্কা মূল্যের কাপড়ই লইয়া আসুক না কেন, সকলই আদেল সরাইতে জমা দিতে এবং সেখানে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিত।

আসবাবপত্রের মূল্য একই প্রকার সুলভ করিবার জন্য দ্বিতীয় নিয়ম হইল মূল্য ধার্য করা এবং তদনুযায়ী কতকগুলি রেশমী কাপড়ের মূল্য নিম্ন প্রকারে ধার্য করা হয়। দিল্লীর রেশম ষোল তঙ্কা; কোনেলা রেশম ছয় তঙ্কা; বৈধ মিহি লোম তিন তঙ্কা; মিহি চাদর লাল ডোরা সহ ছয় চীতল; সাধারণ চাদর সাড়ে তিন চীতল; লাল নাগুরী আস্তর চব্বিশ চীতল; সাধারণ আস্তর বার চীতল; মিহি শিরীন বুনট পাঁচ তঙ্কা; মধ্যম শিরীন বুনট তিন তঙ্কা; সাধারণ শিরীন বুনট দুই তঙ্কা; সালাওতী মিহি ছয় তঙ্কা; সালাওতী মধ্যম চারি তঙ্কা; সালাওতী সাধারণ দুই তঙ্কা। অন্যান্য কাপড় ও আসবাবপত্রের মূল্য ছিল নিম্নরূপ:—পাতলা কার্পাস বিশ গজ এক তঙ্কা; সাধারণ কার্পাস চল্লিশ গজ এক তঙ্কা; চাদর দশ চীতল; সবজী এক সের আড়াই চীতল; ভিজা শক্কর (গুড়) এক সের দেড় চীতল; লাল শক্কর তিন সের দেড় চীতল; পশুর চর্বি দেড় সের এক চীতল; তিল তৈল তিন সের এক চীতল; দিদো লবণ এক মণ পাঁচ চীতল। অন্যান্য মিহি ও মোটা দ্রব্যসামগ্রী ও আসবাবপত্রের মূল্য, যে মূল্যের হার উপরে বর্ণনা করিয়াছি, উহারউপর অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভোর হইতে জোহরের নামাজ পর্যন্ত আদেল সরাই খোলা থাকিত এবং উল্লেখিত মূল্যে সকল ক্রেতাকে দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হইত। বিনা কারণে কেহ ফিরিয়া যাইত না।

আসবাবপত্রের মূল্য সুলভ করিবার তৃতীয় নিয়ম অনুসারে শহর ও বাহিরের সমস্ত সওদাগরের নাম সর্দারের দপ্তরে লিখা হইত। সুলতান আলাউদ্দিনের আদেশে শহর ও বাহির হইতে আগত সর্বপ্রকার হিন্দু মুসলমান সওদাগরের নাম পুনরায় দপ্তরের দেওয়ানে লিখাইতে হইত এবং সকল সওদাগরকে একই নিয়মের অধীন বলিয়া গণ্য করা হইত। এইভাবে এক নিয়মের অধীন করা ছাড়াও তাহাদের নিকট হইতে চুক্তিপত্র লওয়া হইত। যাহাতে তাহারা চুক্তিতে উল্লেখিত যে পরিমাণ মাল বাহির হইতে আমদানী করে, ঠিক সেই পরিমাণ আদেশ সরাইতে উপস্থিত এবং সুলতানী বাজারদরে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। ইহার ফলে সুলতানের পক্ষ হইতে আসবাবপত্র মজুত করিবার প্রয়োজন হইত না। চুক্তিবদ্ধ সওদাগররা যে পরিমাণ মালপত্র চতুর্দিকের রাজ্যগুলি হইতে আদেশ সরাইতে আনিয়া জমা করিত, তাহাই বহুদিন ধরিয়া পড়িয়া থাকিত এবং বিক্রয় হইতে দেরী হইত।

দ্রব্যসামগ্রীর সুলভ মূল্য স্থায়ী করিবার জন্য চতুর্থ নিয়ম অনুসারে শাহী খাজানাখানা হইতে মুলতানীদিগকে অর্থ দেওয়া হইল। ইহার ফলে তাহারা চতুর্দিকের রাজ্যগুলি হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র কিনিয়া আনিয়া আদেলসরাইতে সুলতানী বাজারদরে বিক্রয় করিত। সুলতান আলাউদ্দিন এই উদ্দেশ্যে মুলতানী সওদাগরদিগকে শাহী খাজানা হইতে বিশ লাখ তঙ্কা দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে আদেলসরাইর কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সম্পদ দিয়া তাহারা অন্যান্য দেশ হইতে মালপত্র কিনিয়া আনিয়া বিশেষভাবে সেই সময়ে বাজারে সরবরাহ করিত, যখন কোন কারণে বিদেশী সওদাগররা মাল লইয়া আসিত না কিংবা আসিতে দেরী করিত। ইহার ফলে সুলতানী বাজারদরে তারতম্য ঘটিবার অবকাশ থাকিত না।

পঞ্চম নিয়ম অনুসারে গণ্যমান্য ও সর্দার শ্রেণীর লোকদের চাহিদা অনুযায়ী বেশীমূল্যের দ্রব্য সামগ্রীর জন্য অনুমতিপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। যে সকল সূক্ষ্ম কারুকার্যের পোশাক; যেমন তসবীহ, তবরিজী, সোনালী জরিদার, দিল্লীর রেশম, কিংখাব, শশতরী, হারিরী, চিনি, ভীরম, দেবগিরী ও এই প্রকারের অন্যান্য কাপড়, যাহা জনসাধারণ ব্যবহার করে না; উহার জন্য আদেলসরাইর সর্দার নিজ হাতে অনুমতিপত্র লিখিয়া না পাঠাইলে সরবরাহ করা হইত না। সর্দারও এই সকল পোশাকের ব্যাপারে আমীর, মালীক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির যোগ্য পরিমাণ অনুসারে অনুমতির ব্যবস্থা করিতেন। এইজন্য তাঁহার যাহাকে মনে হইত যে, তিনি সওদাগর না হইতে পারেন; কিন্তু বাহিরে চারি পাঁচ গুণ বেশী মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্যই এই মাল আদেলসরাই হইতে সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাকে অনুমতিপত্র দিতেন না। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবার কারণ এই যে, দেশী ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর সওদাগররাই উচ্চমূল্যের যে সকল কাপড় বাহিরে অন্য কোথাও পাওয়া যাইত না, তাহা আদেলসরাই হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিত। কারণ তাহারা সুলতানীদরে এইস্থল হইতে কাপড় কিনিয়া বাহিরে অন্যত্র বহুগুণ বেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিত।

এই পাঁচটি নিয়ম প্রতিপালনের ফলে দিল্লীতে আসবাবপত্রের মূল্য খুবই সুলভ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহা বৎসরের পর বৎসর স্থায়ীও হইয়াছিল। খুব বয়স্ক লোকেরাও সুলতান আলাউদ্দিনের সময়কার এই প্রকার সুলভ মূল্যের ব্যাপারটি আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। ঐ সময়ের জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বলিতেন, সুলতান আলাউদ্দিন দ্রব্য সামগ্রীর সুলভ মূল্য স্থায়ী করিবার জন্য

চারিটি বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক—নিয়ম পালনে দৃঢ়তা, উহাতে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছিল না। দুই—অতিরিক্ত খেরাজ; ইহার ফলে অভাবগ্রস্ত প্রজারা সুলতানী বাজারদরে দ্রব্য সামগ্রী ও খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। তিন—সাধারণ মানুষের হাতে ধন-সম্পদ ছিল না বলিলেই হয়; যদ্দরুন সেই সময়ের লোকেরা বলিত, একটি দাক্ষ হইলে একটি উট পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দাক্ষটি কোথায় পাই। চারি—তাঁহার সকল কর্মচারীদের প্রতি অতি-মাত্রায় কঠোর ব্যবহার করা হইত, যাহার ফলে কাহারও পক্ষে ঘুষ খাওয়া বা কাহারও প্রতি দয়া দেখানো তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

অশ্ব, দাসদাসী ও অন্যবিধ পশুর মূল্য চারিটি নিয়ম পালন করা হইত এবং এই নিয়ম অতি অল্প সময়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই চারিটি নিয়ম হইল—অশ্বের শ্রেণী বিভাগ করিয়া সেই অনুসারে মূল্য নির্ধারণ, সওদাগর ও থলিদারদের নিকট বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, দালালদিগকে কঠোরহস্তে দমন এবং প্রতিটি বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া দরবারকে অবহিতকরণ। এই চারিটি নিয়ম অনুসরণ করার ফলে এক দুই বৎসরের মধ্যেই অশ্ব ও অন্যবিধ পশু এবং দাসদাসীর মূল্য এমন সুলভ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের পরে এমনি সুলভ মূল্য আর কখনও দেখা যায় নাই।

প্রথম নিয়ম—অশ্বের শ্রেণী বিভাগ ও তদনুসারে মূল্য নির্ধারণ করিবার বিষয়টি এইভাবে সম্পন্ন হইত। সুলতানী কর্মচারীদের দেওয়া নাম অনুসারে অশ্বগুলিকে তিন ভাগে ফেলা হইত এবং দালালদের সাহায্যে উহাদের মূল্য ঠিক করিয়া দেওয়ানে লেখা হইত। প্রথম শ্রেণীর মূল্য একশত হইতে একশত বিশ তঙ্কা, দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল্য আশি হইতে নব্বই তঙ্কা এবং তৃতীয় শ্রেণীর মূল্য পঁয়ষট্টি হইতে সত্তর তঙ্কা। যে সকল ঘোড়া দেওয়ানে লেখা হইত না, সেইগুলিকে টাটু বলা হইত; সেইগুলির প্রতিটির দাম ছিল দশ হইতে পঁচিশ তঙ্কা।

অশ্বাদি পশুর মূল্য সুলভ করিবার জন্য দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে বাজার হইতে সওদাগর ও থলিদারদিগকে পশু খরিদ করিতে এবং অন্য লোকের দ্বারা তাহাদের জন্য পশু খরিদ করাইতে নিষেধ করা হইল। বিশেষভাবে অশ্বের মূল্য সুলভ করিবার জন্য এই নিয়ম কার্যকরী করিতে সুলতান আলাউদ্দিন আদেশ দিলেন যে, বাজারে সওদাগররা ঘোড়ার আশে-পাশেও আসিতে পারিবে না। ইহার ফলে এই নিয়মটি এমন দৃঢ়তার সহিত পালন করা হইয়াছিল যে,

সওদাগররাও বাজারে আসিতেই পারিত না ; উপরন্তু যাহারা অশ্ব বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিত এবং যাহারা দীর্ঘদিন যাবৎ এই ব্যাপারে নিয়োজিত থাকিবার ফলে বড় বড় দালালের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল, তাহা-দিগকে জরিমানা করা হইল। অনেকক্ষেত্রে এই সকল দালালসহ তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া দূর দূরান্তের কেল্লাগুলিতে নির্বাসিত করা হইল। এইভাবে দৃঢ়-তার সহিত উক্ত নিয়ম পালনে অশ্বাদির মূল্য একান্তই সুলভ হইয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয় নিয়ম অনুসারে দালালদের কর্তৃত্ব নষ্ট করা লইল। কারণ ইহারা ঝগড়াটে, জুয়াড়ী ও বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য ইহাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হইল। ইহারা যাহাতে অশ্বাদি পশুর মূল্য সুলভ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি না করিতে পারে, তজ্জন্য অনেককে শহর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। বস্তুতঃ এই সকল বড় বড় দালালই ছিল বাজারের মালীক। ইহাদের দাপটের সীমা ছিল না। ইহারা ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষ হইতেই ঘুষ আদায় করিত এবং উভয় দলকেই সাহায্য করিত। ইহাদের এই ব্যবস্থা বন্ধ করিতে না পারিলে, বাজারদর কমাইবার কোন উপায় ছিল না। অন্যদিকে শত প্রকার কঠোর ব্যবহারেও ইহাদের সুমতি হইত না, যদিনা সুলতান আলাউদ্দিনের কঠোর মেজাজ ও সর্বনাশা ইচ্ছার ভয় ইহাদের মনে ঢুকিত। প্রকৃতপক্ষে ইহার ফলেই কাজ হইল।

বাজারদর কমাইবার চতুর্থ নিয়ম ছিল দরবারের সম্মুখে ঘোড়ার শ্রেণী বিভাগ ও উহার মূল্য নির্ধারণ। সুলতান আলাউদ্দিন প্রতি চল্লিশ দিনে একদিন এবং অন্যবিধ ঘটনা উপলক্ষে যখন ইচ্ছা তিন প্রকার অশ্ব ও উহাদের মূল্য নির্ধারণের জন্য বড় বড় দালালকে দরবারে ডাকিয়া পাইতেন। তিনি নিজেও শ্রেণী বিভাগ ও মূল্য নিরূপণের কাজে খোঁজ খবর লইতেন। যদি শ্রেণী বা মূল্যের ব্যাপারের নিয়মের বাহিরে কোন কিছু পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তজ্জন্য এই দালালদিগকে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া হইত যে, তাহা অপরের জন্যও শিক্ষাপ্রদ হইয়া দাঁড়াইত। কোন সময় দরবারে ডাক পড়ে, এই ভয়ে দালালদের পক্ষে নতুনভাবে শ্রেণী নির্ধারণ বা ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট হইতে কোন প্রকার ঘুষ লইয়া মূল্যের তারতম্য করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই প্রকার নিয়ম পালনের ফলে মূল্য সুলভ হইয়া উঠিয়াছিল।

দাসদাসী ও অন্যান্য পশুর বাজারদর কমাইবার ব্যাপারে উপরে ঘোড়ার মূল্য সম্পর্কে যেরূপ লিখিয়াছি, তেমন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হইয়াছিল। ফলে কোন সওদাগর বা থলিদারের পক্ষে বাজারে আসা সম্ভব হইয়া উঠিত না।

তাহারা দাসদাসীর ছায়াও মাড়াইতে পারিত না। দাসদাসীর বাজারদর ছিল নিম্নরূপ: বয়স্কা দাসী পাঁচ হইতে বার তঙ্কা; কুমারী দাসী বিশ হইতে ত্রিশ চল্লিশ তঙ্কা এবং গোলামদের মূল্য এক শত দুই শত তঙ্কার নীচে ধার্য করা হইয়াছিল। সেই সময় যে শ্রেণীর গোলাম হাজার দুই হাজার তঙ্কায় পাওয়া যাইত না, তেমন কোন গোলামবাঁদীও যদিও বাজারে উঠিত, তথাপি তাহাও শাহী চরদের ভয়ে কেহ দাম বাড়াইয়া কিনিতে বা বেচিতে পারিত না। কিশোর ও সুন্দর গোলামদের মূল্য ছিল বিশ হইতে ত্রিশ তঙ্কা; কর্মী গোলামদের মূল্য দশ হইতে পনের তঙ্কা এবং বাচ্চা গোলামদের মূল্য ছিল সাত হইতে আট তঙ্কা। এই প্রকার ব্যবস্থার ফলে ঐসময়কার দালালদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারা অনবরত মৃত্যু কামনা করিত।

ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম যথাযথ পালিত হওয়ার ফলে যে সকল ভারবাহী পশু তৎকালে ত্রিশ চল্লিশ তঙ্কা মূল্যে বিকাইতে পারিত, তাহাও চারি বা বড়জোর পাঁচ তঙ্কায় পাওয়া যাইত। গর্ভবতী পশুর মূল্য ছিল তিন তঙ্কা। গোশতের জন্য কেনা গাই গরুর মূল্য দেড় হইতে দুই তঙ্কা এবং দুধাল গাভীর মূল্য তিন চারি তঙ্কা ছিল। দুধাল মহিষের মূল্য ছিল দশ হইতে বার তঙ্কা এবং গোশতের জন্য কেনা মহিষের দাম হইত পাঁচ ছয় তঙ্কা। মোটা তাজা একটি ছাগলের মূল্য দশ হইতে বার চৌদ্দ চীতল পর্যন্ত হইত।

এই তিনটি বাজারের মূল্য সম্পর্কীয় নিয়মাবলী এমনই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, ইহার অপেক্ষা বেশী হইবার সম্ভাবনা ছিলনা বলিলেই চলে। মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তজ্জন্য তিনটি বাজারেই কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। তাহারা বাজারের মূল্যাদির ব্যাপারে প্রকাশ্যে ও গোপনে যাহা কিছু ঘটিত, সকলই সংগ্রহ করিয়া সুলতানী দরবারে উপস্থিত করিত। এইভাবে সুলতানের নিকট যে সকল সংবাদ আসিয়া পৌঁছিত, সেই সম্পর্কে যথাবিহিত অনুসন্ধান করা হইত এবং প্রকৃত অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইত। চর শ্রেণীর এই জাতীয় তৎপরতার ভয়ে বাজার ও বাজারের বাহিরের লোকেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত এবং অনুগত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিত। ফলে কাহারও সাধ্য ছিল না যে, সুলতানী হুকুমের তিল মাত্র অবাধ্যতা করে কিংবা সুলতানী বাজারদরের মধ্যে কোনপ্রকার বেশ কম করিয়া লাভবান হইতে সাহস দেখায়। অথবা অন্যবিধ লোভ-লালসাকে কাজে লাগাইয়া ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করে।

বাজারের নিয়ম-কানুন রক্ষা করিবার ভার দেওয়ানে রিয়াসতের উপর ছিল। তথাপি বাজারের অসংখ্য সামগ্রী ও উহাদের মূল্যমান কলকে লিখিয়া রাখার

কাজটি খুবই জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; ইহার ফলে টুপি হইতে মোজা, চিরুনী হইতে সুঁই, আখ হইতে সবজী, হাবিসা হইতে শুরবা, হালুয়া সাবুনী হইতে রেউড়ী, কাবাব ও বিরিয়ানী হইতে ভাত রুটি ও মাছ, পান সুপারী ও ফুল হইতে শাক সবজী পর্যন্ত যাহা কিছু বাজারে উঠিত, সকলই এই নিয়মের অধীনে আনা হইল। সুলতান আলাউদ্দিন এই সকল নিয়ম-কানুনের সুব্যবস্থা এবং বাজারী লোকদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্যই এই প্রকার একটি দুর্বল ব্যবস্থাও অতিশয় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় এবং উহার মাধ্যমে দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হইয়া উঠে।

নিয়মগুলি ছিল এই—অভিজ্ঞ, কঠোর, কৃপণ ও নির্দয় প্রকৃতির একজন সর্দার নিযুক্ত করা; বাজারীদিগকে কয়েদ, মারপিট ও তাহাদের শরীর হইতে মাংস কাটিয়া লওয়ার ন্যায় শাস্তি দেওয়া; কখনও দরবারী চর ও কখনও সর্দারের মাধ্যমে বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের যথাযথ সংবাদ লওয়া এবং দেওয়ানে রিয়াসত হইতে বাজারের সর্বপ্রকার সংবাদ যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য শাহনা নিযুক্ত করা। এই সকল নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন। ইহার ফলে সর্বসাধারণের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। এই কাজে তাঁহার রাত্রিদিনের বিশ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং বহু চেষ্টায় অতি অল্প পরিমাণে হইলেও প্রতিটি জিনিস, যেমন সুঁই, চিরুনী দাস্তানা, জুতা, পেয়ালা, সোরাহী, ঘড়া ইত্যাদিও নিজের সম্মুখে আনাইয়া উহাদের মূল্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের লাভ-লোকসান বিচার করিয়া দেখিতেন এবং উহার বিবরণ দেওয়ানে রিয়াসতে লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিতেন।

সর্বসাধারণের উপকারার্থে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সুলভ করিবার জন্য প্রথম নিয়মটি হইল একজন অভিজ্ঞ, কঠোর প্রকৃতি, খুঁতখুঁতে মেজাজ ও স্বচ্চরিত্র বাজার সর্দার নিযুক্ত করা। কারণ বাজারের লোকেরা সাধারণভাবে নির্লজ্জ, বেপরোয়া, মিথ্যুক, মূর্খ ও নীচ প্রকৃতির হইত। যেহেতু তাহারাই জিনিস-পত্রের মূল্য নির্ধারণের সর্বময়কর্তা ছিল, সেইজন্য তাহাদের মাধ্যমে বাদশাহী ফরমান অনুযায়ী বাজারদর নিরূপণ করাইবার প্রচেষ্টায় বহু সুলতান ও উজির ব্যর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্যই সুলতান আলাউদ্দিন বহু চিন্তা-ভাবনার পর ইয়াকুব নাজিরকে বাজারসর্দার নিযুক্ত করেন। ইনি সমস্ত শহর সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীর বিক্রেতার চরিত্র সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান রাখিতেন। তদুপরি তিনি যেমন স্বচ্চরিত্র সত্যবাদী, তেমনি কঠোর, নির্দয়

ও খিটখিটে মেজাজের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার কাজের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যের নেজারত ও এহতেসাব বিভাগের সমুদয় সাহায্য যাহাতে অনা-য়াসে পাইতে পারেন, সুলতান সেইমত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ এক-জন বাজারসর্দার নিযুক্ত হওয়ার ফলে দেওয়ানে রিয়াসতের মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। বাজারীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মারপিট, কয়েদ ও অন্যবিধ ও অসম্মানজনক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ফলে তাহারা সর্বদাই ভয়ে কম্পমান থাকিত এবং দ্রব্য-সামগ্রী সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিত। অবশ্য মাপে কম দিবার ব্যাপারে তাহারা অন্যপ্রকার অজুহাত দেখাইত। কম দেওয়া ও মূর্খদিগকে ঠকাইবার প্রবৃত্তি তাহারা এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

সাধারণ বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য কমাইবার দ্বিতীয় নিয়ম হইল এই ব্যাপারে বাদশাহের অতিরিক্ত খোঁজ খবর লওয়া। যদি বাদশাহ এই প্রকার নীচ প্রকৃ-তির বাজারীদিগকে নিজ হইতে সঠিক পথে চলিতে বলিতেন কিংবা তাহাদের অসৎ কার্যাবলীর কোনপ্রকার খোঁজ খবর না লইতেন, তাহা হইলে তাহারা ইচ্ছা করিয়া কোন দিনই সঠিক পথে আসিত না। কারণ পূর্বের বাদশাহগণ বলিতেন যে, ভিতরের জঙ্গল পরিষ্কার করা ও বাজারীদিগকে অনুগত করা অপেক্ষা বাহিরের জঙ্গল পরিষ্কার ও দূরবর্তী অবাধ্যদিগকে বাধ্য করা অনেক সহজ। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন ইহার বিপরীতভাবে এমন করিয়া বাজা-রের প্রতিটি বস্তুর দর দাম সম্পর্কে খোঁজখবর লইতেন যে, উহা দেখিয়া মানুষ অবাক হইত। ইহার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য কমাইবার এই প্রচেষ্টা এমনভাবে সফল হইতে পারিয়াছিল; যাহা আর কখনও দেখা যায় নাই।

সাধারণ বাজারে দ্রব্যমূল্য সুলভ করিবার তৃতীয় নিয়ম হইল শাহনা নিযুক্ত করা। দেওয়ানে রিয়াসত ও বাজারসর্দার ইয়াকুব নাজিরের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত। তাহাদের নিকট জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণের কাগজাদি থাকিত। তাহারা এই সকল কাগজপত্র সহ বেচাকেনার জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং প্রতিটি বস্তুর যথাযথ বাজারদর লিখিয়া রাখিত। যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বা নাম সুলতানী মূল্য তালিকায় লেখা হয় নাই, সেইগুলি তাহারা খোঁজ করিয়া ক্রমে ক্রমে লিখিয়া লইত। সুলতানী মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্যে কোন জিনিস বিক্রয় হইলে এই সকল শাহনা বিক্রেতাকে ধরিয়া আনিয়া বাজারসর্দারের সম্মুখে উপস্থিত করিত। মাপে কম দিলেও শাহনারা ক্রেতার পক্ষ লইয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিত। ইহার ফলে বাজারদর একই প্রকার থাকিবার পথ সুগম হইতে পারিয়াছিল।

বাজারদর সুলভ ও স্থায়ী করিবার চতুর্থ নিয়মটি হইল বাজারীদের প্রতি ইয়াকুব নাজিরের গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তাহাদিগকে প্রয়োজনমত মার-পিট করা হইত; এমনকি মাপে কম দিলে তাহাদের শরীর হইতে দ্বিগুণ পরিমাণ মাংস কাটিয়া লওয়া হইত। শহরের আবালবৃদ্ধবণিতা এই কথা স্বীকার করিত যে, দেওয়ানে রিয়াসতে ইয়াকুব নাজিরের ন্যায় কঠোর প্রকৃতির রইস ইতোপূর্বে আর কোন কালে দেখা যায় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রতি-দিন দশ বিশ বারও বাজারের মূল্যমান পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিতেন এবং পরীক্ষা করিয়া কোনপ্রকার ত্রুটি পাওয়া গেলে অপরাধীকে শাস্তি দিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রকার কঠোর প্রকৃতি ও কঠিন শাস্তি সত্ত্বেও বাজারীরা মাপে কম দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা বাটখারায় কম করিত এবং বেশী পরিমাণের জিনিসপত্রে পাথর ভরিয়া দিত। এইভাবে তাহারা সরল ও অল্পবয়স্ক ক্রেতাদিগকে ঠকাইত।

সুলতান আলাউদ্দিন ভাবিয়া দেখিলেন যে, বাজারীদের যেমন স্বভাব, তাহারা কিছুতেই অনভিজ্ঞ ও অল্পবয়স্ক ক্রেতাদিগকে ঠকাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না; সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে হাতেনাতে পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। সুলতানী কবুতরখানায় যে সকল অল্পবয়স্ক ছেলে ছিল, উহাদের কয়েক জনকে দশ বিশ দেরহাম হাতে দিয়া বাজারে পাঠাইতেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বিরিয়ানী ও রুটি, কেহ রুটি ও আখনি পোলাও, কেহ হালুয়া, কেহ তরমুজ, কেহ খিরা ইত্যাদি কিনিয়া দরবারে আনিয়া উপস্থিত করিত। সুলতানী ছেলেরা প্রায়ই এই প্রকার বহু জিনিস কিনিয়া দরবারে লইয়া আসিবার পর বাজারসর্দারের ডাক পড়িত। তাঁহার সম্মুখে এই সকল জিনিস ওজন করিয়া দেখা হইত এবং সকল বস্তুর কম হওয়ার বিবরণ সহ ছেলেদিগকে বাজারসর্দারের সহিত যথাস্থানে পাঠান হইত। তিনি ছেলেদি-গকে লইয়া বাজারের যে সকল দোকানী কম দিয়াছিল, তাহাদের নিকট উপ-স্থিত হইতেন এবং যে পরিমাণ দ্রব্য বা দেরহাম কম দিয়াছিল, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ মাংস তাহাদের শরীর হইতে কাটিয়া লইতেন। এইভাবে কয়েকবার মাংস কাটিয়া লইবার ফলে বাজারীরা সম্পূর্ণ ঠিক পথে চলিতে আরম্ভ করিল। ওজনে কম দেওয়া, মূল্যের ব্যাপারে গোলমাল করা, অনভিজ্ঞ ও অল্পবয়স্ক ক্রেতাদিগকে ঠকাইবার প্রবৃত্তি তাহারা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বাটখারা ও ওজনে তাহারা এমন সতর্ক হইল যে, অনেক সময় ক্রেতারা তাহাদের দ্রব্য যথার্থ ওজনের অপেক্ষা বেশী পাইত।

বাজারমূল্য সুলভ করিবার এই সকল নিয়ম-কানুন, খোঁজ-খবর লইবার এই সকল বিধি ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি বাজারীদিগকে শায়েস্তা করিবার এই সকল শাস্তি জরিমানা—সকল কিছুই সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইতে আরম্ভ করে। তাঁহার পুত্র সুলতান কুতুব উদ্দিনের পক্ষে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করিবার এই প্রচেষ্টা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নাই।

এই সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠার দ্বারা দ্রব্যমূল্য সুলভ হইবার ফলে দুই শত তেতাল্লিশ তঙ্কায় সৈন্য ও আটাত্তর তঙ্কায় দুই ঘোড়া সহ সিপাহী প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইল এবং এই রীতি স্থায়িত্ব লাভ করিল। লশকরের সকলের তীরান্দাজী পরীক্ষা করিবার পর আরজে মুমালেকের দপ্তরে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ হইত এবং যাহারা তীরান্দাজী ও তলোয়ারবাজীতে সুযোগ্য বিবেচিত হইত, তাহাদিগকেই গ্রহণ করা হইত। ফরমায়েশ মত ঘোড়ার মূল্য ও দাগ দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রচলিত হইল।

সুলতান আলাউদ্দিন এমনিতেই মোগলদের ব্যাপারে অতিশয় কঠোর ছিলেন; দ্রব্যমূল্য সুলভ এবং তদ্দরুণ সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিলে যতবারই মোগলরা দিল্লী অথবা দিল্লীর আশে-পাশের রাজ্যগুলি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে; ততবারই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। নিহত, আহত ও বন্দীর সংখ্যাও কম হয় নাই। মুসলমান সৈন্যরা যতদূর সম্ভব মোগলদের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। হাজার হাজার বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে আনিয়াছে এবং হাতীর পায়ের নীচে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহাদের মাথার দ্বারা গম্বুজ তৈয়ার করিয়াছে এবং অলিগলিতে লটকাইয়া রাখিয়াছে। কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কি শহরে মোগলদের শব পচিয়া দুর্গন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমান সৈন্যরা মোগলদের ব্যাপারে এমনই দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছিল যে, দুই এক জন অশ্বারোহী দশজন মোগল অশ্বারোহীকে শিকলে বাঁধিয়া লইয়া আসিত এবং দশজন অশ্বারোহী একশত মোগল অশ্বারোহীকে তাড়াইয়া লইয়া যাইত।

আলীবেগ ও তারতাক মোগল সর্দার হিসাবে খুবই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আলীবেগ ছিল চেঙ্গিজ খানের বংশধর। একবার সে ত্রিশ চল্লিশ হাজার মোগল সৈন্য সহ পাহাড়ের পার্শ্ব পথ দিয়া আমরূহায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলতান আলাউদ্দিন মালীক নায়েব আখোর বেককে মুসলমান সৈন্যদল সহ মোগলদের সম্মুখীন হইতে আদেশ দিলেন। আমরূহার সীমান্তে উভয় সৈন্যদল যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদিগকে জয়ী করিলেন। আলীবেগ ও তারতাক উভয়েই জীবিত বন্দী হইল। বহুতর মোগল

নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। তাহাদের শব দিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উঁচু উঁচু টিবি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আলীবেগ ও তারতাককে গলায় শিকল বাঁধিয়া এবং অন্য বহু সংখ্যক মোগলকে বন্দী অবস্থায় সুলতানের দরবারে উপস্থিত করা হয়। এই সঙ্গে মোগলদের বিশ হাজার অশ্বও দিল্লীতে আনা হইয়াছিল। সুবহানী চবুতরায় বিরাট মজলিসের ব্যবস্থা করা হইল এবং সুলতান সেখানে দরবার সাজাইয়া বসিলেন। দরবার হইতে ইন্দ্রপথ পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে সৈন্যদল সারি দিয়া দাঁড়াইল। এই দিন শহরে এতলোকের সমাগম হইয়াছিল যে, এক কুজা পানি বিশ চীতল ও আধা তঙ্কায় পর্যন্ত বিকাইয়াছিল। আলীবেগ তারতাক ও অন্যান্য মোগল বন্দীকে এই জনসমুদ্রের মধ্যদিয়া দরবারে উপস্থিত করা হইল এবং সেখানে সকলের সম্মুখে তাহাদিগকে হাতীর পায়ের নীচে নিক্ষেপ করা হইল। মোগলদের রক্তে নদী প্রবাহিত হইল।

অন্য একবার খিগর কঙ্ক একদল মোগল সৈন্য লইয়া আসে এবং মুসলমান সৈন্যদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। এইবারও মুসলমান সৈন্যরা জয়ী হইয়াছিল এবং মোগল সেনাপতি কঙ্ককে ধরিয়া আনিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের দরবারে উপস্থিত করা হইলে তাহাকেও হাতীর পায়ের নীচে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। এইভাবে কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কি অন্যত্র যে সকল মোগল বন্দী হইত, তাহাদিগকেও হাতীর পায়ের নীচে ফেলা হইত। এইবার মোগল সৈন্যদের মধ্যে নিহতের সংখ্যা ছিল অধিক। তাহাদের কর্তিত শিরদ্বারা বাদাউনী দরজার সম্মুখে একটি গম্বুজ প্রস্তুত করা হয়। সেই গম্বুজের চিহ্ন আজিও লোকে দেখিয়া থাকে এবং সুলতান আলাউদ্দিনের কথা স্মরণ করে।

অন্য এক বৎসর তিন চারিজন হাজারী সৈন্যদলের মোগল সর্দার ত্রিশ চল্লিশ হাজার সৈন্য সহ সোজাসুজি সোয়ালেক রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ অঞ্চলে ব্যাপক লুটতরাজ করিতে শুরু করিয়াছিল; সুলতান আলাউদ্দিন মুসলমান সৈন্যদলকে এই নির্দেশ দিলেন যে, তাহারা মোগলদের পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে তথাকার নদীতীরে গিয়া শিবির স্থাপন করিবে এবং মোগলরা যখন লুটতরাজ শেষে তৃষ্ণার্ত হইয়া ঐ নদীতীরে আসিবে, তখন তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তি দিবে। মুসলমান সৈন্যরা তাহাই করিল। আল্লাহর ইচ্ছায় মোগলরা সোয়ালেক রাজ্য লুটতরাজ শেষে বহু দূর দরাজ রাস্তা অতিক্রম করিবার পর একান্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া যখন সেই নদীর তীরে আসিয়া পৌছিল, তখন অপেক্ষারত মুসলমান সৈন্যরা অতর্কিতভাবে তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। মোগলরা পথশ্রম ও তৃষ্ণায় কাতর; তাহারা দশটি আঙ্গুল মুখে পুরিয়া মুসলমানদের নিকট পানি চাহিল; কিন্তু

মুসলমান সৈন্যরা উহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। ফলে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে জয়ী হইল এবং মোগলরা স্ত্রীপুত্র সহ সকলেই বন্দী হইল। কয়েক হাজার মোগলকে গলায় শিকল পরাইয়া নারানিয়া দুর্গে পাঠান হইল। ইহাদের স্ত্রী-পুত্রদিগকে কয়েদ করিয়া দিল্লীতে আনিবার পর হিন্দুস্তানী গোলাম বাঁদীদের ন্যায় বাজারে বিক্রয় করা হইল। সুলতান মালীক খাস হাজেবকে নারা-নিয়া দুর্গে যাওয়ার নিদেশ দিলেন। তিনি সেখানে গিয়া সকল মোগল যুদ্ধবন্দীকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করিলেন। তাহাদের রক্তে নদী প্রবাহিত হইল।

অন্য এক বৎসর ইকবাল মন্দা মোগল সৈন্য সহ আসিলে সুলতান আলা-উদ্দিন মুসলমান সৈন্যদিগকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। এইবারও 'তানবু-ঘায়ে আমীর আলী ওয়াহেদ'—এ মোগল সৈন্যদের সহিত মুসলমান সৈন্যদের সংঘর্ষ ঘটিল। মুসলমানরা জয়ী হইয়া ইকবাল মন্দাকে হত্যা করিল। এই বারও বেশ কয়েক হাজার মোগল নিহত হইয়াছিল। যে কিছু সংখ্যক শতী ও হাজারী মোগল সর্দার যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে দিল্লীতে আনিয়া হাতীর পায়ের নীচে দেওয়া হইল। ইকবাল মন্দার হত্যার এই সময় হইতে আর কখনও কোন মোগল জীবিত ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। মোগলরা তখন হইতে মুসলমান সৈন্যদের ভয়ে এমনই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, হিন্দুস্তান আক্রমণ করিবার কথা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। এমনিভাবে সুলতান কুতুব উদ্দিনের রাজত্বের শেষকাল পর্যন্ত মোগলরা হিন্দুস্তান আক্রমণ করিবার নাম মুখেও আনে নাই। সীমান্তেও আগমন করে নাই। মুসলমান সৈন্যদের ভয়ে তখনও তাহারা কাঁপিত এবং স্বপ্নেও মুসলমান সৈন্যদের তরবারির চাকচিক্য তাহাদের চোখ ঝলসাইয়া দিত।

দিল্লী ও অন্যান্য রাজ্য হইতে মোগলদের আক্রমণের ভয় দূরীভূত হওয়ার পর বলিতে গেলে সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল এবং সীমান্তের পাশে প্রজারা শান্তির সহিত কৃষি কাজ ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হইতে পারিল।

সুলতান তুঘলকশাহ, যিনি তখন মালীক গাজী নামে হিন্দুস্তান ও খোরাসানে খুব খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তিনি দেবপালপুর ও লাহোর অঞ্চলের কেতাদার হিসাবে মোগলদের পথে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বসূরী শের খানের ন্যায় তিনিও এই ব্যাপারে খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া-ছিলেন। সুলতান কুতুব উদ্দিনের রাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর শীতকালে সৈন্যদল সহ দেবপালপুর হইতে তিনি মোগল সীমান্তের দিকে বেড়াইতে যাইতেন এবং প্রকাশ্যে মোগলদিগকে

যুদ্ধে আহবান করিতেন। কিন্তু মোগলদের এমন সাহস হইত না যে, তাহারা সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, মোগলদের ভয়ে আর কেহ ভীত হইত না। কাহারও মুখে ইহাদের নামও শোনা যাইত না।

সুলতান আলাউদ্দিনের প্রচেষ্টায় মোগলদের শক্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল এবং এই দেশে তাহাদের আসিবার পথও রুদ্ধ হইয়াছিল। দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সুলভ হওয়ার ফলে সৈন্যদল ও আসবাবপত্র সম্পর্কে একটা স্থিরতা দেখা দিয়াছিল। চতুষ্পার্শ্বের সমুদয় রাজ্য বিশ্বস্ত মালীক ও অনুগত আমীরদের হাতে পড়িয়া সুব্যবস্থা লাভ করিল এবং বিদ্রোহী ও বিরোধীরা আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। সুলতানী জরিপ অনুযায়ী আবাদী ও অনাবাদী জমির খেরাজ রায়তদের নিকট গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইল। বিদ্রোহের ভাব, বাজে খেয়াল ও সকল প্রকার দুরাশা রায়তদের মন হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ইহার ফলে রাজ্যে সর্বশ্রেণীর রায়ত দ্বিধামুক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্যে মনযোগ দিতে সক্ষম হইল।

রণথাম্বুর, চিতোর, মণ্ডর, খির, ধার, উজ্জয়িনী, মান্দুগড়, আলাইপুর, চান্দেরী, ইরাজ, সওয়ানা, জালুর প্রভৃতি রাজ্য প্রকৃতপক্ষে বহিসীমান্তে অবস্থিত ছিল, সেগুলি যোগ্য ওয়ালী ও কেতাদারদের হাতে সুশাসিত হইয়া উঠিল। গুজরাটে আলী খান; মুলতান ও সুস্তানে তাজুল মুলক কাফুরী; দেবপালপুরে গাজী মালীক তুগলকশাহ; সামানা ও সান্নামে মালীক আখোরবেক তাতক; ধার ও উজ্জয়িনীতে আইনুল মুলক মুলতানী; ঝাবনে ফখরুল মুলক মায়সরাতী; চিতোরে মালীক আবু মুহম্মদ; চান্দেরী ও ইরাজে মালীক তমর; বাদাউন, কোয়েলা ও করকে মালীক দীনার শাহনা পীল; অযোধ্যায় মালীক বকতন এবং কোড়ায় মালীক নাসির উদ্দিন সুতীলার শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কুল, বরণ, মিরাট, আমরুহা, আফগানপুর, কাবের এবং দোয়াবের অন্তর্গত অন্যান্য অঞ্চলও এক রাজ্যের দেহে পরিণত হইল। এইগুলি খাসশাহী জমি হিসাবে গণ্য করা, লোক লশকরের ব্যয়ের জন্য তাহা নির্ধারিত করা এবং সর্বপ্রকার খেরাজ দেরহাম ও পাই পর্যন্ত শাহী খাজানাখানায় জমা করিবার ব্যবস্থা করা হইল। তেমনি খাজানাখানা হইতে সৈন্যদলের বেতন দেওয়া এবং কারখানাগুলির ব্যয় নির্বাহের কাজ যথারীতি সম্পন্ন করা হইল। মোটকথা সুলতান আলাউদ্দিনের রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সর্বদিক হইতে পরিপূর্ণতা লাভ করিল।

রাজধানীতে কোন প্রকার কুকাজ ও কুকথার চিহ্ন ছিল না। রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা এতদূর পৌঁছিয়াছিল যে, মুকদিম ও খওতীরা রাস্তার পথিক ও কাফেলাকে নিরুপদ্রবে যাইতে দিত। বিদেশীরা বিনা দ্বিধায় মালমাত্তা সহ মাঠ প্রান্তর পার হইয়া যাইত। সুলতানের সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থার ফলে রাজধানীর ভাল মন্দ খবর এবং রাজ্যের অধিবাসীদের সকলপ্রকার অবস্থার সংবাদ তাঁহার নখ দর্পণে থাকিত, তাঁহার শান শওকত, আদেশের দৃঢ়তা, মেজাজের কঠোরতায় রাজ্যের সর্ব শ্রেণীর লোক ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল এবং তাঁহার শাসনব্যবস্থা সকলে দ্বিধাহীন চিত্তে মানিয়া লইয়াছিল। যে দৃঢ়ভিত্তির সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া কাহারও মনে এই চিন্তার উদয় হইত না যে, এত শীঘ্র তাঁহার বংশ হইতে এই রাজ্যপাট অন্যকোন বংশের হাতে চলিয়া যাইবে।

একান্তভাবে দুনিয়ার সৌভাগ্যের বলেই সুলতান আলাউদ্দিনের রাজ্য গঠন সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপার তাঁহার ইচ্ছামত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন এবং যাহা ভাবেন নাই, তৎসমুদয় কাজই অভাবনীয় রূপে সাফল্যলাভ করিয়াছিল। সংসারমনা যে সকল লোক সাংসারিক সাফল্যকেই সার বলিয়া মনে করে, তাহারা আলাউদ্দিনের এবংপ্রকার সাফল্যকে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলিয়া মনে করিত। রাজ্যশাসন ও যুদ্ধাদি জয়ের সময় তিনি যে সকল আদেশ নিষেধ দান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়কে তাঁহার কেরামতের নিদর্শন বলিয়া ভাবিত। কিন্তু যাহারা দীন ও দুনিয়া সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যাহাদের দৃষ্টি প্রতিটি বস্তুর প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইত এবং ধর্মের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস পৃথিবীর এই উত্থান-পতন অপেক্ষা বহু গুণ বেশী দৃঢ় ছিল, তাঁহারা সুলতান আলাউদ্দিনের এই প্রকার সাফল্য ও যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করিতেন।

তাঁহাদের মতে এই রাজত্বকালে যে সকল যুদ্ধ জয় হইয়াছে, রাজ্যশাসনের ব্যাপারে যে সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং প্রজাসাধারণ যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়াছে, তৎসমুদয়ই শায়খুল ইসলাম নিজাম উদ্দিন গিয়াসপুরীর (আল্লাহ্ তালা তাঁহার অন্তঃকরণ পবিত্র রাখুন) বরকত ও কেরামতের ফল। কেননা তিনি যথার্থই আল্লাহ্ তালার বন্ধু ও তাঁহার প্রেমিক ছিলেন। সর্বদা তাঁহার উপর আল্লাহ্ তালার অফুরন্ত রহমত ও দয়া বর্ষিত হইত। তাঁহার উপর আল্লাহ্ তালার অপার অনুগ্রহ এবং তাঁহার পবিত্র অস্তিত্ব, যাহা সর্বদাই আল্লাহ্ তালার প্রিয় ছিল, উহার বরকতেই আলাউদ্দিনের সকল ব্যবস্থা তাঁহার

ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার দ্বারা ইসলামের পতাকাই জয়ের পরে বিজয় লাভ করিয়া সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দিন যে সকল পাপ ও অনাচারে অভ্যস্ত ছিলেন এবং যেভাবে তিনি বেপরোয়া অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করাইয়াছিলেন, উহার সহিত অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম ও কেরামতের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে। এই কারণেই বলিতে হয় এই সকল সুব্যবস্থা জীবনের সুখ-সুবিধা, জীবিকার প্রাচুর্য, নানাবিধ বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাওয়া এবং সকল শ্রেণীর মানুষের আনুগত্য স্বীকার বস্তুতঃ শায়খ নিজাম উদ্দিনেরই বরকতের ফসল। স্বয়ং আলাউদ্দিনকে এই সমুদয় বিষয় ও সাফল্য আল্লাহ্ তা'লা পরীক্ষাস্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের রাজ্যশাসন ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠা এবং সুলতানের মন এই সকল বিষয় হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইবার বিবরণ দান করায় বর্তমান ইতিহাস লেখকের উদ্দেশ্য এই যে, রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা আসিবার পর সুলতান অন্যান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারিলেন। তিনি সিরির দুর্গে আসিলেন এবং সিরি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। সুলতান এইবার দেশ জয়ের ব্যাপারে নিজকে নিয়োজিত করিলেন। এই উদ্দেশ্যে সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি তাহাদের দ্বারা অন্য রাজ্যগুলির রাজা জমিদারদিগকে উৎখাত করিয়া তথাকার মালমাত্তা দিল্লীতে আনিবার জন্য দক্ষিণ দিকে অভি-যান পরিচালনা করিতে মনস্থ করিলেন। মোগলদের গতিরোধ করিবার জন্য তিনি যে সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন, বর্তমান সৈন্যদল উহা হইতে ভিন্ন। প্রথমবারে তিনি মালীক নায়েব কাফুর হাজারদিনারীকে বহু মালীক ও আমীর সহ লালছত্র প্রদান করিয়া দেবগিরির দিকে পাঠাইলেন। খাজা হাজী আরজে মুমালেককে লোক লশকরের দেখা শোনা এবং গণিমতে মাল বুঝিয়া আনার জন্য তাঁহার সঙ্গে দিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন মালীক থাকাকালে একবার দেবগিরি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ইহার পর দীর্ঘদিন দিল্লী হইতে কোন সৈন্যদল দেবগিরি অভিমুখে যায় নাই। সেই কারণেই তথাকার শাসক রামদেব বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল এবং বেশ কয়েক বৎসর যাবত সুলতানের খেদমতে কোনপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করা হইতে বিরত ছিল।

মালীক নায়েব সুসজ্জিত বাহিনীসহ দেবগিরি আক্রমণ ও লুন্ঠন করিলেন। রামদেব তাঁহার পুত্রগণসহ ধৃত হইলেন। সতেরটি হাতীর পিঠে বোঝাই করিয়া আনিবার মত ধনরত্ন সৈন্যদলের হস্তগত হইল। সৈন্যরা গণিমতের

মালও প্রচুর পাইয়াছিল। দেবগিরি জয়ের সংবাদ দিল্লীতে আসিলে সুউচ্চ মিম্বর হইতে উহা সর্বত্র ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। সর্বত্র আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল। মালীক নায়েব দেবগিরি জয় করিয়া রামদেব, তাঁহার ধনভাণ্ডার ও হাতী-ঘোড়াসহ দিল্লীতে পৌঁছিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দিনের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। সুলতান রামদেবকে মার্জনা করিয়া তাঁহাকে ছত্রদান ও 'রায় রায়ান' উপাধি প্রদান করিলেন। তাঁহাকে এক লাখ তঙ্কা উপহার দিলেন এবং বহুতর সম্মানসহ তাঁহার পুত্রদের সহিত দেবগিরিতে ফেরৎ পাঠাইলেন। দেবগিরির শাসনব্যবস্থা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। সেই সময় হইতে সুলতান জীবিত থাকা পর্যন্ত রামদেব সর্বদা সুলতানের অনুগত ছিলেন। তিনি রীতি অনুযায়ী সর্বদা দিল্লীতে উপঢৌকনাদি পাঠাইতেন।

পরবর্তী বৎসর ৭০৯ হিজরীতে সুলতান আলাউদ্দিন লালছত্র ও বড় বড় আমীর মালীক সহ মালীক নায়েবকে অধিক সংখ্যক সৈন্য দিয়া অরণ্যকূলে পাঠাইলেন। যাইবার কালে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, তিনি যেন অরণ্যকূল দুর্গ জয় করিবার পর ধনরত্ন, মালমাত্তা ও হাতী-ঘোড়া সম্পূর্ণ লুন্ঠন করিয়া না আনেন। আগামী বৎসরগুলিতে যাহাতে সেখান হইতে মালমাত্তা ও হাতী ঘোড়া পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। কোন ক্রমেই হঠকারিতা, সর্বস্ব লুণ্ঠন ও বেশী পাওয়ার জন্য চাপ না দেন। লদ্দর দেবকে নিজের সঙ্গে দিল্লীতে আনিয়া অধিকতর সুখ্যাতি অর্জনের আশায় যেন না থাকেন। তিনি বিদেশে যাইতেছেন, কাজেই সেখানে বেশীদিন থাকিবার চেষ্টা যেন না করেন। মালীক ও আমীরদেরসহ যেন মধ্যম পন্থায় জীবনযাপন করেন এবং তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হন। সেনাপতি ব্যাপারে যেন সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া চলেন। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবার পূর্বে খাজা হাজী ও বড় বড় মালীকদের সঙ্গে যেন পরামর্শ করেন। লোকজনের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং অহেতুক কঠোর হওয়ার ভাব পরিত্যাগ করেন। তিনি বিদেশ বিভূঁইতে যাইতেছেন; দিল্লী হইতে উহার দূরত্ব অনেক। কাজেই তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে এমন কোন কিছু প্রকাশ না পায়, যাহাতে লোকলশকরের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইতে পারে। যতদূর সম্ভব সৈন্যদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়াও না দেখিবার এবং শুনিয়াও না শুনিবার ভান করেন। আমীর, বিশিষ্ট লোকজন ও সেনাপতিদের সহিত এমন কোমল ব্যবহার করা উচিত নহে, যাহাতে তাহারা বেয়াদব ও বেপরোয়া হইয়া আদেশ অমান্য করিতে সাহস করে। আবার এমন কঠোর ব্যবহার করাও ঠিক নহে, যাহাতে তাহারা শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আমীর সেনাপতিদের সর্বপ্রকার ভালমন্দ সংবাদ যেন তিনি জানিতে পারেন এবং

যাহাতে তাহারা একত্র মিলিত হইয়া সংবাদ আদান-প্রদান বা একে অপরের সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। স্বর্ণরৌপ্য ব্যতীত অন্য গণিমতের মাল এক পঞ্চমাংশ তাহাদের মধ্যে বাঁটিয়া দিতে তিনি যেন দ্বিমত না করেন। আমীরদের দ্বারা লুণ্ঠিত কোন ঘোড়া বা গোলাম যদি তাহারা মালীক নায়েবের নিকট হইতে পাইতে আশা করে, তবে তাহা যেন তাহাদিগকে যথাযথভাবে দেওয়া হয়। যদি মালীক ও আমীররা তাঁহার নিকট নিজেদের জন্য কিংবা তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যদের জন্য ধনসম্পদ কর্জ চাহে, তবে তাহাদের নিকট হইতে যথারীতি খত লিখাইয়া যেন কর্জ দান করেন। আমীর বা লশকরের কাহারও ঘোড়া যদি যুদ্ধে নিহত হয়, চুরি হয় অথবা হারাইয়া যায়, তবে তাহাকে যেন পূর্বাপেক্ষা ভাল ঘোড়া প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ঘোড়া কিভাবে নষ্ট হইয়াছে, উহার একটি বিবরণ যেন দেওয়ানে লিখিয়া লইবার জন্য খাজাকে নির্দেশ দেন। কেননা প্রত্যেকটি ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখা একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মালীক নায়েব ও খাজা হাজী সুলতানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মালীক নায়েবের জায়গীর 'রাবেরী'তে পৌঁছিলেন। সেখানে থাকিয়া সমস্ত সৈন্যদল একত্র করিলেন এবং সেখান হইতে অরণ্যকুল ও দেবগিরির পথে অগ্রসর হইলেন। হিন্দুস্তানী মালীক ও আমীরগণ নিজ নিজ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ চান্দেরীতে মালীক নায়েবের সহিত মিলিত হইলেন। এখানে সমস্ত সৈন্যদলের হিসাব-নিকাশ হইল এবং এইস্থান হইতেই মালীক নায়েব যথারীতি সমস্ত সৈন্যদল সহ দেবগিরির সীমান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রায় রায়ান রামদেব আসিয়া মুসলমান সৈন্যদলকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং মালীক নায়েবের খেদমতে নানাবিধ সাহায্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মালীক আমীরদিগকে নানাপ্রকার স্মরণীয় বস্তুদান করিলেন। মুসলমান সৈন্যরা যে কয় দিনে দেবগিরি সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিল, ততদিন প্রত্যহ রামদেব লালছত্রের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া ভূমি চুম্বন করিতেন। সৈন্যদল দেবগিরি শহরে উপনীত হইলে রামদেব তাঁহার আনুগত্যের শর্ত পালন করিয়া মালীক নায়েব সহ সকল বড় বড় মালীক ও আমীরকে নিজ সামর্থ অনুসারে খোরাক দান করিলেন। যতদূর সম্ভব সুলতানী সৈন্যদলের সহিত যুক্ত বিভিন্ন কারখানাকে লোকজন দিয়া সাহায্য করিলেন। প্রতিদিন তিনি নিজ অনুচর অনুগামী সহ লালছত্রের সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেন এবং যথারীতি আদাব আরজ করিতেন। দেবগিরির বাজার সওদা সৈন্যদলে পাঠাইতেন এবং বাজারীদিগকে আদেশ

দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন সৈন্যদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র উপযুক্তভাবে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করে।

সৈন্যদল কিছুদিন দেবগিরিতে অবস্থান করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিল। রামদেব তাঁহার লোকজনকে তেলেঙ্গার রাস্তায় অবস্থিত গ্রামগুলিতে পাঠাইলেন, যাহাতে তাহারা অরণ্যকুল যাইবার পথের সকল ঘাঁটিতে উপযুক্ত রসদ ও অন্য আসবাব-পত্র যোগাড় করিয়া রাখিতে পারে এবং যদি সৈন্যদলের মাঝে যোগাযোগ বিছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা যেন যথাযথ পথ নির্দেশ করিয়া সাহায্য করে। দিল্লীর সৈন্যরা যেমনভাবে সেনাপতির হুকুম পালন করে, তাহারাও যেন তাহাই করে এবং যে সকল সৈন্য নিজ নিজ লস্কর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ফেরৎ আসে, তাহাদিগকে নিরাপদে সীমান্ত অঞ্চল পার করিয়া লস্করের সহিত যুক্ত হইতে সহায়তা করে। রামদেব কিছু সংখ্যক মারাঠী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যকে লালছত্রের সহিত যাইতে আদেশ দিলেন। তিনি নিজেও কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত মালীক নায়েবের সহিত গেলেন এবং তাঁহাকে বিদায় করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সৈন্যদলের অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা রামদেবের এই প্রকার আনুগত্য, আন্তরিকতা ও খেদমতের সকল দিক লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিলেন যে, সদ্বংশজাত মানুষ ও সদ্বংশজাত মানুষের সন্তান-সন্ততিকে উচ্চপদ দান করিলে, তাহাদের নিকট এইপ্রকার ব্যবহারই পাওয়া যায়, যেমন রামদেবের আচার-আচরণে দেখা গিয়াছে।

মালীক নায়েব তেলেঙ্গার মাটিতে পৌঁছিবার পর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি লুট করিবার আদেশ দিলেন। তথাকার রায় ও মুকদ্দিমরা মুসলমান সৈন্য দেখিবা মাত্র উক্ত অঞ্চলের দুর্গগুলি ত্যাগ করিয়া অরণ্যকুলের দুর্গের অভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অরণ্যকুলের মাটির দুর্গ বেশ প্রশস্ত ছিল। আশে পাশের সকল ধনাঢ্য লোক আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। রাজা তাঁহার মুকদ্দিম ও অন্য রায়দের সহিত হাতী-ঘোড়া ও ধনভাণ্ডার লইয়া পাথরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মালীক নায়েব অগ্রসর হইয়া মাটির দুর্গ অবরোধ করিলেন। প্রতিদিন বাহির ও ভিতরের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। দুইদিক হইতেই 'মাগবেরী পাথর' নিক্ষেপ করা হইত। ইহাতে উভয় পক্ষের লোকজন হতাহত হইতেছিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। মুসলান সৈন্যরা অসম সাহসিকতার সহিত সিঁড়ি লাগাইয়া ফাঁস নিক্ষেপ করিয়া পাখীর ন্যায় পাথরের দুর্গ অপেক্ষা মজবুত মাটির দুর্গের চূড়াগুলিতে উঠিয়া পড়িল এবং তীর, তলোয়ার, বল্লম ও চকমারের সাহায্যে ভিতরের লোকজনের প্রচুর ক্ষতিসাধন করিল। অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়

হইয়া দাঁড়াইল এবং ইহার ফলে পাথরের দুর্গের অধিবাসীদের জীবনও দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। লদ্দর দেব যখন দেখিলেন যে, অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং পাথুরে দুর্গের ভাগ্যও অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও বিখ্যাত ভাটদিগকে প্রচুর লোকজনসহ মালীক নায়েবের খেদমতে পাঠাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সন্ধির শর্ত এই জানাইলেন যে, বর্তমানে যে পরিমাণ ধন-সম্পদ, হাতী-ঘোড়া, মণি-মাণিক্য আছে, তৎসমুদয় মালীক নায়েবের খেদমতে হাজির করিবেন এবং আগামী বৎসরগুলিতেও প্রচুর ধনশাহী খাজানাখানা ও প্রচুর হাতী ঘোড়া শাহী পীলখানায় দিল্লীতে পাঠাইবেন। মালীক নায়েব তাঁহাকে অভয় দিয়া পাথুরে দুর্গ জয়ের ব্যবস্থা ত্যাগ করিলেন। বহু বৎসর যাবত যে ধন সম্পদ তাঁহার নিকট জমা হইয়াছিল, তাহা সমস্ত এবং একশত হাতী, সাত হাজার ঘোড়া ও বহু মণি-মাণিক্য লদ্দর দেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। আগামী বৎসরগুলিতে দেয় মালামাল সম্পর্কে লিখিত ফরমান লইলেন এবং ৭১০ হিজরীর প্রথম দিকে সমস্ত লুটের মাল লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার পথে দেবগিরি, ধার, ঝাবণ প্রভৃতি স্থান হইয়া বিজয়বার্তা ঘোষণা করিতে করিতে দিল্লীতে পৌঁছিলেন।

মালীক নায়েব দিল্লী পৌঁছিবার পূর্বেই অরণ্যকুলের বিজয় সংবাদ সুলতানের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। উহা দিল্লী পৌঁছা মাত্রই উঁচু উঁচু মিম্বর হইতে ঘোষণা করা হইল এবং সর্বত্র আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল। মালীক নায়েব আসিবার পর সুলতান আলাউদ্দিন বাদাউনী দরজার ময়দানের সম্মুখে নাসিরী চবুতরায় দরবার আহ্বান করিলেন এবং মালীক নায়েব যে সমস্ত ধন-সম্পদ, হাতী-ঘোড়া ও মণি-মাণিক্য আনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইল। শহরের সমস্ত লোক তাহা দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

মালীক নায়েব অরণ্যকুল দুর্গ জয় করিবার জন্য যে কয় মাস বাহিরে ছিলেন, তখন রাস্তার দুই একটি ঘাটিতে অসুবিধা থাকার জন্য সৈন্যদের যাতায়াত পথ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কোন কাসেদ বা হরকরা অরণ্যকুল হইতে সংবাদ লইয়া সুলতানের নিকট পৌঁছিতে পারে নাই। ইহার ফলে সুলতান খুবই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইজন্য তিনি সৈন্যদলের কুশল সংবাদ জানিবার জন্য শায়খ নিজাম উদ্দিনের নিকট লোক পাঠাইলেন। যাহাতে তিনি তাঁহার কাশফ ও কেরামতের সাহায্যে সৈন্যদলের সংবাদ দিতে পারেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের নিয়ম ছিল যে, দিল্লী হইতে যে কোন স্থানেই তিনি সৈন্যদল পাঠাইতেন, প্রথম মঞ্জিল তিলপথ হইতে যে স্থানে গিয়া সৈন্যদল পৌঁছিত, সম্ভব হইলে সেখানেই থানা করিতে বলিতেন এবং প্রতি মঞ্জিলের সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য অশ্বারোহী কাসেদ নিযুক্ত করিতেন। এইভাবে রাস্তার আধাক্রোশ পোয়াক্রোশ দূরে দূরে হরকরা নিযুক্ত হইত। যে সকল গ্রাম বা শহরের উপর দিয়া অশ্বারোহী কাসেদ যাতায়াত করিত, সেখানে পদস্থ কর্মচারী ও বিবরণ লেখক থাকিত। তাহারা একদিন, দুইদিন কিংবা তিন দিনের সংবাদ একত্র করিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইত। বর্তমানে সৈন্যদল কোথায় কি করিতেছে, তাহা সুলতান জানিতে পারিতেন এবং সৈন্যদলও সুলতানের কুশল সংবাদ জানিতে সক্ষম হইত। ইহার ফলে শহরে সৈন্যদল সম্পর্কে কোন গুজব রটিত না এবং সৈন্যদলও শহর সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আজগুবী আলোচনা করিতে পারিত না। এইভাবে সৈন্যদল ও বাদশাহের কুশল সংবাদ পরস্পর জানাজানির ফলে রাজ্যের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। কিন্তু এইবার মালীক নায়েব অরণ্যকুল দুর্গ জয় করিতে নিযুক্ত থাকাকালে তেলেঙ্গার পথ বিপদযুক্ত হইয়া পড়ে। এই রাস্তার কতকগুলি ঘাঁটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে চল্লিশ দিনের উপর কাটিয়া গেলেও সৈন্য দলের কুশল সংবাদ সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট পৌঁছিতে পারে নাই। এইজন্য সুলতান খুবই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়েন এবং শহরের গণ্যমান্য সকল ব্যক্তির মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, সৈন্যদলে অবশ্যই কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে সংবাদ আদান-প্রদানের রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ চিন্তাযুক্ত থাকাকালে সুলতান আলাউদ্দিন মালীক কীর বেগ ও কাজী মুগিস উদ্দিন বয়ানকে শায়খ নিজামের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে শায়খের খেদমতে সালাম জানাইয়া এই কথা আরজ করিতে নির্দেশ দিলেন যে, সুলতান সৈন্যদলের কুশল সংবাদ জানিতে খুবই উদগ্রীব হইয়া আছেন। যেহেতু ইসলাম সুলতান অপেক্ষা শায়খের দরদ অনেক বেশী, সেইজন্য তিনি যেন তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা সৈন্যদলের সংবাদ জানাইয়া সুলতানকে সুখী করেন। তাঁহাদিগকে সুলতান আরও বলিলেন যে, এই পয়গাম পৌঁছাই-বার পর তাঁহারা শায়খের নিকট যে সকল কথা ও মন্তব্য শুনিবেন, তাহা যেন যথাযথভাবে সুলতানকে জানান এবং কোনপ্রকার তারতম্য না করেন। তাঁহারা উভয়ে শায়খের খেদমতে পৌঁছিয়া সুলতানের সালাম ও পয়গাম জানাইলেন। শায়খ তাঁহাদের বক্তব্য শুনিবার পর সুলতানের বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিলেন

এবং বলিলেন যে, এই বিজয় তেমন কিছুই নহে; তিনি ইহা অপেক্ষা বহু বিরাট বিজয়ের আশা পোষণ করেন। ইহা শুনিবার পর মালীক কীর বেগ ও কাজী মুগিস খুবই আনন্দিত চিত্তে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হইয়া শায়খের নিকট শোনা সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন শায়খের বচন শুনিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে অরণ্যকুল দুর্গ বিজিত হইয়াছে ও তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাঁহার পাগড়ীর শামলা টানিয়া লইয়া উহাতে গিঁট দিলেন এবং বলিলেন, আমি শায়খের এই শুভ সংবাদ শুভ চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করিলাম। কারণ আমি মনে করি যে, শায়খের মুখ হইতে কোন কথা অনর্থক বাহির হয় না। বাস্তবিক অরণ্যকুল বিজয় সমাপ্ত হইয়াছে এবং আমি অনুরূপ আরও বহু বিজয় সংবাদ অচিরেই শুনিতে পাইব।

খোদার ইচ্ছায় ঐ দিনই জোহরের নামাজের সময় মালীক নায়েবের নিকট হইতে সংবাদসহ অশ্বারোহী কাসেদ সুলতানের নিকট পৌঁছিল এবং অরণ্যকুলের বিজয় সংবাদ জানাইল। জুম্মার দিনে এই বিজয় সংবাদ সকল মিম্বর হইতে ঘোষণা করা হইল। শহরের সর্বত্র আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। শায়খ নিজাম উদ্দিনের কেরামত সম্পর্কে সুলতানের ধারণা ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা জন্মিল। যদিও সুলতান আলাউদ্দিনের সহিত শায়খের কোন দিন সাক্ষাত হয় নাই, তথাপি তাঁহার সমুদয় রাজত্বকালে শায়খ সম্পর্কে তিনি এমন কোন কথা বলেন নাই, যাহাতে শায়খের মনে কষ্ট হইতে পারে। শায়খের হিংসক ও শত্রুরা তাঁহার অত্যাধিক দান-ধ্যান, তাঁহার নিকট লোকজনের অতিরিক্ত যাতায়াত, তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কুকথা উল্টা-পাল্টা করিয়া সুলতানের কানে উঠাইত; কিন্তু সুলতান শত্রুদের এই সকল কথা কখনও কানে তুলিতেন না। তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে তিনি শায়খের একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাতের কোন সুযোগ হয় নাই।

৭১০ হিজরীর শেষ দিকে পুনরায় সুলতান আলাউদ্দিন মালীক নায়েবকে সুসজ্জিত সৈন্যদল সহ ঢোল সমুদ্র ও মেবারের দিকে পাঠাইলেন। মালীক নায়েব ও নায়েব আরজ খাজা হাজী শহরে সুলতানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাবেরী পৌঁছিলেন এবং সৈন্যদের একত্র করিবার ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। সেখান হইতে অনবরত পথ চলিয়া দেবগিরি উপস্থিত হইলেন। রামদেবের তখন মৃত্যু হইয়াছে। তথা হইতে যথারীতি পথ অতিক্রম করিয়া

ঢোল সমুদ্রের সীমান্তে গিয়া উপনীত হইলেন। প্রথম আক্রমণেই তথাকার শাসক বল্লাল রায় পরাজিত হইয়াছিলেন। ঢোল সমুদ্র বিজিত হইল এবং তথাকার ছত্রিশটি হাতীর দল ও বহু ধনসম্পদ মালীক নায়েবের হস্তগত হইল। তিনি যথারীতি ঢোল সমুদ্র বিজয় সংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন।

ঢোল সমুদ্র হইতে মালীক নায়েব যথা নিয়মে সৈন্যদলসহ মেবার উপস্থিত হইলেন। মেবারও বিজিত হইল এবং তথাকার স্বর্ণ মন্দিরটি ধ্বংস করা হইল। যে সকল স্বর্ণমূর্তি বহু বৎসর যাবৎ সেই এলাকার হিন্দু জনসাধারণের পূজা পাইয়া আসিয়াছিল, তৎসমুদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইল। স্বর্ণ মন্দিরের সমস্ত ধনরত্ন এবং ভাঙ্গা মূর্তিগুলিসহ অগণিত ধনসম্পদ সৈন্যদলের হাতে আসিল। মেবারে যে দুইজন রাজা ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সমুদয় সম্পদ ও হাতীঘোড়া ছিনাইয়া লওয়া হইল। মালীক নায়েব মেবার হইতে ফিরিবার পূর্বেই সুলতানের নিকট বিজয় সংবাদ পাঠাইলেন। ৭১১ হিজরীর প্রথমদিকে ছয়শত বারটি হাতী, ছিয়ানব্বই হাজার মণ সোনা, বহু সংখ্যক রত্ন মাণিক্যের সিন্দুক ও বিশ হাজার ঘোড়া দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। এই সময় মালীক নায়েব সিরির শাহী মহলে কয়েক বারে সুলতানের সম্মুখে এই সকল গণিমতের মাল উপস্থিত করেন। এইসব উপলক্ষে সুলতানও মালীক আমীর-দিগকে দুই চারি ও এক আধ মণ করিয়া স্বর্ণ উপহার দেন। বৃদ্ধ লোকেরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই সময় ঢোল সমুদ্র ও মেবার হইতে যে পরিমাণ ধনসম্পদ ও হাতীঘোড়া দিল্লীতে আসিয়াছিল, তাহা দিল্লী বিজয়ের পর হইতে আর কখনও দেখা যায় নাই। কেহ এইরূপ কোন ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না কিংবা কোন ইতিহাসেও এই পরিমাণ ধন সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

যে সময় মেবার ও ঢোল সমুদ্র হইতে এই পরিমাণ ধনসম্পদ দিল্লীতে আসিয়াছিল, সেই সময় অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিকে তেলেঙ্গার রাজা লদ্দর দেব বিশটি হাতীসহ সুলতান আলাউদ্দিনের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন যে, লালছত্রের সম্মুখে তিনি যে পরিমাণ ধনসম্পদ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা একদিকে মালীক নায়েবের নিকট দেওয়া অঙ্গীকারপত্রের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, অন্যদিকে তেমনিই তিনি এই আশাও পোষণ করিতেছেন যে, সুলতান এই সকল সম্পদ দ্বারা দেবগিরি জয় করিয়া তথায় শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদান করিবেন। ইহার জন্য তিনি যে কোন খত ও চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে রাজী আছেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বের শেষের দিকে আরও নানাবিধ বিরাট বিরাট বিজয় সংঘটিত হয়। রাজ্যের সকল বিষয় তাঁহার ইচ্ছা অনুরূপ সাফল্য লাভ করে। এমন সময় রাজ্য তাঁহার নিকট বিরক্তিকর ও ভাগ্য তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার মনে নানাপ্রকার খেয়াল আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার পুত্ররা শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করিয়া নানাবিধ কুকাজে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করে। উজির ও কর্মকুশলীদিগকে সুলতান নিজের সম্মুখ হইতে দূরে ঠেলিয়া দেন। কোন মতামত নেওয়া বা পরামর্শ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। তিনি রাজ্যের সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ পদ ও আমীরী নিজ পরিবার ও নিজের দাসদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিলেন। অন্যদিকে রাজ্যের সর্ববিধ ব্যাপারে নিজেকেই সর্বেসর্বা করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ইহার ফলে রাজকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার সম্মুখে এমন কোন অ্যারিস্টটল ও বুযরচমেহের ছিলেন যে, তাঁহাকে রাজ্যের ভালমন্দ ও দোষত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করিতে পারেন এবং রাজ্যের শুভাশুভের কথা তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারেন।

সুলতান আলাউদ্দিন যে বৎসরগুলিতে মোগলদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন নতুন মুসলমানদের কিছু সংখ্যক আমীর একটি হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। নানা কারণে তাহাদের বেতনাদি কম হইয়া গিয়াছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ পুরস্কার ও ধন সম্পদও তাহারা পাইত না। তাহাদের অনেকেই বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতানের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, কয়েকজন নতুন মুসলমান আমীর নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং সুলতানের অশুভ কামনায় বলিতেছে যে, সুলতান প্রজাসাধারণকে খুবই কষ্ট দিতেছেন। তাহাদের নিকট হইতে জরিমানা ও জোরজবরদস্তি করিয়া সমস্ত সম্পদ শাহী খাজনাখানায় আনিয়া জমা করিয়াছেন। মদ, জুয়া ও অনবিধ মাদক দ্রব্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। রাজ্যে খুব ভারী খেরাজ ধরিয়াছেন। ইহার ফলে সকলেই খুব বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই অবস্থায় তাহারা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহা হইলে যত নতুন মুসলমান অশ্বারোহী আছে, তাহারা সকলেই তাহাদিগকে সাহায্য করিবে এবং তাহাদের মিত্র হইয়া দাঁড়াইবে। প্রজাসাধারণও খুশী হইবে এবং সুলতানের কঠোর মেজাজ ও কঠোরতর ব্যবস্থা হইতে মুক্তি চাহিবে।

এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোকের মাথায় এই খেয়ালও চাপিয়াছিল যে, সুলতান যখন শুধু একটি জামা গায় দিয়া শিকরা পাখী উড়াইতে যান এবং যেখানে অধিকক্ষণ অবস্থান করেন, তখন তাঁহার এই শিকরা

উড়াইবার খেলা দেখিবার জন্য যে সকল সভাসদ সেখানে উপস্থিত হন, তাহাদের কাহারও হাতে অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। যেহেতু সুলতানের রাজ্যে বিদ্রোহ হইতে পারে না বলিয়া সকলের ধারণা জন্মিয়াছে, সেইজন্য সকলেই এই ব্যাপারে অসতর্ক হইয়া আছে। এই অবস্থায় যদি দুই তিনশত অশ্বারোহী সহ হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা হইলে অতি সহজেই সুলতান ও তাঁহার সাথীদিগকে পরাস্ত করা সম্ভব।

তাহাদের এই প্রকার ষড়যন্ত্রের কথা সুলতানের কানে আসিয়া পৌঁছিল। সুলতান আলাউদ্দিনের মেজাজ যেহেতু অত্যন্ত উগ্র ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল অতিশয় পাষাণ ও তাঁহার শাস্তি ছিল অতিরিক্ত কঠোর, সেইজন্য এই সকল ব্যাপারে তিনি রাজ্যের মঙ্গলই আগে দেখিতেন এবং ইহার জন্য ধর্মের বিধান বা আত্মীয়তার বন্ধনকে তিনি অনায়াসে দূরে নিক্ষেপ করিতেন। শাস্তি প্রদানের সময় ধর্মের কথা তাঁহার মনে থাকিত না এবং কোনপ্রকার বাৎসল্যবোধও আত্মীয়তার ধারও তিনি ধারিতেন না। সুতরাং এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া তিনি রাজ্যের সর্বত্র সকল নতুন মুসলমান জায়গীরদারকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ এমনভাবে পালিত হইল যে সকল নতুন মুসলমান একদিনে নিহত হইল। কোন কারণেই একটি প্রাণীকেও রেহাই দেওয়া হইল না।

সুলতানের এই আদেশ ছিল ফেরআউন নমরুদদের আদেশের মত হৃদয়হীন। ইহার ফলে বিশ ত্রিশ হাজার নতুন মুসলমান নিহত হইয়াছিল। অথচ ইহাদের অধিকাংশই এইরূপ ষড়যন্ত্রের কোন খবর রাখিতেন না। তাহাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত হইল এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে রাস্তায় নামাইয়া দেওয়া হইল।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে শহরে 'এবাহতী' ও 'বুধ'দের বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুলতান এই সমস্ত লোককে যথাসম্ভব অনুসন্ধান করিয়া শাস্তি দিবার আদেশ দিলেন। ফলে তাহাদিগকে অতিশয় নির্মমতার সহিত হত্যা করা হইল। ইহার পর হইতে দিল্লীতে এবাহতীদের নাম আর কখনও শোনা যায় নাই।

সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে যে সকল সৈন্যের বীরত্ব ও কর্মচারীর কর্মকুশলতায় রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় স্থায়িত্ব আসিয়াছিল এবং যাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তাহারা সাধারণভাবে তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিলেন।

প্রথম স্তরে উলুগ খান, নুসরত খান, জাফর খান, উলবু খান, মালীক আলাউল মুলক গ্রন্থকারের চাচা, মালীক ফখর উদ্দিন জুনা দাদ বেগ, মালীক আসগরী সের দোয়াতদার, মালীক তাজউদ্দিন কাফুরী প্রমুখ আমীর ও মালীকগণ ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি পরিচালনার ব্যাপারে তুলনাহীন দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। অথচ তাঁহারা সকলেই সাধারণ মানুষের মত লোভের বশবর্তী হইয়া সুলতান জালাল উদ্দিনকে হত্যার ব্যাপারে আলাউদ্দিনের সহায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যের সুখভোগ তাঁহারা তিন চারি বৎসরের অধিক করিতে পারেন নাই। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহারা একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশ্য কাজকর্মে তাঁহাদের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট এবং তাঁহাদের এই প্রকার গুণাবলীর জন্যই অনায়াসে বহুরাজ্য জয় ও নানাবিধ বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় স্তরে সুলতান আলাউদ্দিনের দবীরের পুত্রদ্বয় মালীক হামিদউদ্দিন ও মালীক আআয উদ্দিন, আলম খানের দবীর মালীক আইনুল মুলক মুলতানী, মালীক শরফ উদ্দিন কানিনী, খাজা হাজী প্রমুখ মালীকগণ ছিলেন। তাঁহাদের কল্যাণে সুলতান আলাউদ্দিনের রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি আশাতীতভাবে সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে মালীক হামিদ উদ্দিন নায়েব উকিলেদর মালীক আআয উদ্দিন দবীরে মুমালেক, মালীক শরফ উদ্দিন কানিনী নায়েব উজির এবং খাজা হাজী নায়েব আরজ ছিলেন। এই চারিজন বিজ্ঞ ব্যক্তির গুণে চারিটি দেওয়ানের কাজকর্ম এমন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছিল যে, তেমনটি বহু যুগ দেখা যায় নাই, এই চারিটি দেওয়ান পরিচালনায় তাঁহারা যেইরূপ সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ এই চারিটি দেওয়ানের সহিত রাজ্যের শুভাশুভ জড়িত ছিল।

তৃতীয় স্তরে রাজত্বের শেষ চারি পাঁচ বৎসরে ওয়ালা মালীক নায়েব পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে সুলতান আলাউদ্দিনের বিচার-বিবেচনা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছিল। ইহার ফলে পেশোয়ারে মালীক ও উমদায়ে মালীক এবং মালীকদের দলবলে এমনই সব অজ্ঞ ও নিমকহারামদের স্থান হইয়াছিল। উমদাতুল মালীকের পদ আধপাগলা মূর্খ বাহাউদ্দিন দবীরকে দেওয়া হয়। উমদায়ে মালীক আলাউদ্দিন দবীরের পুত্রদ্বয় মালীক হামিদ উদ্দিন ও মালীক আআয উদ্দিন পদচ্যুত হন এবং মালীক শরফ উদ্দিন কানিনী নিহত হন। ইহার ফলে দেওয়ানে রেসালত, দেওয়ানে উজারত ও দেওয়ানে ইনশার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। দেওয়ানে আরজ ছাড়া অন্য তিনটি দেওয়ানের কোনপ্রকার

শ্রী অবশিষ্ট ছিল না। মূর্খ ও অনভিজ্ঞদের কর্তৃত্বের ফলে সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বে ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেছিল এবং চতুর্দিকে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতেছিল। যদিও এই স্তরে মালীক কীরাণ আমীর শিকার ও মালীক কীর বেগ শাহী দরবারে খুবই মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের হাতে কোনপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা পদের দায়িত্বভার ন্যাস্ত করা হয় নাই। তাঁহারা একান্তভাবে সুলতানের খাস পারিষদে পরিণত হইয়াছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের চরিত্র ও গুণাবলী তথা কঠোর মেজাজ ও ব্যবহারের বর্ণনা

সুলতান আলাউদ্দিনের অদ্ভুত ধরণের অভ্যাস ও রীতিনীতি ছিল। কথা-বার্তায় ও চালচলনে তিনি অতিশয় কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। রাজকার্যে এই প্রকার কঠোরতার সহিত উদাসিকতা ও বেপরোয়াভাবের সংযোগ ঘটিয়াছিল। ফলে তিনি শাসন করা বা শাস্তি দান করার সময় শরা-শরিয়তের ধার ধারিতেন না। হালাল-হারামের জ্ঞান তাঁহার ছিল না এবং কোনপ্রকার দায়িত্ব বোধ বা রক্তের বন্ধন এই ব্যাপারে তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইত না। তাঁহার নিজ ধারণা বিশ্বাস ও সন্দেহের বশবর্তী হইয়া রাজ্যের বিদ্রোহী ও অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, তাহাতে অসংখ্য নির্দোষ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিহত হইত। সুলতানের মনে এই সকল ব্যাপারে যে ধারণার উদ্ভব হইত, অন্তরঙ্গ সভাসদ ও মালীক আমীররাও আবেদন নিবেদনের দ্বারা উহাতে তারতম্যের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেন না। নিজ ভাই বা সন্তান-সন্ততিরাও কোনপ্রকার সুপারিশ ও আবদার করিতে পারিতেন না। কাজেই রাজকার্যের বিষয়ে সুলতান যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা বিনা পরামর্শে ও বিনা দ্বিধায় কাজে লাগাইতেন। রাজত্বের প্রথমদিকে সুলতান অবশ্য নিজ অন্তরঙ্গ মিত্র ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সকল ব্যাপারে পরামর্শ করিতেন। কিন্তু যখন রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় তাঁহার ইচ্ছা অনুরূপ সুসম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইল, তখন এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পরামর্শ ত্যাগ করিলেন। অকাট মূর্খতার ফলেই তিনি ভাবিতেন যে, রাজ্যশাসন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় এবং শরা-শরিয়ত এক পৃথক জগতের ব্যাপার। এই কারণেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। নামাজ রোজা কি বিষয় বা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। ইসলাম সম্পর্কে তাঁহার এক অন্ধ বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস এমনই নিরেট ছিল যে, উহাতে কোনপ্রকার ধর্মীয় কুকথা ও কুধারণার স্থান ছিল না। তিনি শুধু যাহারা তাঁহাকে দুঃখ কষ্ট দিতে চেষ্টা করিত, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করিতেন।

তাহাদের প্রতি তাঁহার কোনপ্রকার সহানুভূতি বা দরদ থাকিত না। সর্বদাই তাহাদিগকে নিজ রাজ্যের দুশমন বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্যই যাহা-দিগকে এক সময় কোন কারণে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বা নির্বাসন দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া বা ফিরাইয়া আনার কথা তাহার মনেও হইত না। তাঁহার হুকুমে অনুরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হাজার হাজার লোক তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সুলতান কুতুব উদ্দিনের সময় মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

তথাপি তৎকালীন জ্ঞানীগুণী, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাঁহার রাজত্ব-কালে এমন অনেক আশ্চর্য বিষয় দেখিতে পাইয়াছেন, যাহা অন্য কোন সময় বা রাজত্বকালে দেখা যায় নাই। এই ঘটনাকে তাঁহারা সুলতান আলাউদ্দিনের অলৌকিক ব্যাপার ও তাহার প্রতি আল্লাহ্‌তালার অহেতুক দয়া বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শৈথিল্য প্রদর্শন বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু এইগুলি যে, ঐ সময়ের অদ্ভুত সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এই সকল বিষয়ের প্রথম হইল খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্রের অতিশয় সুলভ মূল্য নির্ধারণ। এই মূল্যমানে অনাবৃষ্টির সময়ও কোনপ্রকার তারতম্য হইত না। সুলতান আলাউদ্দিন জীবিত থাকা পর্যন্ত এই মূল্য স্থায়ী হইয়াছিল এবং এই বিষয়টি যথার্থই বিস্ময়েই উদ্রেক করিয়াছিল।

দ্বিতীয় আশ্চর্য বিষয় হইল রাজ্য জয়ে অধিকতর সাফল্য। কি নিজ রাজ্যের বিদ্রোহী ও শত্রুদের উপর, কি দূরদূরান্তের রাজ্যগুলি জয় করিবার ব্যাপারে, সর্বত্রই তিনি এমনভাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, যাহা অন্য কোন সময় দেখা যায় নাই। তিনি যেমন চাহিয়াছেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁহার শত্রুদিগকে বাঁধিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ও শাস্তি প্রদান করা হই-য়াছে। যে সকল দুর্গ বা রাজ্য জয় করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতিরা চেষ্টা করিয়াছে, তাহা যেন পূর্ব হইতেই বিজিত হইয়া রহিয়াছে।

তৃতীয় আশ্চর্য বিষয় হইল মোগলদিগকে সমূলে উৎপাটন। তাঁহার রাজত্বকালে যেভাবে তাহাদের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আর কখনও কোথাও সম্ভব হয় নাই। যে পরিমাণ মোগল তাঁহার সৈন্যদলের হাতে বন্দী ও নিহত হইয়াছে, উহাও আর কখনও দেখা যায় নাই।

চতুর্থ আশ্চর্যের বিষয় হইল, যাহা শুধুমাত্র তাঁহার রাজত্বকালেই দেখা গিয়াছে, তাহা এই যে, এত কম বেতনে তিনি এত অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ একটি বিরাট সৈন্যদলকে এমনভাবে শৃঙ্খলার

সহিত রাখা এবং তীর ও তরবারির পরীক্ষায় তাহাদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া তোলা আর কখনও সম্ভব হয় নাই। তদুপরি ঘোড়ার এত সুলভ মূল্য আর কখনও সম্ভব হয় নাই, কোন ইতিহাসে দেখা যায় না বা কেহ স্মরণ করিতেও পারে না।

পঞ্চম আশ্চর্যের বিষয় হইল রাজ্যের বিদ্রোহী ও দুশমনদিগকে শায়েস্তা করা এবং প্রজা ও অনুগামীদিগকে একান্ত বাধ্য করিয়া রাখা। সুলতানের রাজত্বকালে যেভাবে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহীদিগকে দমন করা হইয়াছে, তাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। রায় ও মুকদ্দিমরা যেভাবে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, প্রজারা যেভাবে নিজ সন্তান-সন্ততি বিক্রয় করিয়া তাঁহার খেরাজ আদায় করিয়াছে এবং মানুষ যেভাবে সর্বত্র পথচারী ও মুসাফিরদিগকে আলো ধরিয়া রাস্তা দেখাইয়াছে, তাহা আর কোন সময়ে হয় নাই।

ষষ্ঠ আশ্চর্যের বিষয় হইল রাস্তার নিরাপত্তা। সুলতান আলাউদ্দিনের সময় রাজ্যের চতুর্দিক যেরূপ নিরাপত্তার সহিত লোকজন পথ চলিয়াছে, তাহা আর কখনও সম্ভব হয় নাই। যে সকল ডাকাত ও দুর্বৃত্তের দল স্বভাবতঃ রাজ্যের দুশমন ছিল, তাহারা যেন দিল্লী আগমন পথের প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে পথের বিপদ-আপদের ধারণা মানুষের মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল। রাস্তা-ঘাটের এহেন নিরাপত্তা আর কখনও দেখা যায় নাই।

সপ্তম আশ্চর্যের বিষয়টিকে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় বলিয়াও উল্লেখ করা যায়। তাহা হইল সুলতান কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বাজারীদের ক্রয়-বিক্রয় করা। কারণ বাজারীদিগকে শায়েস্তা করা এবং নির্দিষ্ট মূল্যে তাহাদিগকে জিনিসপত্র বেচিতে বাধ্য করা, বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। ইহা আর কোন সুলতানের সময় সম্ভব হয় নাই। শুধু সুলতান আলাউদ্দিনের সময়ই তাহারা তাঁহার আদেশে ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া নির্দিষ্ট মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়াছিল।

অষ্টম আশ্চর্যের বিষয় হইল অধিক সংখ্যক দালান-কোঠা, মসজিদ, মীনারা, দুর্গ ও পুষ্করিণীর সৃষ্টি। অন্যকোন সুলতানের পক্ষে এত অধিক পরিমাণ দালান ও দুর্গ তৈরী করা সম্ভব হয় নাই। আর কি করিয়াই বা সম্ভব হইবে, সুলতান আলাউদ্দিনের মত তাহাদের কারখানায় সত্তর হাজার কুশলী মিস্ত্রীর সমাবেশ সম্ভব হয় নাই যে, আদেশ দিলেই দুই দিনে এক বিরাট শাহী মহল ও দুই সপ্তাহে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া ফেলিতে পারিবে। তাহা শুধু আলাউদ্দিনের ভাগ্যেই জুটিয়াছিল ও সম্ভব হইয়াছিল।

নবম আশ্চর্যের বিষয় হইল সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বের শেষ দশ বৎসরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। সত্যকথা বলা, ন্যায় আচরণ করা ও কুকাজ হইতে দূরে থাকার একটা ভাব তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়াছিল। হিন্দু রায়তরাও সর্বতোভাবে অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল, যাহা আর কখনও দেখা যায় নাই।

দশম ও সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, সুলতান আলাউদ্দিনের ইচ্ছা ও উদ্যম ছাড়াই তাঁহার রাজত্বকালে বহু জ্ঞানী ও গুণীব্যক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছিল। প্রত্যেকে সম্প্রদায়ের মান্য, প্রতিটি জ্ঞানের উস্তাদ ও প্রত্যেক পেশার অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার রাজধানী দিল্লীকে সমৃদ্ধি দান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে দিল্লী, বাগদাদ, মিশর, কনস্টান্টিনোপল ও বয়তুল মোকাদ্দসের সমকক্ষতা দাবী এবং হিংসার উদ্রেক করিত। তাঁহার রাজত্বকালে পয়গম্বর তুল্য পীরদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম নিজাম উদ্দিন, শায়খুল ইসলাম আলাউদ্দিন, শায়খুল ইসলাম রুকন উদ্দিন প্রমুখ ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় পবিত্র ব্যক্তির সংস্পর্শে তৎকালীন ধর্মীয় জগত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। বহুলোক তাঁহাদের পুণ্যহাতে হাত রাখিয়া ধর্মীয় প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্বক পাপের পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বেনামাজী ও কুকাজে রত হাজার হাজার লোক তাঁহাদের প্রভাবের ফলে নামাজী ও ন্যায়নিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে মানুষের অন্তঃকরণ ধর্মীয় কাজের দিকে ফিরিল এবং তাহারা তওবা করিয়া জরুরী ধর্ম কর্মে মনযোগ দান করিল। দুনিয়ার মহব্বতই হইল সকল কল্যাণ ও ধর্মকর্মের পুণ্যধ্বংসকারী। এই সকল মহাগুণী শায়খদের বরকতে মানুষের মন হইতে দুনিয়াবী মহব্বত অনেকাংশে কমিয়া গেল। আল্লাহ্‌ওয়ালা ও দরবেশ শ্রেণীর লোকেরা অতিরিক্ত নফল নামাজ পড়া ও অজিফা পাঠে নিয়োজিত হইলেন। যাহাতে তাহাদের মধ্যেও বুজর্গদের অলৌকিক গুণ আসিয়া বর্তায়।

শায়খদের প্রভাব এত সুদূর প্রসারী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সাধারণ লোকের সাংসারিক কাজকর্মেও তাহার রেশ দেখা যাইত। ইহার ফলে অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যে এক নতুন জাগরণের সূচনা হইয়াছিল। তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র ও অধ্যাত্ম সাধনার ফলেই মহান আল্লাহ্‌তালার অপার করুণাধারা সাধারণ মানুষের উপর বর্ষিয়াছিল এবং সর্বপ্রকার আসমানীবালা-মসিবত হইতে তাহারা মুক্তি পাইয়াছিল। তাঁহাদের সমসাময়িক জনসাধারণের মধ্যে এই কারণেই কোনপ্রকার মহামারী বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। তাঁহাদের পবিত্রতার গুণে তাহার এবংবিধ কঠিন ও মারাত্মক বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁহাদের

কেরামত ও বরকতের ফলেই হিন্দুস্তানের কঠিনতর বিপদ মোগলদের আক্রমণ বন্ধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের এইরূপ সমূলে উৎপাটন আর কখনও সম্ভব হয় নাই।

বস্তুতঃ এই সকল বুজর্গ ও পবিত্রাত্মাদের বরকতে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহাতে ক্রমান্বয়ে ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সোবহানাল্লাহ্। সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বের শেষ দশ বৎসরে মানুষ কি আশ্চর্য সব ঘটনা, কি বিস্ময়কর সব দিনরাত্রি দর্শন করিয়াছে! সুলতানের দিক হইতে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সমস্ত মাদকদ্রব্য, কুকথা ও কুকাজের উপযুক্ত সকল সামগ্রী যথাসাধ্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ধর্ম ও রাজ্যের শান্তি বিনষ্টকারী ধনসম্পদ, যাহা বিবেকহীনদের হাতে পড়িয়া অধর্ম ও পাপের সৃষ্টি করিত, লোভী, কৃপণ ও অলসদের মধ্যে বৃথা সঞ্চয়ের অভ্যাস জন্মাইত, বিদ্রোহ ও ভেদবুদ্ধির অধিকারী লোকদিগের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার শক্তি যোগাইত, শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অহংকার তথা উদাসীনতা ও আলস্যের জন্ম দিত এবং অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যে ভুল ভ্রান্তির সৃষ্টি করিত; সেই সম্পদকে সুলতান আলাউদ্দিন যথা সম্ভব কৌশলে এবং প্রয়োজনমত লাঠি, শিকল ও কয়েদ প্রভৃতির মাধ্যমে সর্ব প্রকার ধনী-মানী ও কর্মচারীদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অধিক মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বাজারী লোকজনকে তিনি রক্তপাতের ভয় দেখাইয়া সত্যকথা বলিতে ও নির্দিষ্ট মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

অন্যদিকে সেই সময় সুলতানের মতই শায়খ নিজাম উদ্দিন তাঁহার দরবার খুলিয়া বসিয়াছিলেন। রাজ্যের চতুর্দিক হইতে লোকজন তাঁহার দরবারে আসিয়া মুরিদ হইত ও খিরকা লাভ করিত। সেখানে ধনী-গরীব, সম্মানী-অসম্মানী, বাদশাহ-ফকির, পণ্ডিত-মূর্খ, বাজারী-অবাজারী, শহরবাসী-গ্রামবাসী, গাজী-মুজাহিদ, প্রভু ও দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সকলই তাঁহার নিকট তওবা করিয়া পুণ্যজীবন লাভ করিত। এই সকল লোকের অধিকাংশই যেহেতু নিজেদেরকে শায়খের মুরিদ ভাবিয়া গৌরববোধ করিত, সেই জন্য বহু অপকাজ হইতে তাহারা স্বেচ্ছায় দূরে থাকিত। যদি কাহারও শায়খের দরবারে আসিবার পর কোন পদস্খলন ঘটিত, তবে সে পুনরায় আসিয়া নতুনভাবে তওবা করিত। বস্তুতঃ শায়খের মুরিদ হওয়ার ফলে লজ্জবশতঃ অধিকাংশ লোক প্রকাশ্যে ও গোপনে কুকথা ও কুকাজ হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা করিত। ইহার ফলে সাধারণ লোকেরাও ধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ

করিয়াছিল। স্ত্রী পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, মূর্খ বাজারী, গোলাম চাকর ও বালক যুবার মধ্যে নামাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই 'এশরাক' ও 'চাশতে'র নামাজেরও পাবন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভ্রান্ত ও দয়াশীল লোকেরা শহর হইতে গিয়াসপুর পর্যন্ত পথের মধ্যে স্থানে স্থানে চত্বর তৈরী করাইয়া উহার উপর চাল দিয়া নামাজের জায়গা করিয়া দিয়াছিলেন। এইগুলির পাশে কূয়া খোদাইয়া, মটকা ও সোরাহীতে পানি রাখিয়া লোটা বা চাটাইর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতিটি চত্বরে একজন করিয়া খেদমতগার থাকিত; যাহাতে শায়খের দরবারে আসিবার পথে লোকজন নামাজ পড়িবার সময় অজুর পানি পাইতে পারে। সম্ভবতঃ এই সকল চত্বরে মুসল্লীদের ভীড় হইত।

এইভাবে একদিকে যেমন মুসল্লীদের মধ্যে নফল নামাজের প্রতি আকর্ষণ দেখা গিয়াছিল, তেমনই বাজে কথা বলার অভ্যাসও তাহাদের মধ্যে লোপ পাইয়াছিল। অধিকাংশ লোকের মধ্যে যে প্রকার কথাবার্তা হইত, তাহা বস্তুতঃ এশরাক, চাশত, আওযাবীন, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামাজের রাকাত ও অজু লইয়াই হইত। এই সকল নামাজের কোনটি কোন নামাজের পরে কয় রাকাত পড়িতে হয়, প্রতিটি রাকাতে কোরানের কোন কোন সুরা পড়া ভাল, নামাজ আদায়ের পর কিরূপ দোয়া করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা একে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিত। শায়খের দরবারে আসিয়া নতুন আগন্তুকরা পুরাতন মুরিদদের নিকট দরবারে রাত্রে কয় রাকাত নামাজ পড়িতে হয়, প্রতি রাকাতে কি সুরা পড়িতে হয় এবং শুইবারকালে হজরত মুহম্মদ মোস্তফা (দঃ) উপর কয়বার দরুদ পাঠ করিতে হয়, তাহা জানিয়া লইতে চেষ্টা করিত। তাহাদের জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল, শায়খ ফরিদ ও শায়খ বখতিয়ার কয়বার দরুদ পড়িতেন এবং কয়বার সুরা এখলাসের অজিফা পাঠ করিতেন। তাহারা নামাজ রোজা, নফল এবাদত ও আহার কমাইবার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে উৎসুক্য প্রকাশ করিত। ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকের মধ্যে কোরান শরীফ হেফজ করিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নতুন মুরিদগণ সর্বদাই পুরাতন মুরিদগণের সাহচর্যে থাকিতে চেষ্টা করিত। পুরাতন মুরিদগণ সর্বদা নানাবিধ এবাদত, নির্জনে বসা, মারেফতের কিতাব পাঠ, পীর পয়গম্বরদের কীর্তিকাহিনী আলোচনা করিতেন। এইগুলি ব্যতীত তাঁহাদের অন্যকোন কাজ ছিল না। নাউযুবিল্লাহ্! দুনিয়াদারীর কোন কথা ও দুনিয়াদারের কোন বার্তা তাঁহারা মুখেও আনিতেন না। দুনিয়ার প্রতি তাকাইয়া দেখা, উহার আলোচনা করা এবং দুনিয়াদারদের সহিত মেলামেশা করাকে তাঁহারা সর্বপ্রকার পাপ কর্মের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন।

এই সকল মুরিদানের কল্যাণে নফল ধর্ম কর্মেও এমন নিষ্ঠা দেখা দিয়াছিল যে, স্বয়ং সুলতানের সভাসদদের মধ্য হইতে বহু আমীর, সেলাহদার, সেলাহ-নবীশ, লশকরী, চাকর-নফর প্রভৃতি, যাহারা শায়খের মুরিদ হইয়াছিলেন, তাহারাও চাশত ও এশরাকের নফল নামাজ পড়িতেন এবং 'আইয়ামবিয়' ও আশুরার রোজা রাখিতেন। যখনই সুযোগ হইত বিশ দিন একমাস ধরে পুণ্যাত্মাদের মজলিস বসিত ও সুফী সাধকদের জিকিরের মহফিল অনুষ্ঠিত হইত এবং এইগুলিতে কান্নাকাটি ও জজবার এক নতুন জগৎ দেখা দিত। শায়খের মুরিদদের অনেকেই মসজিদে উপস্থিত হইয়া ও নিজ ঘরে বসিয়া তরবাবির নামাজে কোরান খতম করিতেন। তাহাদের মধ্যে যাহাদের সামর্থ ছিল, তাহারা রমজান মাস, জুম্মা ও অন্য উপলক্ষের রাত্রিগুলি জাগিয়া কাটাইতেন এবং ভোর পর্যন্ত তাহাদের চোখের পাতা একত্র হইত না। এমন অনেক বুজর্গ ছিলেন, যাহারা সারা বৎসর রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ তিন-চতুর্থাংশ জাগিয়া এবাদত করিতেন এবং অনেক সাধক শ্রেণীর লোক শয়নকালীন অজু দিয়া ফজরের নামাজ আদায় করিতেন। আমি এমন অনেককে জানি, যাহারা শায়খের স্নেহদৃষ্টির ফলে দিব্যদৃষ্টি ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। শায়খের পুণ্য অস্তিত্ব, তাঁহার পুণ্য প্রভাব ও তাঁহার নেক দোয়ার বরকতে এই এলাকার অধিকাংশ মুসলমান এবাদতে, মারেফতে, নির্জন বাসে, ধর্ম-কর্মে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহার পুণ্য ইচ্ছাপূরণে একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দিন নিজেও সপরিবারে শায়খ নিজামের অনুগত হইয়া গিয়াছিলেন।

ইহার ফলে বিশেষ ও সাধারণ সর্বশ্রেণীর লোকের মনে পুণ্য কর্ম করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছিল। আলাই শাসনের শেষ কয় বৎসর মানুষ শরাব, জুয়া, দুর্নীতি, দুষ্কর্ম, সমকামিতা, ব্যাভিচার ইত্যাদির নাম মুখেও আনে নাই। অধি-কাংশ লোকের নিকট এই প্রকার গর্হিত পাপের সমুদয়ই কুফরীর সমতুল্য বলিয়া গণ্য হইত। মুসলমানরা লজ্জায় সুদ ও মজুতদারীর কথা মুখেও আনিতে পারিত না। বাজারীরাও ভয়ে ও লজ্জায় সর্বপ্রকার প্রতারণা, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল করা, জাল করা, অজ্ঞ লোকদিগকে আস্কারা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপার হইতে বিরত ছিল। শায়খের দরবারের সহিত যুক্ত অধিকাংশ আলেম, শরীফ ও বুজর্গ মারেফতের কিতাবাদি পাঠ ও উহার বিভিন্ন তরিকা সম্পর্কে জ্ঞানলাভে নিরত ছিলেন। 'কুয়তুল কুলুব,' 'এহিয়াউল উলুম', এহিয়াউল উলুমের অনুবাদ, 'আওয়ারেফ', 'কাশফুল মাহজুব', 'শরহে তাআর্রুফ', 'রেসালা কুশাইরী', 'মেরসাদুল এবাদ', 'মাকতুবাতে আইনুল কুজাত', কাজী হামিদ

উদ্দিন নাগুরীর 'লাওয়ায়েহ' ও 'লাওয়ামেহ', আমীর হাসানের 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' প্রভৃতি গ্রন্থ শায়খের নির্দেশে সকলেই খরিদ করিত। বই বিক্রেতাদের নিকট মানুষ মারেফতের গ্রন্থাদি সম্পর্কে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিত। যে কোনপ্রকার পাগড়ী, যাহার সহিত দাঁতন ও চিরুনী থাকিত না, তাহা কেহ গ্রহণ করিত না। সুফী সাধকদের ব্যবহৃত লোটা ও চামড়ার চিলুমচীর গ্রাহক বেশী হওয়ায় উহাদের দাম বাড়িয়া গিয়াছিল।

মোটা মুটিভাবে এই কথা বলা যায় যে, আল্লাহ্‌তালা এই আখেরী জামানায় শায়খ নিজামকে শায়খ জুনায়েদ ও শায়খ বায়েজীদের তুল্য মর্যাদা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে খোদায়ী এশকের জজবা যেই পরিমাণে দিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ মানুষের ধারণায় আসা সম্ভব নহে। মনে হয়, তাঁহার মধ্যেই সৎপীরের গুণাবলী ও হেদায়তের সকল প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া যেন মোহর মারিয়া দিয়াছিলেন। কবি বলেন,

এই মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ বিষয়ের সমুদয় কিছু
নিজাম উদ্দিনের মধ্যে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

মোহার্রম মাসের পাঁচ তারিখে, যে দিন শায়খুল ইসলাম সায়খ ফরিদ উদ্দিনের ওরস অনুষ্ঠিত হইত, সেই দিন শায়খের দরবারে শহর ও হিন্দুস্তানের নানাদিক হইতে এত অধিক পরিমাণ লোক সমাগত হইত এবং জিকিরের মহফিল বসিত যে, ইহার পরে কেহ আর ইহার অনুরূপ কিছু স্মরণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ শায়খ নিজাম উদ্দিনের কালটি ছিল এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য সময়।

আলাই শাসন আমলে অযোধ্যায় শায়খ ফরিদ উদ্দিনের পৌত্র শায়খ আলাউদ্দিন তাঁহার সাজ্জাদানশীন হিসাবে স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আল্লাহ্‌তালা শায়খ ফরিদ উদ্দিনের প্রৌত্র শায়খ আলাউদ্দিনকে মূর্তিমান পুণ্য ও এবাদত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল বুজর্গ ব্যক্তি ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি রাত্রিদিন সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহ্‌তালার এবাদতে কাটাইতেন। এক মুহূর্তও তাঁহারা নামাজ ও জিকির আজকার ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। আল্লাহ্‌র প্রেম এই সমস্ত শরীফের পুত্র শরীফের মধ্যে এমনভাবে স্থান করিয়া লইয়াছিল যে, তাঁহারা কায়মনে সর্বদা সেই প্রেমেই মগ্ন থাকিতে চাহিতেন। তফসীরে যেমন আসিয়াছে যে, পবিত্র ফেরেশতাদের মধ্যে এমন অনেক ফেরেশতা আছেন, যাহারা শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছেন এবং জন্মের দিন হইতে তাঁহারা এই কাজেই নিরত রহিয়াছেন। শায়খ আলাউদ্দিনকে মনে হয় এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। আমি জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে

শুনিয়াছি ; তিনি বলিয়াছেন, আমি এক বৎসর ছয় মাস শায়খ ফরিদ উদ্দিনের মাজারে কাটাইয়াছি, কিন্তু কোন দিন শায়খ আলাউদ্দিনকে নামাজ পড়া, কোরান পড়া এবং হাদীস ও মারেফতের কিতাবাদি পাঠকরা ছাড়া দেখিতে পাই নাই। বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তিদের নিকট ইহা সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বল যে, কোন ব্যক্তির অন্তর যদি আল্লাহ্র প্রেমে সম্পূর্ণ মগ্ন না থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এইভাবে নিজকে নিয়োজিত রাখা সম্ভব নহে। বস্তুতঃ শায়খ আলাউদ্দিন যদি এইভাবে নিজকে সর্বক্ষণ এবাদতে নিয়োজিত না রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দুনিয়ার কুতুব ও আশ্রয়স্থল শায়খ ফরিদ উদ্দিনের সাজ্জাদা-নশীন হওয়া সম্ভব হইত না এবং এমন এক মহান ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত তিনি কিছুতেই হইতে পারিতেন না।

অনুরূপভাবে সমুদয় আলাই শাসন আমলে শায়খ রুকন উদ্দিন, যিনি শায়খের পুত্র শায়খ ছিলেন, মুলতানে শায়খ সদর উদ্দিন ও শায়খ বাহাউদ্দিনের সাজ্জাদানশীন হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা আর কাহার শরাফত, বুজর্গী, মহিমা ও গুণাবলী অধিকতর উন্নত ও উত্তম হইতে পারে, যাহার পিতা ছিলেন শায়খ সদর উদ্দিন এবং পিতামহ ছিলেন শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া। আলাই শাসন আমলে শায়খ রুকন উদ্দিন মুলতান ও উচের পীর মুরিদীর যথার্থ পথ দেখাইয়াছেন এবং পিতা ও পিতামহের গদিকে অলংকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সিন্ধুনদ ও তন্নিম্নবর্তী অঞ্চলের লোকেরা এই মহান শায়খ রুকন উদ্দিনের দরবারের সহিত একান্ত আনুগত্যের সহিত যুক্ত ছিল (আল্লাহ্ তাঁহার দিব্য জ্ঞানের শক্তি পবিত্র রাখুন); হিন্দুস্তানের শহর ও গ্রামের বিপুল সংখ্যক জ্ঞানীগুণী শায়খ রুকন উদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাদের কাহারও শায়খের অলৌকিক ক্ষমতা ও দিব্যজ্ঞান সম্পর্কে কোনপ্রকার দ্বিধা সন্দেহ ছিল না। তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্য সর্বদাই প্রশংসার উর্ধে ছিল। শায়খ বাহা উদ্দিন জাকারিয়াকে আল্লাহ্ প্রেমিক সুফী সাধকদের মধ্যে সাদা বাজের ন্যায় গণ্য হইত। বস্তুতঃ যে কেহ তাহার পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহার খোদাপ্রাপ্তি অবধারিত ছিল। শায়খ সদর উদ্দিন পরিপূর্ণ গুণাবলী ও দান-ধ্যানে ব্যাপক উদারতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার পিতার নিকট হইতে তিনি প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বুজর্গ ব্যক্তি অত্যধিক দান খয়রাতের জন্য অধিকাংশ সময় কর্জ করিয়া দিন গুজরান করিতেন।

আলাই শাসন আমলের বুজর্গ ব্যক্তিরা, যাহাদের কল্যাণে তৎকালীন পৃথিবী স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল, তাঁহারা অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা ও উন্নত সম্মানের অধিকারী

ছিলেন। তাঁহাদের বংশাবলীর নিদর্শন, যাহা তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রে প্রকাশ পাইত, উহার সত্যতা সম্পর্কে সকলে ঐক্যমত পোষণ করিত। যে সকল বুজর্গানেদীনের পুণ্য প্রভাবে এতদঞ্চলের সর্বত্র অধিক মাত্রায় সৎকার্য ও সদাচারের বিস্তার ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন বুজর্গ শিরোমণি সৈয়দ তাজউদ্দিন। তিনি এই অঞ্চলের সকল বুজর্গের মধ্যে মহৎ ছিলেন এবং তাঁহার কল্যাণে এই অঞ্চল সম্মানিত ও সমাদৃত ছিল। তাঁহার পিতার নাম ছিল শায়খুল ইসলাম সৈয়দ কুতুব। উক্ত সৈয়দ তাজউদ্দিন সৈয়দ কুতুব উদ্দিনের পিতা ও সৈয়দ আআয উদ্দিনের পিতামহ ছিলেন। তিনি বাদাউনের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইতোপূর্বে বহু বৎসর তিনি অযোধ্যার কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। পরে সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া বাদাউনের কাজীর পদে নিযুক্ত করেন।

সৈয়দ তাজউদ্দিন, আল্লাহ্ তাঁহাকে ক্ষমা করুন ও শান্তি দিউন, যথার্থই উন্নত মর্যাদার সৈয়দ ছিলেন। বহু সুফী সাধক ও মারেফতপন্থী তাঁহার আকৃতিতে হজরত মুহম্মদ মোস্তফা (স:)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। তাঁহার আকৃতিতে হজরতের এই প্রকার স্বপ্নে দর্শন দান এই কথাই প্রমাণিত করে যে, তাঁহার সৈয়দ বংশীয় হওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহের অতীত ছিল; তদুপরি তাঁহার পুত্র সৈয়দ কুতুব উদ্দিন ও তাঁহার পৌত্র সৈয়দ আআয উদ্দিনের সদাচার ও সচ্চরিত সমসাময়িক কালের লোকেরা দেখিতে পাইয়াছে। এই সকল বুজর্গ সৈয়দদের প্রত্যেকেই জ্ঞানে-গুণে, দানে-ধ্যানে ও অনবিধ আচার-আচরণে নিজেরাই নিজেদের তুলনা ছিলেন।

উপরোক্ত সৈয়দ তাজ উদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ রুকন উদ্দিন কোড়ার কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ্ তালা সৈয়দ রুকন উদ্দিনকে সর্বপ্রকার গুণে গুণান্বিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টি ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি জিকিরের মজলিসে উপস্থিত হইলে জজবা ও ভাবের এক অদ্ভুত স্বভাব তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার ত্যাগ-তিতিক্ষা, নির্জনবাস ও দান-ধ্যানের যুগ অত্যন্ত মূল্যবান সময় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তারিখ-ই-ফিরুজশাহী প্রণেতা আমি উপরোক্ত সৈয়দ তাজ উদ্দিন ও সৈয়দ রুকন উদ্দিন (রহ:) উভয়ের খেদমতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য এবং তাঁহাদের কদম-বুছি করিবার গৌরব লাভ করিয়াছি। আমি তাঁহাদের ন্যায় বুজর্গ, এমন জ্ঞান-গুণের অধিকারী এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত মহিমার ধারক লোক খুব কমই দেখিয়াছি। বস্তুত: সৈয়দ বংশ নিজেই একটি গুণের আকর এবং হজরত

১৯—

মুহম্মদ মোস্তফা (সাঃ)র বংশধর হওয়া একান্তই জ্ঞান, গুণ, সদাচার ও সুখ্যাতির ব্যাপার। আমি যদি এই সকল সৈয়দ এবং অন্যান্য সৈয়দ বংশীয় লোক, যাহারা হজরত মুহম্মদ মোস্তফা ও মোর্তজার কলিজার টুকরা ও চোখের রৌশনী ছিলেন, তাঁহাদের গুণপনার প্রশংসা করিয়া কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সত্যই দিশাহারা হইয়া পড়িব এবং আমার অক্ষমতার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

আলাই শাসন আমলে কাটিহালের সম্মানিত, মর্যাদাশালী ও জনপ্রিয় সৈয়দজাদাদের মধ্যে সৈয়দ মুগিস উদ্দিন ও তাঁহার মহান ভাই সৈয়দ মুজিব উদ্দিনও ছিলেন। দুনিয়াতে তাঁহাদের উভয় ভাইয়ের বুজর্গীর কোন তুলনা ছিল না। কাটিহালে তাঁহাদের বুজর্গী ও সৈয়দ বংশীয় হওয়ার ব্যাপারটি সকলের নিকট সুপরিচিত ছিল। গ্রন্থকারের পিতা সৈয়দ জালাল উদ্দিন কাটিহালীর কন্যার পৌত্র ছিলেন। উক্ত সৈয়দ জালাল উদ্দিন কাটিহালের জ্ঞানী ও গুণীদের মধ্যে বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হইতেন। এই অক্ষমের পিতাও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ছিলেন এবং এই অক্ষমের পিতামহী সৈয়দজাদী দিব্যদৃষ্টি ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার দিব্যশক্তি বহু গুণবতী নারী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।

আলাই শাসন আমলের প্রথম দিকে নওহাটার সৈয়দ বংশীয়রা জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার দিব্যদৃষ্টি ও অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়টি সুপরিচিত ছিল। শহরের সকল বুজর্গ আলেম ও উস্তাদ এই নওহাটার সৈয়দদের সময়কে পুণ্যের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টি এই পুণ্যাত্মাদের কদম মোবারকে ন্যাস্ত রাখিয়া তৃপ্তি পাইতেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের মহিমা ও গুণাবলী এমনই ব্যাপক ছিল যে, আমার ন্যায় একজন অক্ষমের পক্ষে এই দুই জগতের বাদশাহদের সম্পর্কে কোন কিছু বর্ণনা করা সম্ভব নহে। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও গরীব শিক্ষার্থী, যাহারা শহরে জ্ঞানার্জন করিয়া জ্ঞানী-গুণী হইয়াছেন, তাহারা এই সকল পুণ্যাত্মাদের প্রতিপালন ও সাহায্য সহানুভূতি লাভ করিয়াই এইরূপ খ্যাতিমান হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

আলাই শাসনকালের প্রথম দিকে কুরদিসের সৈয়দ বংশীয় সৈয়দ অহজু ও সৈয়দ আজলীর পিতামহ দুইজন খুবই খ্যাতিমান এবং সকলের নিকট সম্মানিত ও প্রিয় ছিলেন। আলাই আমলের সর্বক্ষণ সৈয়দ মজদ উদ্দিন চেনারী, সৈয়দ আলাউদ্দিন জিউরী, সৈয়দ আলাউদ্দিন পানিপথী, সৈয়দ হাসান, সৈয়দ মোবারক প্রমুখ সৈয়দদের প্রত্যেকেই অসাধারণ জ্ঞান-গুণের অধিকারী হিসাবে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। সৈয়দ আলাউদ্দিন জিউরী সৈয়দ বংশের খ্যাতিতে মারেফতের সাজ্জাদানশীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং শিক্ষার্থী ও শিষ্যদিগকে যথারীতি বয়েত দান করিতেন।

আলাই শাসনকালে অনেক সৈয়দ বংশীয়দের মধ্যে অনেকেই, যেমন মালীক মুঈনউদ্দিন, মালীক তাজউদ্দিন জাফর, মালীক জালাল উদ্দিন, মালীক জামাল, সৈয়দ আলী বভোলী প্রমুখ সৈয়দগণ সকলেই জীবিত ছিলেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন পদমর্যাদা অলংকৃত করিয়া উহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার নিজে দীন দুনিয়ার এমনই সকল মহান ব্যক্তিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং তাঁহাদের বুজর্গী, সচ্চরিত্র, উদারতা, মহত্ব, নেতৃত্ব, সদাচার, দানধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়াছে। যদি সে এই সকল বুজর্গ সৈয়দদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কিছু গুণগান করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাহাকে বহু খণ্ড পুস্তক লিখিতে হইবে। আলাই আমলে বাদাউনেও বহু খাঁটি সৈয়দ বংশীয় লোক বাস করিতেন। তাঁহাদের পুণ্য প্রভাব শুধু বাদাউনবাসীদের উপর নহে; বরং সমগ্র হিন্দুস্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সকল সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তিদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে সকল বংশবিশারদই ঐক্যমত পোষণ করিতেন। এই আমলে খাঁটি সৈয়দী বংশ মর্যাদার অধিকারী বয়ানার সৈয়দরা ছিলেন এবং বর্তমানেও তাঁহাদের বংশধরগণ যথারীতি বয়নায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে বয়ানা উজ্জ্বল ছিল এবং ভবিষ্যতেও আরও উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিবে।

আলাই শাসনকালে সৈয়দদের অন্তত: তিনজন বিভিন্ন রাজ্যের কাজীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। একজন স্বয়ং সুলতানের দরবারে থাকিয়া কাজী হিসাবে সুলতানের স্থলাভিষিক্ত হইবার মর্যাদা পাইয়াছিলেন। আলাই আমলের প্রথম দিকে সদরে জাহান মিনহাজ জুরজানীর পৌত্র দাউদ মালীকের পিতা কাজী সদর উদ্দিন আরেফ বহু বৎসর এইরূপ নায়েব কাজীর পদ অলংকৃত করেন। পরে তিনি সদরে পদে অভিষিক্ত হন এবং তাঁহার জ্ঞান-গুণে এই পদটির শোভা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যদিও উক্ত কাজী সাহেব আলেম হিসাবে তেমন সুপরিচিত ছিলেন না, তথাপি তাঁহার মধ্যে এমন একটা কঠোরতা ছিল, এবং শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের স্বভাব তিনি এমনভাবে বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার সম্মুখে কোন প্রকার কলা-কৌশল কাজ করিত না। শহরে নানা শ্রেণীর কুশলী ও ধূর্ত লোক ছিল, কিন্তু তাঁহার এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য দরবারে আসিয়া কোনপ্রকার ধোকাবাজী ও প্রতারণামূলক আচরণ করিতে সাহস পাইত না। বিচার বিভাগ তাঁহার সদরে জাহান পদের জন্য নতুন মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পরে কাজী জালাল উদ্দিন উলূলজী দরবারী নায়েব কাজীর পদ লাভ করেন। সদরে জাহানের পদ লাভ করেন মওলানা জিয়াউদ্দিন বয়ানা। তিনি ইতোপূর্বে সৈন্যদলের কাজী ছিলেন। তিনি আলেম হিসাবে খুবই সুপরিচিত ছিলেন। কাজী জিয়াউদ্দিন জ্ঞান-গুণের ক্ষেত্রে অপরিসীম

মর্যাদার অধিকারী হইলেও গাম্ভীর্য, মহিমা ও কঠোরতার কোন গুণ রাখিতেন না ; ফলে কাজী পদের পূর্বের সেই মর্যাদা আর অবশিষ্ট থাকে নাই এবং তাঁহার নিরীহ ভাবের জন্য সদরে জাহান পদের প্রভাবও কমিয়া গিয়াছিল।

আলাই শাসনের শেষ দিকে সুলতান আলাউদ্দিনের মেজাজ মরজি খুব সঠিক ছিল না। ফলে তিনি রাজধানী দিল্লীর কাজীর পদটি মালীকুত্তোজ্জার হামিদ উদ্দিন মুলতানীকে প্রদান করেন। রাজধানীর এই কাজীর পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ; জ্ঞান-গুণ ও বংশ মর্যাদা এবং সর্বোপরি ধার্মিকতা ছিল এই পদটির যোগ্যতার মাপকাঠি। এইজন্য সুপরিচিত বুজর্গ ব্যক্তি ও বুজর্গ-জাদা ব্যতীত অন্যদিগকে এই পদ দান করা হইত না। কিন্তু সুলতান এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি তাঁহার পরিবারের নফর, পোষ্য ও মহলের চাবির মালীক এই মুলতানীকে দান করেন। এই ইতিহাসে এই মালীকুত্তোজ্জার নামক ব্যক্তিটির গুণাবলী উল্লেখ করা যায় না। সুলতান আলাউদ্দিন তাহাকে এই পদটি দেওয়ারকালে বংশ-মর্যাদা বা ধার্মিকতার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই ; বরং তাঁহার ও তাঁহার পিতার আনুগত্য ও সেবাকেই মূল্য দিয়াছেন। তখন সুলতানের সম্মুখে এই কথা বলিবার কেহই ছিল না যে, কাজীর পদ অলংকৃত করিবার জন্য শুধু জ্ঞানী হইলেই চলে না, পরহেজগার হওয়া চাই। আর পরহেজগারী বলিতে দুনিয়াদারী, সকল প্রকার গুনাহ ও অসচ্চরিত্র হইতে দূরে থাকিবার অবস্থাকেই বুঝায়। যে কোন বাদশাহের পক্ষে কাজীর এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি ধার্মিক ও গুণবান কোন বুজর্গকে দেওয়া ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। কারণ যে বাদশাহ তাঁহার রাজধানী ও বিভিন্ন রাজ্যের কাজীর পদ দেওয়ার সময় ধার্মিকতাকে শর্ত হিসাবে গণ্য না করেন এবং লোভী, নীচাশয়, দুনিয়াদার ও অধার্মিকদের হাতে উহা অর্পণ করেন, তিনি স্বয়ং ধর্মকে ত্যাগ করিয়া উহাকে যথেচ্ছ নষ্ট হইবার সুযোগ করিয়া দেন।

যেহেতু সুলতান আলাউদ্দিন শেষ জীবনে সদরে জাহানের পদটি দেওয়ার বেলায় ধার্মিকতার পরিবর্তে সেবা ও আনুগত্যকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন, সেই জন্য পরবর্তী বাদশাহদের মধ্যেও এই বিবেচনাটি একটি প্রথা হইয়া দাঁড়ায় এবং ধার্মিকতার ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাক্ত হয়। অথচ আলাই শাসনের সময় রাজধানী দিল্লীতে যে ধরনের আল্লামা ও বিচক্ষণ জ্ঞানী আলেমরা ছিলেন, তাহাদের ন্যায় জ্ঞানী তৎকালে বোখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ, মিশর, খোয়ারজম, দামেশক, তাবরিজ, ইস্পাহান, রায়, রোম ও পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব ছিল না। যে কোন বিদ্যার কথাই ধরা যাউক না কেন, যেমন

শ্রুতি ও স্মৃতি, তফসীর, ফেকাহ, অসুলে ফেকাহ, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মীয়নীতি ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, অভিধান, অলংকার শাস্ত্র, রচনাশৈলী, কালাম শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র প্রভৃতির যে কোনটি সম্পর্কে তাঁহারা বিনাদ্বিধায় বক্তব্য উপস্থিত করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর বহু বিদ্যার্থী এই সকল উস্তাদের নিকট হইতে জ্ঞানের পুঁজি লাভ করিত এবং নিজেরা ধর্মীয় বিধান দানের যোগ্য উস্তাদে পরিণত হইত। এই সকল মহান উস্তাদের অনেকেই জ্ঞানে-গুণে ও বিদ্যায় ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম রাজীর সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। যেমন কাজী ফখর উদ্দিন নাকেলা, কাজী শরফ উদ্দিন সেরবাহী, মওলানা নাসির উদ্দিন গণী, মওলানা তাজউদ্দিন মুকাদ্দম, মওলানা জহির উদ্দিন লঙ্গ, কাজী মুগিস উদ্দিন বয়ানা, মওলানা রুকন উদ্দিন সান্নামী, মওলানা তাজউদ্দিন কেলাহী, মওলানা জহির উদ্দিন বহকরী, কাজী মহীউদ্দিন কাশানী, মওলানা কামাল উদ্দিন কোলী, মওলানা ওজিহ উদ্দিন পায়েলী, মওলানা মিনহাজ উদ্দিন কাবেনী, মওলানা নেজাম উদ্দিন কেলাহী, মওলানা নাসির উদ্দিন কাড়া, মওলানা নাসির উদ্দিন সাবুনী, মওলানা আলাউদ্দিন তাজের, মওলানা করিম উদ্দিন জওহরী, মওলানা হুজ্জত মুলতানী কাদিম, মওলানা হামিদ উদ্দিন মুখলেস, মওলানা বুরহান উদ্দিন বহকরী, মওলানা এফতেখার উদ্দিন বারানী, মওলানা হেশাম উদ্দিন সুর্খ, মওলানা ওহিদ উদ্দিন মালহু, মওলানা আলাউদ্দিন করক, মওলানা হেসাম উদ্দিন ইবনে শাদী, মওলানা হামিদ উদ্দিন বুনিয়ানী, মওলানা শেহাব উদ্দিন মুলতানী, মওলানা ফখর উদ্দিন হাঁসুবী, মওলানা ফখর উদ্দিন সাকাকেল, মওলানা সেলাহ উদ্দিন শতরফী, কাজী জয়েন উদ্দিন নাকেলা, মওলানা ওজিহ উদ্দিন রাজী, মওলানা আলাউদ্দিন সদরুশ্ শরিয়ত, মওলানা মীরান মারিকেলা, মওলানা নজিব উদ্দিন সাবী, মওলানা শামস উদ্দিন তাম, মওলানা সদর উদ্দিন গন্ধক, মওলানা আলাউদ্দিন লাহোরী, মওলানা শামস উদ্দিন ইয়াহিয়া, মওলানা শামস উদ্দিন গাজরোতী, মওলানা সদর উদ্দিন তাবী, মওলানা মুইন উদ্দিন লোনী, মওলানা এফতেখার উদ্দিন রাজী, মওলানা মুয়েজ উদ্দিন আজ্জিনী ও মওলানা নজম উদ্দিন এন্তেশার।

এইযে ছেচল্লিশ জন উস্তাদ, যাহাদের নাম ও উপাধি আমি এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, অনেকের খেদমতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়াছি এবং অনেককে শিক্ষাদানে ও বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছি। আমার উস্তাদ শরফ উদ্দিন বুশায়খীর অধিকাংশ শিষ্য ও অন্যান্য বুজর্গ আলেম, যাহাদের নাম আমি এইস্থলে উল্লেখ করি নাই, তাঁহারাও আলাই শাসন আমলে জীবিত ও

যথারীতি শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। আলাই আমলের শেষের দিকে শায়খ বাহা উদ্দিন জাকারিয়ার পৌত্র মওলানা এলম উদ্দিন, যিনি বিদ্যার জগৎ ও বিচক্ষণ জ্ঞানী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন, তিনি দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আমি যদি এই সকল বুজর্গ উস্তাদ ও তাঁহাদের যে সকল শাগরেদ তৎকালে উস্তাদের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের কথা বর্ণনা করিতে যাই, তাহা হইলে বিষয়টি অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি অনুরূপ কার্য হইতে বিরত রহিলাম।

আফসোস, হাজার আফসোস যে, এই সকল বুজর্গ উস্তাদের মূল্য সুলতান আলাউদ্দিন বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের প্রতি কর্তব্য পালনের কোন তাগিদই তিনি অনুভব করেন নাই। সমকালীন অন্য লোকেরাও এই কথা বুঝিতে পারে নাই যে, এই প্রকার মহান ব্যক্তিদের পায়ের ধূলি অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও নিজেদের চোখের সুরমা হিসাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হন। আমি, এই গ্রন্থকারও তৎকালে তাঁহাদের গুণ ও মহিমার কোন সংবাদই রাখিতে পারি নাই। আজ বহু বৎসর পরে যখন তাঁহাদের ন্যায় অতুলনীয় ব্যক্তিদের সকলেই আল্লাহর দরবারে হাজির হইয়াছেন এবং সেই মহামহিমের সাথে একাত্ম হইবার অনুরূপ সমুন্নতি লাভ করিয়াছেন, তখন মনে হইতেছে, আমি কেন, কেহই তাঁহাদের পরে তাঁহাদের ন্যায় ও তাঁহাদের অপেক্ষা হাজার গুণ ন্যূন গুণের অধিকারী কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান ও গুণাবলীর বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, যদি তাঁহাদের প্রত্যেককে লইয়া এক এক খণ্ড পুস্তকও লিখিয়া ফেলি, তথাপি তাহা শেষ করিতে পারিব না।

যে সময় এই সকল উস্তাদ, তাঁহাদের কালের কাজী আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ শায়বানীর ন্যায় জীবিত বিদ্যমান ছিলেন ও শিক্ষাদান করিতেছিলেন, তখন যদি কোন বিচক্ষণ, বিখ্যাত মুফতী ও উস্তাদ খোরাসান, মাওরায়ান্নাহার, খোয়ারজম অথবা অন্য কোন শহর হইতে দিল্লীতে আসিতেন এবং উপরোক্ত উস্তাদদের জ্ঞান-গুণ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাহারা পুনরায় শিক্ষার্থী হিসাবে নিজেদের শিক্ষাকে সংশোধন করিতেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে আদবের সহিত বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। যদি সেই সময় যে কোন বিষয়ের উপর লিখিত কোন গ্রন্থ বোখারা, সমরকন্দ, খোয়ারজম, ইরাক প্রভৃতি স্থান হইতে এই শহরে আসিয়া পৌঁছিত, তাহা হইলে আমাদের এই শহরের উস্তাদগণ উহাকে গ্রহণ ও প্রশংসা করিলেই কেবল তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত ; অন্যথায় উহা পরিত্যাক্ত বলিয়া গণ্য হইত।

আলাই আমলের এই ইতিহাসে তাঁহাদের গুণাবলী উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য হইল এই যে, এই শহর ও সেই যুগ কি আশ্চর্য কালইনা ছিল। যখন তাঁহাদের ন্যায় উস্তাদগণ শিক্ষাদানকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। আমরা কেনই বা সেই যুগকে এক বিশিষ্ট যুগ এবং এই শহরকে দুনিয়ার একটি বিশিষ্ট শহর বলিয়া গণ্য করিব না।

আলাই শাসনকালে এলমে কেরাত ও কোরান শিক্ষা দিবার উস্তাদের সংখ্যা ছিল অনেক। অবশ্য তন্মধ্যে মওলানা জামাল উদ্দিন শাতেবী, মওলানা আলাউদ্দিন মুকরী ও হাসান বসরীর ভাগিনেয় খাজা যকীর ন্যায় ব্যক্তিগণও আলাই আমলে কেরামতের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। শহরের এমন অনেক হাফেজে কোরান তাঁহাদের নিকট কেরাতের শুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিতেন, যাহাদের তুলনা খোরাসান ও ইরাকেও পাওয়া সম্ভব হইত না।

আলাই শাসন আমলে এমন অনেক ওয়ায়েজ—ধর্মীয় বক্তা ছিলেন, যাহাদের তুলনা এই দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় নাই এবং আজ পর্যন্ত কেহ অনুরূপ কাহারও সন্ধান দিতে পারে নাই। এই সকল ওয়ায়েজের পুণ্য প্রভাবে দিল্লীর শহর আলোকিত এবং জমজমাট হইয়া উঠিয়াছিল। সপ্তাহের কোন দিন ওয়াজ নসিহত ব্যতীত যাইত না। আলাই আমলের এই সকল ওয়ায়েজের মধ্যে একজন ছিলেন মওলানা এমাদ উদ্দিন হেসাম দরবেশ। যাহার সর্বদা এই দরবেশের ওয়াজ নসিহত শুনিবার সৌভাগ্য হইত, তাহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইত যে, এক আশ্চর্য ওয়াজ সে শুনিয়াছে। মওলানা এমাদের ন্যায় এমন আবেগপূর্ণ, এমন হাস্য কৌতুকময়, এমন সারগর্ভ, এমন তত্ত্ব গভীর, এমন প্রাঞ্জল, এমন মনোমুগ্ধকর সুন্দর ওয়াজ কোন কর্ণ শুনে নাই ও কোন চক্ষু দেখে নাই। আলাই আমলের বিশ বৎসরব্যাপী মওলানা এমাদ ওয়াজ করিয়াছেন এবং ওয়াজের মহফিল গরম করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ওয়াজের মহফিলে বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বুজর্গ, মান্যবান ও কবিরা উপস্থিত থাকিতেন। এই সকল ওয়ায়েজের মহফিলে আবেগের পরিবেশে মওলানা হামিদ, মওলানা লতিফ মুকরী এবং তাঁহাদের পুত্ররা কোরান পাঠ করিতেন। তাঁহাদের সুর লহরীতে আকাশের পাখীও মাটিতে নামিয়া আসিত। বস্তুতঃ তাঁহাদের ওয়াজ নসিহতের ফলে মহফিলে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হইত যে, চতুর্দিকের শ্রোতারা আবেগে দাঁড়াইয়া পড়িত এবং সকলের কণ্ঠে কান্নার শব্দ ও হাহুতাশের আওয়াজ উঠিত। এক সপ্তাহেও এই আবেগের রেশ হৃদয় হইতে দূর হইত না। ইহার ফলে মানুষের মন সেই মহফিলের দিকে পাগলের ন্যায় ছুটিয়া যাইত।

এই সকল গণ্যমান্য ও বিখ্যাত বক্তার মধ্যে দ্বিতীয় যিনি কোরানের ব্যাখ্যাতা, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও শহরের শিশুদের উস্তাদ হিসাবেও পরিচিত ছিলেন, তিনি হইলেন মওলানা গিয়াস উদ্দিন সান্নামী। তিনি আলাই শাসন আমলে সর্বদা ওয়াজ ও কোরান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি কোরানের যে কোন একটি আয়াত লইয়া অজস্র বক্তব্য উপস্থিত করিতেন এবং তাঁহার মহফিলে দুই তিন হাজার লোক সর্বদা উপস্থিত থাকিত। কিন্তু এই ভীরু প্রকৃতির লোকটি জগতের আদর্শ, যুগের কুতুব ও মানুষের আশ্রয়স্থল শায়খুল ইসলাম নিজাম উদ্দিনের দরবারের প্রতিহিংসা ও কুধারণা পোষণ করিতেন। ইহার ফলে সাধারণ অধ্যাত্মপন্থীরা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে নানাবিধ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হয়। পরিণামে তাঁহার নাম-নিশানাও দুনিয়ার বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

আলাই শাসন আমলের প্রথম দশ বৎসর অন্য একজন বিখ্যাত ওয়ায়েজ ছিলেন মওলানা শিহাব উদ্দিন খলিলী। তিনি ওয়াজ নসিহতে ভয় প্রদর্শনের রীতিকে প্রাধান্য দিতেন, কবিতা পাঠ করিতেন এবং কোরান হইতে প্রচুর আয়াত তুলিয়া ধরিতেন। তাঁহার ওয়াজে নানাবিধ কাহিনী, উপদেশ, মারেফতপন্থী গল্প ও ধার্মিক আলেমদের কীর্তিকথা থাকিত এবং তিনি এই সকল কথা মিলাইয়া সত্যকে ফুটাইয়া তুলিতেন। তাঁহার মহফিলে প্রচুর লোক সমাগম হইত এবং শ্রোতারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িত। মওলানা করিম উদ্দিনও আলাই আমলের ওয়ায়েজদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ওয়াজ নসিহতের ধারা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। তাঁহাকে অন্যদিক হইতে দিল্লী শহরের কবি, গদ্য-পদ্য রচনাকারী বলিয়াও গণ্য করা হইত। ওয়াজ নসিহতে তিনি নিত্য-নতুন কবিতা ও প্রবন্ধ সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার বহু গদ্য-পদ্য রচনা মানুষের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে এবং এইগুলি তাঁহার রচনার ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় বহন করিতেছে। তাঁহার ওয়াজ নসিহতের অধিকাংশ এইজন্য কৃত্রিম বলিয়া মনে হইত এবং এই কারণে ও সুস্বর কোমলতার অভাবে তাঁহার দ্ব্যর্থবোধক রচনা মানুষের বোধগম্য হইত না। কাজেই তাঁহার মহফিলে জনসমাগম হইত খুবই কম।

মওলানা জালাল উদ্দিন হেসাম দরবেশও আলাই আমলের একজন বিখ্যাত ওয়ায়েজ ছিলেন। তাঁহার ওয়াজ নসিহত ছিল মিশ্রিত ধারার এবং ওয়াজের মধ্যে ভয় প্রদর্শনের প্রাধান্য ছিল। তিনি আবেগের সঙ্গে অনেক হাস্য-কৌতুকও উপস্থিত করিতেন এবং রসের কবিতা পাঠ করিতেন। মওলানা জালাল শায়খ

রুকন উদ্দিনের দরবার হইতে মুরিদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুমতি পাইয়াছিলেন। তিনি মুরিদ করিতেন, বয়েত দিতেন ও পীরের কার্য সমাধা করিতেন। আলাই আমলে আরও একজন ওয়ায়েজ ছিলেন, তাঁহাকে মওলানা বদর উদ্দিন পান্নু-খোদী বলা হইত। তিনি অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলেন এবং বেশ কয়েক মাস দিল্লীতে ওয়াজ নসিহত করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বেশী কথা বলিতেন না; কিন্তু যাহা বলিতেন সত্য বলিতেন। এই কারণে তাঁহার মহফিলে প্রচুর জনসমাগম হইত এবং তাঁহার ওয়াজ মানুষের মনে দাগ কাটিত। ইহার ফলে কান্নায় ও আবেগে তাঁহার ওয়াজের মহফিল জমিয়া উঠিত এবং দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হইত।

সুলতান আলাউদ্দিনের দরবারে দশ পনের বৎসর যে সকল সভাসদ ছিলেন, তাঁহারা নানাদিক হইতেই অতুলনীয় ছিলেন। সুলতান যে ধরনের বদমেজাজ, কঠোরতা, কর্কশভাব ও দুর্ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন, তৎসত্বেও এই সকল সভাসদের রসিক মন ও সজীব মানসিকতা নষ্ট হয় নাই। তাঁহার সভাসদরা এমন মধুমাখা কথা, অমায়িক ব্যবহার ও হাস্য-কৌতুকের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁহাদের সম্মুখে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাঁহার সভাসদের মধ্যে একজন ছিলেন সিপাহশালার তাজউদ্দিন ইরাকী আমীর দাদ লশকর। তাঁহার ন্যায় বিচিত্র জ্ঞান, অমায়িক চরিত্র, সুলতান ও শায়খদের চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অধিকারী অন্য কেহ ছিলেন না। কোমলে কঠোরে জীবন যাপন করা, নিজের গাম্ভীর্য ও মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, কোনপ্রকার অকাজের মধ্যে না যাওয়া এবং সর্বদা সুখ্যাতির মধ্যে বাস করার ব্যাপারে শহরে তাঁহার তুলনা ছিল না বলিলেই চলে।

সুলতান আলাউদ্দিনের অন্তরঙ্গ সভাসদদের মধ্যে অন্য একজন ছিলেন খোদাওন্দজাদা চাশনিগীর। ইনি বুজর্গ বলবনের পৌত্র ও শামসী বান্দাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহের বুজর্গী ও মহিমা মানুষের মনে এক অক্ষয় প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল এবং সুলতানী মজলিসে যেমন হওয়া ও যেমন থাকা উচিত, সেই ব্যাপারে এই চাশনিগীর নিজেই নিজের তুলনা ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিনের অন্য একজন সভাসদ ছিলেন মালীক রুকন উদ্দিন দবীর। তাঁহার ন্যায় মধুর বচন ও হাস্য কৌতুকের অধিকারী বহু যুগের মধ্যেও দেখা যায় নাই। যে ব্যক্তি তাঁহার মধুর বচন ও হাস্য কৌতুক শুনিত, তাঁহার মজলিসে বসিত এবং তাঁহার সাহচর্যে থাকিত, তাঁহার পক্ষে অন্যের সাথে মেলামেশা বা অন্যের কোন কথা শোনার ইচ্ছা পোষণ করা সম্ভব হইত না।

বস্তুতঃ সুলতান আলাউদ্দিনের দরবারে হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট মালীকজাদারা একত্র হইয়াছিলেন। সুলতানের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন মালীক আআয উদ্দিন ইর্গা খান ও মালীক নাসির উদ্দিন বোরখান। শহরের সকল লোক এই বিষয়ে একমত ছিল যে, শাহী নফরের মধ্যে এই প্রকার আলাপী ও কথক, যাহারা আনন্দে-বিষাদে অতুলনীয় বাগ্মিতার পরিচয় দিতেন, কোন চক্ষু আর কখনও দর্শন করে নাই। উলুবী কিতাব খানও সুলতানের পুরাতন চাকর ও অন্তরঙ্গ পারিষদ হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। দিল্লী শহরের জ্ঞানী-গুণীরা একমত ছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় শাহী দরবারের কিতাব পড়ুয়া প্রত্যেক যুগে পাওয়া যায় না। তিনি যে ঢং, ধরন ও আওয়াজে কবিতা পাঠ করিতেন, তাহা শ্রোতা মাত্রের হৃদয় হরণ করিত এবং উপস্থিত সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িত। মনে হইত, এই দুনিয়ায় সৈয়দ কিতাব খানের ন্যায় কিতাব পাঠ আর কেহ কখনও শুনে নাই। এই ব্যক্তি ছাড়াও আলাই আমলে আরও বহু বিরল কিতাব পড়ুয়া ছিলেন।

আলাই শাসন আমলে এমন অনেক কবিও ছিলেন, যাহাদের তুল্য কবি তাঁহাদের পূর্বে বা পরে কখনও দেখা যায় নাই। বিশেষ করিয়া আমীর খসরু, যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কবির মধ্যে সম্রাট তুল্য ছিলেন। বিচিত্র ভাব ও বিভিন্ন তত্ত্বাদির রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার রচনাবলী তুলনাহীন ছিল। গদ্য ও পদ্যের উস্তাদরা হয়ত একটি দুইটি বিষয়ে অতুলনীয় দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আমীর খসরু সর্ব বিষয়ে ব্যাপক ও বিশেষ দক্ষতা রাখিতেন। তাঁহার ন্যায় কাব্যের সর্ববিষয়ে এমন বিচক্ষণ ও দক্ষ পণ্ডিত অতীতে ছিলেন না; ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করেন কিনা কে জানে। বস্তুতঃ আমীর খসরু ফারসী ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনার দ্বারা এক কুতুবখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং বচনের সর্বপ্রকার অনির্বচনীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। খাজা সানাই সম্ভবতঃ আমীর খসরুর উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন,

আল্লাহ্‌র কসম, মনে হয় এই ধূসর আকাশের নীচে
তাঁহার ন্যায় কেহ ছিল, আছে, হয়তবা থাকিবে।

আমীর খসরু এই প্রকার জ্ঞান-গুণ, দক্ষতা ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সুফী সাধক হিসাবে অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় নামাজ, রোজা, কোরান পাঠ ও নফল এবাদতে কাটিয়াছে। নিষ্ঠা সহকারে এবাদত বন্দেগী করার ব্যাপারে তাঁহার তুলনা ছিলনা। সর্বদা রোজা রাখিতেন এবং শায়খের বিশেষ মুরিদদের অন্যতম

ছিলেন। এই প্রকার অনুগত ও ভক্ত মুরিদ আমি অন্য কাহাকেও দেখি নাই। প্রেম ও ভাবের জগতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং জিকির, জজবা ও দশার অধিকারী হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সর্বপ্রকার সংগীত রচনা ও গাওয়ায় তাঁহার বিচক্ষণতা আদর্শ স্থানীয় ছিল। যাহা কিছু সূক্ষ্ম, যাহা কিছু সুষম; আল্লাহ্তাআলা তজ্জন্য তাঁহার মধ্যে এক অদ্ভুত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এমন অতুলনীয় গুণের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী একান্তই বিরল।

আলাই শাসন আমলের বিরল কবিত্ব শক্তির অধিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি আমীর হাসান সঞ্জরী। গদ্যে-পদ্যে তাঁহার রচনা সম্ভার অত্যন্ত বেশী। তাঁহার বাক্‌বিন্যাস ও রচনাশৈলীর মধ্যে যাদু ছিল। তিনি বিভিন্নভাবের গজল অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে রচনা করিয়াছেন। তাঁহাকে হিন্দুস্তানের শেখ সাদী বলা হইত। তাঁহার চরিত্রগুণও অতিশয় অমায়িক ও মধুর ছিল। সর্বপ্রকার চরিত্রবান ব্যক্তির সহিত তুলনা করিয়া বলিতে পারি, হাস্য কৌতুক, মজলিসী মেজাজ, সুলতান ও বুজর্গদের কীর্তি কাহিনী বর্ণনা, দিল্লীর আলেম সমাজের গুণগান করা, সুফী সাধকের ধ্যান-জ্ঞান ও তরিকা গ্রহণ করা, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ও সংচিন্তা পোষণ করা, দুনিয়ার প্রাচুর্য ছাড়া খুশী থাকা ও খুশীতে জীবনযাপন করা এবং দুনিয়ার সর্বপ্রকার কলুষ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে তাঁহার ন্যায় অন্য কাহাকেও দেখি নাই। বহু বৎসর আমি উক্ত আমীর খসরু ও আমীর হাসানের বন্ধুত্বের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তাঁহারাও আমাকে ছাড়া জীবনযাপনে আনন্দ পান নাই এবং আমিও তাঁহাদের সাহচর্য ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করিতে পারি নাই। আমার সহিত এই প্রকার বন্ধুত্বের ফলে উভয় উস্তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং আমরা সকলে একে অন্যের গৃহে যাতায়াতের অভ্যাস গড়িয়া তুলিয়াছিলাম।

আমীর হাসান শায়খের প্রতি অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতেন। এই কারণেই শায়খের মজলিসে যে সকল বক্তব্য তিনি শুনিয়াছিলেন, অতিশয় বিশ্বস্ততার সহিত সেই সমস্ত বাণীর দ্বারা কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং উহার নাম রাখিয়াছিলেন 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ'। বর্তমান সময়ে এই গ্রন্থটি অধ্যাত্মপন্থীদের নীতিগ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হইতেছে। আমীর হাসানের নিজেরও কতিপয় দেওয়ান বিদ্যমান এবং গদ্যের বিভিন্ন পুস্তিকা ও মসনবী রহিয়াছে। তিনি এমন অমায়িক, রহস্যপ্রিয়, হাস্যমুখ, খোশ মেজাজ, বিনয়ী ও মার্জিত রুচির অধিকারী ছিলেন যে, তাঁহার সাহচর্যে আমরা যে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করিতাম, তাহা আর কাহারও সাহচর্যে পাই নাই।

আলাই আমলে সদর উদ্দিন আলী, ফখর উদ্দিন কয়াস, হামিদ উদ্দিন রাজা, মওলানা আরেফ, আবিদ হাকিম, শিহাব আনসারী ও সদর বস্তীও কবি হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন এবং দেওয়ানে আরম্ভ হইতে যথারীতি ভাতা পাইতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক বৈশিষ্ট্য ও ধারা ছিল এবং পৃথক দেওয়ানও ছিল। তাঁহাদের গদ্য-পদ্য রচনা তাঁহাদের দক্ষতার সাক্ষী হিসাবে বিদ্যমান।

আলাই আমলের ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন ছিলেন আমীর আরসালান কেলাহী। প্রাচীন সুলতানদের বহু তারিখ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহাকে যে কোন সুলতান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মুখস্থ বলিয়া দিতে পারিতেন ; কিতাবাদি দেখিবার প্রয়োজন হইত না। তিনি ইতি-হাসের ব্যাপারে অসামান্য দক্ষতা রাখিতেন এবং এই বিষয়ে শহরের উস্তাদ বলিয়া গণ্য ছিলেন। আলাই আমলের দ্বিতীয় বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ছিলেন তাজউদ্দিন ইরাকীর পুত্র কবির উদ্দিন। তিনি বিচিত্র বিষয়ে, বিশেষ করিয়া বাক্‌বিন্যাস, মুনশিয়ানা ও রচনায় শুধু আলাই আমলে নহে, তঁহার নিজের আমলেও বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার স্থানে তিনি আমীরদাদ লশকর হইয়াছিলেন। আলাই দরবারে তাঁহার খুবই সম্মান ছিল। তিনি আরবী ও ফারসী গদ্য রচনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং বিজয় কাহিনী লইয়া তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি গদ্য রচনায় এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের খ্যাতি ম্লান করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমুদয় আলাই আমলের খবরাদি বিজয় কাহিনীসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি এই সকল বর্ণনায় প্রশংসা ও বাক্যের আড়ম্বরকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের ধারা অনুসারে ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ সমুদয়ের কথা বলিবার ধারে কাছেও যান নাই। কারণ তাঁহার গ্রন্থটি সুলতান আলাউদ্দিনের জীবিতকালেই রচিত হইয়াছে এবং ইহার প্রতিটি অংশ সুলতানের সম্মুখে পেশ করিতে হইয়াছে। সম্ভবত: এই কারণেই তাঁহার পক্ষে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কিছু করা সম্ভব হয় নাই। এই কঠোর প্রকৃতির সুলতানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে তিনি সাহস করেন নাই।

যাহা হউক, দিল্লী শহরে আলাই আমলে, উহার পূর্বে ও পরে বহু গ্রন্থকার, সাহিত্যিক, কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আমি, তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক যেহেতু আমার এই গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করিতে মনস্থ করিয়াছি, সেইজন্যই সকলের কথা এই স্থলে লিখিতে পারিতেছি না। শুধু

প্রত্যেক দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা নেতৃস্থানীয়, বিচক্ষণ ও অতুলনীয় দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, তাঁহাদের কথাই এই ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছি। যদি সকলের কথা—সকল খ্যাতিমান গ্রন্থকার, লেখক, সাহিত্যিক ও কবিদের কথা আমি লিখিতে ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলেও তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যতার জন্য তাহা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। এইজন্য তাহা করি নাই।

আলাই আমলে এমন অনেক চিকিৎসকও ছিলেন, যাহাদের প্রত্যেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রে দক্ষতা এবং রোগাদির ঔষধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বুকরাত (হিপোক্রিটাস) ও জালিনুস (গ্যালেন) কে অত্যন্ত পারদর্শিতার সহিত আত্মস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় দক্ষ চিকিৎসক অন্য কোন আমলে দেখা যায় নাই। উস্তাদুল আতেব্বা মওলানা বদর উদ্দিন দামেশকী আলাই আমলের সর্বক্ষণ চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন এবং শহরের অন্য চিকিৎসকরা সর্বদা তাঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করিতেন। আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দান করিয়াছিলেন। তিনি কেবল-মাত্র রোগীর নাড়ী স্পর্শ করিয়াই সমুদয় অবস্থা বুঝিতে পারিতেন এবং রোগের উৎপত্তির কারণ, উহার যোগ্য ঔষধপত্র ও রোগী মরিবে কি বাঁচিবে ; তাহাও বলিয়া দিতে পারিতেন। যদি কতিপয় জন্তুর পেশাব কোন মানুষের পেশাবের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরীক্ষার শিশিতে ভরিয়া তাঁহার সম্মুখে আনা হইত, তাহা হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের বলে কেবল শিশির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াই হাসিয়া ফেলিতেন এবং বলিতেন, এই শিশিতে কিছু সংখ্যক জন্তুর পেশাবও রহিয়াছে। নাড়ীজ্ঞান ও মলমূত্রাদি পরীক্ষায় মওলানা হামিদ মুত-রিযের পরে মওলানা দামেশকীর ন্যায় বিজ্ঞ অন্য কেহ এই শহরে ছিলেন না। আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে বলিবারও অদ্ভুত ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। আবু আলী সিনার 'কানুন' ও 'কানুনচা' এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ তিনি শিষ্যদের সম্মুখে এমন প্রাঞ্জল, বিশদ ও অকাট্যভাবে বর্ণনা করিতেন যে, শিষ্যরা তাঁহার অদ্ভুত বর্ণনা ও সুন্দর বাক্‌ভঙ্গির সম্মুখে সেজদা করিতে বাধ্য হইত। চিকিৎসাশাস্ত্রে এইরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি অধ্যাত্ম-বিদ্যায় আদর্শ স্থানীয় ছিলেন এবং তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ও অলৌকিক শক্তিও ছিল।

আলাই আমলে দ্বিতীয় উস্তাদুল আতেব্বা হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন মওলানা হেশাম মারিকেলীর পুত্র মওলানা সদর উদ্দিন তবীব। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন দিকে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা পিতা-পুত্র উভয়েই চিকিৎসক হিসাবে অপূর্ব দক্ষতা রাখিতেন। উক্ত মওলানা সদরউদ্দিনও নাড়ী জ্ঞান ও পদচারণা জ্ঞানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি

রোগের ভালমন্দ বুঝিতে পারিতেন এবং সেই অনুপাতে ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের গুণেই তাঁহার ব্যবস্থাপত্র সত্বর ফলদায়ক হইত। আলাই শাসন আমলে আরও চিকিৎসক, যেমন ইয়ামেনী তবীব, এলম উদ্দিন, মওলানা আজাম উদ্দিন বাদাউনী ও তদীয় শিষ্য বদর উদ্দিন দামেশকী চিকিৎসা শাস্ত্রে দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। নাগুরী, ব্রাহ্মণ ও জায়তী চিকিৎসকরাও শহরে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। পদচারণা জ্ঞানে মাহচন্দর তবীব, রোগ বিশারদ জাজা জার্রাহ ও চক্ষু চিকিৎসক এলম উদ্দিনের ন্যায় অভিজ্ঞ চিকিৎসা শাস্ত্রী সমগ্র হিন্দুস্তানে নাই ও ছিল না। তাঁহারা সকলেই একবার দেখিয়াই রোগের পরিচয় জানিতে পারিতেন এবং যথাযোগ্য ঔষধাদি প্রয়োগে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইতেন।

আলাই শাসন আমলের জ্যোতিষীরাও নক্ষত্রের নিয়মাবলী নির্ধারণে ও ইহাদের গতি পর্যবেক্ষণে প্রভূত দক্ষতা রাখিতেন। বড় লোক, শরীফ, বুজর্গ ও বুজর্গজাদাদের দ্বারা দিল্লী শহর পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই সেখানে জ্যোতিষের ব্যাপক চর্চা ছিল। প্রতি মহল্লাতেই একজন না একজন জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁহারা বাদশাহ, মালীক, আমীর, শরীফ, খাজা ও খাজাজাদাদের নিকট হইতে অধিকমাত্রায় পুরস্কার ও দান লাভ করিতেন। সম্ভবত: চারি পাঁচশত তঙ্কায় গ্রহশান্তি ও দুই তিন শত মুদ্রায় জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া জ্যোতিষীরা মালীক, আমীর, উজির ও বড় লোকদের খেদমতে উপস্থিত করিতেন এবং তদুপরি পুরস্কার ও সম্মানীও লাভ করিতেন। ইহার ফলে জ্যোতিষীরা তৎকালে খুবই সুসজ্জিত অবস্থায় ছিলেন এবং বড় লোকদের মধ্যেও উত্তরাধিকারসূত্রে এমন এক প্রথার প্রচলন ছিল যে, তাহারা জ্যোতিষীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ আরম্ভ করিতেন না। বস্তুত: দিল্লীতে জ্যোতিষীদের অনুমতি ব্যতীত কোন পুণ্য কাজ, দান-ধ্যান ও শুভারম্ভও হইতে পারিত না। জ্যোতিষীরাও গৃহ পত্তন, যুদ্ধ জয়, শুভ কাজ ইত্যাদির ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ দক্ষতা রাখিতেন এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মওলানা শরফ উদ্দিন মুতরিয এই সকল জ্যোতিষীর উস্তাদ ছিলেন। তিনি এইজন্য সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট হইতে জায়গীর ও বেতনাদি ভোগ করিতেন। এই বিদ্যায় গৃহ পত্তনীদের সংখ্যাই ছিল বেশী; তাহারাও সুলতানের নিকট হইতে এবং হারেমের অন্যান্যদের নিকট হইতে বহু পুরস্কার লাভ করিত। ইহার ফলে জ্যোতিষীদের সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। শহরে মুসলমান হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের জ্যোতিষীরাই প্রচুর সংখ্যায় ছিল। কিন্তু বিখ্যাত ও বিচক্ষণ ব্যতীত ইতিহাসে অন্যদের কথা উল্লেখ করিবার কোন হেতু নাই।

আলাই আমলে তিন জন গণক ও বহু হস্তরেখা বিশারদও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। গণকদের মধ্যে একজন হইলেন মওলানা সদর উদ্দিন লোতী, অন্য জন গবলী রাস্মাল কোল এবং তৃতীয় জন মুইনুল মুলক জোবায়রী। তাহারা অন্তরের কথা ও অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান এবং হারান প্রাপ্তির ব্যাপারে অদ্ভুত দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিনের ভয়ে কাহারও এমন সাহস ছিলনা যে, এই গণনা ও কিমিয়া শাস্ত্রের ব্যাপারে প্রকাশ্যে দাবী উত্থাপন করে। কারণ সুলতান যদি জানিতে পারিতেন যে, অমুক ব্যক্তি কিমিয়া শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তবে তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য বন্দী করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল কিমিয়ার কল্যাণে সম্পদের প্রাচুর্য ঘটিবে এবং পরিণামে নানাপ্রকার বিপত্তি দেখা দিবে। কারণ অর্থই অনর্থের মূল।

আলাই শাসন আমলের প্রথম দশ বৎসরে মওলানা মাসউদ মুকরীর পুত্রদ্বয় মওলানা হামিদ উদ্দিন ও মওলানা লতিফ কোরান আবৃত্তিকারী হিসাবে অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন এবং শেষ দশ বৎসর মওলানা লতিফের দুই পুত্র আলতাফ ও মুহম্মদ এই বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। এই চারিজন কোরান আবৃত্তিকারীর স্বর এমন মনমুগ্ধকর ছিল যে, শ্রোতার হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। কোন হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষে তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্থির থাকিবার উপায় ছিল না। এই সকল আবৃত্তিকারী যে মজলিসে কণ্ঠ সাধনা করিতেন, উহার ঔজ্জ্বল্য পূর্বাপেক্ষা শত গুণ বৃদ্ধি পাইত। তাঁহাদের পরে তাহাদের ন্যায় সুস্বর, সুন্দর, মজলিসী, সুরসাধক ও হাস্য-কৌতুকী আর কোন কালে দেখা যায় নাই। আলাই আমলের গজল গায়করাও সেই কালের আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যতদূর মনে হয়, মাহমুদ ইবনে সিক্কা, ইসানিশী, মুহম্মদ মুকরী, ইসা খোদাদী প্রমুখের কণ্ঠে হজরত দাউদের সুস্বরের আদল ছিল এবং যাহারা তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছেন, তাহারা এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তাঁহাদের ন্যায় গজলগায়ক পূর্বেও ছিলনা ও তাহাদের পরেও আর সৃষ্টি হয় নাই।

আলাই আমলে লিপিকর, হস্তলিপি বিশারদ, হিসাবনবীশ অথবা শতরঞ্জ খেলোয়াড়; কাওয়াল, বাদক, চঙ্গবাদক, রবাবী, কামানচী, মুশকিলী ও নওবৎ বাদকদের মধ্যে এমন অনেক গুণী ছিলেন, যাহারা সর্বদা জন্ম গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক শিল্পকর্মেই এমন কিছু শিল্পী; যেমন ধনুক, তীর, টুপি, মোজা, তসবীহ, চাকু ইত্যাদি প্রস্তুতকারী অন্যান্য আমলের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। বস্তুতঃ তাহাদের ন্যায় দক্ষ শিল্পী ও কারিগর দিল্লী শহর ইতোপূর্বে আর দেখে নাই। তাহাদের এই প্রকার একত্র হওয়া এবং তাহাদের দক্ষতার প্রশংসা

করিতে হয় যে, তাহারাও ইতিহাসে উল্লেখের যোগ্য হইয়াছেন। বাস্তবিকই তাহাদের ন্যায় এমন গুণী পরবর্তীকালে আর কোথাও দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

বর্তমান গ্রন্থকার ও সমসাময়িক আরও অনেকেই সুলতান আলাউদ্দিনের ব্যাপারে আরও একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই প্রকার বহু পণ্ডিত ব্যক্তি, দক্ষ গুণী এবং প্রত্যেক বিষয়ে বিচক্ষণ জ্ঞানী আলাই আমলে একত্র হইয়াছিলেন ; তাঁহার রাজধানী দিল্লী এই প্রকার অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিদের দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল ; অথচ সুলতান তাঁহাদিগকে একত্র করিতে কোন উদ্যোগ আয়োজন করেন নাই কিংবা এই সকল অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় গুণীদের কাহারও যথাযথ মর্যাদা দেন নাই। অনেক সময় সুলতান গর্ব করিয়া তাঁহার দরবারে এই কথাও বলিয়াছেন, আমার রাজধানীতে এমন বহু অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের যে কেহ পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত হইলে, আল্লাহ জানেন, তৎকালের রাজা বাদশাহরা তাহাদের জন্য কি মর্যাদা ও পুরস্কার দিতেন। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন নিজে এই সকল জ্ঞানীগুণীর কোন মর্যাদা দেন নাই ও তাহাদের মূল্য বুঝেন নাই এবং আমরা ও আমাদের ন্যায় অন্যরাও তাহাদের জ্ঞান-গুণের মূল্য বুঝিতে পারি নাই—তাহাদের উপস্থিতিকে সৌভাগ্য বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। বরং আমরা মনে করিয়াছি যে, এই প্রকার বিচক্ষণ গুণীদিগকে সর্বদাই দেখিতে পাইব। বর্তমানে যখন এই দুনিয়াকে আকাট মূর্খ, অযোগ্য, অন্তঃসারশূন্য ও যথেচ্ছচারীদের কবলে দেখিতে পাইতেছি এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনও আর অবশিষ্ট নাই ও অন্য কেহ হয়ও নাই, তখন সেই প্রবাদের সত্য অনুসারে যে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না—তাঁহাদের মর্যাদা বুঝিতে পারিতেছি ও আক্ষেপে অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে যে, কেন সেই সময় তাঁহাদের পদধূলি দুইচক্ষের সুরমা করিয়া মাখিয়া লয় নাই।

উপরের এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সুলতান আলাউদ্দিনকে কোন হৃদয়ের মানুষ বলিব ; কি ধরনের উদাসীন ও নির্দয় প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই হাজার দুই হাজার ফরসঙ্গ দূর হইতে মুসাফির সাধকরা শায়খ নিজাম উদ্দিনের সাক্ষাতের আশায় আসিয়া পৌছিত এবং বড়-ছোট, যুবক-বৃদ্ধ, আলেম-মূর্খ, বুদ্ধিমান-নির্বোধ নির্বিশেষে দিল্লী শহরের সকলেই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা তদবির করিত ; অথচ স্বয়ং সুলতান আলাউদ্দিন কখনও মনে এই ইচ্ছা পোষণ করেন নাই যে, তিনি শায়খের দরবারে উপস্থিত হন কিংবা শায়খকেই তাঁহার দরবারে ডাকাইয়া আনেন ও সাক্ষাত করেন। ইহাতে কি এইরূপ সন্দেহই জাগে না

যে, আলেম সমাজের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু অন্য দেখিতে গেলে আমীর খসরুর ন্যায় মহান ব্যক্তির প্রতিও তিনি যথাযথ সম্মান দেখান নাই। যদি আমীর খসরুর ন্যায় গুণী সুলতান মাহমুদ ও সঞ্জরের সময় জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এই কথা জোর করিয়াই বলা যায় যে, তাঁহারা এই ধরনের গুণীকে যথাযোগ্য জায়গীর দান করিয়া নিজেদের দরবারে অতিশয় সম্মানের সহিত রাখিতেন। অথচ সুলতান আলাউদ্দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুণীর শিরোমণি বিরল প্রতিভার অধিকারী এই কবিকেও মাত্র এক হাজার তঙ্কা ভাতা দিতেন। কিন্তু তাঁহার দরবারে তাঁহাকে কোনপ্রকার সম্মান দান করেন নাই এবং তাঁহার মর্যাদার যথাযথ মূল্যও দেন নাই।

কি অদ্ভুত প্রকৃতির লোকই সুলতান আলাউদ্দিন ছিলেন এবং তাঁহার উদাসীনতা ও গাম্ভীর্যের বহরই বা কি পরিমাণ ছিল! আল্লাহ্তালা সুলতান আলাউদ্দিনকে কতগুলি অদ্ভুত ও আশ্চর্য চরিত্রগুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হইতে পারে ইহা তাঁহার জন্য আল্লাহ্র পরীক্ষা ছিল; হইতে পারে ইহা অন্যদের জন্য বিভ্রান্তিকর বিষয় ছিল, তাহা এই যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে এই প্রকার অতুলনীয় জ্ঞানীগুণী ও অদ্বিতীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বাদশাহ বানাইয়া দিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সকল উদ্দেশ্যকে প্রায় সাফল্যের তীরে পেঁাছাইয়া দিয়া তাঁহাকে এই উন্নত মর্যাদার সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন! ইহা কি তাঁহার অদ্ভুত ভাগ্য ছিল না যে, সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার নির্বোধ কানকাটা দাসেরা হাটে-বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইত ও দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া বিজয়ের নিশান উড়াইত।

আলাই সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা ও তাঁহার রাজকোষের বর্ণনা

একসময় দুনিয়ার বুক সুলতান আলাউদ্দিনের বোঝাকে দুর্বহ বলিয়া বোধ করিল, সৌভাগ্য তাঁহার সাহচর্যকে অসম্মানের বিষয় বলিয়া গণ্য করিল, সময় উহার কৃতঘ্নতাকে তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিল ও প্রতারক আকাশ তাঁহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্য মাতিয়া উঠিল এবং সুলতান আলাউদ্দিনের দিক হইতেও এমন কিছু কার্যক্রম দেখা দিল, যাহা ইহার সহিত মিলিয়া তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট ও তাঁহার পরিবারবর্গ ধ্বংস হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উল্লেখিত কার্যক্রমের প্রথমটি হইল; তিনি মনে মনে বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের খ্যাতিমান কর্মীদিগকে নিজের সম্মুখ হইতে দূর করিলেন এবং এই সকল বিচক্ষণ বুদ্ধিমানের স্থলে অলস নির্বোধ গোলামজাদা ও হারে-

মের বেআদব খোজাদিগকে স্থাপন করিলেন। তাঁহার মনে এই বিষয়টি মোটেও স্থান পাইল না যে, এই সকল খোজা ও গোলামজাদা কখনও রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা রাখে না। তিনি বিনা দ্বিধায় সমুদয় দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে দূর করিলেন, নিজের উপর সমস্ত দায়িত্বের বোঝা চাপাইলেন এবং যে উজিরের নির্ভর করা রাজ্যের কোন কাজেই আসে না, তিনি তাহারই উপর নির্ভর করিলেন। এই কারণে তাঁহার রাজ্যের গুরুত্ব কমিয়া গেল এবং নিয়ম-কানুনে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিল।

দ্বিতীয় কাজটি হইল সুলতান নিজের পুত্রদিগকে তাহাদের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখা দিবার পূর্বেই সংরক্ষিত অবস্থা হইতে বাহিরে লইয়া আসিলেন। খিজির খানকে বাদশাহীছত্র দান করিলেন এবং তাহার বাসস্থান ও দরবারী ব্যবস্থায় আতিশয্য প্রদর্শন করিলেন। সুলতান তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারীও নির্ধারণ করিলেন এবং একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া উহাতে সকল মালীকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ ও দক্ষ রাজকর্মীদিগকে এই ব্যাপারে কোন সংবাদ দিলেন না। খিজির খান বাহির হইতে আসিয়া আরাম-আয়েশ ও বিবেকশূন্য কার্যাদিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। কতিপয় কৌতুকপ্রিয় বিলাসী লোক তাহার সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। অন্যান্য পুত্ররাও খুবই উপাদেয় কার্যাদি করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা হারেমের মধ্যে আমোদ-ফূর্তি ও হৈহুল্লোড়ের বন্যা বহাইয়া দিল। ইহার ফলে আলাই রাজ্যে অঘটন ঘটিতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয়তঃ সুলতান যেহেতু মালীক নায়েবের খুবই অনুরক্ত ছিলেন, সেইজন্য তাহাকে রাজ্যের সেনাদলের সর্বাধিনায়ক করিলেন এবং উজিরের পদও তাহা-কেই দান করিলেন। রাজ্যের সকল সহায়ক আমীর-উমরাহের উপর তাহার সম্মান বর্ধিত করিলেন। ফলে এই অযোগ্য নির্বোধের মনেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ রোপিত হইল। তাহার সহিত খিজির খানের শাহজাদা পদের প্রতিদ্বন্দ্বী আলপ খানের মারাত্মক শত্রুতা দেখা দিল এবং আলাই রাজ্য উৎখাত হইবার সমুদয় কারণ তাহাদের এই প্রকার শত্রুতার মধ্যে একত্র হইতে লাগিল ও দিনদিন উহার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিল।

চতুর্থতঃ এইভাবে যখন রাজ্যের বিভিন্ন নিয়ম শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, সুলতান পুত্রবা নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে লিপ্ত হইয়াছিল ও হারেমের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বহিতেছিল এবং আলপ খান ও মালীক নায়েব পরস্পরকে উৎখাত করিবার চেষ্টায় নিরত ছিল, তখন সুলতান আলাউদ্দিন এক

দুরারোগ্য ব্যাধি—তৃষ্ণার আধিক্যে আক্রান্ত হইলেন। সুলতানের ব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অথচ তখনও তাঁহার পুত্ররা আমোদ-প্রমোদে আরও বেশী করিয়া লিপ্ত হইতেছিল এবং হারেমেও আনন্দের জোয়ার সমান তেজে বহিতেছিল। একদিকে রোগের যাতনা, অন্যদিকে স্ত্রীপুত্রদের এইরূপ উদাসীনতা দেখিয়া এবং নিজের জীবনের প্রতি নিরাশ হইয়া সুলতানের কঠোর মেজাজ ও কর্কশ ব্যবহার আরও বহুগুণ বাড়িয়া গেল। তিনি দেব-গিরি হইতে মালীক নায়েবকে এবং গুজরাট হইতে আলপ খানকে ডাকিয়া রাজধানীতে আনিলেন। রাজধানীতে পৌছিয়াই অকৃতজ্ঞ, সংকীর্ণমনা মালীক নায়েব দেখিল যে, খিজির খান ও হারেমের অন্যান্যদের প্রতি সুলতানের মেজাজ বিগড়াইয়া আছে; সুতরাং সে এই সুযোগ হাতছাড়া হইতে দিল না। গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া কোনপ্রকার দোষ-ত্রুটি ছাড়াই সুলতানের দ্বারা আলপ খানকে হত্যা করাইল এবং খিজির খানকে বন্দী করাইয়া গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া দিল। খিজির খানের মাতাকেও হারেম হইতে বাহির করিয়া দিল। ফলে আলপ খানের হত্যা ও খিজির খানের নির্বাসন সমাপ্ত হইবার দিনেই আলাই পরিবারের উৎখাত সম্পূর্ণ হইল।

ঐ দিকে গুজরাটে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিল এবং তাহা ক্রমশঃ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল। মালীক কামাল উদ্দিন গুর্গ, যিনি এই বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হইলেন। আলাই রাজ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। যখন এই বিক্ষোভ বিদ্রোহ সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছিল, তখনই সুলতান আলাউদ্দিন এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন ত্যাগ করিয়া আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে গমন করিলেন। অনেকে বলেন, রোগের যাতনায় বিকারগ্রস্ত ও অগ্রপশ্চাত বিচ্ছিন্ন সুলতান আলাউদ্দিনের কাজ মালীক নায়েবই শেষ করিয়া দিয়াছিল। ইতোপূর্বেই রাজ্যের সমুদয় কাজকর্ম অযোগ্য ও নির্বোধ কতিপয় চাকর-নফরের হাতে পড়িয়াছিল। বুরজচ মেহেরের ন্যায় এমন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি সেখানে ছিল না। সুতরাং এই সকল কানকাটা, নালায়েকরা যাহা পারিল তাহাই করিল; শাওয়াল মাসের ছয় তারিখের শেষ রাত্রিতে তাহারা সুলতানের লাশ শাহীমহল হইতে বাহিরে আনিল এবং জুম্মা মসজিদের সম্মুখে তাঁহার জন্য নির্ধারিত কবরে তাঁহাকে দাফন করিল। কবি বলেন,

সোয়ারী যখন আসিয়াছে, চলিয়া যাইতেই হইবে;
জমশেদ, পারভেজ আর খসরু—তুমি যেই হওনা কেন!

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি বহু বৎসর একটি রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিল এবং একমাত্র তাহারই রাজ্য, অন্য কাহারও নহে—এই দাবী করিয়া পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া-

ছিল, তাহার এই প্রকার মৃত্যু ও চারি হাত জমিতে স্থানলাভ প্রসঙ্গে কায়খসরু তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ সভাসদকে এই বিষয়ে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে বর্ণনা করিতেছি।

কায়খসরু সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। একসময়ে তিনি তাঁহার রাজ্যপাট ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া অগ্নি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। যেহেতু তিনি অগ্নিউপাসক ছিলেন, সেইজন্য ঐ স্থানে নির্জনে এবাদতবন্দেগী করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক অতিশয় অন্তরঙ্গ পারিষদ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, বাদশাহ নামদার। সমুদয় পৃথিবী আপনার বাদশাহীর অধীনে আসিয়াছে, সুতরাং এই প্রকার জাঁকজমক ও নেতৃত্ব ত্যাগ করা, স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নির্জনবাস অবলম্বন করা এবং সপ্তাঞ্চলের এই দৃঢ় শাসনকে বর্জন করার যথার্থ কারণ কি, যে কোন ব্যক্তির তাহা জানিবার ইচ্ছা হওয়া একান্ত স্বাভাবিক; আপনী কি কারণে এই বিশাল রাজ্য ও সম্পদ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন?

কায়খসরু ইহার উত্তরে তাঁহার অন্তরঙ্গ পারিষদকে বলিলেন, হে আমার অনুগত সন্তান। আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং এই কতঘ্ন সময় ও অকৃতজ্ঞ আকাশের বহু অবিমৃষ্যকারিতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। তুমি এখনও যুবক, সেইজন্য বোধ হয় জানিতে, শুনিতে ও দেখিতে পাও নাই যে, এই দুনিয়া বাদশাহদের সহিত কি ব্যবহার করিয়াছে। কিভাবে তাহাদের অন্তরে নেশা জাগাইয়াছে, কিভাবে তাহাদের জন্য বন্ধু সঙ্গী ও চাকর-নফর জুটাইয়াছে এবং পরিণামে তাহারাই কি বিচিত্রভাবে শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। বন্ধুরাই ঐ সকল বাদশাহের রক্তে ভুমি রঞ্জিত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে শত অপমানের সহিত এই মাটির নীচে প্রোথিত করিয়াছে। কবি বলেন,

হে খসরু, তোমার কোমল হৃদয়ের রক্তই সেই মদ্য, যাহা পরিবেশিত হয়;
পারভেজের দেহের মৃত্তিকা দিয়াই উহার পানপাত্র শিল্পীরা প্রস্তুত করে।
বহু মহা পরাক্রমশালীকে এই আকাশ অবলীলায় গ্রাস করিয়াছে;
তবুও উহার বুভুক্ষু চক্ষু আজিও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই।
বাদশাহদের হৃদয়ের রক্তেই মদ্যের রং এমন লাল হইয়া উঠিয়াছে;
উহাই বীরবরদের চুলের বাহার, উহাই সুন্দরীদের যৌবনের চাকচিক্য।

কায়খসরু দুনিয়ার অকৃতজ্ঞতা ও শত্রুতা সম্পর্কে তাঁহার অন্তরঙ্গ পারিষদকে আরও বলিলেন, হে আমার সন্তান। তোমার দৃষ্টি কিছুদিন বা কিছুক্ষণের ভোগ সম্ভোগের উপরই পড়িয়াছে; এইজন্যই তুমি আমাকে বলিতেছ, এই দুর্ভাগ্যের

আকর দুনিয়াকে যেন আমি ত্যাগ না করি এবং নির্জনবাস অবলম্বন করা হইতে বিরত থাকি। কিন্তু আমি ইহার পরিণামের দিকে দৃষ্টি দিয়াছি; আমি জানি এই মূল্যহীনা কপটচারিণী দুনিয়া অচিরেই আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে এবং অন্যের পার্শ্বে বসিয়া আসর জমাইবে। বস্তুত সে কিউমরচ পর্যন্ত আমার বহু পূর্বপুরুষকে এইভাবে ত্যাগ করিয়াছে। প্রথমে সে তাঁহাদিগকে সঙ্গ দিয়াছে, উৎসাহিত করিয়াছে ও তাঁহাদের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া দাসদাসীর ন্যায় আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছে এবং পরিণামে এমনভাবে মুখ ফিরাইয়াছে, এমন শত্রুতা লইয়া সম্মুখে আসিয়াছে ও এমন সব কাণ্ড করিয়াছে, যাহা কোন চরম শত্রুতেও করিতে পারে না। আমাকেও সে উৎসাহিত করিয়াছে; সুতরাং আমার সম্মুখেও দুর্যোগ আসিবে এবং আমাকেও সে ছাড়িয়া যাইবে। যেহেতু আমি আজ এই দ্বিচারিণী দুনিয়ার সমুদয় ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, সেইজন্যই আমি উহাকে ত্যাগ করিতেছি এবং নির্জনবাস অবলম্বন করিয়া ঘরের কোণে বসিতেছি। হে আমার রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী সন্তান! আমার আর কতদিনইবা বাকী আছে; তুমি আমাকে আর এই দুনিয়ার ঝামেলায় ফিরিয়া যাইতে বলিও না। এই দ্বিচারিণী, প্রতারিকা ও অকৃতজ্ঞা দুনিয়াকে এখনই ত্যাগ করা ভাল; নতুবা সে আমাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিবে এবং আমার কথা ভুলিয়া গিয়া আমার শত্রুর আনন্দে অংশ গ্রহণ করিবে। হে আমার সন্তান! তুমি আমি সকলেই এই কথা ভাল করিয়াই জানি যে, বাঘ মানুষকে আহার করে এবং সেও জানে যে, সে যদি দুনিয়ার লোভ ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুও অনিবার্য। তুমিও এই কথা জান যে, আমি যদি উহাকে ত্যাগ না করি, তাহা হইলে সেই আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। প্রথম দিকে আমাকে উৎসাহিত করিবে, পরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে; ফলে আমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না এবং মৃত্যুর সময় এই আক্ষেপ লইয়া মরিতে হইবে ও মৃত্যুর পরও উহার জের মিটিবে না। সুতরাং এখন এই সুস্থ অবস্থায় স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে যদি উহাকে ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে মৃত্যুর সময় আর কোন আক্ষেপ থাকিবে না এবং মৃত্যুর পরেও তজ্জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না। আমার এইভাবে দুনিয়া ত্যাগ করা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে; যে কেহ আমার এই কথা পাঠ করিবে, আমার বুদ্ধিমত্তা ও পরিণামদর্শিতার জন্য প্রশংসা করিবে এবং আমার সুখ্যাতি কিয়ামত অবধি বাকী থাকিবে।

কায়খসরু তাঁহার অন্তরঙ্গ পারিষদকে উপরোক্ত উত্তর প্রদান করিলেন এবং তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজন ও সভাসদগণকে ডাকাইয়া আনিয়া হাসিমুখে তাঁহা-

দের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তিনি যথারীতি অগ্নি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই পরম শক্তিমান রাজ্যাধিপতির উপাসনায় নিজকে নিয়োজিত করিলেন এবং ইহার পর তিনি এই নির্জনবাস হইতে বাহিরে আসেন নাই, কাহারও সহিত কথা বলেন নাই ও কাহারও সহিত মিশেন নাই।

প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তি, যিনি এই কাহিনী পাঠ করিবেন, তিনিই এই কথা স্বীকার করিবেন যে, যথার্থ ত্যাগ বলিতে ইহাকেই বুঝায় এবং তাঁহার এই প্রকার ত্যাগের প্রশংসা করিয়া এই কথাও বলিবেন যে, কায়খসরুর হাতে যে বিরাট সাম্রাজ্যের ক্ষমতা আসিয়াছিল, তাহা আর কাহারও হাতে আসিবে না এবং তিনি যেভাবে উহা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাহাও আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবে না।

সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর অকৃতজ্ঞ মালীক নায়েবের কার্যাবলী এবং সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র মালীক শিহাব উদ্দিনের আলাই সিংহাসনে আরোহণের বিবরণ

সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর দিনই মালীক নায়েব সকল গণ্যমান্য মালীক আমীরকে একত্র করিয়া সেই চুক্তিনামা বাহির করিয়া দেখাইলেন, যাহাতে সুলতান খিজির খানকে পদচ্যুত করিয়া মালীক শিহাব উদ্দিনকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে পাঁচ ছয় বৎসর বয়সী উক্ত শিহাব উদ্দিনকে বাজীকরের পুতুলের ন্যায় সিংহাসনে বসাইলেন। মালীক নায়েব নিজে রাজ্য চালনার কোনপ্রকার অভিজ্ঞতা এবং সভাসদ ও পাত্র-মিত্রদের তুল্য কোনরূপ যোগ্যতা ছাড়াই তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইল। এই হতভাগা নির্বোধ কোনপ্রকার বিবেচনা ছাড়াই সকল মালীক, আমীর এবং সুলতান আলাউদ্দিনের ভ্রাতাদিগকে নিজের অনুগত, বাধ্য ও কল্যাণকামী বলিয়া ভাবিতে লাগিল। বস্তুতঃ মালীক নায়েবের বুদ্ধি-বিবেচনা বলিতে কিছু ছিল না। তাহার ভিতর বাহির উভয়েই ছিল একান্ত অপরিপক্ক এবং তাহার লালসা ও মনোভাবও ছিল একান্ত স্থূল। কোন সুলতানের মৃত্যুর পর কি ঘটনা ঘটিতে পারে, কি ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে, উহার কোন ধারণাই তাহার ছিল না। যে ইতিহাস হইতে সুলতানদের এতদ্‌সম্পর্কীয় কীর্তি কাহিনী শুনিতে পায় নাই এবং তাহার এমন কোন সুপরামর্শদাতা বন্ধুও ছিল না, যে রাজ্য পরিচালনার জন্য তাহাকে হিতোপদেশ দিতে পারে ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে সতর্ক করিতে

পারে। সুতরাং সে হঠাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া একান্তই অবিবেচক হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার আচার-আচরণের পরিণাম সম্পর্কে তাহার নিজের কিংবা তাহার পার্শ্বে সমবেত সংকীর্ণচেতাদের কাহারও দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল না।

ক্ষমতালাভের প্রথম দিনেই মালীক নায়েব আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া পড়িল এবং বহু সহস্র আলাই আমীর মালীক, যাহারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বিষয়ে কোন চিন্তাই করিল না। সে শাহী মহলকে নানাবিধ কদর্য আচরণ এবং তাহার অন্তরের কুভাব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। ক্ষমতালাভের পর মুহূর্তেই সে নিমকহারাম মালীক সম্বলকে খিজির খানকে অন্ধ করিবার জন্য গোয়ালিয়রে পাঠাইল এবং তাহার প্রকাশ্য নিমকহারামী সত্ত্বেও তাহাকে দরবারে স্থান দিয়া বারবেক পদে নিযুক্ত করিল। প্রথম দিনেই সে খিজির খানের সমবয়স্ক ভাই শাদী খানকে শাহী মহলে রাখিয়াই অন্ধ করিতে মনস্থ করিল এবং নিজের খাস নাপিতকে আদেশ দিল, যাহাতে সে উক্ত শাদী খানের চক্ষু দুইটি খরবুজার টুকরার ন্যায় চক্ষুর কোঠর হইতে বাহির করিয়া আনে। প্রথম দিনেই সে সম্পূর্ণ নির্মমতা ও উদাসীনতার সহিত তাহার অভিভাবকের খাজানাখানায় গিয়া প্রবেশ করিল এবং শাহী বেগম খিজির খানের মাতাকে অত্যন্ত অসম্মানের সহিত সাধারণ পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত করিল। খাজানাখানায় সোনা-রূপা, মণি-মাণিক্য যাহা কিছু ছিল; সমুদয় হস্তগত করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভীড় করিয়া আসা খিজির খানের অনুগত লোকজনকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিল। মুবারক খান অর্থাৎ সুলতান কুতুব উদ্দিনকেও যিনি খিজির খানের প্রায় সম বয়সী ছিলেন, শাহী মহলেই নজরবন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দিল। তাঁহাকেও অন্ধ করিয়া দিবার পরিকল্পনা তাহার ছিল। বস্তুত: এই আদ্যন্ত বিবেচনাহীন নির্বোধকে কেহ এই কথা বুঝাইয়া বলিবার ছিল না যে, সুলতানের বিবি বাচ্চাদিগকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করিতে থাকিলে, অবশিষ্ট সকলেই তাহার প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং অন্য কেহও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।

যাহা হউক এই নির্বোধ অযোগ্য মালীক নায়েব তড়িঘড়ি সকল দেওয়ানকে তাহার সম্মুখে পেশ করিতে আদেশ দিল এবং যে সকল আদেশ নিষেধ সুলতান আলাউদ্দিন বহু বৎসর ধরিয়া রক্তপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই যথাযথ থাকিতে নির্দেশ প্রদান করিল। নতুন সুলতানের জন্য যেসকল প্রথা পালন করিতে হয়; যেমন বন্দীদের মুক্তিদান, দু:খ কষ্ট লাঘব এবং শাহীমহল ও সভাসদদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে দান-ধ্যানে আপ্যায়ন—এই নির্বোধ উহার কিছুই করিল না। সময়ের প্রয়োজনে

ও পরিস্থিতির চাহিদায় সুলতানের পরিবর্তনের পর যে, পূর্ববর্তী আদেশ নিষেধ বহাল থাকা উচিত ও শোভন নহে, তাহার মগজে উহার বিন্দু বিসর্গও ঢুকিল না এবং বুঝিতেও পারিল না যে, পরিবর্তনের মাধ্যমে এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন জগৎ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করা দরকার। সুতরাং এই বেচারা সেই প্রথম দিনেই দেওয়ানে রেসালত, দেওয়ানে উজারত, দেওয়ানে আরজ ও দেওয়ানে ইন-শাকে নির্দেশ দিল যে, তাহারা যেন সুলতান আলাউদ্দিনের নিয়ম-কানুন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত বলিয়া মনে করে। ইহার ফলে সকল দেওয়ান সুলতান আলা-উদ্দিনের নিয়ম অনুসারে সর্বপ্রকার সাধারণ ও বিশেষ বিষয়ের বিবরণ পেশ করিতে লাগিল এবং এই নির্বোধও সেই অনুসারে নির্দেশ দিয়া কর্তব্য সম্পন্ন করিল। সে নিজেও সেই পূর্ববর্তী নিয়ম মানিয়া সকল বিষয় অনু-সন্ধান করিতে লাগিল এবং ইহাতে রাজ্যের সমুদয় কাজকর্মে তাহার ভিতরের ভীরুতাই শুধু প্রকাশ পাইল। এই সংকীর্ণমনা নির্বোধের অন্তরে ইহা মোটেও প্রবেশ করিল না যে, সাধারণ মানুষের উপর হুকুম জারী করা একান্তই বিস্ময়কর এক ব্যাপার। যদি কাহারও সহায়ক জনশক্তির প্রাচুর্য এবং সম্পদ ও জাঁক-জমকের প্রতুলতা না থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উহার আশা দুরাশা মাত্র। এই দুনিয়ায় শক্তি ও সাহস ছাড়া কেহ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই এবং তাহা পারাও সম্ভব নহে।

যাহা হউক, যে কয়দিন এ দুর্ভাগা নির্বোধ জীবিত ছিল, প্রতিদিন সামান্য সময়ের জন্য পুতুল সুলতান মালীক শিহাব উদ্দিনের হাজার সতুন শাহী মহলের সিংহাসনের উপর বসাইয়া সকল মালীক, আমীর ও সভাসদকে ভূমি চুম্বন করিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে এবং কিছুক্ষণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে নির্দেশ দিত। ইহার পর দরবার শেষ করিয়া এই শিশুকে তাঁহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দিত। এই শিশু সুলতান মালীক নায়েবের কন্যার দিক হইতে তাহার পৌত্র ছিলেন। ইহার পর মালীক নায়েব নিজে হাজার সতুন শাহী মহলে আসিয়া বসিত। সেখানে তাহার জন্য আমোদ-স্ফূর্তির ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই নির্ধারিত থাকিত। ইহার মধ্যেই সে বিভিন্ন দেওয়ানকে ডাকাইত এবং আলাই নিয়ম অনু-সারে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করিত। দেওয়ানের কার্যাদি শেষ হইলে সে কতিপয় অযোগ্য সংকীর্ণমনা লোকের সহিত খেলাধুলায় মত্ত হইত এবং লোকজন চলিয়া গেলে নিজের পুরাতন চাকর-নফরের মধ্য হইতে অনুগত দুই চারি জনের সহিত আলাই পরিবারের উৎখাতের ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। সে যে কয়দিন জীবিত ছিল, তাহার সর্বদা এই চিন্তাই ঘুরিয়া বেড়াইত যে, কি করিয়া আলাই আমলের মালীক, আমীর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যাহারা

প্রকৃতপক্ষে আলাই রাজত্বের যথার্থ উত্তরাধিকারী তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা যায় এবং এই সকল নিমকহারাম যথার্থ গুণী ব্যক্তির স্থলে নিজ অনুগত চাকর-নফরদিগকে স্থান দেওয়া যায়। কারণ এই সকল দুর্ভাগা নিমকহারাম চাকরের মধ্যে অনেকেই তাহাকে এই পরামর্শই দিত যে, রাজ্যক্ষমতা যেন সে নিজেই কুক্ষিগত করিয়া লয়। আর নির্বোধ নিজেও এই কথা বুঝিত না যে, এই প্রকার বোকামি ও নিমকহারামী একান্তই দোষাবহ এবং এই কথাও জানিত না যে, রাজ্য চালনার জন্য এমন গুণাবলীর প্রয়োজন, যাহা সর্ব বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীন, বীরত্বব্যঞ্জক, দানশীল ও শক্তিমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু সে হঠাৎ হাতে ক্ষমতা পাইয়া দিন কয়েক একান্ত অচেতন ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল ; ফলে তাহার সম্মুখে দিন রাত্রির কোন পার্থক্য ছিল না এবং মৃত্যুও তাহার দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিতেছিল। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা দিনের পর দিন দুর্ভাগা শির তীক্ষ্ণ বল্লমের আগায় বিদ্ধ দেখিতে পাইতেছিলেন এবং তাহার ও তাহার বিচ্ছিন্ন সঙ্গীদের রক্তে ভূমিতল সিক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের চাকর-নফরদের হাতে নিমকহারাম মালীক নায়েবের নিহত হইবার বিবরণ

যে কয়দিন মালীক নায়েব আলাই পরিবারের উৎখাত সাধনে চেষ্টা করিতে সময় পাইয়াছিল, তন্মধ্যে তাহার এই ধারণাও ছিল যে, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের গণ্যমান্য আলাই মালীক আমীররা ক্রমশঃ রাজধানীতে আসিয়া একত্র হইলে তাহাদিগকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়া হত্যা করিবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তালা হাজার সতুন শাহী মহলের কতিপয় পদাতিক রক্ষী, যাহারা পূর্ব হইতেই মহলের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিলেন যে, এই মালীক নায়েব নিমকহারামকে হত্যা করিতে হইবে। এই রক্ষীদের শতকী ও পঞ্চাশী আমীরেরা প্রতি রাত্রেই দেখিতে পাইতেন যে, হাজার সতুনের শাহী দরবার শেষ হইয়া লোকজন চলিয়া গেলে এবং মহলের দরজা বন্ধ হইলেও মালীক নায়েব সারা রাত্রি জাগিয়া কতিপয় সঙ্গী-সাথীর সহিত আলাই পরিবারের ধ্বংস কামনায় ষড়যন্ত্র করিত। সুতরাং এই সকল পদাতিক রক্ষী এই বিষয়ে একমত হইল যে, তাহারা নিমকহারামকে হত্যা করিবে এবং এই ভাবে তাহারা তাহাদের নিমকহালালীর পরিচয় তুলিয়া ধরিবে। এই পরামর্শ অনুসারে কোন এক রাত্রিতে লোকজনের চলিয়া যাওয়া ও হাজার সতুনের দরজাগুলি বন্ধ হওয়া মাত্রই এই রক্ষীরা খোলা তরবারি লইয়া মালীক নায়েবের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং এই

নিমকহারামের দুষ্কৃতিপূর্ণ মস্তককে তাহার অপবিত্র দেহ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিল। যে সকল পরামর্শদাতা তাহার ষড়যন্ত্রের সঙ্গী হইয়া তাহার চিন্তায় নিত্য নতুন ইন্ধন যোগাইত, তাহাদের কেহই রেহাই পাইল না।

এইভাবে সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ দিন পরে নিমকহারাম মালীক নায়েবের উৎখাত সম্পূর্ণ হইল এবং তাহার হত্যার মাধ্যমে খিজির খান ও শাদী খানের চক্ষুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে মালীক, আমীর ও অন্যান্য সভাসদ সকলে শাহী মহলে আসিয়া এই নিমকহারামের লাশ দেখিতে পাইলেন এবং ভীরু কাপুরুষের এই রক্তাক্ত পরিণতি দেখিয়া আল্লাহ-তালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা নতুন জীবন লাভের আনন্দে একে অপরকে মোবারকবাদ জানাইলেন।

যে সকল পদাতিক রক্ষী মালীক নায়েবকে হত্যা করিয়াছিল, তাহারাই শাহী মহলে নজরবন্দী সুলতান কুতুব উদ্দিনকে বাহির করিয়া আনিল। তিনি তখন মোবারক খান নামে পরিচিত ছিলেন। মালীক নায়েবই তাঁহাকে নিজ কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাঁহাকেও ধ্বংস করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। যাহা হউক, তাহারা মোবারক খানকে মালীক নায়েবের স্থলে সুলতান শিহাব উদ্দিনের অভিভাবক নিযুক্ত করিল। মালীক নায়েবের হত্যাকারী পদাতিক রক্ষীরা এই কায সম্পন্ন করিবার ফলে তাহাদের মগজে এই ধারণাই জন্মাইল যে, তাহারা অতিশয় ক্ষমতাবান; তাহারা ইচ্ছা করিলে একজনকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া অন্যজনকে তথায় বসাইতে পারে।

সুলতান কুতুব উদ্দিন সুলতান শিহাব উদ্দিনের প্রতিনিধি হিসাবে কয়েক মাস পর্যন্ত রাজ্য চালনার বিভিন্ন দিক গুছাইয়া আনিলেন। তখন তাঁহার বয়স সতের আঠার বৎসর হইয়াছিল। তিনি মালীক ও আমীরদিগকে নিজের বন্ধু করিয়া তুলিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় ইহার পর নিজেই সিংহাসনে বসিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই মাস যাইবার পর সুলতান শিহাব উদ্দিন অর্থাৎ সুলতান আলাউদ্দিনের যে শিশু পুত্রের তিনি অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল।

এইভাবে সুলতান কুতুব উদ্দিন সিংহাসনে বসিবার পর যে সকল পদাতিক রক্ষী মালীক নায়েবকে হত্যা করিয়াছিল এবং সুলতান কুতুব উদ্দিনকে বাহিরে আনিয়াছিল, তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল যে, তাহারাই মালীক নায়েবকে হত্যা করিয়া মোবারক খানকে সুলতান বানাইয়াছে। সুতরাং তাহারা অত্যন্ত অশোভন

ভাবে মালীক ও আমীরদের পরে বসিবার আসন দাবী করিল। তাহারা তাহাদের এই পদমর্যাদা অনুসারে প্রথম শ্রেণীর পোশাকাদি, কোমরে বাঁধা তরবারি ইত্যাদি চাহিয়া বসিল। মালীক আমীররাও যাহাতে তাহাদের প্রতি সম্মান দেখান, এই ইচ্ছা তাহারা মনে মনে পোষণ করিতে লাগিল এবং অনুরূপ দাবী দাওয়া লইয়া তাহারা শাহী মহলে হৈহুল্লোড়ের সৃষ্টি করিয়া দিল। সুলতান কুতুব উদ্দিন এই অবস্থা দমনে প্রয়োজন বোধ করিয়া সকল পদাতিক রক্ষীকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা এইভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে নীত হইল এবং একের পর এক নিহত হইল। এইভাবে তাহাদের সৃষ্ট হৈহুল্লোড়ের অবসান ঘটিল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই সকল পদাতিকের নিহত হওয়া দেখিয়া কবির সেই কথাই মনে মনে আওড়াইতেন—

হে হত্যাকারী! তুমি কাহাকে হত্যা করিয়াছ? বরং বলিব নিজেকেই;
কারণ তুমি সেই স্থলেই নিহত হইবে, যেখানে তাহাকে হত্যা করিয়াছ!

যে সময়ে সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্ররা নিহত হইতেছিলেন, অনেককে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছিল, একের পর এক দুর্ভাগ্য আসিয়া সমস্ত পরিবারটিকে গ্রাস করিতেছিল এবং আলাই রাজ্যের সকল কিছু শিথিল হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখন কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি দিব্যশক্তির অধিকারী শায়খ বশীর দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শায়খ! এ কেমন হইতেছে; আলাই পরিবার এমনভাবে একে অন্যকে ধ্বংস করিতেছে ও নষ্ট হইয়া যাইতেছে? শায়খ তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন, সুলতান আলাউদ্দিন মূলতঃ ভিত্তিহীন ছিলেন। মানুষ যে কিছু কাল তাঁহার ইচ্ছামত সমস্ত কাজ কর্ম হইতে দেখিয়াছে, উহা তাঁহার ব্যাপারে একটি পরীক্ষা ছিল মাত্র এবং অন্যদের ব্যাপারে ছিল একটি বিভ্রান্তিকর বিষয়। সুলতান আলাউদ্দিন নিজের প্রতিপালক, চাচা ও শ্বশুরকে হত্যা করিয়া এই রাজ্য ও সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কোন রাজ্য বা সিংহাসন ঠিক এইভাবে জবর দখল করিয়া লয়, পরিণামে তাহার রাজ্য ও সিংহাসন একই ধারায় অপরের দ্বারা অধিকৃত হয়। যে যেমনভাবে অন্যের পরিবার পরিজনকে হত্যা করে, তেমনিভাবে নিজের পরিবার পরিজনও অন্যের হাতে নিহত হয়। অন্যের প্রতি কৃত ব্যবহারের তুল্য ব্যবহার সে লাভ করিয়া মানুষের সম্মুখে এই কথাই প্রমাণ করিয়া যায় যে, 'যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল তার পায়'। যে অন্যকে উৎখাত করে, সে নিজেও অন্যের দ্বারা উৎখাত হয়। বর্তমানে আলাউদ্দিনের ঘরে দ্বারে দুনিয়াবাসী তাহাই দেখিতে পাইতেছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, পরকালে সুলতান আলাউদ্দিনের উপর আর কি দুর্যোগ আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি কতজনকে বিনা কারণে হত্যা

করিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহাকেও না জানি উহার পরিবর্তে কতবার হত্যা করা হইবে এবং কত প্রকারের শাস্তিই না তাহার উপর আপতিত হইবে।

বস্তুতঃ রাজ্য একমাত্র আল্লাহ্‌তালার এবং উহার পরিচালনা একমাত্র তাঁহারই যোগ্য কাজ। কারণ তাঁহার কোন শরীক নাই ; তাঁহার কোন দোসর নাই। অন্যান্যদের রাজত্ব কয়েক দিনের লীলাখেলা অস্থির অস্থায়ী ব্যাপার মাত্র। কবি বলেন,

দোসরহীন আল্লাহ্‌তালার জন্যই রাজ্য ও শক্তির একমাত্র অধিকার ;
অন্যদের জন্য, তুমি যেমন দেখিতে পাও, উহা ধার করিয়া লওয়া মাত্র।
সমস্ত পৃথিবী জয়ের রহস্য কুঞ্জী তাঁহার খাজানা খানাতেই সুরক্ষিত ;
নিজের বাহুবলে কাহারও পক্ষে উহার দ্বার উন্মুক্ত করা সম্ভব নহে।

সুলতান শহীদ কুতুব উদ্-দুনিয়া ওদ্-দিন মোবারক শাহ

সদরে জাহান—কাজী জিয়াউদ্দিন. তাঁহাকে কাজী খানও বলা হইত, জাফর খান মালীক দিনার; শের খান মালীক মুহম্মদ মওলা; খসরু খান কাফের নিয়ামত; উমদাতুল মুলক মালীক বাহাউদ্দিন দবীর; মালীক আইনুল মুলক মুলতানী—উজির দেবগিরি; মালীক তাজুল মুলক ওহিদ উদ্দিন কোরায়শী; গাজী মালীক শাহনকে বারগাহ; মালীক ফজলুল্লাহ মুলতানী—নায়েব উজির; মালীক ফখর উদ্দিন আখোরবেক জুনা—বারিদ মুলক; মালীক শাহীন ওফা মুলক; মালীক মুগিস উদ্দিন কাফরী—নায়েব উজির; মালীক তাজউদ্দিন হাজেব কায়সরে খাস; মালীক বাহরাম আবা—নায়েব উকিলেদর মালীক গাজীর পুত্র; নাসিরুল মুলক খাজা হাজী; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন তালিয়া—আমীর কুহ; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন ইয়াল আফগান; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন তমর মুলক নগীন; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন মুফতী আউধ; মালীক নাসির উদ্দিন; মালীক কীরবেক—চৌদ্দটি কাজের অধিকারী; মালীক হিসাম উদ্দিন বেদার—নায়েব ঝাবন; মালীক নাসির উদ্দিন কখোঈ; মালীক তাজউদ্দিন জাফর; মালীক ফখর উদ্দিন আবু রেজা; মালীক কীর বেকের মধ্যম পুত্র মালীক হুসাইন; মালীক মুখলেস—সের আবদার। কীরবেকের জ্যেষ্ঠপুত্র মালীক হাসান; মালীক কাফুর মোহরদার; কীরবেকের পুত্র মালীক বদর উদ্দিন আবু বকর; মালীক সম্বল—আমীর শিকার; মালীক মসীহ সেরজানদার; মালীক শামস উদ্দিন মীরক; মালীক তাজউদ্দিন আহমদ; মালীক তাজউদ্দিন তুর্ক—নায়েব গুজরাট; মালীক নিজামউদ্দিন হাঁসিওয়াল; মালীক মুহম্মদ শাহলোর; মালীক হিসাম উদ্দিন গোরী; মালীক নাসির উদ্দিন খাজা—আমীর কুহ; মালীক শরফ উদ্দিন মাসউদ, মালীক মুহম্মদ পীর সেলাহদার; মালীক কামাল উদ্দিন গুর্গের পুত্র মালীক তুসমক; মালীক কাফুর-হারেম সরাই; মালীক সম্বল খাজা সরাই; মালীক নিজাম উদ্দিন সিকরী হাঁসুবী—বর্তমানে সিকরী মসজিদ হাঁসীতে বিদ্যমান এবং উহাকে সকলেই সিকরী মসজিদ বলিয়া ডাকে। সেখানে পাঁচ অক্তই যথা নিয়মে নামাজ আদায় করা হয় এবং উক্ত মালীকের পুত্র পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়; এই ফেরাস্তাতুলা মালীকের আমলনামায় উহার সমুদয় পুণ্য লিপিবদ্ধ হইতেছে। আল্লাহ্ তাঁহাকে শান্তি দিউন!

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওসসালাতু
ওস্সালামু আলা রসুলিহি মুহম্মদিও ও আলা
আলিহি আজমাইন।

সমগ্র মুসলমান সমাজের দোয়াপ্রার্থী আমি জিয়া বারাণী বলিতেছি যে, ৭১৭ হিজরীর* কোন একমাসে সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্র সুলতান কুতুব উদ্দিন আলাই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি মালীক দিনার আলাই শাহনা পীলকে জাফর খান উপাধি দিলেন এবং নিজ নানা মওলানাকে শের

---

* শুদ্ধ ৭১৬ হিজরী; কারণ আমীর খসরু তাঁহার 'নসপহর' নামীয় মসনবীতে বলিয়াছেন, 'সাত শত হইবার পর ষোল বৎসরে—সুলতান তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।'

খান উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তাঁহার লিপিশিক্ষার উস্তাদ মওলানা বাহা উদ্দিন খাত্তাতের পুত্র মওলানা জিয়া উদ্দিনকে সদরে জাহানের পদে অভিষিক্ত করিয়া সোনা-রূপা মণ্ডিত বল্লম দান করিলেন এবং কাজী খান উপাধি দিলেন। মালীক কীর বেককে উন্নীত করিয়া তাঁহার দায়িত্বে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য অর্পণ করিলেন। নিজের গোলামজাদাদিগকে গুরুত্বপূর্ণ পদ ও বৃহৎ জায়গীর প্রদান করিলেন। হাসান নামে এক গোলামজাদা ছিল, যে আলাই নায়েব খাস হাজেব মালীক শাদীর অধীনে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সুলতান তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রথম বৎসরেই তাহাকে উন্নীত করিয়া বিশেষ দায়িত্বাদি অর্পণ করিলেন ও খসরু খান উপাধি দিলেন। যৌবনের উন্মত্ততা ও উদাসীনতার ফলে নিহত মালীক নায়েবের সমুদয় চাকর-নফর ও জমি-জমা এই গোলামজাদাকে দান করিলেন। আরও অধিক খাম খেয়ালী ও অসর্কতার পরিচয় দিয়া উজারতে দায়িত্বও তাহার উপরে ন্যাস্ত করিলেন। যৌবনের মত্ততা ও কদাচারের ব্যাপকতা তাঁহার উপর এমনভাবে চাপিয়া বসিয়াছিল যে, এই গোলামজাদার সাহচর্য ব্যতীত সুলতান এক মুহূর্তও কাটাইতে পারিতেন না।

তথাপি সুলতান কুতুব উদ্দিন আলাই সিংহাসনে স্থায়ী মর্যাদায় বসিবার ফলে সুলতান আলাউদ্দিনের রোগাক্রান্ত হইবার সময় হইতে নিমকহারাম মালীক নায়েব নিহত হইবার সময় পর্যন্ত আলাই রাজ্যে যে সকল বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাহা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং মানুষের মন হইতে প্রাণের ভয় দূর হইয়া শান্তি দেখা দিল। আলাই মালীক আমীররাও জানের ভয় মানের ভয় হইতে মুক্তি পাইলেন। সুলতান কুতুব উদ্দিন তাঁহার নিজের বৈশিষ্ট্যের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর মুহূর্তেই আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইলেও ব্যবহারের দিক হইতে তিনি অমায়িক ও কোমল প্রকৃতির ছিলেন। ফলে মানুষ হত্যাকাণ্ড ও নানাবিধ দুর্ভোগ হইতে মুক্তি পাইয়া এবং সম্পূর্ণ নিরাশার পর তাঁহার শাসনকে অদৃশ্য শক্তির কৃপা মনে করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সুলতান কুতুব উদ্দিনও সিংহাসনে বসিবার দিনই আলাই আমলের বন্দী ও নির্বাসিত ব্যক্তি, যাহাদের সংখ্যা প্রায় সতের আঠার হাজার হইবে, শহর ও অন্যান্য স্থান হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দানের ফরমান জারী করিলেন। কাসেদরা এই ফরমান লইয়া রাজধানী ও অন্যান্য স্থানে পৌঁছিল এবং একান্ত নিরাশা ও হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা মুক্তি পাইয়া নতুন জীবন লাভ করিল। সুলতান সিংহাসনে বসিবার কৃতজ্ঞতায় রাজ্যের সকল কর্মচারী ও চাকর-নফরদিগকে ছয় মাসের মাহিনা পুরস্কার হিসাবে দান করিলেন। মালীক ও আমীরদের বেতন বৃদ্ধি করিলেন

এবং তাহাদের পুরস্কার ও দানের মাত্রাও বাড়াইয়া দিলেন। বহুদিন ধরিয়া রাজকোষের থলি ও তোড়াগুলিতে বহু তঙ্কা ও চীতল পড়িয়াছিল এবং অভাবী সাধারণ মানুষ উহার ভাগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। সুলতান এই অভাবীদের আবেদনপত্র শাহী দরবারে হাজির করিতে বলিলেন এবং তাহাদের উপস্থিতিতে যথাসম্ভব অধিক হারে তাহাদের অভাব পূরণের চেষ্টা করিলেন।

সুলতান কুতুব উদ্দিন তাঁহার চারি বৎসর চারি মাসব্যাপী বাদশাহীর কালে আলেম উলামাদের অজিফার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন, চাকর-নকরদের বেতনাদি বৃদ্ধি পাইল এবং এমন বহু জমি জমা, যাহা আলাই আমলে খাস জমিরূপে শাহী তদারকে আনা হইয়াছিল, তাহাও মানুষের মধ্যে ফেরৎ দেওয়া হইল। এইভাবে আলাই রাজত্বে যে সকল গ্রাম ও জমির নিষ্কর অবস্থা রহিত করিয়া খেরাজের অধীন করা হইয়াছিল, উহার অধিকাংশই সুলতান যথানিয়মে লোকজনের হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন। বহু নতুন অজিফা, রুজি ও অন্যাবিধ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিলেন। সুলতান কুতুব উদ্দিন তাঁহার সহজাত সৎগুণের জন্যই প্রজাদের উপর হইতে ভারী খাজনা ও অন্যাবিধ করের বোঝা হ্রাস করিয়া দিলেন। দেওয়ানে উজারত হইতে জরিমানা, জবরদস্তি, লাথি-গুঁতা, কয়েদ ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেন। এইভাবে তাঁহার ভোগ-সম্ভোগ, দানধ্যান ও উদারতার ফলে আলাই আমলের সকল কঠোর নিয়ম পরিবর্তিত হইল। এই পরিবর্তনের ফলে যে সকল সুযোগের সৃষ্টি হইল, তাহা রাজ্যের অধিবাসীদিগের উপকারে আসিল। সুলতান আলাউদ্দিনের বদমেজাজী, কঠোর শাসন ও নানাবিধ অন্যায্য হুকুম হইতে সকলে মুক্তি পাইল। ধন-সম্পদ, সোনারূপা ও বিলাসের সামগ্রী প্রকাশ্যে ঘরদ্বার ও অলিগলিতে দেখা যাইতে লাগিল। ইহা কর, উহা করিও না; ইহা বল, উহা বলিও না; ইহা পর, উহা পরিও না; ইহা খাও, উহা খাইও না; এইভাবে বিক্রয় কর, ঐভাবে বিক্রয় করিও না; এইরূপে থাক, ঐরূপে থাকিও না ইত্যাদি নিয়ম-অনিয়মের ভীতি ও কঠোরতার চাপ হইতে মানুষের মন মুক্তি লাভ করিল। নানাবিধ ভোগের সামগ্রী, মদ জুয়া ও গোলামবাঁদীর কথা আবার মানুষের মনে পড়িতে লাগিল।

যেমনটি সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর সুলতান মুয়েজ উদ্দিনের সিংহাসনে বসিবার ফলে ঘটিয়াছিল, ঠিক তেমনই ঘটিল। সুলতান বলবন ছিলেন অতিশয় নিয়মনিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী। ইহার ফলে তাঁহার রাজত্বকালে সর্বসাধারণ নির্বিশেষে কাহারও পক্ষে তাঁহার আদেশ অমান্য করার সাহস ছিল না। কিন্তু বিলাসপ্রিয় সুলতান মুয়েজ উদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ

করিয়াই আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-সম্ভোগে মত্ত হইয়া পড়িলেন। ফলে সুলতান বলবনের সময়কার সকল নিয়ম-কানুন শিথিল হইয়া গেল। বাদশাহ ও সাধারণ প্রজা সকলকেই ভোগ সম্ভোগে আত্মনিয়োগ করিল। সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর অনুরূপভাবে সুলতান কুতুব উদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিবার ফলে তাঁহার পিতার নিয়ম-কানুন; বিশেষ করিয়া খেরাজ ও বাজারদরের সকল ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সুলতান আলাউদ্দিনের সময় মানুষ সর্বক্ষণ নিজের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিত এবং সুলতানী চর ও তদারককারী-দের ভয়ে জোরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলিত না। কোনপ্রকার কুকাজ করিতে সর্বদা দ্বিধা করিত। কারণ কোনরূপ কুকাজের খবর বাদশাহের দরবারে পৌঁছিলে উহার শাস্তি রহিত করিবার জন্য কোন সুপারিশ বা নিবেদন কার্যকরী হইত না। শাহী খাজানাখানা ছাড়া অন্যত্র সম্পদ ছিল না বলিলেই হয়। মানুষ নিজেদের জীবিকা অর্জনে এমনই ব্যস্ত ছিল যে, বিদ্রোহের নাম ও উহার চিন্তা তাহাদের মনে উদয় হইত না এবং এই সম্পর্কে কোন কথা তাহারা মুখেও আনিত না। দেওয়ানে উজারত ও দেওয়ানে আরজের নিয়ম-কানুন হইতে এক চুল এইদিক ঐদিক করিবার সাহস কাহারও ছিল না। কিন্তু সুলতান কুতুব উদ্দিন সিংহাসনে বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল নিয়ম-কানুন বিদূরিত হইল, রাজ্যের কাজকর্ম আরামপ্রিয় বিলাসীদের হাতে পড়িল। দিন রাত্রির ব্যস্ততায় এক নতুন রং দেখা দিল। শাহী ভীতি ও শাস্তির কথা লোকের মন হইতে দূর হইয়া গেল। অধিকাংশ লোক তওবার কথা ভুলিয়া পুণ্য ও পবিত্রতাকে বিদায় দিল। সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর জনসমাজে নফল ও অন্যান্য এবাদতের প্রতি যে আকর্ষণ দেখা গিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। ফরজ ওয়াজেবের ব্যাপারেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিল। মসজিদগুলি মুসল্লীহীন হইয়া পড়িল। যেহেতু বাদশাহ প্রকাশ্যে রাত্রিদিন কুকাজ ও আমোদ-স্ফূর্তিতে মত্ত হইয়া রহিলেন, সেইজন্য রায়তদের মনেও এই সকল কাজের প্রতি অতি মাত্রায় আসক্তি দেখা দিল। সুন্দরীদের আগমন ঘটিল। বালকদের প্রাদুর্ভাব হইল। খুবসুরত গায়ক ও বাদক বালকরা শহরের অলিগলিতে ভীড় জমাইয়া তুলিল। বালক ও সুন্দর খোজা এবং সুন্দরী দাসীদের মূল্য পাঁচ শত, হাজার ও দুই হাজার তঙ্কায় গিয়া পৌঁছিল।

যদিও সুলতান কুতুব উদ্দিন সুলতান আলাউদ্দিনের সমস্ত নিয়মের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার নিয়মটি পূর্ববৎ বহাল রাখিয়াছিলেন, তথাপি শাহী ভয় ভীতি ও শাস্তির অভাবে প্রতি ঘরে শরাবের কারখানা আবির্ভূত হইল এবং শত সহস্র কৌশল ও গোপন উপায়ে গ্রামাঞ্চল হইতে শরাবের চালান শহরে আসিতে

লাগিল। আসবাবপত্র ও খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইল। আলাই বাজারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। পোশাক পরিচ্ছদের মূল্য বিক্রেতাদের ইচ্ছা অনুসারে নির্দিষ্ট হইল এবং আদেল সরাইর সমুদয় ব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। মুলতানীরা আবার তাহাদের ব্যবসা আরম্ভ করিল। প্রতিঘরে ঢোল নাকারা বাজিতে লাগিল। বাজারী লোকেরা সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মালপত্র বিক্রয় করিতে এবং নানাবিধ অপকৌশলে লোকজনকে ঠকাইতে লাগিল। তাহারা সুলতান আলাউদ্দিনের বদনাম ও সুলতান কুতুব উদ্দিনের সুনাম করিতে আরম্ভ করিল; চাকর-নফরদের বেতন চারি পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইল; দশ বার তঙ্কা হইতে সত্তর আশি, এমন কি একশত তঙ্কায় গিয়া পৌঁছিল। ঘুষ, রেশোয়াত ও তহবিল তসরূপের সমুদয় পথ উন্মুক্ত হইল। সুতরাং মুতসরিক ও আমলাদের নতুন জীবন দেখা দিল। খেরাজের হার কমিয়া যাওয়ার ফলে হিন্দুরা প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মুখ দেখিল; তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। যাহারা ক্ষুধার জ্বালায় গমের খোসা কুড়াইত, রুটির তালাশে দেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, সাজ পোশাক ছিল একান্তই নিম্ন শ্রেণীর এবং লাথি গুঁতার ফলে কোন কিছুর চিন্তা করিবার সময়ও পাইত না, সেইসকল লোক ভাল জামা-কাপড় পরিতে, ভাল ঘোড়ায় চড়িতে এবং তীর তলোয়ার হাতে লইয়া ঘোরাফেরা করিতে লাগিল।

সমুদয় কুতুবী রাজত্বকাল ব্যাপিয়া আলাই নিয়মকানুনের একটিও প্রতিপালিত হয় নাই। সকল কিছুতে শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। ইহা যেন এক অন্য জগৎ। এই জগতে চরদের কোন কাজ ছিল না। বাজার তদারককারীরা বেকার বসিয়াছিল। দেওয়ানে রিয়াসতের কোন মর্যাদা বা শাসন ছিল না। মানুষ নিঃস্ব অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে সমৃদ্ধি ও সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বর্তমান ইতিহাসের লেখক আমি কুতুবী আমলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছি যে, সুলতান বলবন অভিজ্ঞ, ধর্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ ও নিয়মনিষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন। তিনি শাসনত্রাসন ও কঠোর শাস্তির যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা একমাত্র অন্যায়কারী ও অবিচারীদের জন্য ছিল। অনুগত ও বাধ্য ব্যক্তিদের জন্য তিনি ছিলেন পিতৃমাতৃ তুল্য দয়ালু। তাঁহার ঐসকল কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইহার ফলে যে ভীতি লোকের মনে স্থান পাইবে, তাহা সুষ্ঠভাবে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। যাহাতে সৎলোক শান্তিতে থাকিতে পারে এবং তাহাদের উপর কোনপ্রকার অন্যায় অবিচার না হয়। মানুষের সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তি সমৃদ্ধিতে তাঁহার কোন লোভ

ছিল না। স্বেচ্ছায় তিনি কোন বেশর‍া নির্দেশ দেন নাই। আমৃত্যু কয়েদ ও নির্বাসন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তদুপরি তিনি এবাদত ও জিকির-আজকারে এমন পাকাপোক্ত ছিলেন যে, তৎকালের কোন শায়খ বা আলেমও তাঁহার সমকক্ষতা দাবী করিতে পারেন নাই।

এই তুলনায় সুলতান আলাউদ্দিন মানুষের সহিত অতিশয় অদ্ভুত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারনা জন্মিয়াছিল যে সম্পদই সকল অনর্থের মূল। এই জন্য জোর জবরদস্তি, জরিমানা ও অন্য যে কোন কৌশলেই হউক না কেন মানুষের নিকট হইতে সম্পদ ছিনাইয়া আনিয়া তাহার খাজানাখানায় জমা করিয়াছিলেন। কয়েদী ও নির্বাসিতদের মুক্তি দেওয়ার কোন চিন্তা তাহার অন্তরে স্থান পাইত না। তিনি হিন্দুদেরকে ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং বহু রাজার রাজ্য সবলে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। অন্যায় ও কুকাজকে তিনি মানুষের নিকট বিষতুল্য তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং দ্রব্য-মূল্য সুলভ করিবার জন্য বাজারী ও সওদাগরদের রক্ত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি মোগলদিগকে সমূলে উৎপাটিত করেন এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনামাত্র চিন্তা করিয়া রক্তের নদী বহাইতে থাকেন। কাহারও কোন সম্পদ, সম্পত্তি ও মূল্যবান সামগ্রী তিনি হস্তগত করিতে দ্বিধা করেন নাই। এবাদত বন্দেগীর কোন খেয়াল তাঁহার ছিল না এবং ফরজ ওয়াজেবের কোন তোয়াক্কা তিনি করিতেন না। তিনি যে সকল কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহার দ্বারা রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা স্থাপনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এইজন্য জনসাধারণকে সৎ-পথে পরিচালিত করিতে তাহার এই শাসন শৃঙ্খলা খুবই কার্যকরী হইয়াছিল।

বহু বিষয়ে তিনি নিজের খেয়াল খুশিমত শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে পুরুষটিকে খাসী ও মেয়ে লোকটিকে হত্যা করাইতেন। মদখোর ও মদবিক্রেতাদিগকে জীবিত কূয়ায় ফেলিয়া দেওয়া হইত। শাস্তিরযোগ্য কাহারও প্রতি করুণা করার কথা তিনি চিন্তাও করিতেন না। ফলে কোন কয়েদী বা নির্বাসিতকে তিনি মুক্তি দেন নাই। দেওয়ানে আরজে সৈন্যরা তিন বৎসরের ঘোড়ার হিসাব যথাযথ দাখিল করিতে না পারিলে তাহাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সম্মুখে কেহ কাহারও জন্য কোন আবেদন বা সুপারিশ করিতে পারিত না। সুলতান আলাউদ্দিনের এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থার ফলেই তাহার রাজত্বকালে মানুষ কি ধর্মীয় কাজ কর্মে কি সংসারিক ব্যাপারে ঠিক পথে চলিতে শিখিয়াছিল। তাহার বদমেজাজ ও কঠোরতার জন্যই মুসলমানরা ধার্মিক ও হিন্দুরা বাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল; সর্বতো-ভাবে সকল বিষয়ে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়াছিল।

ইহার পর সুলতান কুতুব উদ্দিনের নম্রতা ও ধ্যানের আধিক্যের ফলে কঠোর আলাই নিয়ম-কানুনের একটিও অবশিষ্ট রহিল না এবং মুসলমানদের মধ্যে অন্যায় কুকাজ ও হিন্দুদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ভোগ-সম্ভোগে সুলতানের অতিমাত্রায় ব্যাপৃত হওয়ার ফলে আমোদ-আহ্লাদের এক নতুন জগতের সৃষ্টি হইল। ঘরে-দ্বারে অলিতে-গলিতে শরাব ও জুয়ার আড্ডা জমিয়া উঠিল। সর্বত্রই আমোদ-স্ফূর্তির হাওয়া বহিতে লাগিল। ইহার ধাক্কায় আলাই হুকুম ভাসিয়া গেল। গুণের জায়গায় দোষ আসিয়া আসর জমাইল। মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে সকলে শাহী নিয়ম অমান্য করিতে লাগিল। চারি বৎসর চারিমাস কালীন রাজত্বকালে শরাব পান করা, গান শোনা, আমোদ-স্ফূর্তি করা, পুরস্কার দেওয়া, কুপ্রবৃত্তির আশা পূর্ণকরা ইত্যাদি ছাড়া সুলতান কুতুব উদ্দিনের অন্য কোন কাজ ছিল না। যদি এই সময়ে মোগলরা দিল্লী আক্রমণ করিত কিংবা অন্য কেহ রাজ্য দখল করিতে উদ্যত হইত; যদি রাজ্যের মধ্যে বৃহৎ কোন বিদ্রোহ বা গোলমাল দেখা দিত, তাহা হইলে সুলতানের এই প্রকার উদাসীনতা, ভোগ-সম্ভোগের আধিক্য ও অপ্রস্তুতির ফলে দিল্লীর অবস্থা যে বিরূপ ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইত, তাহা সহজেই অনুমান করা। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই, মোগলদের আক্রমণ হয় নাই, কোন দুরারোগ্য ব্যাধি বা মহামারী দেখা দেয় নাই, কোন বিদ্রোহ জাগে নাই, কাহারও মুখে সেইরূপ কোন আশংকার কথা শোনা যায় নাই এবং দুঃখ-কষ্টের কথাও কেহ বলে নাই। তথাপি সুলতানের অধিকমাত্রায় ভোগ-সম্ভোগই তাহার কাল হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উদাসীনতাই তাঁহার ধ্বংস ডাকিয়া আনিল।

যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি সুলতান বলবনের কুশাসন ও সুলতান মুয়েজ উদ্দিনের শৈথিল্য এবং সুলতান আলাউদ্দিনের কঠোরতা ও সুলতান কুতুব উদ্দিনের আরামপ্রিয়তা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদশাহ যদি অভিজ্ঞ, ন্যায়নিষ্ঠ, সুশাসক ও কঠোর হন, তাহা হইলে তাহার শাসনে মানুষ সংসার ও ধর্মের ব্যাপারে সৎ হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। যদিও ইহাতে তাহাদের কিছুটা দুঃখ-কষ্ট পোহাইতে হয়, অনেক সময় অশান্তিও দেখা দেয়; তথাপি এইরূপ হওয়ার পরিণামে লাভ হয়। কারণ ইহার বিপরীত যদি বাদশাহ আরামপ্রিয়, কুপ্রবৃত্তির দাস ও মানুষের অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন হন, তাহা হইলে ইহাতে আপাতদৃষ্টিতে মানুষের আরাম-আয়েশ ও কুপ্রবৃত্তি সেবা করিবার সুযোগ মিলিতে পারে; কিন্তু পরিণামে বাদশাহ বা প্রজা কাহারও কোন কল্যাণ হয় না। বরং দিনের পর দিন সর্ববিষয়ে মানুষের মধ্যে অবনতি দেখা দেয়।

তখতে বসিবার প্রথম বৎসরে সুলতান কুতুব উদ্দিন গুজরাটে আলপ খানের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বহু সৈন্য পাঠাইলেন। আলপ খানের এই বিদ্রোহ বহু পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার হাতে মালীক কামাল উদ্দিন গুর্গ নিহত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে গুজরাট দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিল। সুলতান আইনুল মুলক মুলতানীকে সেনাপতি নির্বাচিত করিলেন। আইনুল মুলকের অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। তিনি সিরি শহরের নির্মাণ কার্যে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ সকলেই গ্রহণ করিতে আসিত। তিনি সৈন্যদল সহ গুজরাটে গেলেন। এই সৈন্যদলে বহু গণ্যমান্য আমীর ছিল। গুজরাটের বিদ্রোহীরা তাঁহাদের হাতে পরাজিত হইল এবং তাহাদের সকল ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। আইনুল মুলকের পরামর্শ ও পরিচালনায় নহরওয়ালা ও গুজরাটের অন্যান্য সমুদয় অঞ্চল পুনরায় দিল্লীর অধীনে আসিল। সেখানে দিল্লীর শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিদ্রোহীদের কোন চিহ্ন রহিল না। তাহারা উক্ত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া দূরে হিন্দুদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সুলতান কুতুব উদ্দিন মালীক দিনারের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহাকে তিনি পূর্বেই জাফর খান উপাধি দিয়াছিলেন। এইবার তাঁহাকে গুজরাটের ওয়ালী নিযুক্ত করিলেন। জাফর খান আলাই গোলামদের মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নানাবিধ গুণের জন্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি গণ্যমান্য বহু আমীর ও লোকজন সহ গুজরাটে গমন করিলেন এবং তিন চারি মাসের মধ্যে সে স্থানে এমন সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, বিদ্রোহী আলপ খানের শাসন ও তাহার নাম লোকেরা ভুলিয়া গেল। সেই অঞ্চলের সকল রায় ও রাজা তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আনুগত্য স্বীকার করিল। ইহার ফলে বহু ধন সম্পদ আসিয়া একত্র হইল এবং সুনির্বাচিত লোকজন দিয়া একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গড়িয়া উঠিল।

যদিও সুলতান কুতুব উদ্দিন আলাই নিয়ম-কানুনের একটিও অবশিষ্ট রাখেন নাই, তথাপি প্রথম বৎসরেই তাঁহার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ কেতাদার, জায়গীরদার ও বিভিন্ন রাজ্যের ওয়ালী হিসাবে আলাই মালীক আমীররাই নিযুক্ত ছিলেন। ইহার জন্যই অন্য কোন দিকে বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই এবং কোনপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হয় নাই। সর্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই তাঁহার রাজত্ব স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

৭১৮ হিজরীতে সুলতান কুতুব উদ্দিন দেবগিরির দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। মালীক নায়েবের মৃত্যুর পর দেবগিরি দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার

করিয়াছিল। হরপালদেব ও রামদেব উহার শাসনভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করেন। সুলতান দেবগিরি যাইবার কালে কোন গণ্যমান্য আমীর মালীককে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান নাই। তিনি যৌবনের উন্মাদনা ও অবিবেচনার জন্যই এক গোলামজাদাকে তাঁহার নায়েবী অর্পণ করিয়া যান। আলাই রাজত্বকালে তাহাকে 'বারিনদা' বলিয়া ডাকা হইত। তাহার নাম ছিল শাহীন। সুলতান তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়া 'ওফাউল মুলক' খেতাব দিয়াছিলেন; দিল্লীর তখত ও খাজানাখানার দায়িত্বে প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকেই রাখিয়া গেলেন। এই প্রকার নায়েব নিয়োগের ফলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে, উহার বিন্দুমাত্র আশংকাও তাঁহার মনে উদয় হইল না। তিনি দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া যথারীতি দেবগিরি পৌঁছিলেন। যে সকল হিন্দু সৈন্য ও জনসাধারণ হরপাল দেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া দেবগিরির স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাদের কেহই সুলতানী সৈন্যদলের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। সকল মুকদিম বিচ্ছিন্ন হইয়া পলাইল। সুলতানকে আর যুদ্ধ করিতে হইল না। তিনি বিনা বাধায় দেবগিরি শহরে পদার্পণ করিলেন। বিদ্রোহীদের সরদার হরপাল দেবকে ধরিয়া আনিবার জন্য কতিপয় আমীরকে নির্দেশ দিলেন এবং হরপাল দেব ধৃত হইয়া সুলতানের সম্মুখে আনীত হইলে সুলতান তাহার চামড়া তুলিয়া দেবগিরির সদর দরজায় টানাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। ফলে দেবগিরিতে কিছুকাল অবস্থান করিতে হইল। সুলতান সৈন্যদল সহ সেখানে থাকার ফলে সমগ্র মারাঠা অঞ্চল পুনরায় দিল্লীর শাসনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিল। সুলতান কুতুব উদ্দিন দেবগিরির উজারত মালীক একলাখীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ইনি আলাই শাসন আমলে বহু বৎসর 'নায়েব বারিদে মুমালেক' এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মারাঠার সমুদয় অঞ্চলে সুলতান কেতাদার, মুতসরিফ ও আমলা নিযুক্ত করিলেন।

শরৎকাল আসিলে সুলতান দিল্লী যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি খসরু খানকে ছত্রদান এবং মালীক নায়েব অপেক্ষাও অধিকতর মর্যাদা ও নৈকট্য দান করিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন মালীক নায়েবের প্রতি আসক্ত ও তাহার অনুগত ছিলেন; সুলতান কুতুব উদ্দিন খসরু খানের প্রতি তদপেক্ষা অধিক আসক্ত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। শাহী মহলের এই গোলামজাদা অকৃতজ্ঞ হারামখোরকে বহু মালীক আমীর ও সৈন্য সহ মালাবার আক্রমণের জন্য পাঠাইলেন। সুলতান আলাউদ্দিন যেমন অবিবেচক অপরিণামদর্শী মালীক নায়েবকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া বিরাট সৈন্যদলের অধিনায়ক করিয়া বহু দূর-

দূরান্তে পাঠাইতেন এবং যেভাবে তাহাকে সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব দান করিতেন; সুলতান কুতুব উদ্দিনও তেমনিভাবে অবিবেচক খসরু খানকে সর্বময় কর্তৃত্বদান করিয়া মালাবারে পাঠাইলেন। শাহী মহলের গোলামজাদা এই খসরু খান একান্তই প্রতারক, হীনমনা ও কমজাত ছিল। কুকর্ম ও পাপানুষ্ঠানের আধিক্যের ফলেই সে সুলতান কুতুব উদ্দিনের দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। যথার্থই তাহার অন্তঃকরণ সকল কুমন্ত্রণার কেন্দ্র ও শয়তানের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সুলতান কুতুব উদ্দিন কখনও চিন্তা করিয়া দেখিলেন না যে, সুলতান আলাউদ্দিনের মালীক নায়েবের প্রতি আসক্ত হওয়া, তাহাকে মর্যাদা ও উজারত দেওয়া, সৈন্যদের অধিনায়ক নিযুক্ত করা, দূরদূরান্তে রাজ্য জয় করিতে প্রেরণ করা, সর্বময় কর্তৃত্ব ও সুলতানী প্রতিনিধিত্ব দান করা প্রভৃতি কাজ পরিণামে স্বয়ং সুলতান ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য কি কুফল ডাকিয়া আনিয়াছিল। এই প্রকার একজন প্রতারক, অকৃতজ্ঞ, ধোকাবাজ লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করার ফলে পরিণামে তাহার মধ্য হইতে কি ভয়ানক অকৃতজ্ঞতাই না প্রকাশ পাইয়াছিল। এইরূপ একটি পরিণাম দর্শন সত্বেও তিনি এই গোলামজাদা খসরু খানকে মর্যাদা, খেতাব ও উজারত দান করিয়া এক বিরাট সৈন্যদল সহ যেভাবে দূরের রাজ্য জয় করিতে পাঠাইলেন এবং বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে সর্বময় কর্তৃত্ব তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন, তাহাতে কিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে পারে এবং কি ভয়ানক অকৃতজ্ঞতাই না প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

যাহা হউক সুলতান কুতুব উদ্দিন কোন বিবেচনা ছাড়াই এই প্রকার এক প্রতারককে বিরাট সৈন্যদল সহ মালাবারে পাঠাইলেন। কিন্তু হীনচেতার হৃদয় ছিল কুযুক্তিতে পূর্ণ, সেইজন্য সে সুলতানকে বিদায় দিতে গিয়া প্রকাশ্যে চুমা খাওয়ার সময়ও বারংবার তাঁহাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়াছে। গোপনে এই জারজ সন্তান নীচমনা সুলতান হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিত এবং প্রকাশ্যে একটি বেশ্যার মত ছল-কলা দেখাইত। এইভাবে সে সুলতানের সকল রাগ-বিরাগকে পানি করিয়া ফেলিত। আবার পরোক্ষে সে নিজেই সুলতানের কুৎসা রটাইত। এইজন্য এই অকৃতজ্ঞ অধর্ব খসরু খান মালাবারের পথে সুলতানের চোখের আড়াল হওয়ার পর প্রতিরাত্রে খাস দরবার ডাকিয়া হিন্দু ও মালীক নায়েবের কতিপয় অন্তরঙ্গের সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত। এইভাবে ষড়যন্ত্র করিতে করিতে সে সৈন্যদল সহ মালাবার সীমান্তে গিয়া উপনীত হইল।

সুলতান কুতুব উদ্দিন খসরু খানকে বিদায় করিবার পর পথে পথে শরাব ও স্ফূর্তির জলসা করিতে করিতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার এই

প্রকার আমোদ-স্ফূর্তির উদাসীনতার সুযোগে আরও একটি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এবং অল্পের জন্য সুলতান রক্ষা পাইয়াছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের চাচা ইয়াগরুশ খান ছিলেন অতিশয় কুশলী ও বীরত্বের অধিকারী। তাঁহার পুত্র মালীক আসাদ উদ্দিন দেখিলেন যে, সুলতান কুতুব উদ্দিন সর্বদাই আরাম-আয়েশে লিপ্ত। তিনি রাজ্যের কোন সংবাদ রাখেন না বা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তাঁহার কোন উদ্বেগ আশংকাই নাই। তিনি কতিপয় অর্বাচীন অনভিজ্ঞ যুবককে নিজের অন্তরঙ্গ সভাসদ করিয়া তাহাদের বিবেচনাকে পরামর্শ মনে করিতেছেন। অথচ তাহারা সকলেই রাজ্যশাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অপ্রকৃতিস্থ। সুলতানের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া মালীক আসাদ দেবগিরিতে কিছু সংখ্যক গোলযোগকারীকে নিজের সঙ্গী করিয়া ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিলেন। তাহারা ভাবিলেন যে, সুলতান কুতুব উদ্দিন যখন তাঁহার হারেমের সহিত আমোদ-স্ফূর্তি করিয়া মত্তাবস্থায় 'কুঠি সাকুন' হইতে বাহিরে আসিবেন, তখন তাহার সহিত কোন অস্ত্রধারী সৈন্য থাকিবে না; এই অবস্থায় যদি কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী খোলা তরবারি হাতে তাঁহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে অতি সহজেই তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিবে। মালীক আসাদই প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী। কারণ তিনি সুলতান আলাউদ্দিনের চাচাতো ভাই। সুতরাং সুলতানকে এই ভাবে হত্যা করিয়া এইখানেই শাহীছত্র ধারণ করিলে জনসাধারণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না; বরং সকলেই তাহাকে মোবারকবাদ জানাইবে ও তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িবে।

মালীক আসাদ উদ্দিন নিজ সঙ্গীদের সহিত এইরূপ পরামর্শ স্থির করিলেন। সুলতান যাত্রা করিলে তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, তিনি পথে পথে মদ্যপান আমোদ-স্ফূর্তি ও হারেমের সহিত বেপরোয়া ভোগ সম্ভোগে লিপ্ত রহিয়াছেন। কয়েকবার এইরূপ দেখিবার ফলেই তাহাদের ধারণা জন্মিল যে, এমন উদাসীন ও অসতর্ক অবস্থায় যদি দশ বারজন অশ্বারোহী একপ্রাণ হইয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে সুলতান কুতুব উদ্দিনকে হত্যা করা খুব কঠিন কাজ হইবে না। কিন্তু সুলতানের মৃত্যুর সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই; তাঁহার আরাম-আয়েশ ভোগ-সম্ভোগের কাল তখনও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। ইহার ফলে যে রাত্রিতে 'কুঠিসাকুন' হইতে বাহিরে আসিলে সেই বিদ্রোহীরা সুলতানকে আক্রমণ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছিল, উহার পূর্বেই একজন আসিয়া তাহার বিদ্রোহী সঙ্গীদের ষড়যন্ত্রের সমুদয় বিবরণ সুলতান কুতুব উদ্দিনের নিকট বর্ণনা করিল। সুলতান কুঠিসাকুনেই রহিলেন এবং মালীক আসাদ উদ্দিন ও তাহার বিদ্রোহী

সঙ্গীদের সকলকে রাত্রেই ধরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। যথাসম্ভব অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের সকলকে দহলিজের সম্মুখে আনিয়া হত্যা করা হইল। সুলতান কুতুব উদ্দিন নিজ পিতার কঠোরতা অনুসরণ করিয়া একান্ত বেপরোয়া ভাবে দিল্লীতে অবস্থানরত ইয়াগরুশ খানের বংশধরদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। উনত্রিশ জন নাবালক তরুণ যাহারা কখনও বাড়ীর বাহির হয় নাই এবং উক্ত ষড়যন্ত্রের কোন খবরই রাখিত না, তাহাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করা হইল। ইয়াগরুশ খানের সমুদয় সম্পদ নানা স্থান হইতে আনিয়া খাজানা-খানায় জমা করা হইল এবং তাঁহার স্ত্রীকন্যাদিগকে রাস্তায় নামাইয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইল।

এইরূপ একটি ষড়যন্ত্রে সুলতান কুতুব উদ্দিনের মৃত্যু আল্লাহ্ তালা নির্ধারণ করেন নাই বলিয়া তাহা হয় নাই। তথাপি তিনি ইহাতে সচেতন হন নাই এবং সতর্কতার সহিত নিজেকে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-সম্ভোগ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। রাজ্যের শাসনব্যবস্থার প্রতি কোন নতুন দৃষ্টিও তাঁহার জন্মে নাই। শুধু ফিরিবার পথে তিনি ঝাবন পৌঁছিয়া সের সেলাহদার শাহী কুত্তাকে গোয়ালিয়রে পাঠাইলেন। সেখানে সুলতান আলাউদ্দিনের অন্যান্য পুত্ররা—খিজির খান, শাদী খান ও মালীক শিহাব উদ্দিন বাস করিতেন। অন্ধ অবস্থায় তাঁহারা সপরিবারে খোরপোশ পাইতেন। তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিবার পর তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে দিল্লীতে লইয়া আসিবার জন্য আদেশ দিলেন। শাদী কুত্তা সেখানে পৌঁছিয়া সকলকে হত্যা করিল এবং তাঁহাদের পুত্র-পরিজনকে দিল্লীতে লইয়া আসিল। সুলতান কুতুব উদ্দিন বিনা প্রয়োজনে এইরূপ একটি অন্যায়ের বোঝা নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন।

সুলতান কুতুব উদ্দিনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অন্যায় হইল শায়খ নিজাম উদ্দিনের প্রতি শত্রুতার ভাব পোষণ করা। তিনি খিজির খানকে হত্যা করাইয়াছিলেন আর এই খিজির খান ছিলেন কুতুবে আলম শায়খ নিজাম উদ্দিনের একজন প্রিয় শিষ্য। ইহার ফলে শায়খের প্রতি তাঁহার ধারণার পরিবর্তন ঘটে; তিনি শায়খের বিরুদ্ধে কুকথা বলিতে আরম্ভ করেন এবং যাহাতে শায়খের ক্ষতি হয়, তৎপ্রতি যত্নবান হন। এমন কিছু সংখ্যক কুলোক, যাহারা সুলতান কুতুব উদ্দিনের নিকট নিজেদেরকে রাজ্যের কল্যাণকামী বলিয়া প্রকাশ করিত, তাহারাই শায়খের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে।

সুলতান কুতুব উদ্দিন দেবগিরি হইতে নিরাপদে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। দেবগিরি ও গুজরাট বিজিত হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে আয়োজিত ষড়যন্ত্র একদিনেই দমন করা লইল। আলাই মালীক ও আমীরদিগকে তিনি

তাঁহার বাধ্য ও অনুগত দেখিতে পাইলেন। চাকর-নফর, প্রাচীন খেদমতগার এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিকে তাঁহার গৃহ রক্ষায় ও রাজ্য পরিচালনায় যত্নবান হইতে দেখিতে পাইলেন। ইহার ফলে তাঁহার চরিত্রে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল; যৌবন, রাজ্য, সম্পদ, হাতীঘোড়া কুপ্রবৃত্তি, মদ, রাজ্য জয়, প্রবীণ ও নবীন আমীর মালীকদের আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ের সাফল্য তাঁহার উন্মাদনার ভাব জাগাইয়া তুলিল। তিনি আরও বেপরোয়া ও উদাসীন এবং নির্মম ও ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চারিত্রিক সদ্গুণ পরিবর্তিত হইয়া ক্রোধ, অশ্লীলতা, কঠোরতা ও শাস্তি প্রদানের ইচ্ছায় পরিণত হইল। অন্যায় রক্তপাতে নিজের হাত সিক্ত করিতে এবং নিজের সঙ্গী সাথীদের প্রতিও কুবাক্য উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বাপেক্ষাও শতগুণ বেশী আমোদ-ফূর্তিতে নিজকে নিয়োজিত রাখিলেন। রাজ্য হারাইবার কোন ভয় বা দুর্ঘটনা ও গোলযোগের কোন চিন্তা তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল না। তাঁহার পরামর্শদাতারা সকলেই যেহেতু অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন, অহঙ্কারী, অথর্ব ও অল্পদিনের সৌভাগ্যবান ছিল, সেইজন্য তাহারা কোনপ্রকার সুপরামর্শ দিতে পারিত না। অথচ তাহারা ইহা ভাল করিয়াই জানিত যে, সুলতানের এই রাজ্যপাট একান্তই অস্থায়ী। অন্য জ্ঞানী-গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সকল পরামর্শদাতা যাহা কিছু শুনিত, তাহাও সুলতানের এই বেপরোয়া ও কঠোর মনোভাবের জন্য তাঁহার নিকট বলিতে সমর্থ হইত না। অপরিসীম মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য যথাযথ উদাহরণ ও উপমাসহ অতীতের উত্থানপতনের কাহিনী সুলতানকে শুনাইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিবার যোগ্যতা তাহাদের ছিল না। সুলতান কুতুব উদ্দিনের সমুদয় রাজত্বকালে না সুলতানের, না তাঁহার সঙ্গী-সাথীদের, কাহারও এই কথা মনে হয় নাই যে, রাজ্যশাসন ও তৎসম্পর্কীয় সম্ভাব্য সর্ব প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য অতীতের সুলতানগণের ইতিহাস পাঠ করিয়া শোনা উচিত। কারণ অতীতের ঘটনাবলী সবদাই রাজ্যশাসন ও তৎসম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। সুলতানের নিজের অহেতুক অহংকার, নিজের মতামতকে যথেষ্ট মনে করা ও নির্বিরোধ স্বেচ্ছাচারিতার ফলে আলাই আমলের অভিজ্ঞ মালীক আমীরদের নিকট তিনি কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করিতেন না। এইজন্য তাঁহাদের পক্ষেও রাজ্যের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে যথাযথ কোন পরামর্শ সুলতানের নিকট তুলিয়া ধরিবার সুযোগ ছিল না। বিশেষ করিয়া সুলতান দেবগিরি হইতে ফিরিয়া আসিবার পর গৃহের ও বাহিরের কাহারও পক্ষেই নিজ জীবনের ঝুঁকি লইয়া তাঁহার নিকটে কোন কিছু বলিবার সাহস হয় নাই।

সুলতান কুতুব উদ্দিনের মগজে ফেরআউনী, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার যে বদখেয়াল ঘুরপাক খাইতেছিল, উহার প্রথম শিকারে পরিণত হইলেন গুজ-রাটের ওয়ালী জাফর খান। নিতান্ত বিনা কারণে তাঁহাকে হত্যা করিয়া সুলতান তাঁহার রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পরে মালীক শাহীন-কেও হত্যা করিলেন। ইনি সুলতানের শ্বশুর ছিলেন। তাঁহাকে ওফাউল মুলক উপাধি দান করিয়া সুলতান নিজের অনুপস্থিতে নায়েব হিসাবেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে নিজের সহায়কদিগকে হত্যা করিয়া সুলতান ফের-আউনী ও নিষ্ঠুরতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। বস্তুত: তাঁহার এই প্রকার আচরণ রাজ্যশাসনের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর ছিল। তদুপরি সুলতান লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া অলংকার ও মেয়েদের কাপড় পরিয়া দরবারে আসিতে আরম্ভ করিলেন। নামাজ-রোজার পাট উঠাইয়া দিলেন। রোজার সময় প্রকাশ্য দরবারে আহারাদি করিতে লাগিলেন। শাহী মহল হাজার সতুনের ছাদ হইতে নির্লজ্জ বাজারী মেয়েলোকদের দ্বারা মানাবর মালীক আইনুল মুলক মুলতানী ও চৌদ্দটি দায়িত্বের অধিকারী মালীক কীর বেক সম্পর্কে এমন সব নাপাক কুকথা বলাইতেন যে, তাহা হাজার সতুনের সকলেই শুনিতে পাইতেন। একান্ত বেপ-রোয়াভাবের জন্যই তৌবা নাম্নী এক গুজরাটী রূপবতী মহিলাকে নিজ দরবারে এমনই স্বাধীনতা দিয়াছিলেন যে, সে মালীক আমীরদিগকে মেয়েলী নামে ডাকিত, যৌন আবেদনমূলক ভাবভঙ্গি দেখাইত, মালীকদের জামা-কাপড়ে প্রস্রাব এবং তাহাদের মধ্যে বসিয়া বায়ু ত্যাগ করিত। কোন কোন সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া দরবারে আসিত এবং সর্বপ্রকার অশ্লীল কথা বলিত।

সুলতান কুতুব উদ্দিনের পতন ও তাঁহার রাজ্যনাশের বিষয়টি দিন দিন বুদ্ধিমান মূর্খ নির্বিশেষে সকলের নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই তিনি শায়খ নিজাম উদ্দিন সম্পর্কে কুকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া সুলতান নিজ দরবারের মালীকদিগকে গিয়াসপুরে গিয়া শায়খের সহিত সাক্ষাত করিতে নিষেধ করিতেন। অনেক সময় একান্ত বেপরোয়া ও উন্মাদের ন্যায় বলিতেন যে, যদি কেউ শায়খের খণ্ডিত শির তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে, তবে তিনি তাহাকে হাজার তঙ্কা পুরস্কার দিবেন। একদিন শায়খ জিয়া উদ্দিন রোমীর আস্তানায় তাঁহার মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে শায়খ নিজাম উদ্দিনের সহিত সুলতানের সাক্ষাত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অতিশয় দুর্ভাগ্য যে, তিনি শায়খের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেখান নাই এবং তাঁহার সালামের উত্তর দেন নাই। শায়খের প্রতি এই অবজ্ঞতার ভাব পোষণ ও দুর্ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হইতেই সুলতান শায়খের বিরোধী পুত্র জামকে নিজ

দরবারের অন্তরঙ্গ সঙ্গী করিয়া লইয়াছিলেন এবং শায়খুল ইসলাম রুকন উদ্দিনকে মুলতান হইতে দিল্লীতে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন।

গুজরাটের ওয়ালী জাফর খানকে হত্যা করিবার পর অকৃতজ্ঞ খসরু খানের ভ্রাতা ধর্মত্যাগী হিসাম উদ্দিনের উপর গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করেন। বহু গণ্যমান্য আমীর ও কুশলী কর্মীসহ তাহাকে নহরওয়ালা পাঠাইলেন। নিহত জাফর খানের সমুদয় লোকজনকে তাহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন। শাহী মহলের গোলামজাদা খসরু খানের এই ভাইটি ছিল একান্তই বেপরোয়া ও কুস্বভাবী; সুলতান তাহাকেও মর্যাদা দিয়াছিলেন। অথচ এই জারজ সন্তানটি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিল। ফলে গুজরাটে পৌঁছিয়াই হিসাম উদ্দিন নিজের আত্মীয় স্বজন ও সঙ্গী সাথীকে একত্র করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ইহার ফলে একটি গোলযোগের সৃষ্টি হইল। কিন্তু সেখানে আল্লাই মালীক আমীর ও লোকজনের শক্তি ছিল অধিক; তাঁহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সুলতান কুতুব উদ্দিনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু খসরু খানের অনুরক্ত সুলতান তাহার ভাইকে একটি মাত্র থাপ্পড় দিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন এবং নিজের অন্তরঙ্গ দরবারী করিয়া লইলেন। গুজরাটের আমীরগণ তাহার এই প্রকার মুক্তি ও দরবারে স্থান পাওয়ার কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন এবং সুলতানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

খসরু খানের ভ্রাতার পদচ্যুতির পর সুলতান গুজরাটের সর্বময় কর্তৃত্ব মালীক ওহিদ উদ্দিন কোরায়শীকে দান করেন। তিনি বংশধারা ও গুণাবলীর দিক হইতে যথার্থই অভিজ্ঞ ও যোগ্য ছিলেন। তাঁহাকে সদরুল মুলক খেতাব দিয়া গুজরাটে পাঠাইলেন। মালীক ওহিদ উদ্দিন তৎকালীন মালীকদের মধ্যে বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্তালা তাঁহাকে সর্বগুণে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি গুজরাটে পৌঁছিয়া খসরু খানের ভ্রাতার বিশৃঙ্খলকৃত সমুদয় অঞ্চলকে অতি অল্প সময়ে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

মালীক ওহিদ উদ্দিনকে গুজরাটে প্রেরণ ও খসরু খানের ভ্রাতাকে দরবারী হিসাবে গ্রহণ করিবার পরই সুলতান মালীক একলাখীর বিদ্রোহের কথা শুনিতে পাইলেন। ইনি দেবগিরিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুলতান দেবগিরিতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা মালীক একলাখী ও তাহার বিদ্রোহী সঙ্গীদিগকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসিল। সুলতান একলাখীর নাক কান কাটিয়া তাহাকে নানাভাবে অপমান করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গী বিদ্রোহীদিগকে যথাবিহিত শাস্তি দিলেন। সুলতান দেবগিরির উজির

পদে আইনুল মুলককে এবং আশরাফ পদে খাজা আলা দবিরের পুত্র মালীক তাজুল মুলককে নিযুক্ত করিলেন। নায়েব উজিরের পদে মুবাইয়ার উদ্দিন আবু রেজাকে নিয়োগ করিয়া দেবগিরি পাঠাইলেন। বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রাজত্বের অহংকারে উন্মাদ সুলতান কুতুব উদ্দিন কর্তৃক এইরূপ গুণীদিগকে কার্যে নিয়োগের ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা সকলেই কর্মকুশলী ছিলেন। তাঁহারা গুজরাটে পৌঁছামাত্র সেখানকার সর্ব বিষয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন ত্বরান্বিত হইল এবং লোকজনের কর্তব্য ও খেরাজ ইত্যাদি যথারীতি নির্ধারিত হইল। দেবগিরির গোলযোগ দূর হইবার পর সুলতান গুজরাট হইতে মালীক ওহিদ উদ্দিনকে দিল্লীতে ডাকিয়া আনিয়া তাজুল মুলকের পদ, নায়েব উজিরের দায়িত্ব ও দেওয়ানে উজারতের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহার হস্তে ন্যাস্ত করিলেন। এইক্ষেত্রে তিনি যথার্থই যোগ্য ব্যক্তি কার্যে নিয়োগ করিয়া গুণীর কদর করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিয়োগেও শহরের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। কারণ যৌবনের উন্মাদনা ও ভোগ-সম্ভোগের উদাসীনতার মধ্যে এই ধরণের কাজ একান্তই অভাবনীয় ও অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

খসরুখানের মালাবার গমন ও তথায় অবস্থান করিয়া সসৈন্য বিদ্রোহ করিবার ইচ্ছা; আলাই মালীকগণের তাহাকে নিরস্ত্র করিয়া দিল্লীতে ফিরাইয়া আনা এবং অকৃতজ্ঞ খসরু খানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী আলাই মালীকদের প্রতি সুলতান কুতুব উদ্দিনের দুর্ব্যবহারের বিবরণ

খসরু খান মালাবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি মালীক নায়েবের সমুদয় ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন; সুতরাং এই স্থলে পৌঁছিয়া তাহার কুপরামর্শদাতাদের মধ্যে ধন-দৌলত বন্টন করিলেন। উক্ত দুই শহরে শতশত হাতী লোকেরা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তৎসমুদয় খসরু খানের হাতে পড়িল। এই সময় বর্ষা কাল আরম্ভ হওয়ার ফলে তথায় বেশ কিছু কাল অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

মালাবারে খাজাতকী নামে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সুন্নী মজ-হাবভুক্ত এবং তাঁহার অগণিত ধন সম্পদও পবিত্র ছিল। শহরে মুসলমান সৈন্যদল আসিতেছে মনে করিয়া তিনি কোথাও পলাইয়া যান নাই। কিন্তু

খসরু খানের অন্তর ছিল একান্তই কুযুক্তি ও কুখেয়ালে পরিপূর্ণ; তিনি এই ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে অকথ্য নির্যাতনের দ্বারা তাঁহার সমুদয় ধন সম্পদ খাজানাখানায় আনিয়া শামিল করিলেন এবং তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ছাড়িলেন। খসরু খান যে কিছু কাল মালাবারে ছিলেন, তাহার অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের সহিত ষড়যন্ত্র করা ছাড়া তাহার অন্য কোন কাজ ছিল না। তিনি কিভাবে আলাই মালীকদিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করিবেন, মালাবারে কিভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন, সৈন্যদলের মধ্যে কাহাকে নিজের বন্ধু করিবেন ও কাহাকে হত্যা করিবেন ইত্যাকার পরামর্শে রাত্রিদিন কাটাইতেন। সুতরাং চান্দেরীর কেতাদার মালীক তমর, মালীক আফগান ও কোড়ার কেতাদার মালীক তলবেগা ইয়াগদা প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রতি খসরু খানের ব্যবহার রহস্যজনক হইয়া উঠিল।

এই সকল আলাই মালীক প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকজনের অধিকারী ছিলেন। খসরু খানের সহিত যোগ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা লোকমুখে খসরু খানের বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার কথা শুনিতে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, অচিরেই এক গোলযোগের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। এইজন্য মান্যবর ও নিমকহালাল আলাই মালীকদের মধ্যে মালীক তমর ও মালীক তালবেগা ইয়াগদা খসরু খানকে বলিয়া পাঠাইলেন, শুনিতে পাইলাম তুমি রাত্রিদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছ এবং তোমার ইচ্ছা এই যে, মালাবার হইতে আর দিল্লীতে ফিরিবে না। কিন্তু আমরা তোমাকে এখানে থাকিতে দিব না। আমরা আসিয়া তোমাকে বন্দী করিবার পূর্বেই তুমি ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। তাঁহারা এইভাবে পয়গাম পাঠাইয়া বহু কৌশল ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তাহাকে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিলেন। এইভাবে সসৈন্যে খসরু খানকে দিল্লীতে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, সুলতান তাঁহাদের নিমকহালালীর কথা শুনিয়া কত ভাবেই না তাঁহাদের মর্যাদা বাড়াইবেন এবং খসরু খানের বিদ্রোহ ও তাহার সঙ্গীদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি কি নির্যাতনই না করিবেন!

কিন্তু সুলতান কুতুব উদ্দিন এই সকল অথর্বের প্রতি এমনই আসক্ত ও ভোগ-সম্ভোগে এমনই মত্ত ছিলেন যে, খসরু খানের ফিরিয়া আসার কথা শুনিয়া আদেশ দিলেন, তাহাকে যেন দেবগিরি হইতে পালকীতে চড়াইয়া দিল্লীতে আনা হয়। রোজ সাত আট বার যেন তাহার তারিফ করা হয়। প্রতি মঞ্জিলে অনেকগুলি বেহারা পূর্ব হইতেই মোতায়েন রাখা হইল, যাহাতে খসরু খানের পালকী আসিতে পথে কোনপ্রকার অসুবিধা বা দেরী না হয়। এইভাবে এই প্রতারক জারজ সন্তান অদ্ভুত অবস্থায় দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হইল এবং বিরোধী মালীকদের

সম্পর্কে সুলতানের নিকট নানান অভিযোগ জানাইল। সে বলিল, ইহারা আমার উপর বিদ্রোহ ঘোষণার দোষ আরোপ করিতেছে এবং আমার বিরুদ্ধে অযথা মিথ্যা কথা বলিতেছে। এইভাবে নিমকহালাল মালীকদের বিরুদ্ধে সে যতদূর সম্ভব সুলতানকে উত্তেজিত করিল। সুলতান তাহার প্রতি এমনই আসক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন যে, বিনা দ্বিধায় এই হারামখোরের সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। নিমকহালাল মালীকগণ সসৈন্যে দিল্লী পৌঁছিবার পূর্বেই এইভাবে সুলতানের মন তাঁহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। দেবগিরির যে সকল হাতী ও খাজা তকীর যে ধনদৌলত খসরু খান নিজের সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা সুলতা- নের খেদমতে পেশ করায় তাঁহার অবস্থা আরোও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি একেবারে গলিয়া গেলেন। ইহার পর সৈন্যদল দিল্লীতে পৌঁছিলে মালীক তমর ও মালীক তালবেগা খসরু খানের দেবগিরিতে অবস্থান ও বিদ্রোহ করিবার ষড়যন্ত্রের কথা সুলতানের নিকট সবিস্তারে বলিলেন এবং প্রতিটি বিষয়ে যথাযোগ্য প্রমাণ দাখিল করিলেন। কিন্তু সুলতান কুতুব উদ্দিনের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়া- ছিল এবং 'যাহার মরণ যথা নৌকা বাহিয়া যায় তথা'-র দৃষ্টান্ত অনুসারে তাঁহার ভিতর ও বাহিরের সকল চক্ষুর উপর পর্দা পড়িয়া গিয়াছিল। সেইজন্য তিনি এই সকল নিমকহালালের কথায় মোটেও কর্ণপাত করিলেন না। উল্টা যৌবনের উম্মাদনায় মত্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেন এবং সাক্ষীদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অহংকারবোধ আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। মালীক তমরকে পদমর্যাদায় হীন করিয়া শাহী মহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। চান্দেরীর জায়গীর তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া খসরু খানকে দান করিলেন। মালীক তালবেগা ইয়াগদাকে, যেহেতু ইনি খসরু খানের ব্যাপারে একটু বিস্তারিতভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাকেমুখে থাপ্পড় মারিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার পদ, জায়গীর ও লোকজন তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। যাহারা খসরু খানের বিরুদ্ধে একান্ত নিমকহালালীর তাগিদে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদিগকে নানাবিধ শাস্তি দিয়া বন্দী করিলেন এবং রাজ্যের চতুর্দিকে দূরে দূরে নির্বাসিত করিলেন।

ইহার ফলে দরবারে ও দরবারের বাহিরে সকল কর্মচারীর মনে এই কথা দাগ কাটিয়া বসিল যে, নিমকহালালীর পরিচয় দিতে গিয়া খসরু খানের বিরুদ্ধে সুলতানের নিকট কিছু বলিতে গেলে উহার শাস্তি এইরূপই হইবে; যেমনটি মালীক তমর, মালীক তালবেগা ও অন্যান্য নিমকহালালদের ভাগ্যে জুটিয়াছে। শাহী মহল ও শহরের সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, সুলতান কুতুব উদ্দিনের

মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। যে সকল গণ্যমান্য লোক মহলে ও বাহিরে চাকুরী করিতেন, তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেদেরকে খসরু খানের হাতে সঁপিয়া দিলেন। খসরু খানের ক্ষমতা লাভ এবং সুলতানের উদাসীনতা, অযথা অহংকার ও আসক্তি চরমে পৌঁছিল। কারণ সকল শ্রেণীর সৎ-পরামর্শদাতাদের মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। খসরু খানের প্রতি সুলতানের আসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার হাবভাব হইতে সকলেই সুলতানের ধ্বংসের ইঙ্গিত পাইতেছিল। কিন্তু তাহাদের করিবার কিছু ছিল না। কারণ সুলতানের কঠোর মেজাজ, ক্রোধ ও অবিচারের ভয়ে কেহ মুখ খুলিতে সাহসী হইত না।

খসরু খানের প্রতারণা ও সুলতান কুতুব উদ্দিনের নিহত হওয়ার বর্ণনা

খসরুখান নিজের বিরোধীদিগকে নিস্তব্ধ করিবার পর সমস্ত শক্তি লইয়া প্রতারণার কাজে আত্মনিয়োগ করিল। অকৃতজ্ঞ বাহা উদ্দিন দবিরের সহিত একটি মেয়েলোকঘটিত ব্যাপারে সুলতানের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় ছিলেন। খসরু খান এই ব্যাপারে সুলতানকে সাহায্য করিবার পরিবর্তে বাহা উদ্দিনকে নিজের বন্ধু বানাইয়া লইল। সুলতানকে প্রতারণা করিবার পূর্বে খসরু খান সুলতানের খেদমতে আবেদন জানাইল, আমি জাঁহাপনার দৌলতেই এমন সম্মানের অধিকারী এবং দূরদূরান্তে নানাপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাইবার উপযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু অন্যান্য মালীক আমীরদের যে প্রকার আত্মীয় স্বজন ও জনবল আছে, আমার তেমন কিছুই নাই। যদি জাঁহাপনা অনুমতি দেন, তবে আমার মামাকে 'বাহলোয়াল' ও গুজরাটে পাঠাইয়া আমার কিছু সংখ্যক আত্মীয় স্বজনকে আপনার খেদমতের জন্য উপস্থিত করিতে পারি। ভোগ-সম্ভোগে মত্ত সুলতান এই জারজ সন্তানের এই প্রকার আবেদনে খুব খুশী হইয়া তাহাকে অনুমতি দিলেন। খসরু খান এই সুযোগে নিজের ভাই বন্ধু বলিয়া কথিত গুজরাটীদিগকে ডাকিয়া আনিল এবং তাহাদের মর্যাদা বাড়াইয়া দিল। তাহাদিগকে ধন-সম্পদ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রসস্ত্র দিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

এইভাবে যে সময়ে সুলতানকে প্রতারণা করিবার কাজ অগ্রসর হইতেছিল, তখন খসরু খান মুকদ্দম বরদার এবং অন্য কতিপয় গোলযোগকারীকে একত্র করিয়া প্রতিরাত্রে ষড়যন্ত্র করিত। 'কুর্‌তকীমার' এর পুত্র, ইউসুফ সুফী ও অনুরূপ অন্যান্য লোক এই কুপরামর্শে মালীক নায়েবের কক্ষে আসিয়া শরীক

হইত। ইহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কুযুক্তি প্রকাশ করিয়া সুলতানকে হত্যা করিবার উপায় বর্ণনা করিত। এই সময়ে একদিন সুলতান 'সের দাওয়া'র দিকে শিকার করিতে গেলেন। বর্বররা এই সময়ে শিকাররত সুলতানকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু কুরতকীমারের পুত্র, ইউসুফ সুফী ও ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যেকার অন্যরা উহাদিগকে এই কাজ করিতে নিষেধ করিল। তাহারা বলিল, যদি এই অবস্থায় আমরা সুলতানকে হত্যা করি, তাহা হইলে যথা সম্ভব সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়া এই শিকার স্থলেই আমাদিগকে হত্যা করিবে। সুলতান নিহত হওয়ার সংবাদে মুসলমান সৈন্যরা গোলমাল শুরু করিবে এবং আমাদের উপর যখন হামলা চালাইবে, তখন আমরা কোথায় পলাইব? কাজেই সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা এই যে, আমরা সুলতানকে শাহী মহলেই হত্যা করিব। হাজার সতুনের উপর তলায় আমরা তাঁহার কাজ শেষ করিয়া আমরা সেখানেই আশ্রয় লইব এবং মালীক আমীরদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া আমাদের পক্ষে যোগ দিতে বলিব। যদি তাহারা আমাদের কথা অস্বীকার করে, তবে তাহাদিগকে সেখানেই হত্যা করিব।

যাহা হউক, সুলতান খুব তাড়াতাড়ি সের দাওয়ায় শিকার করিলেন এবং যথারীতি ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। খসরু খানের সহিত সুলতানের অন্তরঙ্গতার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সে সুলতানের নিকট আবেদন করিল, আমি যখন শাহী খেদমত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাত্রে আমার কক্ষে গমন করি, তখন শাহী মহলের সমস্ত দরজায় তালা পড়িয়া যায়। ইহার ফলে আমার যে সকল আত্মীয়-স্বজন নিজেদের দেশের মায়া ত্যাগ করিয়া আমার খেদমতের জন্য এখানে আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে আমার সহিত সাক্ষাত করা সম্ভব হয় না। যদি দরজার চাবিগুলি আমার কোন লোকের হাতে থাকিত, তাহা হইলে এই সময়ে এবং প্রয়োজন মত অন্য সময়ে লোকজনকে আমার খেদমতে উপস্থিত হইবার সুযোগ করিয়া দিতে পারিতাম। তাহা হইলে তাহারা আমাকে দেখিতে পারিত এবং আমিও তাহাদিগকে দেখিতে সক্ষম হইতাম। ভোগ-সম্ভোগে মত্ত সুলতান ইহা শুনিবামাত্র আদেশ দিলেন যে, শাহী মহলের দরজার চাবিগুলি যে খসরু খানের লোকের হাতে দিয়া দেওয়া হয়। এই ভাবে দরজার সমুদয় চাবি খসরু খানের আয়ত্তে চলিয়া আসিল।

ইহার পর প্রতি রাত্রেই এক প্রহর অতীত হইলে বর্বররা প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়া অস্ত্রসস্ত্র সহ আসিয়া উপস্থিত এবং তিনশত গুজরাটী বর্বর মালীক নায়েবের কক্ষে আসিয়া একত্রে মিলিত। নহবতখানার লোকেরা শাহী

মহলের সম্মুখের দিকেই ঘুমাইত এবং তাহারা এইভাবে প্রতি রাত্রে অস্ত্রসস্ত্রসহ বর্বরদের যাতায়াত লক্ষ্য করিত। ইহার ফলে তাহাদের মনে নানাবিধ আশংকার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যকার বুদ্ধিমানরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বর্বর-দের এইভাবে শাহী মহলে যাতায়াত খুব শুভ লক্ষণ নহে। পাহারাদারদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া আলাপ-আলোচনাও হইত এবং তাহারা একে অন্যে বলাবলিও করিত যে, আজ কিংবা কাল খসরু খান সুলতানের সহিত প্রতারণা করিবে। কিন্তু সুলতানের মেজাজ যেভাবে বাঁকিয়াছিল, ইহার ফলে কাহারও পক্ষে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবার ব্যাপারে কোন কিছু বলিতে সাহস হইত না। শাহী মহলের সকলেই ইহা বুঝিয়াছিল, তাহারা এই বিষয় লইয়া আলাপও করিত এবং নিরুপায়ের মত দূর হইতে সব কিছু লক্ষ্য করিত; অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সুলতানের মত্তাবস্থা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, যেমন সুলতান জালাল উদ্দিনকে সম্পদের লোভ অন্ধ করিয়া কোড়ায় লইয়া গিয়া হত্যা করাইয়াছিল, তেমনই সুলতান কুতুব উদ্দিনকেও কামুকতা, ভোগ-সম্ভোগ ও বেপরোয়াভাব অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে; পরিণামে খসরু খানের দ্বারা তাঁহাকেও হত্যা করাইবে। গণ্যমান্য মালীক আমীরদের মধ্যে কাহারও এই শক্তি ছিল না যে, সুলতানকে সতর্ক করিয়া বলিতে পারেন, খসরু খানের প্রতারণা ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে। এখনও সুলতানের নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য সতর্ক হওয়া দরকার। রাত্রিতে যে সকল বর্বর শাহী মহলে আসিয়া জমায়েত হয়, তাহাদের মধ্যে কোন একজন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—ষড়যন্ত্র কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই খসরু খানের এই প্রকার ষড়যন্ত্রের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বর্বরদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিতেন, মনে মনে সতর্ক হইলেন এবং রাগ হজম করিয়া ফেলিতেন। সুলতানের উগ্র মেজাজকে ভয় করিয়া নিশ্বাসও ফেলিতে চাহিতেন না। অহেতুক নিজের প্রাণ দিবার ইচ্ছা কাহারও ছিল না। এইজন্য সকলেই সমস্ত ব্যাপার দূর হইতে লক্ষ্য করিতেন এবং পারতপক্ষে কোন ব্যাপারে কাহারও মুখ খুলিবার ইচ্ছা হইত না।

কাজী জিয়া উদ্দিন, যাঁহাকে সকলে কাজী খান বলিয়া ডাকিত, শাহী মহলের সমস্ত চাবি তাঁহারই কাছে থাকিত। হস্তলিপি শিক্ষার ব্যাপারে তিনি সুলতান কুতুব উদ্দিনের উস্তাদ ছিলেন। এইজন্য তাঁহার মর্যাদাও ছিল উচ্চস্তরে। যেদিন গত রাত্রে ষড়যন্ত্রকারীরা সুলতানকে হত্যা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সেই দিন জোহরের পর জিয়া উদ্দিন নিজ প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়া সুলতানকে বলিলেন, খসরু খানের কক্ষে প্রতি রাত্রে বর্বররা একত্র হইয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। বহু লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, খসরু

২২—

খান বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছে। সকল মালীকই খসরু খানের ব্যাপারে শুনিয়াছেন, কিন্তু সুলতানের মেজাজের ভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিতেছেন না। আমি সুলতানের দয়ার উপর ভরসা করিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই খেদমতে প্রকাশ করিতেছি। জাঁহাপনা খুব ভাল করিয়াই জানেন যে, কেহ যদি নিজের বাড়ীতে বেশী পানি পান করিত, উহার সংবাদও সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট তখনই আসিয়া পৌছিত; অথচ শাহী মহলে এমন এক বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রতি রাত্রে ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং একদল লোক সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু সুলতানের নিকট উহার কোন সংবাদ পৌছিতেছে না। জাঁহাপনা যদি নিজ প্রাণের সাথে সম্পর্কিত এই ব্যাপারে অনুসন্ধান ও তদন্ত করেন, তবে রাজ্যের কি ক্ষতি হইবে আর খসরু খানের প্রতি সুলতানের ভালবাসারই বা কি অনিষ্ট ঘটিবে! যদি অনুসন্ধান করিয়া কিছু পাওয়া না যায় ও বান্দাদের এই প্রকার ধারণার কোন পরিচয় উহাতে না থাকে, তবে খসরু খানের প্রতি জাঁহাপনার আসক্তি আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে। অন্য দিকে যদি অনুসন্ধানের ফলে কোন কিছু বাহির হইয়া পড়ে, তবে সুলতানের প্রাণরক্ষা পাইবার উপায় বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু সুলতান কুতুব উদ্দিন ও কাজী জিয়া উদ্দিনের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছিল এবং সুলতান আলাউদ্দিনের ঘরদ্বার অসম্মানিত হইবার অপেক্ষায় ছিল; এই জন্য সুলতান নিজের মৃত্যু স্বীকার করিয়াই যেন কাজী খানের কথায় বিরক্ত হইলেন এবং এইরূপ একজন নিমকহালালের কথার কোন মূল্য না দিয়া উল্টা তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিলেন।

সেই সময় খসরু খান সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হইল। সুলতান এক অর্বাচীন অসহায়ের ন্যায় ভোগ-সম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন, সেইজন্য একান্ত বেপরোয়া ও উদাসীনের ন্যায় খসরু খান—এই জারজ সন্তানের নিকট বলিলেন, একটু আগেই কাজী জিয়া উদ্দিন আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। এই কথা শুনিবার পর এই কমজাত কমিনের বাচ্চা কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং সম্পূর্ণ মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া বলিতে লাগিল, জাঁহাপনা যেহেতু আমাকে অধিকভাবে ও আমার মর্যাদা সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেইজন্য জাঁহাপনার অধীনস্থ সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া আমাকে হত্যা করাইবার জন্য পাগল হইয়া পড়িয়াছে। সুলতান তাহার এই অভিনয় ও কান্নামিশ্রিত বিনয়ে একেবারে গলিয়া গেলেন। তাঁহার আসক্তি নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি খসরু খানকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কপোলে চুম্বন ও অন্য যাহা কিছু করিবার করিলেন।

এই মহা মিলনের সময়, যখন স্বভাবতঃই কুবৃত্তি পরায়ণদের অন্তরাত্মা বিগলিত হইয়া পড়ে, সুলতান তাহাকে ভাবগদগদ স্বরে বলিলেন, যদি দুনিয়া উলট-পালট হইয়া যায়, যদি আমীর মালীকরা সকলে মিলিয়া তোমার বদনাম করিতে থাকে, তথাপি আমি তোমার প্রতি এমনই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, তোমার একটি চুলের জন্য সকলকে বিসর্জন দিব। তুমি নিশ্চিত থাক, আমি তোমার সম্পর্কে সকলের কথাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিব।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। আমীর মালীকরা সকলেই মহল ত্যাগ করিয়া গেলেন। শুধু নহবতখানার লোকেরা শাহী মহলের সম্মুখে যথারীতি নিদ্রার আয়োজন করিল। এমন সময় কাজী জিয়া উদ্দিনের মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি হাজার সতুনের উপর তলা হইতে নীচে নামিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া দরজা, পাহারাদার ও নহবতখানার লোকদের অবস্থান সম্পর্কে খবরাখবর লইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় সুলতানের নিকট খসরু খান ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। তাহার মামা 'রন্দুল' কতিপয় বর্বর সহ কাপড়ের নীচে অস্ত্রশস্ত্র গোপন করিয়া হাজার সতুনে উপস্থিত হইল। কাজী জিয়া উদ্দিনের নিকট গিয়া তাঁহাকে একটি পান খাইতে দিল। এখন সুলতান কুতুব উদ্দিনের হত্যার জন্য নিযুক্ত জাহরিয়া বর্বর কাজী সাহেবের নিকটে আসিল এবং চাদরের নীচ হইতে একটি তীর বাহির করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। এইভাবে এই সদাশয় মুসলমানের কাজ শেষ করিয়া দিল। কাজী জিয়া উদ্দিনের হত্যার ফলে হাজার সতুনে এক বিরাট শোরগোলের সৃষ্টি হইল। জাহরিয়া কাজী খানকে হত্যা করিবার পর কতিপয় বর্বর সহ হাজার সতুনের উপর তলার দিকে ধাবিত হইল। শাহীমহল বর্বরদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল। হৈচৈ আর শোরগোলের ফলে হাজার সতুনের দেওয়ালগুলি কাঁপিতে লাগিল। এই প্রকার গোলমালের খবর সুলতানের কানে পৌঁছিলে তিনি খসরু খানকে বলিলেন, উঠিয়া দেখত, নীচের দিকে কেন এত গোলমাল হইতেছে? হাজার সতুনের নীচের তলায় কি ঘটিয়াছে? এই জারজ সন্তান সুলতানের সম্মুখ হইতে উঠিয়া আসিয়া হাজার সতুনের দেওয়ালের কাছে ও জানালার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক করিল। পরে সুলতানের নিকট আসিয়া বলিল, নীচে অনেকগুলি ঘোড়া ছুটিয়া গিয়াছে; উহারা হাজার সতুনের প্রাঙ্গণে দৌড়াইতেছে। লোকজন হৈচৈ করিয়া উহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। খসরু খান সুলতানের নিকট এই সকল কথা বলিয়া শেষ করিতে না করিতেই সেখানে বর্বর সহ জাহরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শাহী কক্ষের দ্বারবার ইব্রাহিম

ও ইসহাককে তীর দ্বারা নিহত করিল। শাহী কক্ষের পার্শ্বে এইরূপ গোলমাল শুনিয়া সুলতান এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, বিশ্বাসঘাতকতার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পাদুকায় পা গলাইয়া হারেমের দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। খসরু খান দেখিলেন, সুলতান যদি দৌড়িয়া হারেমে পৌঁছিয়া যায়, তাহা হইলে খুবই অসুবিধা হইবে; সে একান্ত নির্লজ্জের মত দৌড়িয়া গিয়া পিছন দিক হইতে সুলতানের বাবরী চুল ধরিয়া নিজের হাতে পেঁচাইয়া ফেলিল। সুলতান তাহাকে ধরিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন। কিন্তু হারামজাদা খসরু খান কোন অবস্থাতেই চুলে ধরা তাহার হাতের মুঠি আলগা করিল না। সুলতান এইভাবে খসরু খানকে নীচে ফেলিতে না ফেলিতে জাহরিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। খসরু খান সুলতানের নীচ হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, দেখিস আমার শরীরে যেন না লাগে। জাহরিয়া সুলতানের বুকে তীর বিদ্ধ করিয়া খসরু খানের বুকের উপর হইতে চুলে ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া নামাইয়া ফেলিল এবং অতি সহজে তাঁহার শির কাটিয়া লইল।

হাজার সতুনের ভিতর বাহির উপর নীচের আরও বহু লোক বর্বরদের হাতে নিহত হইল। শাহী মহল বর্বরদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল। পাহারাদাররা পলাইয়া এখানে সেখানে লুকাইতে লাগিল। বর্বরা চারিদিকে মশাল জ্বালাইয়া ধরিল। সুলতান কুতুব উদ্দিনের মস্তকহীন ধড় বর্বররা হাজার সতুনের উপরের তলা হইতে উহার প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করিল। সমবেত লোকজন এই ধড় দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং প্রত্যেকেই নিজের প্রাণ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া ঘরের কোণায় আত্মগোপন করিল। এইভাবে সুলতানকে হত্যা করিবার পরই খসরু খানের মামা রন্ধুল, তাহার ধর্মত্যাগী ভাই হিসাম উদ্দিন, বর্বর জাহরিয়া এবং অন্যান্য বর্বররা সুলতানের হারেমে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ ফরিদ খান ও উমর খানের মাতা সুলতান আলাউদ্দিনের বেগমকে হত্যা করিল এবং সেখানে এমন সব কাণ্ড করিল, যাহা বিধর্মীরাও তাহাদের দেশে করিতে ভয় পাইবে। তাহাদের এই অমানুষিক কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া অদৃশ্য হইতেই কেহ যেন এই কথা বলিয়া উঠিল, ওহে, 'যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল তার পায়।' এই দৃষ্টান্ত বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রকাশ পাইল। সুলতান জালাল উদ্দিনের অতৃপ্ত আত্মা যেন হাজার সতুনের দরদালানে আলাই হারেমের অভ্যন্তরে ইহারই যথার্থ প্রত্যক্ষ করিল। সকল বাদশাহের বাদশাহ, সকল মালীকের মালীক সেই এক অদ্বিতীয়ের নিকট হইতে নিজ রক্তের প্রতিশোধ পাইয়া ধার্মিক লোকদের মুখ দিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল, 'ওরে, তোরা কেউ খারাপ কাজ করিস না,

তাহা হইলে খারাপ দিন দেখিতে পাইবি ; ওরে, তোরা কেউ কুয়া খুঁদিসনা, তাহা হইলে নিজেই উহাতে পড়িবি।'

বর্বররা যাহাদিগকে হত্যা করা দরকার সকলকেই নির্বিবাদে হত্যা করিল। শাহী মহলের পাহারাদাররা কোন প্রকার হৈ চৈ করিল না বা বাধা দিল না। ফলে মহলের সর্বত্র তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা মশাল ও বাতি জ্বালাইয়া চতুর্দিক আলোকিত করিয়া তুলিল এবং তখনই দরবার ডাকিল। সেই দুপুর রাত্তেই মালীক আইনুল মুলক মুলতানী, মালীক ওহিদ উদ্দিন কোরায়শী, মালীক ফখর উদ্দিন জুনা অর্থাৎ সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহ, মালীক বাহাউদ্দিন দবির, মালীক কীর বেকের পুত্রগণ, অন্যান্য গণ্যমান্য মালীক আমীর এবং লোকজনকে নিজ নিজ গৃহ হইতে ডাকাইয়া আনিয়া হাজার সতুনে উপস্থিত করিল। রাত্রি ভোর হওয়ার অপেক্ষায় তাঁহাদের সকলকেই সেখানে আটকাইয়া রাখা হইল। মহলের সর্বত্র বর্বর ও হিন্দুরা আসিয়া ভীড় জমাইল। খসরু খান নিজ হাতে সমুদয় ক্ষমতা গ্রহণ করিল। এক নতুন জগতের সৃষ্টি হইল। শাহী মহলের আদব-কায়দা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। আলাই রাজত্বের সকল কিছুই নষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। নিষ্ঠুর সময়ের চক্রান্তে আলাউদ্দিনের ঘরদ্বার উলট-পালট হইয়া গেল। গোলামজাদাদিগকে প্রতিপালন করিবার এমন অশুভ ফল কি ভয়ানক হইয়াই না দেখা দিল। মালীক নায়েব ও খসরু খান উভয়ে মিলিয়া সুলতান আলাউদ্দিন ও সুলতান কুতুব উদ্দিনের কাজ শেষ করিয়া বুদ্ধিমানদের সম্মুখে সেই দৃষ্টান্তই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল।

অকৃতজ্ঞ খসরু খানের সিংহাসনে আরোহণ।
বর্বরদের ক্ষমতা লাভ ও মহলে মূর্তি পূজা।
বর্বর ও হিন্দুদের সাহায্যে আলাইদের উপর
খসরু খানের আধিপত্য এবং আলাই ও কুতুবীদের
নাম নিশানা ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবার বর্ণনা।

এইভাবে বর্বরদের সহায়তায় খসরু খান বিশ্বাসঘাতকতার কাজ শেষ করিবার পর সকল আমীর মালীককে হাজার সতুনে ডাকিয়া আনিয়া আটকাইয়া রাখিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। খসরু খান নিজকে সুলতান নাসির উপাধিতে ভূষিত করিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। হিন্দু ও বর্বরদের সাহায্যেই এই গোলামজাদা জারজ সন্তানের পক্ষে এমন দুঃসাহস দেখান সম্ভব হইয়াছিল। নিষ্ঠুর সময়ও এমন কুকুর তুল্য খবিসকে এমন সিংহতুল্য বীর ও মহৎ লোকদের আসনে উপবেশন করিতে সাহায্য করিয়াছিল। সিংহাসনে বসিবার

পরই এই অভিশপ্ত অথর্ব আদেশ দিল যে, সুলতান কুতুব উদ্দিনের যে সকল খাস গোলাম আমীরের পদ অলংকৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে যেন তখনই হত্যা করা হয়। সেইদিনই ইহাদের কয়েকজনকে নিজ নিজ গৃহে হত্যা করা হইল। অন্য কয়েকজনকে ধরিয়া আনিয়া হাজার সতুনের কক্ষে গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইল। এই সকল ব্যক্তির পুত্র-পরিজন, ধনদৌলত ও গোলাম-বাঁদীদিগকে বর্বর ও হিন্দুদের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। কাজী খানের ঘরদ্বার ও সমুদয় আসবাবপত্র খসরু খানের মামা রন্ধুলের ভাগে পড়িল। তাঁহার পরিবারবর্গ কাজী জিয়াউদ্দিনের নিহত হওয়ার সংবাদে রাত্রির প্রথম ভাগেই সবকিছু ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

এই নিমকহারাম তখতে বসিবার পর নিজের ধর্মত্যাগী ভাই হিসামকে খানে খানান, নিজ মামা রন্ধুলকে রায় রায়ান, কুর্‌তকীমারের পুত্রকে শায়েস্তা খান, ইউসুফ সুফীকে সুফী খান ও তাহার বন্ধু বাহাউদ্দিন দবিরকে আজমুল মুলক খেতাব দান করিল। আলাইদিগকে ধোকা দিবার ও তাহাদের মন কাড়িবার জন্য আইনুল মুলক মুলতানীকে আলম খান বলিয়া ডাকিবার আদেশ দিল। অথচ তাহার কাজের সহিত এই বুজর্গ ব্যক্তির কোন সম্পর্কই ছিল না। দেওয়ানে উজারত তাজুল মলক ও মালীক ওহিদ উদ্দিন কোরায়শীকে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ, বড় বড় আমীরদিগকে এবং কীর বেকের সমুদয় কার্য তাঁহার পুত্রদিগকে অর্পণ করিল। এই কমজাতের তখতে বসিবার পাঁচ দিনের মধ্যেই শাহী মহলের মূর্তি পূজার ব্যবস্থা করা হইল। সুলতান কুতুব উদ্দিনের হত্যাকারী জাহরিয়াকে সোনা-রূপা ও জেউর জওয়াহেরাত দ্বারা সাজাইয়া দিল। নাপাক বর্বররা শাহীমহলে আরাম-আয়েশে থাকিতে লাগিল। সুলতান কুতুব উদ্দিনের বেগমকে খসরু খান গ্রহণ করিল এবং বর্বররা আলাই আমীর মালীকদের স্ত্রী ও বাঁদী-দিগকে নিজেদের ভোগ দখলে আনিল। অত্যাচারের তীব্রতা ও আক্ষেপের অগ্নিজ্বালা আকাশে গিয়া পৌঁছিল। বর্বররা ও হিন্দুরা অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করিয়া কোরান শরীফ জ্বালাইয়া দিল এবং মিম্বরগুলিতে মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিল। বিধর্মীদের রীতিনীতি এই হারামজাদার তখতে বসিবার দিন হইতে বর্বর ও হিন্দুদের সহায়তা লাভ করিয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। খসরু খান যেহেতু বর্বর ও হিন্দুদের সহায়তায় তখতে বসিয়াছিল, সেইজন্য তাহার অনুগত বর্বর ও হিন্দুদের মধ্যে শাহী খাজনাখানার ধন-সম্পদ ও সোনা-রূপা বাঁটিয়া দিল; যাহাতে তাহারা তাহার প্রয়োজন অনুরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে।

যে চারি মাস ও বিশেষভাবে আড়াই মাস কাল সুলতান মুহম্মদ খসরু খানের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠেন নাই, সেই সময়ে তাহাকে সুলতান নাসির উদ্দিন বলিয়া ডাকা হইত, মিম্বরে তাহার নাম খোতবায় পাঠ করা হইত এবং টাকশালে তাহার নামে তঙ্কা তৈরী করা হইত। এই একটি মাস আলাই খান্দানের সকলকে বিনাশ করিবার পরিকল্পনা ছাড়া খসরু খান ও তাহার অনুসারীদের অন্য কোন কাজ ছিল না। একমাত্র গাজী মালীক অর্থাৎ সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ ছাড়া অন্য কোন আমীরকে তাহারা ভয় করিত না। গাজী মালীক তখন তাঁহার দেবপালপুরের জায়গীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আলাই খান্দানের এই প্রকার দুর্দশার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এইজন্য তিনি যাহাতে দিল্লীতে না আসেন ও খসরুখানীদের পিছনে না লাগেন; তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুলতান মুহম্মদ অর্থাৎ মালীক ফখর উদ্দিন জুনাকে বহুতর সমাদর করিয়া আখোর বেকের পদে নিযুক্ত করিল এবং নানাবিধ পুরস্কার ও সম্পদ দান করিল। সুলতান মুহম্মদ সুলতান কুতুব উদ্দিনের নিকট যথেষ্ট মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য নিজ মালীকের নিহত হওয়ার সংবাদে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুরুব্বীদের বংশাবলীর উপর বর্বর ও হিন্দুদের এই প্রকার অকথ্য অত্যাচারে রাগে নিজের আঙ্গুল কামড়াইতেছিলেন। কিন্তু খসরু খান ও তাঁহার অনুসারীরা সোনা রূপা দিয়া যেহেতু লোকজনকে ভুলাইয়া ফেলিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার পক্ষে তখন কোন কিছু করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

দেবপালপুরে থাকিয়া গাজী মালীক নিজ মুরুব্বী সুলতান আলাউদ্দিন ও সুলতান কুতুব উদ্দিনের বংশধরদের প্রতি অকথ্য নির্যাতনের সমুদয় সংবাদ প্রতি মুহূর্তে পাইতেছিলেন। আলাই বংশের প্রতিটি দুঃসংবাদে তিনি দুঃখিত, রাগান্বিত ও উত্তেজিত হইতেন। কিভাবে নিজ মুরুব্বী বংশের প্রতি এই জঘন্য অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া বর্বর ও হিন্দুদিগকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া যায়, উহার যথাযথ পন্থা অনুসন্ধান করিতেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষের নিধি সুলতান মুহম্মদের প্রতি হিন্দু ও বর্বরা কোন সাংঘাতিক দুর্ব্যবহার করিয়া বসে, একমাত্র এই ভয়ে তিনি দেবপালপুর হইতে ঘসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া উহাদের ক্ষমতার স্বাদ তিক্ত করিয়া দিতে পারিতেছিলেন না। ইহার ফলেই নীচ ও হেয়রা শক্তিশালী হইয়া উঠিল। হিন্দুদের সহায়তায় চারিদিকে কুফরীর হাওয়া বহিতে লাগিল এবং বর্বরা ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সমস্ত মুসলিম রাজ্যে হিন্দুরা আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং এই প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর

হইল যে, পুনরায় যাহাতে দিল্লীতে হিন্দুয়ানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও মুসলমানীর চিহ্ন কোথাও না থাকে।

খসরু খান তথা বর্বর ও হিন্দুদের এইভাবে চারি মাস কাল রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকাকালে দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমানরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রতি তাহাদের অত্যধিক লোভ ও দুর্বল ঈমানের জন্য খসরুখানীদের একান্ত সুহৃদ হইয়া দাঁড়াইল। বর্বর ও হিন্দুদিগের ক্ষমতালাভ ও গোলযোগে তাহাদের কোন আপত্তি ছিল না। বরং ইহাদের শক্তি ও সম্পদ তাহারা অন্তর দিয়া কামনা করিত এবং ইহার পরিবর্তে তাহারা প্রচুর সম্পদলাভের সুযোগ পাইত। এইরূপ একশ্রেণীর লোক, এই দুনিয়াই যাহাদের একমাত্র কাম্য ছিল, তাহাদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। অন্য একদল শুধু বাহিরের দিক হইতেই এই অকৃতজ্ঞ অর্বাচীনের নিকট হইতে বেতন ও পুরস্কার গ্রহণ করিত। কিন্তু ভিতরে তাহাদের প্রকৃতি ছিল অন্যরূপ। তাহারা উহার নিকট ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশার সুবিধা গ্রহণ করিলেও উহার অনুগত হয় নাই। ইসলামের দুর্বলতা ও বিধর্মীদের প্রভাব দেখিয়া তাহারা মনে মনে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইত এবং খসরুখানীদের সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে তাহাদের আনন্দ ছিল না। তৃতীয় দল, যদিও তাহাদের সংখ্যা একান্তই নগণ্য ছিল, তথাপি খসরু খানের বাদশা হওয়া, বর্বর ও হিন্দুদের ক্ষমতা লাভ এবং ইসলামের উপর বিধর্মীদের রীতি-নীতির অন্যায় আক্রমণে তাঁহারা মরমে মরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের আহার নিদ্রা রুচিত না এবং তাঁহারা রাত্রিদিন এই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া খসরুখানীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা নিজেদের ও ধর্মের এই দুর্দশার জন্য যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অন্যায়ের মূলোৎপাটনের নিমিত্ত আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

খসরু খানের প্রতি বিরূপ হইয়া মালীক কখর উদ্দিন জুনা অর্থাৎ সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহের পিতার নিকট দেবপালপুরে গমন। গাজী মালীক অর্থাৎ সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহের খসরুখানীদের বিরুদ্ধে দিল্লীতে সৈন্য প্রেরণ। খসরু খানের ধর্মত্যাগী ভাই ও সুফী খানকে গাজী মালীকের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো এবং খসরুখানীদের উপর গাজী মালীকের বিজয়লাভের বিবরণ

খসরু খানের বাদশাহীর আড়াই মাস বয়সে, যখন আলাই ও কুতুবী বংশের সর্বনাশ এবং আলাই আমীর মালীকদের অসম্মানিত হওয়ার কাজ শেষ হইয়াছে, তখন অবশিষ্ট গণ্যমান্য আলাই মালীকদের মধ্যে মালীক ফখর উদ্দিন জুনা অর্থাৎ সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি অতিশয় বীরত্ব ও সাহসিকতার সহিত খসরুখানীদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে মনস্থ করিলেন। আলাই নিমকদের দাদ লইবার প্রেরণা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল এবং নিজ মালীক ও মুরব্বীদের জন্য তিনি কিছু করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। জোহরের নামাজের পর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া তিনি কতিপয় চাকর-নফর সহ অশ্বারোহণ করিলেন। খসরুখানীদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া মহাবীরগণ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে গিয়া সৈন্যদলের উপর নির্ভর করেন না, তেমনি ভাবে সুলতান মুহম্মদ দেবপালপুরের পথে অশ্ব চালনা করিলেন। সেইদিনই মাগরিবের নামাজের সময় সুলতান মুহম্মদের দেবপালপুর গমনের সংবাদ খসরু খানের নিকট পৌঁছিল। খোরাসান ও হিন্দুস্তানের উল্লেখযোগ্য এই বীরের তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হওয়ার সংবাদে খসরুখানীরা নিরাশ হইয়া পড়িল। খসরু খানের বাদশাহীর মজা এবং তাহার অনুসারীদের ক্ষমতা-লাভের স্বাদ তিক্ত হইয়া উঠিল। কতকগুলি বিদ্রোহী সৈন্যকে কুরাত কীমারের পুত্র মুহম্মদের অধীনে করিয়া তাহারা সুলতান মুহম্মদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পাঠাইল। কিন্তু ইরান ও তুরানের বীরের পুত্র বীর সুলতান মুহম্মদ উহাদের এক রাত্রি পূর্বেই সরস্বতীতে পৌঁছিয়া গেলেন। কাজেই ইহাদের পক্ষে তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব হইল না। ফলে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনকারী অশ্বারোহীরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

সুলতান মুহম্মদ সরস্বতীতে পৌঁছিবার পূর্বেই গাজী মালীক অর্থাৎ সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ দেবপালপুর হইতে দুই শত সৈন্যসহ মুহম্মদ শিরতবাকে সরস্বতী পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা সেখানে আসিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে সব কিছুর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং সুলতান মুহম্মদ সরস্বতী হইতে শান্তির সহিত যাত্রা করিয়া দেবপালপুরে পিতার সহিত মিলিত হইলেন। পুত্রের আগমনে গাজী মালীক খোদার দরগাহে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, দান খয়রাত দিলেন এবং আনন্দ প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। হিন্দু ও বর্বরদের নিকট হইতে নিজ মুরুব্বীদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পথ গাজী মালী-কের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল এবং তিনি এই ব্যাপারে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

খসরু খান, যিনি বর্বর ও হিন্দুদের নিকট সুলতান নাসির উদ্দিন বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন, নিজের বিধর্মী ভাই ও সুফী খান দেবপালপুরে গাজী মালীকের বিরুদ্ধে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার ভাইকে খান খানান ও ইউসুফ সুফীকে সুফী খান খেতাব দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা বহু সৈন্য, লোকজন ও ধনসম্পদ সহ দেবপালপুরের পথে যাত্রা করিল এবং এই উপলক্ষে খসরু খান তাহার ভাইকে ছত্র দান করিল। এই দুই অথর্ব সেনাপতি নিজ নিজ সৈন্যসহ যেন মুরগীর বাচ্চার মত সদ্য মুরগীর ডানার নীচ হইতে বাহির হইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। একান্তভাবে বোকামির পরিচয় দিয়া এমন সব বীর ও সাহসী পুরুষদের বিরুদ্ধে পথে নামিল, যাহাদের তলোয়ারের ভয়ে সমগ্র খোরাসান ও মোগলস্তান কাঁপিয়া উঠিত। ইহাদের এই ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়াই শুধুমাত্র সম্পদ ও হাতী ঘোড়ার উপর নির্ভর করিয়া দেবপালপুরের পথে যাত্রা করিয়াছিল।

এই সময় সুফী খানও ধর্মত্যাগী হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই গাজী মালীকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সাধু ও যোগীদের আস্তানায় গিয়া যথা নিয়মে বিজয়লাভের জন্য প্রার্থনা করাইল। শহরের সকল ধার্মিক ব্যক্তি সুফী খান ও খসরু খানের সম্মুখে ও গোপনে মোটামুটিভাবে বলিতে লাগিলেন, হে খোদা, তাহাকে সাহায্য কর, যে দীনে মুহম্মদীকে সাহায্য করে। তাঁহাদের এই প্রার্থনা গাজী মালীকের ভাগ্যেই জুটিল। কারণ তিনিই দীনে মুহম্মদীকে সাহায্য করিবার জন্য সসৈন্যে আগাইয়া আসিতেছিলেন।

যাহা হউক এই দুইজন অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বনকারী সেনাপতি সৈন্যদলসহ সরস্বতীতে পৌঁছিল। কিন্তু নিজেদের অথর্বতা ও অকেজোপনার জন্য গাজী মালীকের সৈন্যদের নিকট হইতে সরস্বতীর দুর্গ জয় করিতে পারিল না। একান্ত অনভিজ্ঞতা ও বোকামির জন্য শত্রু সৈন্যকে পিছনে রাখিয়া তাহারা নাবালক বাচ্চাদের ন্যায় মামার বাড়ীতে বেড়াইতে রওয়ানা হইল। যে মহাবীর কমপক্ষে বিশ বার মোগলদিগকে দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়াছেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যাহার বয়সের অভিজ্ঞতা তুলনাহীন, সেই তাঁহার বিরুদ্ধে এই সকল অর্বাচীন একমাত্র মিথ্যা অহংকার ও সৈন্যবলের গর্বে স্ফীত হইয়া অগ্রসর হইল।

এই অর্বাচীন ও অথর্ব সেনাপতির দিল্লী হইতে দেবপালপুরের দিকে যাত্রা করিবার পূর্বেই গাজী মালীক নিমকহালালদের পক্ষাবলম্বনকারী মালীক বাহরাম আয়বাকে উচ্ছ হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মালীক আমরা নিজ সৈন্যদল ও অস্ত্রসস্ত্র সহ দেবপালপুরে আসিয়া গাজী মালীকের সহিত মিলিত

হইলেন। গাজী মালীক যখন শুনিলেন যে, খসরু খানের ধর্মত্যাগী ভাই ও সুফী খান একান্ত অহংকারের বশবর্তী হইয়া সসৈন্যে সরস্বতী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহার অন্তরে ইসলামের প্রতি প্রীতি ও কুফ্রীর প্রতি ঘৃণার ভাব নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি নিমকহালাল ও যোগ্য সকল সৈন্যসহ সুসজ্জিত হইয়া দেবপালপুর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং দলিলী কসবাকে পিছনে ফেলিয়া ও পানি পার হইয়া শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। দ্বিতীয় দিনে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখে কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সেখানে তখন সত্যের জয় ও গাজী মালীকের পতাকার উপর আসমানী রহমত বর্ষিত হওয়ার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। গাজী মালীক প্রথম আক্রমণেই বিপক্ষ দলকে পরাজিত করিলেন এবং তাহাদের সমুদয় শক্তি ছিনভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। খসরু খান তাহার ভাইয়ের সঙ্গে যে ছত্র ও খাজানাখানা পাঠাইয়াছিল, তৎসমুদয় গাজী মালীকের হাতে পড়িল। নিমকহারামদের বহু আমীর ও মালীক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল এবং বহুতর অশ্বারোহী ও আমীর বন্দী হইল। যে দুইজন অর্বাচীন নিজে-দেরকে খানখানান ও বিরাট লশকরের সেনাপতি মনে করিয়া খুব গর্বের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সিংহতুল্য বীর পুরুষদের দ্বারা নিজেদের বহু লোককে হত্যা করাইয়া, হাতী-ঘোড়া মাল দৌলত পিছনে ফেলিয়া এমনভাবে কাটিয়া পড়িল যে, তাহাদের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তাহারা রাত্রিতে রাত্রিতে তীর বেগে পলাইয়া দিল্লীতে খসরু খানের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

গাজী মালীকের বিজয় ও নিমকহারামদের পরাজয়ের কথা শুনিয়া খসরু খান ও তাহার অনুসারীদের ধড়ের পানি শুকাইয়া গেল। বর্বরদের মন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং নিমকহারামদের মুখ শুকাইয়া এতটুক হইয়া গেল। যে সকল বর্বর ও হিন্দু খসরু খানের সাহায্যকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা তখনই গাজী মালীকের হাতে নিজেদেরকে বন্দী কল্পনা করিতে লাগিল। গাজী মালীক যুদ্ধ জয়ের পর সেই ময়দানেই এক সপ্তাহ অবস্থান করিলেন। সেখানে নিমকহারামদের নিকট হইতে পাওয়া গণিমতের মাল বন্টনের ব্যবস্থা ও সৈন্য-দলকে সুসজ্জিত করিবার কাজ শেষ করিয়া অতিশয় জাঁকজমকের সহিত নিজ মুরুব্বীদের রক্তের প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং ইসলাম ধর্মকে বর্বরদের অন্যায় প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হইলেন। হতভাগ্য খসরু খান তাহার দুর্ভাগা আমীর মালীক এবং তাহাকে সাহায্যকারী বর্বর ও হিন্দুদের দলসহ নিরুপায় হইয়া সিরি হইতে বাহিরে আসিল। আলাই তালাবের চতুর্দিকের বাগান সম্মুখে রাখিয়া এবং দিল্লীর দুর্গ পশ্চাতে ফেলিয়া 'লহরাওত'-এ নামিয়া আসিল ও গাজী মালীকের ভয়ে 'চাহরিণা'র মধ্যে শিবির

স্থাপন করিল। দিল্লী ও কিলুখড়ি হইতে সমস্ত ধন-সম্পদ বাহিরে আনিয়া সৈন্য শিবিরে রাখিল। পলাতকের পন্থা অনুসরণ করিয়া শাহী খাজানাখানায় একটি তঙ্কাও রাখিল না এবং সকল উপার্জন ও খরচ পত্রের দপ্তর জ্বালাইয়া দিল। যেহেতু সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, রাজ্য, সম্পদ ও জীবন সকল কিছুই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, সেইজন্য আড়াই মাসের বেতন কিংবা পুরস্কার হিসাবে শাহী খাজানাখানার সমস্ত সম্পদ সৈন্যদলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল এবং যাহাতে মুসলমান বাদশাহের হাতে একটি কড়িও না যায়, সেইজন্য খাজানাখানা শূন্য করিয়া ফেলিল। অচল মুদ্রাগুলিও ফেলিয়া আসিল না। এই সম্পদ বিতরণের জোরেই সে অন্ধ হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সৈন্যদলের সম্মুখে আসিল এবং গণ্যমান্য সকল সেনাপতি ও সৈন্যকে নিজের সম্মুখে ডাকাইয়া তাহাদিগকে নিজ নৈকট্য ও সম্পদের প্রলোভন দেখাইল। নিজের আচার-আচরণের প্রতি সে মোটেও লক্ষ্য করিল না।

সৈন্যদলের সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সকলেই গাজী মালীকের দিল্লী আক্রমণের সংবাদ শুনিয়া খসরু খানীদের মৃত্যু সমুপস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিল এবং নিমক হারামদের শিরগুলি বর্শাগ্রে বিদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইতেছিল। ইহার ফলে এই নিমকহারাম খসরু খান সর্বনাশের সাগরে ডুবিয়া হাত পাও ছুড়িতেছিল। কারণ তাহার সৈন্যদলের অধিকাংশই মূলত গাজী মালীকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। বরং মনে মনে তাহারা তাঁহাকে ইসলামের রক্ষক হিসাবে খোশ আমদেদ জানাইতেছিল। এই জন্য তাহারা আপাততঃ অভিনয় করিয়া সমস্ত সম্পদ এই অথর্বের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছিল এবং মনে মনে তাহার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতেছিল। অনেকে পলাইয়া বাড়ীর রাস্তাও ধরিয়াছিল। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মিথ্যা সত্যের উপর, নিমকহারাম নিমকহালালের উপর এবং কুফরী ইসলামের উপর কখনও জয়ী হইতে বা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। খসরু খানের অকৃতজ্ঞ ও অথর্বের পক্ষে নিমকহালাল ও অভিজ্ঞ গাজী মালীকের উপর জয়লাভ করা একান্তই অসম্ভব।

সেইজন্য খসরু খান ও তাহার অনুসারীরা সুফী খানের সসৈন্যে পরাজিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে খাজানাখানার অধিকাংশ সম্পদ বাহিরে আনিয়া ফেলিল এবং নিজেরা ডুবন্ত ব্যক্তির মত খড়কুটাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। এইভাবে তাহারা চরম বেহায়াপনা, জাতগোলামি ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, সুলতান আলাউদ্দিন যেরূপ তখতে বসিবারকালে ধন বিতরণ করিয়া সুফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহারাও তেমনি সুফল পাইবে।

গাজী মালীক তাঁহার সুসজ্জিত সৈন্যদল সহ মঞ্জিলের পর মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া শহরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি যথারীতি ইন্দ্রপথে শিবির স্থাপন করিলেন। যেদিন উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইবে, উহার পূর্ব-রাত্রে মালীক আইনুল মুলক মুলতানী খসরু খানের পক্ষ ত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনী ও ধারের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পক্ষত্যাগের সংবাদে খসরু খান ও তাহার অনুসারীদের মনোবল আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল।

খসরু খানের সহিত গাজী মালীকের যুদ্ধ ও গাজী মালীকের জয়লাভ এবং সর্বশ্রেণীর আমীর মালীকদের সহায়তায় তখতে বসিবার বিবরণ

সে ছিল এক জুম্মার দিন, যেদিন মুসলমানদের উপর খোদার রহমত বর্ষিত হইতে থাকে এবং কাফের ও হিন্দুদের উপর অভিসম্পাত ঝরিয়া পড়ে। এমনি এক বরকতের দিনে গাজী মালীক নিজের বিশ্বস্ত সৈন্যদল সহ ইন্দ্রপথ হইতে যাত্রা শুরু করিলেন এবং খসরুখানীদের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। খসরু খানও তাহার হিন্দু ও প্রায় ধর্মত্যাগী মুসলমান সহায়কদের সহিত যাত্রা করিয়া হাতীর দলকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইল। লহরাওতের ময়দানে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইল। দলরক্ষীদের একক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। গাজী মালীকের দলরক্ষীরা খসরুখানীদের উপর জয়লাভ করিল। খসরু খানের পক্ষে যুদ্ধকারী মালীক তালবেগা নাগুরী ও অন্য কতিপয় বর্বরের কর্তিত শির গাজী মালীকের সম্মুখে আনা হইল। কুর্‌তকীমারের পুত্র, যাহার উপাধি ছিল শায়েস্তা খান ও যে আরজে মুমালেকের পদে অধিষ্ঠিত ছিল, সে যুদ্ধের এই অবস্থা দেখিয়া নিজ অনুচরবর্গ সহ খসরু খানের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মরুভূমির পথে ইন্দ্রপথ পৌঁছিল এবং তথাকার গাজী মালীকের পক্ষের অবশিষ্ট শিবির লুণ্ঠন করিয়া আবার মরুভূমির পথে উধাও হইয়া হইয়া গেল। এইদিকে উভয় সৈন্যদল এইভাবে জুম্মার নামাজ পর্যন্ত পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জুম্মার নামাজের পরের সময়টি খুবই বরকতপূর্ণ। এই সময়ে গাজী মালীক নিজ আমীর, মালীক ও আত্মীয় স্বজন সহ খসরুখানীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মেয়েলী স্বভাবের খসরু খান এই সকল রুস্তম জালসদৃশ বীরপুরুষের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তাহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ও পরাজিত হইল। খসরু খান সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিলপথের দিকে পলায়ন করিল। সমস্ত বর্বরের দল ছিন্নভিন্ন হওয়ার ফলে কেহ খসরু খানের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। শাহীছত্র, 'দূরবাশ', হাতী-

ঘোড়া সমস্ত কিছুই গাজী মালীকের সম্মুখে আনা হইল। গাজী মালীক বিজয়ীর বেশে ফিরিয়া চলিলেন। পথে রাত্রি হইল এবং প্রহরেক রাত্রির সময় ইন্দ্রপথে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

খসরু খান তিলপথে পৌঁছিলে তাহার নিকট একজন বর্বরও ছিল না। সুতরাং সে তিলপথ হইতেও পলাইল এবং তাহার প্রাচীন মুরুব্বী মালীক শাদী আলাইর বাগানের ঝুপড়িতে আসিয়া আশ্রয় লইল। রাত্রিকাল সেই বাগানেই কাটাইল। খসরু খানের পরাজয়ের পর তাহার সৈন্যদলের হিন্দু ও বর্বর সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মাঠ-ময়দান, বাজার ও অলিগলি যেখানেই তাহাদের দেখা মিলিল নির্বিচারে হত্যা করা হইল। তাহাদের হাতিয়ার ও ঘোড়া লুটিয়া লওয়া হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা দুই-চারিজন করিয়া একত্রে পলাইয়াছিল, তাহারা গুজরাটে যাইবার পথে নিহত হইল। অস্ত্র ও ঘোড়া গাজী মালীকের সৈন্যদের হাতে পড়িল। পরদিন মালীক শাদীর বাগান হইতে খসরু খানকে বন্দী করিয়া গাজী মালীকের সম্মুখে আনিয়া তাহার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইল।

যুদ্ধ জয়ের দিনগত রাত্রে গাজী মালীক যখন ইন্দ্রপথে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শহরের আমীর মালীক ও অন্যান্য ব্যক্তিরা সেখানে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া শাহী মহল ও সকল শাহী দরজার চাবি প্রদান করিলেন। পরদিন গাজী মালীক সকল আমীর মালীক, গণ্যমান্য শহরবাসী ও আত্মীয়-স্বজন সহ ইন্দ্রপথ হইতে সিরিতে আসিয়া হাজার সতুনে বসিলেন। তাঁহার এই প্রথম দরবারে তিনি সুলতান আলাউদ্দিন, কুতুব উদ্দিন ও তাঁহার অন্যান্য মুরুব্বীদের এহেন দুর্দশার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিলেন। পরে হিন্দু ও বর্বরদের নিকট হইতে নিজ মুরুব্বীদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হওয়ায় আল্লাহর দরগাহে শোকরিয়া জানাইলেন। এই সকল কাজ শেষ হইবার পর সেই দরবারে তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, আমি সুলতান আলাউদ্দিন ও কুতুব উদ্দিনের অনুরাগী; সেই জন্য আমার মুরুব্বীদের রক্তের প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা আলাই ও কুতুবী আমীর মালীক, যাহারা এই দরবারে উপস্থিত আছেন, যদি জানেন যে, আমার মুরুব্বীদের বংশের কেহ কোথাও এখনও জীবিত আছেন, তবে এখনই তাঁহাকে এই দরবারে উপস্থিত করুন; আমি তাঁহাকে তখতে বসাইয়া তাঁহার সম্মুখে একজন গোলামের ন্যায় হাজির থাকিয়া যথারীতি সেবা করিতে প্রস্তুত আছি। যদি শত্রুরা

সকল আলাই ও কুতুবী বংশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা, যাহারা এই দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনাদের মধ্যে যাহাকে এই শাহী তখতের যোগ্য মনে করেন, তাহাকেই তখতে বসাইতে পারেন। আমি নিজে তাঁহার খেদমত করিতে রাজী আছি। আমি তলোয়ারের সাহায্যে মুরুব্বীদের রক্তের যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা এই তখতের লোভে করি নাই। আমার জান-মাল জন-ফরজন্দ যেভাবে আমি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি, তাহা শাহী তখতে বসিবার জন্য দেই নাই। আমি যাহা কিছু করিয়াছি উহাতে শুধু মুরুব্বীদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই আপনারা যদি অন্য কাহাকেও এই তখতের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আমিও তাঁহাকে বাদশাহ বলিয়া মানিয়া লইব।

গাজী মালীকের এই ঘোষণা শুনিয়া উপস্থিত সকলে একবাক্যে বলিলেন, সুলতান আলাউদ্দিন ও কুতুব উদ্দিনের বংশধরদের মধ্যে শত্রুদের হাত হইতে এমন কেহ রক্ষা পায় নাই, যে এই তখতে বসিবার যোগ্য হইতে পারে। বর্তমান খসরু খান ও বর্বরদের বিদ্রোহ ও ক্ষমতা লাভের ফলে রাজ্যের চতুর্দিকে সমূহ গোলযোগ দেখা দিয়াছে। বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং অনেক অঞ্চল দিল্লীর শাসনাধীন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় আপনার মত লোকের সহায়তাই আমাদের দরকার। কারণ আপনি মালীক থাকা অবস্থাতেই আমাদিগকে ঋণী করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনি যেভাবে মোগলদের পথ আটকাইয়া বসিয়াছিলেন, উহার ফলেই তাহাদের হিন্দুস্তান আগমন বন্ধ হইয়াছে। এখন যেভাবে আপনি নিজ মুরব্বীদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন, তাহাও ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তদুপরি সকল মুসলমানকে হিন্দু ও বর্বরদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কাজেই এই দেশে সকলের উপরে নিজের যোগ্যতা আপনি নিজেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তালা এতগুলি আলাই আমীর ও মালীকের মধ্যে আপনাকেই এই ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। এই কারণে আমরা এবং এই দেশের সকল মুসলমান আপনার নিকট ঋণী। আমরা, যাহারা এই দরবারে উপস্থিত রহিয়াছি, সকলে আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও বাদশাহী ও নেতৃত্বের যোগ্য বলিয়া মনে করি না এবং জ্ঞান, বুদ্ধি, ধার্মিকতা প্রভৃতির দিক দিয়াও আপনার তুল্য উপযুক্ত অন্য কাহাকেও জানি না।

এইভাবে দরবারে উপস্থিত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এবং দায়িত্বশীল সকল ব্যক্তিই সম্মত হইয়া গাজী মালীকের হাত ধরিয়া তাঁহাকে তখতে বসাইলেন। যেহেতু গাজী মালীক মুসলমান ও ইসলামের আকুল আবেদনে সাড়া

দিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার উপাধি হইল সুলতান গিয়াস উদ্দিন। সেই দিনই সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ সর্বসাধারণ নির্বিশেষে সকলের সম্মতিক্রমে শাহী তখতে বসিলেন। মালীক, আমীর, উজির, গণ্যমান্য দরবারী ও অন্যান্য সকলে যথা নিয়মে কোমরে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। সকল গোলযোগ দূর হইল, ইসলাম জিন্দা হইল এবং মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন চেতনা জন্মলাভ করিল। কুফুরীর সকল বিশৃঙ্খলা বিনষ্ট হইল। সকল শ্রেণীর লোকের মন তৃপ্তি ও সন্তুষ্টিতে ভরিয়া উঠিল।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওস্সালাতু
ওস্সালামু আলা নবীয়েহি মুহম্মদিও ও আলা আলিহি
আজমাঈন

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ

সদরে জাহান—কাজী কামাল উদ্দিন ; উলুগ খান অর্থাৎ সুলতান মুহম্মদ শাহ : শাহজাদা বাহরাম খান ; মাহমুদ খান শাহজাদা : মোবারক খান শাহজাদা ; মাসুদ খান শাহজাদা ; নসরত খান শাহজাদা ; সুলতানের পোষ্যপুত্র তাতার মালীক ; মালীক সদর উদ্দিন আর সালান —নায়েব বারবেক ; মালীক শাদী দাওরের ভাতিজা ফিরুজ মালীক নায়েব উজির ; মালীক বুরহান উদ্দিন আলেমে মুলক-কতোয়াল ; মালীক বাহা উদ্দিন-আরজে মুমালেক : মালীক আলী হায়দর নায়েব উকিলেদর ; মালীক নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ খাস হাজেব ; মালীক খুথা খাজাঞ্চী ; মালীক আলী আগদী আশক ; মালীক শিহাব উদ্দিন চাউশ গোরী ; মালীক তাজ উদ্দিন জাফর ; মালীক কিয়াম উদ্দিন ও উজিরে দওলতাবাদ কতলুগ খান ; মালীক ইউসুফ নায়েব দেবপালপুর : মালীক শাহীন আখোর বেক । আহমদ আয়াজ শাহানা ইমারত ; নাসিরুল মুলক খাজা হাজী। মালীক এহসান দবির ; মালীক শেহাব উদ্দিন মুলতানী তাজুল মুলক ; মালীক ফখর উদ্দিন ; দৌলশাহ বোসহারী ; মালীক কীর বেগ ; মালীক কাশ্মীর শাহানা বারগাহ ; মালীক মুহম্মদ জাগ ; মালীক সাদ উদ্দিন মস্তৌকী ; মালীক হিসাম উদ্দিন হাসান মুস্তাওফী ; মালীক আইনুল মুলক ; মালীক কাফুর লঙ্গ ; মালীক সিরাজ উদ্দিন কাসুরী ; মালীক খান শাহানা পীল ; মালীক হিসাম উদ্দিন বেদার ; আলেমে মুলকের পুত্র মালীক নিজাম উদ্দিন ; মালীক হাজীর ভাই মালীক আলী ; মালীক বদর উদ্দিন ; মালীক তাজ উদ্দিন তুর্ক নায়েব গুজরাট ; মালীক সায়েফ উদ্দিন ; মালীক হাজী ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওস্‌সালাতু আলা
রসুলিহি মুহম্মদিও ও আলিহি আজমাঈন ও সাল্লাম।
তসলীমান কাসীরান কাসীরা ।

আল্লাহ্‌তালার রহমতের প্রত্যাশী জিয়া বারানী বলিতেছি যে, ৭২০ হিজরীতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ সিরির প্রাসাদে সিংহাসন আরোহণ করিলেন এবং বাদশাহী তাঁহার পূত অস্তিত্বের স্পর্শে শোভামণ্ডিত হইয়া উঠিল। যেহেতু তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর, লোকজন ছিল প্রয়োজন অনুরূপ এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল অনন্য সাধারণ, সেইজন্য এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি রাজ্যের সমুদয় কাজ সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিলেন। খসরু খান ও তাহার অনুসারী-দের কল্যাণে নানাবিধ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং নিমকহারামদের ক্ষমতা লাভের ফলে শাহী মহলেও নানাপ্রকার গোলযোগ জন্মু হইয়াছিল ; তাঁহার তখতে বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তৎসমুদয় দূরীভূত হইল ও রাজ্যের শাসনব্যবস্থা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই অবস্থা দেখিয়া সকল লোকেরই মনে হইল যে, পুনরায় সুলতান আলাউদ্দিন যেন ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তখতে বসিবার চল্লিশ দিনের মধ্যে সুলতান গিয়াস উদ্দিনের বাদশাহী সর্ব সাধারণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। চতুর্দিকে বিরোধ ও

বিদ্রোহের যে আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা লোপ পাইল। তুগলক শাহের দৃঢ় মেজাজের পরিচয় পাইয়া মানুষ আরামবোধ করিল এবং মানুষের অন্তর হইতে নানাবিধ কুখেয়াল ও কুমন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। দৃঢ়চেতা ও পরাক্রমশালী বাদশাহের শাসনে সকলেই নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করিল। বৃথা বাক্যালাপ ও অকারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি শান্ত হইল। সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলকের আগমনে রাজ্যের শোভা বৃদ্ধি পাইল এবং যে সকল কাজ বহু বৎসরেও সঠিক ভাবে হইতে পারিতেছিল না, তাহা অতি অল্পদিনেই সাবলীল গতিতে আগাইয়া চলিল। ইসলাম ও মুসলমানদের করুণ আবেদনে সাড়া দিবার ফলে তুগলক শাহের হাতে খসরু খানীদের কুফরী রীতিনীতি লোপ পাইয়া নতুনভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হইল। তদুপরি সুলতান গিয়াস উদ্দিন যেভাবে নিজ মুরুব্বীদের প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপরতা দেখাইয়াছেন, তাহা এমন সুষ্ঠুভাবে আর কোন সুলতানের ভাগ্যে ঘটে নাই।

তখতে বসিবার পর হইতেই সুলতান গিয়াস উদ্দিন আলাই ও কুতুবী বংশের অবশিষ্ট লোকজনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং আলাই হারেমের প্রতি যথারীতি সম্মান দেখাইলেন। সুলতান আলাউদ্দিনের কন্যাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিলেন এবং যে সকল লোক সুলতান কুতুব উদ্দিনের বেওয়া বেগমকে তিনদিন না যাইতেই খসরু খানের সহিত অবৈধভাবে বিবাহ দিবার কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। আলাই মালীক, আমীর সকলকে উপযুক্ত বেতন, জায়গীর, কেতা ও পুরস্কার দান করিলেন এবং তাহাদিগকে খাজায়ে তাশ হিসাবে গণ্য করিতে লাগিলেন। কোন অবস্থাতেই আলাই পোষ্য ও অনুগৃহীত আমীর মালীকদিগকে অসম্মান করিবার চিন্তা তাঁহার মনে স্থান দেন নাই। তাহাদের কোন অন্যায় হইলে যথারীতি সতর্ক করিবার পন্থাও তিনি অনেক সময় অনুসরণ করিতেন না। তথাপি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার সতর্ক করিবার বিষয়টি সকলের সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইত এবং ইহা হইতে কেহই রেহাই পাইত না।

তখতে বসিবার পর হইতেই সুলতান গিয়াস উদ্দিন রাজ্যশাসনের জন্য শৃঙ্খলা, সংশোধন, পুনর্বাসন, সুবিচার, প্রবীণ ও জ্ঞানীদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার এবং দায়িত্ব পালনকে নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করিলেন। খাজা খতীর, মালীকুল উমারা জুনায়দী, খাজা মুহাজ্জাব বুজর্গ প্রমুখ প্রবীণ উজির, যাহাদের শাহী মহলে কোন মর্যাদা ছিল না, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত পোশাক ও বেতন দান করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে যথাস্থানে বসিবার নির্দেশ দিলেন। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সুব্যবস্থা স্থাপনের

জন্যে প্রয়োজনীয় সকল পরামর্শ তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন এবং রাজ্যের কল্যাণ, বিধি ব্যবস্থা, পুনর্বাসন ও মানুষের সাচ্ছন্দ্য বিধান সম্পর্কে তাঁহারা যেরূপ বলিতেন, তিনি সেই অনুযায়ী কাজ করিতেন। যাহাতে কাহারও মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়, এইরূপ কোন নতুন কাজ তিনি স্বেচ্ছায় করিতেন না বা অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে যাইতেন না। যে সকল পরিবার বিনষ্ট ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, উহাদিগকে নতুন করিয়া স্থাপন করিলেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিনের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক ছিল কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও পরোপকার করা। এই কারণে তিনি মালীক থাকাকালে যাহাদের সহিত অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল ও যাহাদের নিকট হইতে আন্তরিক খেদমতের পরিচয় পাইয়াছিলেন তখতে বসিয়া নিজের সমৃদ্ধির দিনে তাহাদের কথা ভুলিয়া যান নাই। তাহাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ চাহিদা অনুসারে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কাহারও কোন হক আদায় করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। রাজ্যের সর্বকার কাজেই তিনি সুবিচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পন্থাই রাজ্যশাসনের পক্ষে একান্ত উপযোগী। এইজন্য তিনি কোথাও স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন নাই এবং দান-ধ্যান বা শাসন-ত্রাসনের কোথাও পরিমাণ ও নিয়মকে অতিক্রম করেন নাই। ফলে একজনকে হাজার তঙ্কা দান করা এবং তাহার সমতুল্য অন্যজনকে এক দেরহামও না দেওয়ার মত কাজ তিনি কখনও করেন নাই। তিনি যথার্থ পাওয়ার যোগ্যকে কখনও ভুলেন নাই এবং অযোগ্যকে কখনও সম্মানিত করেন নাই। যে সকল কাজ মানুষের মধ্যে বিরোধী ও বিরূপতার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা তিনি সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিনের পুত্র সুলতান মুহম্মদের রাজ্যশাসন বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। এইজন্য সুলতান তাঁহাকে উলুগ খান উপাধি ও ছত্র দান করিয়া তখতের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিলেন। অন্যান্য শাহাজাদের মধ্যে একজনকে বাহরাম খান, অন্যজনকে জাফর খান, তৃতীয় জনকে মাহমুদ খান ও চতুর্থ জনকে নসরত উপাধি দেন। বাহরাম আয়বা, যাহাকে নিজের ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে কিসলু খান উপাধি দিয়া মুলতান ও সিন্ধু অঞ্চল তাহার শাসনাধীনে অর্পণ করিলেন। নিজ ভাতিজা মালীক আসাদ উদ্দিনকে নায়েব বারবেক, ভাগিনা মালীক বাহা উদ্দিনকে আরজে মুমালেকের পদ ও সামানার কেতা এবং জামাতা মালীক শাদীকে দেওয়ানে উজারতের দায়িত্ব-ভার দিলেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র তাতার খানকে তাতার মালীক উপাধি দিয়া জাফরাবাদ কেতা দান করিলেন। কতলুগ খানের পিতা মালীক বুরহান উদ্দিনকে

আলেমে মুবারেক উপাধি দিয়া দিল্লীর কতোয়ালের পদে নিযুক্ত করিলেন। মালীক আলী হায়দরকে নায়েব উকিলেদর, কতলুগ খানকে দেবগিরির নায়েব উজির, কাজী কামাল উদ্দিনকে সদরে জাহান, কাজী সামা উদ্দিনকে শহরের কাজীর পদ এবং মালীক তাজ উদ্দিন জাফরকে গুজরাটের শাসনভার সহ নায়েব আরজের পদ দান করিলেন। তিনি এমন সব লোককে রাজ্যের সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করিয়াছিলেন যাহাদের জ্ঞানে-গুণে যথার্থই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে পারে এবং যাহাদের প্রতি কাহারও মনে কোন রূপ বিরূপ ধারণার সৃষ্টি না হয়। ফলে সকলের মনেই এই সকল লোকের বুজর্গী ও জ্ঞান-গুণ এমনভাবে দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল যে, যেন তাহারা সারাজীবন তাঁহাদের অধীনেই অতি-বাহিত করিয়াছে। সুলতান গিয়াস উদ্দিনের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল প্রচুর। এইজন্য তিনি তাঁহার চারি বৎসর কয়েক মাসের রাজত্বকালে হঠাৎ এমন কাহাকেও গুরুত্বপূর্ণ পদ বা সর্দারী দান করেন নাই, যাহাতে সে পদমর্যাদার ভারে অন্ধ হইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। কিংবা কাহারও কোন হক বা প্রাপ্য এমনভাবে ভুলিয়া যান নাই, যাহাতে সে পর হইয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে। তাঁহার আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় এমন কোন কিছু প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে অন্তরঙ্গ ও প্রবীণ ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হারা-ইয়া ফেলেন। মনে হয় আমীর খসরু যেন সুলতান গিয়াস উদ্দিনের রাজ্য শাসন ও জ্ঞান-গুণের পরিমাণ প্রকাশ করিবার জন্যই এই পদটি লিখিয়াছিলেন,

তিনি জ্ঞান ও গুণের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ছাড়া কোন কাজ করিতেন না ;
মনে হয়, তাঁহার টুপির উপর একশতটি পাগড়ী বিদ্যমান ছিল।

অতীতের সুলতানেরা অধীনস্থ লোকজন, সভাসদ উজিরদিগকে প্রতিপালন করিবার যে ধারা অনুসরণ করিতেন এবং যাহা ইতিহাস গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সুলতান তুগলক শাহ নিজ লোকদিগকে প্রতিপালন করিতে গিয়া সেই ধারা ও নির্দেশ যথাযথ পালন করিয়াছিলেন। আল্লাহ্তালা সুলতানের স্বভাবের মধ্যে শৃঙ্খলা, সংশোধন, সুব্যবস্থা, অধিক গৃহাদি নির্মাণ ও অধিক পুনর্বাসনের যে সদিচ্ছা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহার ফলেই তিনি রাজ্যের খেরাজের ব্যবস্থা ন্যায়পরায়ণতার সহিত নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং নতুন নতুন খেরাজ ও শাহী প্রাপ্যের সম্ভব-অসম্ভব সকলপ্রকার গুরুভার প্রজাদের উপর হইতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। 'সায়ী' ও 'মুরাফ্ফী'দের আবেদন ও কেতোদারদের লালসার ব্যাপারে তিনি কিছু শুনিতে চাহিতেন না এবং তাহারা যাহাতে দেওয়ানে উজারতের নিকট আসিতে না পারে, তজ্জন্য যথারীতি নির্দেশ

দিয়াছিলেন। তিনি দেওয়ানে উজারতকে আরও নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, সায়ী ও মুয়াফ্‌ফীদের কথায় ও তাহাদের ইচ্ছা অনুসারে শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া যেন কোন রাজ্য বা কেতা হইতে নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত কিছু আদায় করা না হয়। বরং তাহারা যেন এই চেষ্টাই করে, যাহাতে আবাদ বেশী হয় এবং প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া খেরাজ আদায় করা হয়। তাহা হইলে এক-বারের গুরুভারের চাপে দেশের অবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া উন্নতি ব্যাহত হইবে না। সুলতান তুগলক শাহ আদেশ দিলেন যে, দেশের খেরাজ এইভাবে আদায় করা উচিত, যাহাতে প্রজারা কৃষিকাজ বেশী করিয়া করিতে উৎসাহী হয় এবং খরচাদি করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে। হঠাৎ একবারে এতবেশী বা এমনভাবে আদায় করা উচিত নহে, যাহাতে তাহাদের অবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ভবিষ্যতে কোন কিছু করিবার সাহস হারাইয়া ফেলে। দেশ ও প্রজাদের দুরবস্থার জন্য আসলে বাদশাহের অত্যধিক চাপই দায়ী এবং ইহাতে তাঁহার চাকর-নফর ও কেতাদাররাই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকে।

সুলতান তুগলক শাহ সমস্ত কেতাদার ও ওয়ালীদিগকেও এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, হিন্দু প্রজাদের নিকট হইতে খেরাজ আদায় করিতে গিয়া দেখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা এমন সম্পদশালী হইয়া না উঠে, যাহার ফলে বিদ্রোহ করিতে সাহস পায় এবং এমন নিঃস্বও না হইয়া পড়ে, যাহাতে তাহারা চাষাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে যথাযথ ও ন্যায্য খেরাজ আদায়ের রীতি ও পরিমাণ যথার্থই বুজুর্চ মেহের ও জ্ঞানবানদের স্বভাব এবং ইহার মাধ্যমেই হিন্দুদের প্রতি যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ ছিলেন যথার্থই অভিজ্ঞ, পরিণামদর্শী ও সুবিচারক। তাঁহার খেরাজ আদায়ের রীতি সম্পর্কে এই কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি ওয়ালী ও কেতাদারদিগকে খেরাজ সম্পর্কে সর্বদা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিতেন। যাহাতে মুকদিম ও খওতীরা সুলতানের নির্দিষ্ট হার হইতে বেশী কিছু আদায় না করে। যদি তাহারা নিজেদের চাষাবাদ ও চারণভূমিকে খাজনার আওতায় না আনে, তাহা হইলে উহার আয় হইতেই মুকদিম ও খওতী হিসাবে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া লইতে পারে। ইহার চাইতে বেশী যেন তাহারা পাইতে না চাহে। অবশ্য এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুকদিম ও খওতীদের দায়িত্ব অনেক। কাজেই তাহারা যদি সাধারণ প্রজার ন্যায় খাজনা ইত্যাদি দিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের ঐসকল দায়িত্বের পরিবর্তে অতিরিক্ত প্রাপ্যের কোন সুযোগ তাহাদের থাকিবে না।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন যে সকল আমীর মালীককে গুরুত্বপূর্ণ পদ, জায়গীর ও কেতার দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেওয়ানের আমলাদের দ্বারা ডাকাইয়া আনা এবং অন্যায় ও অসম্মানকর উপায়ে তাহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত সম্পদ আদায় করার কোন ব্যবস্থা পছন্দ করিতেন না ! আমীর মালীক-দিগকেও নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, দেওয়ানের আমলারা যেন তাঁহাদের নিকট কৈফিয়ত তলবের সুযোগ না পায় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যেন এমন অসম্মানজনকভাবে প্রাপ্য আদায় করিতে না হয়, যাহাতে তাঁহাদের আমীরী বা মালীকীর ইজ্জত নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই তাঁহারা যেন নিজ নিজ কেতা হইতে সামান্য প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকেন। উহার আয়ের কিছু অংশ যেন নিজ নিজ কর্মচারীর জন্য অবশিষ্ট রাখেন এবং অধীনস্থ লোকজনকে বেতনাদি যথা-রীতি প্রদান করেন। কারণ নিজ নিজ লোকজনকে বেতনাদি নিয়মিত প্রদান না করিলে উক্ত সম্পদ তাহাদের হাতেই জমা থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত অর্থ, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অধীনস্থ লোকজনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহা হইতে যদি তাহারা তাহাদের স্বার্থ আদায় করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাহাদের আমীর মালীক হওয়ার কোন যোগ্যতা নাই। যাহারা এইভাবে নিজ অধীনস্থ লোকজনের সম্পদ ভোগ করে, তাহারা মাটি খাওয়া অপেক্ষাও গর্হিত কিছু করে বলিয়া মনে করিতে হইবে। অবশ্য যদি আমীর ও মালীকরা তাঁহাদের কেতা ও জায়গীর হইতে আধা গ্রামে এগার ও এক গ্রামে পনেরর হারে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করে এবং কেতাদার ও জায়গীরদার হিসাবে তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়, তবে এইজন্য তাহাদিগকে নিষেধ করা বা তাহাদের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করা আক্ষেপের কারণ হইবে। তেমনই যদি কোন জায়গীর ও কেতার কারকুন ও মুতসরিফরা নিজ বেতনের অতিরিক্ত পাঁচ দশ হাজার খরচ করিয়া বসে, তবে ইহার জন্য তাহাদিগকে লাথি গুঁতার দ্বারা অসম্মান ও কয়েদ করিয়া উক্ত সম্পদ আদায় করা উচিত নহে। অবশ্য যদি ইহারা অন্যায়ভাবে এই সম্পদ আদায় করে ও উহা জমার খাতায় না লিখে এবং জায়গীর ও কেতা হইতে নিজেদের প্রাপ্য মনে করিয়া যথেচ্ছ আদায় করিয়া লয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে লাথি-গুঁতার দ্বারা অসম্মান ও কয়েদ করিয়া যে পরিমাণ তসরুপ করিয়াছিল, সেই পরিমাণ আদায় করিয়া লইতে হইবে। জ্ঞানীরা যদি এই বিষয়টিকে ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, এই ন্যায়পরায়ণ ও অভিজ্ঞ বাদশাহ সে সকল আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা যথা-র্থই ন্যায় ও সঠিক ছিল।

এই কারণেই সুলতান গিয়াস উদ্দিন খাজনাদি আদায়ের ব্যাপারে যে

সত্য পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহার ফলে তাঁহার রাজত্বকালে খওতী, মুকদিম, কারকুন প্রভৃতির অতিরিক্ত লাভের সুযোগ থাকা সত্বেও জায়গীর ও কেতাগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আবাদ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমীর মালীকরা জায়গীরদার ও কেতাদার হিসাবে নিজেদের প্রাপ্যের অধিক লাভ করিয়া প্রতি বৎসর অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কারকুনরাও যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ লাভ করিয়াছিল। অথচ অন্যায় হস্তক্ষেপের জন্য কাহাকেও দেওয়ানের সম্মুখে জবাবদিহি করিতে হয় নাই এবং কোন-প্রকার অসম্মানজনক ব্যাপার ঘটে নাই। ইহার ফলে রাজ্যের সহায়ক সকল কর্মচারীর মধ্যে দিন দিন আন্তরিকতার ভাব অধিকতর দৃঢ় হইতেছিল।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ দেওয়ানে উজারতের দায়িত্ব উপযুক্ত ও সুনামের অধিকারী লোকদের হাতে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ফলে দেওয়ানের আমলাদের মধ্যে অন্যায় জোর-জবরদস্তি, কয়েদ জিঞ্জির ও বাজেয়াপ্তির কোন-প্রকার ঘটনা ছিল না বলিলেই চলে। অবশ্য প্রথম দিকের যে দুই এক বৎসর দেওয়ানে উজারত হইতে জোর জবরদস্তি করা হইয়াছিল, উহার এক মাত্র কারণ বয়তুলমালের সম্পদ আহরণ করা। কারণ খসরু খান পরাজিত হওয়ার পূর্বে বয়তুলমাল হইতে সমস্ত সম্পদ বাহির করিয়া লইয়াছিল এবং যুদ্ধের সময় সৈন্যদল ও প্রজাসাধারণের জন্য সমুদয় খাজানা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। যে সকল লোক এই লুটপাটে শরীক হইয়া অন্যায়ভাবে বয়তুল-মালের সমুদয় সম্পদ গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে এই সকল সম্পদ ছিনাইয়া আনিতে তুগলক শাহী দেওয়ানে উজারত কর্তৃক কিছুটা জোর জবরদস্তি করা হইয়াছিল। অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাসকারী এই সকল লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা খোদাভীরু ও তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অল্প। ফলে তাহারা খসরু খানের নিকট হইতে যে সম্পদ লাভ করিয়াছিল, তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে খাজানাখানায় ফিরাইয়া দিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ছিল সম্পদলোভী। তাহারা নানাপ্রকার তাল-বাহানা করিয়া দেরী করিতে লাগিল এবং ঘুষ দিয়া নিজেদের মাথা বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইহাদের প্রতারণামূলক কোন আরজিই শ্রবণ করেন নাই এবং জোর-জবরদস্তি করিয়াই উহাদের নিকট হইতে সম্পদ আদায় করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের সকলেই ছিল সম্পদলোভী ডাকাত, মিথ্যাবাদী ও অন্যায়ের পোষক। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যায়-ভাবে সম্পদ আহরণ করিয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল অধিক। তাহাদের নিকট সম্পদ থাকা সত্বেও তাহারা জোর জবরদস্তির ন্যায় অসম্মানজনক অবস্থায়

নিজদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের নিকট সম্পদ তলব করিবার সময় তাহারা মিথ্যা অজুহাত দেখাইত এবং বাহানা করিয়া নানাস্থানে বেড়াইতে বাহির হইত। সকল স্থানেই মুসলমানদের রক্ষক ও আশ্রয় বাদশাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত ও মন্দ কথা বলিত। কিন্তু সুলতান এই সকল ধনাঢ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন তাহাদের নিকট হইতে কয়েক জিঞ্জির ও জোর জবরদস্তি দ্বারা মাল-মাত্তা আদায় করা হয় এবং তাহাদের মিথ্যা অজুহাত শোনা না হয়। ইহার ফলে এক বৎসরের মধ্যে আলাই খাজানাখানা যেরূপ পূর্ণ ছিল, তুগলকী খাজনাখানাও সেইরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং যোগ্য চেষ্টার ফলে খাজানাখানা হইতে অপহৃত সমুদয় সম্পদ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

খোদাতালা সুলতান গিয়াস উদ্দিনকে বয়তুলমালের সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যয় করার এক অপূর্ব দক্ষতা দান করিয়াছিলেন। ফলে তিনি যে স্থান হইতে সম্পদ গ্রহণ করা দরকার, সেখান হইতেই গ্রহণ করিতেন এবং যে স্থানে সম্পদ ব্যয় করা দরকার, সেখানেই ব্যয় করিতেন। আবার জ্ঞান ও শরিয়ত মত যে স্থান হইতে সম্পদ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, সেখানে হস্তক্ষেপ করিতেন না এবং যাহাদিগকে দয়া-দাক্ষিণ্য করিলে অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদিগকে কদাচ দান করিতেন না। এইরূপ একজন বাদশাহ্ যিনি যথাস্থান হইতে সম্পদ আহরণ ও যথাস্থানে বিতরণের সঠিক পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতেন, তাঁহার অনুরূপ কেহ কোন যুগে কোন দেশে তখতে বসিয়াছিলেন কিনা, তাহা বড় কথা নহে; বরং সুলতান গিয়াস উদ্দিনের রাজত্বকালে এমন কোন সপ্তাহ বাদ যাইত না, যাহাতে সুলতান সকল অন্তরঙ্গ ও ভিতর বাহিরের লোককে ডাকিয়া তাহাদের নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে দানধ্যান না করিতেন। দানধ্যান ও পুরস্কারের ব্যাপারে তিনি মধ্য পন্থা অবলম্বন করিতেন। এত বেশী দিতেন না, যাহাতে অপব্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এবং এত কমও দিতেন না, যাহাতে কেহ তাঁহাকে বখিল বলিয়া দোষারোপ করিতে সক্ষম হয়। ফেরআউন ও নমরুদরা যেমন একজনকে লাখ লাখ ও হাজার হাজার দান করিত, যোগ্যতা-অযোগ্যতার বাছ-বিচার করিত না এবং অন্যরা কিছু মাত্র না পাইয়া আক্ষেপ করিত, তেমনভাবে তিনি দান করিতেন না। তাঁহার সকল দানের পশ্চাতেই আন্তরিকতা ও সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য থাকিত; পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসাদ্বেষ সৃষ্টি করা নহে। যাহাতে উহা লোকজনের মধ্যে তাঁহার কল্যাণ কামনার ভাব সৃষ্টি করে, তৎপ্রতি তিনি অতিশয় দৃষ্টি রাখিতেন।

এই দূরদর্শী বাদশাহ দান-ধ্যানের সময় তাঁহার সকল প্রবীণ ও নবীন খেদমত-

গারকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন। বস্তুত: বিভিন্ন পদমর্যাদা সত্ত্বেও তাহারা সকলেই বাদশাহের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। সুতরাং কেহ বাদশাহের ইনাম লাভ করিলে ও অন্যরা উহা হইতে বঞ্চিত হইলে, স্বভাবত:ই তাহারা হিংসা দ্বেষের অধীন হইয়া বাদশাহের প্রতি আন্তরিকতা হারাইয়া ফেলিবে; ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হইলে একতার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে; এই সমস্ত কারণে বাদশাহ যাহা কিছু ইনাম দিতেন, তাহা অল্প-বেশী সকলকে দিতে চেষ্টা করিতেন। যাহাতে তাহাদের মধ্যে না পাওয়ার কোন ক্ষোভ না থাকে। সুলতান তুগলক শাহ কর্তৃক অনুসৃত এই প্রকার ইনাম দানের ব্যবস্থা যথার্থই বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য আদর্শস্বরূপ ছিল। এই ব্যাপারে তাঁহার ন্যায় এমন যোগ্যতা দিল্লীর তখতের অন্য কোন বাদশাহের মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহার এই ব্যবস্থার ফলে সবসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া আমীর মালীক ও মহলের সকলেই যথোপযুক্ত ইনামাদি লাভ করিত।

সুলতান তুগলক শাহ বিজয়বার্তা পাইলে এবং বিবাহ, জন্ম ও অন্যবিধ পুণ্য উপলক্ষ দেখা দিলে শহরের গণ্যমান্য, জ্ঞানী-গুণী ও রইস সর্দারদিগকে শাহী মহলে দাওয়াত করিতেন এবং সকলকে নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে ইনাম দিতেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দান-খ্যান করার ন্যায় তিনি বিভিন্ন খানকা, মাজার ও আস্তানায় নজর নিয়াজ দিয়া তাহাদের খরচপত্রে সাহায্য করিতেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁহার রাজ্যের সকলেই যেন তাঁহার দান-খ্যানের সুযোগ লাভ করে এবং কোন ব্যক্তিই যেন এইরূপ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত না হয়। নিজ অন্তরঙ্গ সভাসদ ও হিতাকাঙ্ক্ষী এবং যাহারা নিজেদেরকে সুলতানের আশ্রিত বলিয়া মনে করে, তাহাদের সকলকেই তিনি খুব শীঘ্র শীঘ্র ইনামাদি দিতেন। বস্তুত: যাহারা তাহার রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচিত হইত, তাহাদের খরচপত্রের অভাব হইত না এবং বাদশহকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে নিজেরাও সন্তুষ্ট হইত। সুলতান যদিও অল্প পরিমাণে দিতেন, তথাপি উহাতে অধিক লোককে এবং বারংবার দেওয়ার ফলে সকলের জন্যই তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত। যদি বাদশাহের দেওয়া সকলপ্রকার ইনামের হিসাব লওয়া হইত, তবে সকলের বেতন, ভাতা ও অন্যবিধ প্রাপ্য অপেক্ষা তাহা অবশ্যই বেশী হইত। সুলতানের স্বভাবে সকলের কল্যাণ কামনার যে প্রবৃত্তি বিদ্যমান ছিল, উহার জন্য তিনি সকলকে সন্তুষ্ট ও সচ্ছল রাখিতে চাহিতেন এবং অভাবী ও অসহায়রূপে তাহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার হইত না। তিনি তাহাই চাহিতেন, যাহাতে তাঁহার প্রজা, সৈন্য ও লোকজন সচ্ছল জীবন যাপন করিতে পারে।

সুলতান তুগলক শাহের আরও একটি পুরাতন অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি সর্বদা ইহাই চাহিতেন, যাহাতে তাঁহার রাজ্যের সকলেই কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত থাকে। কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই যেন নিজ নিজ পেশা, ব্যবসা ও গৃহস্থী লইয়া ব্যাপৃত থাকে, উহার আয় হইতে সচ্ছলতা লাভ করে এবং পরের দ্বারে হাত পাতিবার মত অবস্থায় উপনীত না হয়। সুলতানের এই প্রকার প্রজা-কল্যাণমূলক মনোভাবের জন্যই তিনি ভিখারীদিগকে ভিক্ষা করার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া কোন সৎ পেশায় নিযুক্ত হইতে বলিতেন এবং পরের দ্বারে হাত পাতিবার দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজ্যের সর্ব-শ্রেণীর লোক নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত হইয়া বেশ সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দ্বারা এমন কোন অন্যায় ও অসহায়ভাব সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যাইত না, যাহার ফলে তাহাদের প্রতি কোনপ্রকার দুর্ব্যবহার করা যায় এবং তদ্দরুন তাহারা নিজেরাও নিঃস্ব, অসহায় ও অনন্যোপায় হইয়া পড়ে।

সুলতান নিজ খান্দান, সঙ্গীসাথী ও রক্ষীদিগকে প্রতিদিন, সপ্তাহ ও মাসে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন এবং তাহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া নিজ নিজ কার্যে নিয়োজিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। অবস্থা যেমনই হউক না কেন, সুলতান কখনও নিজ হাতে নিজের লালিত-পালিত অধীনস্থ লোকদের সর্বনাশ করিতে চাহিতেন না এবং কখনও কোন কারণে তাহারা দুঃখ কষ্ট পাইয়া যাহাতে অসহায় ও হতোদ্যম হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। কাহাকেও উচ্ছেদ, নির্বাসন ও অসহায় অবস্থায় ফেলিবার ইচ্ছা আদতেই তাঁহার চরিত্রে ছিল না।

কিন্তু সুলতান তুগলক শাহের ন্যায় এই প্রকার সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহেরও নিন্দুক ছিল। কারণ তিনি যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিচার করিতেন, প্রতিটি বিষয় যথাযথ করিবার চেষ্টা করিতেন এবং অযোগ্য লোকদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে সংগৃহীত সম্পদ ছিনাইয়া লইতেন। এইজন্য সেই সকল লোভী ও প্রতারক, যাহাদের লোভ লাখ লাখ ও হাজার হাজারেও তৃপ্ত হইত না, তাহারা এইরূপ একজন সুবিচারক ও খোশ-মেজাজী বাদশাহকেও দেখিতে পারিত না এবং তাঁহার বিরুদ্ধে নানাবিধ কুকথা বলিয়া বেড়াইত। সুলতান জালাল উদ্দিন খিলজী যেমন পুণ্যবান ও সত্যনিষ্ঠ হওয়া সত্বেও তাহার ছিদ্রান্বেষী লোকের অভাব ছিল না, ঠিক তেমনি সুলতান তুগলক শাহেরও দোষত্রুটি তাহারা বাহির করিত। কারণ লোভী, প্রতারক ও সোনা-রূপা তঙ্কা-চীতলের জন্য পাগল লোকজনের পক্ষে এমন একজন বাদশাহকে সহ্য করা সত্যি কঠিন, যিনি যোগ্যতা-অযোগ্যতা স্থান-অস্থানের বিচার করেন, প্রত্যেক বিষয় যথাযথভাবে সম্পন্ন

করিতে চাহেন এবং একবারেই নিজ খাজানাখানা লোভীদের সম্মুখে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দেন না। আসলে এই সকল লোকেরা এমন ধরনের বাদশাহ চাহে, যে খুব দানধ্যান করিতে পারে, আবার ইচ্ছামত লুটিয়াও লইতে জানে। একদিকে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়, অন্যদিকে খাজনাখানার সম্পদ বিলাইয়া দেয়। হাজার হাজার লোকের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে সম্পদ ছিনাইয়া লয়; আবার হাজার হাজারকে অহেতুক দান করিয়া বসে। সমৃদ্ধ খান্দানকে পথে বসায় এবং পথচারীকে ধনে-জনে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। নীচ, হেয়, অযোগ্য ও অধার্মিকদিগকে মর্যাদা দিয়া বড় করিয়া তোলে এবং তাহাদের জন্য সব প্রকারের সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা করে। আবার যাহারা যথার্থই যোগ্য, গণ্যমান্য ও পুণ্যবান, তাহাদিগকে হত্যা করে এবং নানানভাবে নির্যাতন করিয়া অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করে। একজনকে ধনভাণ্ডারের মালীক করে এবং অন্যজনকে দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে বলে। কাজেই এই ধরনের নীচমনা, হীনচেতা, লোভী ও প্রতারকদের পক্ষে একজন যথার্থ বাদশাহকে সহ্য করা, তাঁহাকে বন্ধু ভাবা ও তাঁহার প্রশংসা করা কখনই সম্ভবপর নহে। বরং কোন বাদশাহ যদি আলস্যপরায়ণ হয়; নীচ ও হেয় লোকদিগকে নিজের সঙ্গী বানায়; কুকাজ ও কুকথায় কোন ত্রুটি না ধরে; সর্ব প্রকারের অন্যায়, অবিচার, অধর্ম ও পাপ প্রকাশ্যে করিতে দেয়; কোনপ্রকার জ্ঞানগুণের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য না থাকে; তাহার সকল প্রচেষ্টা শুধু কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয় হয় এবং সৎ ও পুণ্যবান লোককে সে নিজের দুশমন বলিয়া মনে করে তাহা হইলে এই সকল লোকের নিকট এই বাদশাহ হয়ত প্রিয় হইতে পারে।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ তাঁহার রাজ্যের সহায়ক সকল শ্রেণীর লোকজনের জন্য পিতামাতা অপেক্ষাও অধিকতর দয়ালু ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রাপ্য সম্পর্কে নিজে অনুসন্ধান লইতেন এবং যাহাতে আমীরগণ তাহাদের প্রাপ্য হইতে একটি কড়িও অযথা ভোগ না করেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। দেওয়ান আরজে মুমালেকও যাহাতে তাহাদের নিকট হইতে অযথা কিছু গ্রহণ না করে, সেই সম্পর্কে যথারীতি খোঁজ লইতেন। সৈন্যদের দুঃখ-কষ্ট তাহাদের বালবাচ্চার খরচপত্র সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ-খবর রাখিতেন। তখতে বসিবার পর আরজে মুমালেকের পদ ও উহার যাবতীয় দায়িত্ব সিরাজুল মুলক খাজা হাজীকে অর্পণ করেন। লোকজনের অবস্থা ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা ও তীর তলোয়ারের পরীক্ষা, ঘোড়ার মূল্যমান ইত্যাদির যে ব্যবস্থা আলাই রাজত্বে ছিল, তাহাই ঠিক রাখিলেন। যে সকল অশ্বারোহী সৈন্যদলে নাম লিখাইবার পর নিজ কর্তব্য পালন করিত না, তাহাদিগকে যথারীতি শাস্তি দানের আদেশ দিলেন।

খসরু খান হইতে শাহী লোকজনেরা যে সকল সম্পদ লাভ করিয়াছিল, উহার কিছু অংশ লোকজনের এক বৎসরের বেতন হিসাবে ধরিয়া দিবার এবং বেতনের অতিরিক্ত অন্য অংশকে এক কালে আদায় না করিবার আদেশ দিলেন। এই অংশটি অতিরিক্ত ব্যয়ের দপ্তরে লিখিয়া আগামী বৎসরগুলিতে অল্পে অল্পে আদায় করিতে বলিলেন এবং যাহাতে লোকজনের অসুবিধা না হয়, তেমনভাবে বেতনের মধ্যে ধরিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। অবশ্য যে সকল ধন-সম্পদ লুট করিয়া জমা করা হইয়াছিল এবং উহার যে অংশ আরজে মুমালেকের কর্মচারী-দের মধ্যে অটুট ছিল, তাহা তেমনিভাবে শাহী খাজানাখানায় জমা করিয়া লওয়া হইল।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তাঁহার চারি পাঁচ বৎসরের রাজত্বকালে নিজ তত্ত্বাব-ধানে লোকজনকে প্রচুর সম্পদ দান করিলেও তাহাদের প্রাপ্য বেতনাদি সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখিতেন। যাহাতে নির্দিষ্ট বেতনের এক কড়িও কম না হয়, এইজন্য তিনি সকলের জন্য নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার এই ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন আমীরগণ এই নির্দিষ্ট প্রাপ্য সত্ত্বেও পূর্বাপেক্ষা অধীক খুশী হইয়াছিলেন এবং নবীন আমীররাও নানাভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন।

আলাই রাজত্বকালে যে সকল ইনাম, অজিফা, নিষ্কর গ্রাম ও জমি ছিল, সুলতান তুগলক শাহ বিনা অনুসন্ধানে তৎসমুদয় বহাল রাখিলেন। খসরু খানের চারি মাসকালীন শাসনে যে সকল বন্দোবস্ত নতুনভাবে শাহী ফরমান ও দেওয়ানের অনুমতি লাভ করিয়াছিল, সেইগুলিকে তৎক্ষণাৎ বাতিল করিয়া সম্পূর্ণ ফিরাইয়া আনিলেন। আলাই ও কুতুবী রাজত্বের শেষভাগে যে সকল ইনাম, অজিফা, নিষ্কর গ্রাম ও জমি বাদশাহের মাতাল ও অচেতন অবস্থায় নিজ নিজ অন্তরঙ্গ সভাসদদের পরামর্শে দেওয়া বা নতুনভাবে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তৎসমুদ-য়কে নিজের সম্মুখে আনিয়া অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল বন্দোবস্তের মধ্যে যেগুলি অযোগ্যপাত্রে অর্পিত হইয়াছিল এবং উহাতে সভা-সদদের স্বার্থ প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া লওয়া হইল। অন্যদিকে যেগুলির মধ্যে প্রাপকদের যোগ্যতা ও দানের উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া মনে হইয়া-ছিল, সেইগুলি বহাল রাখিয়া দিলেন।

দেওয়ানের তলব আদায়ের ব্যাপারে তুগলক শাহের ব্যবস্থা অপেক্ষা সহজ-তর কোন ব্যবস্থা দিল্লীর কোন সুলতান করিতে পারে নাই। যদি কয়েক লাখের মধ্যে কয়েক হাজার ও কয়েক হাজারের মধ্যে কয়েক শত আদায় হইত এবং দেওয়ানের আমলারা জানাইত যে, অমুক তাহার বকেয়া অনাদায়ের জন্য

কয়েদ হইয়া আছে, তথাপি সুলতান যথার্থ সহানুভূতির সহিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিতেন। যদি দুইলাখ তলব বাকীর মধ্যে দশ হাজার বা পাঁচ হাজার তঙ্কার মাল আসবাবের জামিন দিত, তবুও তিনি এই পরিমাণ আদায়েই আপোষ করিয়া তাহার মুক্তির আদেশ দিতেন এবং তাহাকে পূর্বতন কার্যে বহাল করিবার ফরমান জারী করিতেন। তলব বাকী অনাদায়ের জন্য কোন কয়েদীর অধিক-কাল কয়েদখানায় থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি কোন বিষয়েই চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেন না। তাঁহার একান্তই ইচ্ছা ছিল, যাহাতে রাজ্যের সকল নিয়ম-কানুন সহজে জারী হয় এবং তাঁহার নিজের ও সভা-সদদের তরফ হইতে এমন কোন নতুন নিয়ম জারী না হয়, যাহাতে লোকজনের মনে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে নিজের লোকজন দ্বারা কোনপ্রকার আতঙ্ক ও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াকে তিনি পছন্দ করি-তেন না এবং প্রজাদের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব তাঁহার ভাল লাগিত না। অনিয়ম অবিচার, অযথা কঠোরতা, যাহা জনসাধারণের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, তাহা সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহের নিকট অহেতুক বলিয়া মনে হইত।

কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃই অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌তালা কোরান শরীফে বলিয়া-ছেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ অতিশয় অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।' এইজন্য এইরূপ একজন পুণ্যবান, সত্যনিষ্ঠ, সৎলোকের আশ্রয় ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে লোভী, প্রতারক ও অধার্মিকরা দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না! যে সকল লোক সুলতান কুতুব উদ্দিনের মত্তাবস্থায় এবং খসরু খানের সম্ভাব্য পরাজয়ের আতঙ্ক ও অধর্মের প্রভাবের সময় প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করিয়াছিল, তাহারাই সুলতান তুগলক শাহের মন্দ বলিয়া বেড়াইত। এই সকল ধনসম্পদ তাহারা কোনপ্রকার যোগ্যতার জন্য লাভ করে নাই। কাজেই তাহাদের নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লওয়ার ফলে তাহারা লোকজনের নিকট এমন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করিত, তাঁহারা রাজ্যের অমঙ্গল চাহিত, পরস্পরের নিকট আভাসে ইঙ্গিতে নানাপ্রকার অকৃতজ্ঞতা ও অবিবেচনার কথা প্রকাশ করিত এবং এমন একজন দয়ালু বাদশাহকে কৃপণ বলিয়া দোষ দিত।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি জিয়া বারানী বহু অভিজ্ঞ ও সুবিবেচক লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, জনসাধারণের কল্যাণ ও মুসলমানদের সর্বাঙ্গীণ কুশলের ব্যাপারে সুলতান তুগলক শাহের ন্যায় এমন যোগ্য বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে পূর্বে বসেন নাই এবং তাঁহার পরেও বসিবেন কিনা বলা যায় না। জ্ঞান, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও বাদশাহের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন বলিয়া সর্ব

লোকে মনে করে অথবা গ্রন্থাদিতে যে সকল গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, আল্লাহ্-তা'লা তৎসমুদয় পরিপূর্ণভাবে তুগলক শাহকে দান করিয়াছিলেন। বীরত্ব, উদারতা, বুদ্ধি, দক্ষতা, দয়া, সুবিচার, ধার্মিকতা, অমায়িকতা, সত্যনিষ্ঠা, দায়িত্ব-পালন, বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের একত্র সমাবেশ তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল।

যদি শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সুলতান তুগলক শাহের তখতে বসার প্রথম বৎসরেই যেভাবে তাঁহার শাসনব্যবস্থা রাজ্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা অন্য যে কোন বাদশাহের পক্ষে এক যুগেও লাভ করা সম্ভব হইত না। যদি ধার্মিক ও ধর্মের পোষক হিসাবে বিচার করা যায়, তবে দেখিতে পাইব যে, সুলতান তুগলক শাহ মালীক থাকা অবস্থাতেই দীনে ইসলামের সহায়ক রূপে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার তরবারির জোরে মোগল আক্রমণের পথ বন্ধ হইয়াছিল। বাদশাহীর সময় মোগলরা তাঁহার ভয়ে সীমান্তে আসিত না এবং নদী পার হইয়া কোন মুসলমানকে বিরক্ত করিতে সাহস করিত না। সুলতান তুগলক শাহের তরবারি বিধর্মী ও অকৃতজ্ঞদের উপর এমনভাবেই বিজয়ী হইয়াছিল যে, মোগলরা যেমন উহার ভয়ে সীমান্তে আসিত না, তেমনি রাজ্যের অভ্যন্তরের বিদ্রোহপ্রিয় লোক এবং রাজ্যের বাহিরের হিন্দু রাজাগণ মাথা তুলিতে ভয় পাইত। যদি কেহ বাদশাহের নিকট হইতে সুবিচার, ধর্মের শাসন ও সুকাজ-কুকাজ সম্পর্কে নির্দেশ আশা করে, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সুলতান তুগলকের পরিপূর্ণ সুবিচার ও সুশাসনের ফলে সবল দুর্বলের উপর হাত তুলিতে সাহসী হইত না। তাঁহার ভয়ে বাঘে হরিণে এক ঘাটে পানি পান করিত। ইসলামী শরীয়ত জারী করিবার জন্য তিনি কাজী, মুফতী, দাদবেগ, মুহতাসিব প্রভৃতি পদকে যথেষ্ট গুরুত্বদান করিয়াছিলেন। যদি বাদশাহের মধ্যে নিজ লোকজনকে সুসজ্জিত রাখিবার গুণ কেহ অনুসন্ধান করে, তবে সুলতান তুগলক শাহ এই ব্যাপারেও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ইহাদের সাহায্যেই রাজ্যের রক্ষা, ধর্মের পোষকতা ও ইসলামের জয় সুলভ হইয়া উঠিবে। এইজন্যই তাঁহার তখতে বসিবার পরই হাজার হাজার অশ্বারোহী সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেনাপতি হিসাবে অভিজ্ঞ লোকেরা নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বে সকলপ্রকার কর্মচারী পরি-পূর্ণ বেতন পাইত এবং তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে এক কানা কড়িও কম পড়িত না।

যদি কোন বাদশাহের মধ্যে প্রজাপালনকে আবশ্যকীয় গুণ বলিয়া মনে করা হয়, তবে বলিতে হয় যে, মালীক থাকা কাল হইতেই সুলতান তুগলক প্রজাপালক

হিসাবে হিন্দুস্তান ও খোরাসানে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল প্রচেষ্টা খাল খনন, বাগান প্রতিষ্ঠা, দুর্গ নির্মাণ, কৃষি কার্যের ব্যবস্থা, জনসাধারণের নিরাপত্তা, পুনর্বাসন ও পতিত উদ্ধার প্রভৃতি কাজে ব্যয়িত হইয়াছিল। সুলতান তুগলক শাহ প্রজাপালনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল প্রজাপালক বাদশাহগণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি আরও কয়েক বৎসর তিনি দিল্লীর সিংহাসন অলংকৃত করিয়া থাকিতেন এবং মৃত্যু তাঁহাকে অকালে আহ্বান করিয়া লইয়া না যাইত, তবে আল্লাহ্ জানেন, আরও কত উজাড় ঘর আবাদ হইত ও কত অনুর্বর ময়দান সবুজ বাগ বাগিচায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় নদীগুলি বহুক্রোশ ও 'ফরসংগ' অবধি পরিষ্কৃত হইয়া নতুন স্রোতে ভরিয়া যাইত। জনসাধারণের পেশা ও কৃষিকার্যে আরও কত সহজ ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিত। শস্যের সুলভ মূল্য ও নানাবিধ আসবাবপত্রের সুলভ ব্যবস্থার উন্নতি হইত। দালান-কোঠা ও দুর্গ নির্মাণের যে ব্যাপক পরিকল্পনা এই অভিজ্ঞ বাদশাহের অন্তঃকরণে ছিল, উহার সাক্ষীস্বরূপ তুগলকাবাদের পত্তন কিয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

যদি কোন বাদশাহের নিকট হইতে রাস্তার নিরাপত্তা ও চোর-ডাকাতের উচ্ছেদ আশা করা যায় যে, খোদাতালা সকল চোর-ডাকাতের মনে সুলতান তুগলক শাহের তরবারির ভয় এমনভাবে অংকিত করিয়া দিয়াছিলেন, যদ্দরুন তাঁহার রাজত্বকালে দুষ্কৃতিকারী ও ডাকাতরা রাস্তার রক্ষক হইয়া উঠিয়াছিল। যে সকল ডাকাতদল ডাকাতি ছাড়া অন্য কিছু করিতে জানিত না, তাহারা নিজেদের তরবারি ভাঙ্গিয়া ধনুক বিক্রয় করিয়া কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশা অবলম্বন করিল। ডাকাতির কথা কাহারও মুখে শোনা যাইত না এবং চোর-ডাকাতের ভয় কাহারও মনে উদিত হইত না। তাঁহার রাজত্বকালে এমন সাহস কাহারও ছিল না যে, অপরের সামান্য জিনিসও আত্মসাৎ করিয়া বসে। তাঁহার তরবারির ভয়ে শুধু নিজের রাজ্যে নহে, গজনীর রাস্তাঘাটেও চুরি ডাকাতি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোনপ্রকারেই সওদাগর ও পথিকদের ধনসম্পদে কাহারও হস্তক্ষেপ করার সাহস হইত না।

যদি কোন বাদশাহের মধ্যে ইমান, শরাশরিয়ত, জেহাদ ও আত্মার পবিত্রতা প্রভৃতি গুণাবলী তথা ইসলামী খলিফাদের আচার-আচরণ পাওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে দেখা যাইবে যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন কুপ্রবৃত্তির দাস বাদশাহের তুলনায় বহুগুণে বেশী পবিত্রতা ও ধার্মিকতার দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন। তিনি সর্বদা পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতে আদায় করিতেন। এশার নামাজ জামাতে আদায় না করিয়া হারেমে প্রবেশ করিতেন না। জুমা ও ঈদের নামাজে সর্বদা

উপস্থিত থাকিতেন। রমজানের ত্রিশ রাত্রিতেই তারাবীর নামাজ আদায় করিতেন। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, রমজানের রোজা তিনি কখনও স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ও আত্মার পবিত্রতার অবস্থা এই ছিল যে, কখনও কোন কিশোর, মালীক ও গোলামদের সুন্দর বালক এবং মহলের সুন্দর চাকর-নফরকে নিজের আশে-পাশে ঘোরাফেরা করিতে দেন নাই। যদি কাহারও সম্পর্কে ছোকড়া-বাজীর ন্যায় কোন দুকর্মের কথা শুনিতেন, তাহাকে নিজের শত্রু মনে করিতেন। যতদূর মনে হয়, তিনি কখনও ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই। বাদশাহী আমলেও কখনও শরাবের জলসা বসান নাই। রাজধানীতে বিশিষ্ট ও সাধারণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই শরাব পান নিষিদ্ধ ছিল। মালীকী ও বাদশাহী কোন অবস্থাতেই তিনি জুয়া খেলেন নাই। এমন সব ভোগ-সম্ভোগ, যাহা প্রায় সকল বাদশাহের মধ্যেই দেখা যায়, যেমন মদ্যপান ও ছোটখাট পাপ; সুলতান তুগলককে কেহ এই সবের মধ্যেও দেখে নাই। তাঁহার ইসলামী ধ্যান-ধারণায় কুধর্মীদের মতামত, যুক্তিতর্কের কূটজাল ও বিধর্মীদের চাল-চলনের কোন স্থান ছিল না। মরহুম সুলতান অধিকাংশ সময় অজুর সহিত কাটাইতেন। মিথ্যা বাগাড়ম্বর ও অযথা আস্ফালন তাঁহার মুখে কখনও শোনা যায় নাই। বাল্যকাল হইতে যৌবন এবং যৌবন হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত প্রতারণা, অকৃতজ্ঞতা, কুধারণা, বিদ্রোহ ও গোলযোগ সৃষ্টির কোন ভাব তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। শত্রু ও কুলোকদের মুখে যে সকল কথা শোনা যায়, খোদাতালা তাঁহাকে সেই সব অন্যায় ও পাপ হইতে সারা জীবন মুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা সম্মান ও উদারতা, মহত্ব ও দানশীলতার জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

যদি কোন বাদশাহের মধ্যে অপরের যোগ্যতা বিচারের ক্ষমতা, গুণগ্রাহিতা ও যথাযোগ্য প্রতিদান দেওয়ার অভ্যাস থাকা প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে সুলতান তুগলক শাহ পূর্বাপর সকল বাদশাহের মধ্যে এই বিষয়ে অধিক বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ক্রমানুয়ে উন্নতি লাভ করিয়া বাদশাহীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যেসকল লোক তাঁহাকে আমীর থাকাকালে সাহায্য বা তাঁহার খেদমত করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি মালীক হইয়া যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহাকে মালীক অবস্থায় সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি বাদশাহ হওয়ার পর যথেষ্ট দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রাচীন খেদমতগারদের প্রতি তিনি এমন সদয় ব্যবহার করিয়াছেন যে, কোন দয়ালু পিতাও নিজ সন্তানের প্রতি তাহা করে না। নিজ প্রবীণ সঙ্গীদিগকে তিনি সন্তান ও ভ্রাতার ন্যায় সমাদরে প্রতিপালন করিয়াছেন। তিনি তাহাদের অশ্বশালাকে নিজের অশ্বশালা বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাদের গোলাম-বাঁদীদের প্রতি কোনপ্রকার

দুর্ব্যবহার হওয়াকে তিনি কখনও সুনজরে দেখেন নাই। তাঁহার একান্ত গুণগ্রাহিতা, কৃতজ্ঞতা ও দয়াশীলতার ফলেই তুগলক শাহ তাঁহার প্রাচীন সহায়ক ও খেদমতগারদের সঙ্গে আচার-আচরণ করিতে গিয়া কখনও মেজাজ দেখান নাই; বরং আমীর ও মালীক থাকাকালে তিনি যেভাবে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, যেভাবে তাহাদের শাদীগমীতে শরীক হইয়াছেন, ঠিক তেমনভাবে বাদশাহী অবস্থাতেও তাহাদিগকে আদর-আপ্যায়ন করিয়াছেন ও নিজের সঙ্গে মিশিতে দিয়াছেন। নিজ চাকর-নফর ও গোলাম-বাঁদীদের প্রতিও তিনি শাহী জাঁক-জমকের সহিত ব্যবহার করেন না; বরং প্রাচীন প্রথাকেই চালু রাখিয়াছিলেন।

সহজাত বীরত্ব, যুদ্ধের নানাবিধ ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকৌশলের দিক হইতে হিন্দুস্তান ও খোরাসানে সুলতান তুগলক শাহের ন্যায় অভিজ্ঞ আর কেহ ছিলেন না। সকল সেনাপতি ও বীরপুরুষই একবাক্যে এই কথা স্বীকার করিতেন। যদি তাঁহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তৎ সম্বন্ধীয় কলা-কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে যাই, তাহা হইলে পৃথক একটি গ্রন্থ লিখিতে হয়। আক্ষেপ এই যে, তিনি অধিককাল বাদশাহী করিতে পারেন নাই। তথাপি যে কয় বৎসর দিল্লির সিংহাসনে ছিলেন, সেই স্বল্পকালেই পূর্ব পশ্চিমে ইসলামের পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হইয়াছিল এবং বহু বিধর্মীদেশ ও রাজ্য তাঁহার শাসনাধীনে আসিয়াছিল। আমীর ও মালীক থাকা অবস্থায় তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কাহিনীর কোন রুস্তমের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। যদি বাদশাহ অবস্থায় তিনি মৃত্যুর হাত হইতে আরও কিছুকাল অব্যাহতি পাইতেন, তবে তাহাই করিতেন, যাহা কোন সেকান্দর বাদশাহের পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব নহে। সুলতান আলাউদ্দিন বহু বৎসরের কঠোর ব্যবহার, রক্তপাত ও জাঁকজমকের দ্বারা যে শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, সুলতান তুগলক শাহ তেমন কঠোরতা ও রক্তপাত ছাড়াই মাত্র চারি বৎসর কয়েক মাস সময়ে উহার অধিকারী হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তুগলক শাহের রাজত্বকালকে আল্লাহ্ তালার অপূর্ব দান হিসাবে মনে করিতেন এবং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিয়া সুলতানের জন্য দোয়া ও তাঁহার প্রশংসায় নিজেদের নিয়োজিত রাখিতেন। লোভী, প্রতারক ও অবিবেকীরা, যাহাদের লোভ-লালসা কারূনের সম্পদেও পূর্ণ হইবার নহে, তাহারাই এইরূপ একজন সুলতানের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার কুৎসা রটনা করিত এবং তাঁহার রাজ্যের বিনাশ কামনায় তৎপর থাকিত।

তৎকালে উলুগ খান উপাধিধারী সুলতান মুহম্মদকে প্রথমবার অরণ্যকুল অভিযানে পাঠাইবার বিবরণ

৭২১ হিজরীতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ সুলতান মুহম্মদকে ছত্র দান করিয়া সুসজ্জিত সৈন্যদল সহ অরণ্যকুল ও তেলেঙ্গানা প্রদেশে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কতিপয় প্রবীণ আলাই আমীর ও সুলতানের নিজস্ব আমীরদের মধ্য হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট আমীরকে পাঠাইলেন। সুলতান মুহম্মদ শাহী জাঁকজমক ও প্রচুর সৈন্য সহ অরণ্যকুলের পথে যাত্রা করিলেন। দেবগিরি উপস্থিত হইয়া তথাকার যোগ্য আমীর ও লোকজনকে সঙ্গে লইয়া সুলতান মুহম্মদ ক্রমে ক্রমে তেলেঙ্গানা রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। সুলতান তুগলকের রাজ্যশাসন ও সুলতান মুহম্মদের তরবারির ভয়ে রাজা লদ্দর দেব সকল রায় ও মুকদিম সহ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তাহারা যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। সুলতান মুহম্মদ মাটির দুর্গের নিকট পৌঁছিয়া উহা অবরোধ করিলেন এবং কয়েকজন আমীরকে তেলেঙ্গানা অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া ধনসম্পদ সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাহাদের অবাধ লুণ্ঠনের ফলে প্রচুর ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র সৈন্যদলের হাতে আসিল এবং তাহারা সর্বতোভাবে সুসজ্জিত হইয়া দুর্গ জয়ের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অরণ্যকুলের মাটি ও পাথরের দুর্গে বহু হিন্দু একত্র হইয়া নানাভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে 'মাগবেরী' ও 'গার্রারা' বিনিময় হইতে লাগিল এবং প্রতিদিন তুমুল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। দুর্গের ভিতর হইতে উহারা অগ্নিবান নিক্ষেপ করিতেছিল। ইহার ফলে উভয় পক্ষেই বহু লোক নিহত হইল। মুসলমানরা হিন্দুদের উপর বিজয়ী হইয়া প্রতিদিনই তাহাদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিতেছিল। এইজন্য অরণ্য কুলের মাটির দুর্গ জয় হইবার প্রাক্কালে লদ্দর দেব বহু রায় ও মুকদিমদের একটি দলের মাধ্যমে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। বহু ধনসম্পদ ও উপঢৌকন সহ শেঠদিগকে সুলতান মুহম্মদের খেদমতে প্রেরণ করিলেন। ইহা ছাড়াও বহু ধনরত্ন ও হাতী-ঘোড়া দেওয়ার অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি পূর্বে যেভাবে মালীক নায়েবকে ধনরত্ন ও হাতী-ঘোড়া দিয়া ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন, ঠিক তেমনভাবে সুলতান মুহম্মদকে ধনরত্ন দিয়া ও খেরাজ কবুল করিয়া ফেরৎ পাঠাইবেন। কিন্তু সুলতান মুহম্মদ তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং শেঠরা ধনরত্ন সহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। তিনি যুদ্ধ করিয়া দুর্গ জয় করিতে মনস্থ করিলেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

দুর্গ জয়ের জন্য অবিরাম যুদ্ধ ও দুর্গবাসীদের সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ ইত্যাদি ব্যাপারে প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে সুলতান তুগলক শাহের নিকট হইতে কোন সংবাদবাহক আসে নাই। সুলতান মুহম্মদ প্রতি সপ্তাহে পিতার নিকট হইতে দুই তিনবার উপদেশ পাইতেন; কিন্তু এই একমাসে কোন সংবাদ না পাওয়ার ফলে সুলতান মুহম্মদ স্বয়ং ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সাথীরা কিছুটা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে হইল যে, মধ্য পথে কোথাও কিছু সংখ্যক থানা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহার ফলে সংবাদ বাহকরা পৌঁছিতে পারিতেছে না। সুলতান মুহম্মদের এই চিন্তিত হওয়ার কথা সৈন্য দলে ছড়াইয়া পড়িল; ফলে সৈন্যদের মধ্যে নানাপ্রকার কুধারণার সৃষ্টি হইল এবং সর্বত্র একটা সন্ত্রাসের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সৈন্যদলের মধ্যে আবিদ শায়ের ও শায়খজাদা দামেশকী নামে খুবই বিশৃংখলা পরায়ণ ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী দুইজন লোক ছিল। তাহারা এই সুযোগে সুলতান মুহম্মদ কোন কিছু বলিবার পূর্বেই সৈন্যদলে গুজব ছড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল যে, দিল্লীতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মারা গিয়াছেন এবং তখতে অন্য কেউ আরোহণ করিয়াছে। ইহার ফলে সংবাদ আদান-প্রদানের সকল পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল এবং আবিদ শায়ের ও শায়খজাদা দামেশকীর ন্যায় প্রতারক ও অকৃতজ্ঞ লোকের গুজবে ভুলিয়া এক বিরাট গোলমাল পাকাইয়া তুলিল। তাহারা মালীক তমর, মালীক তকীন, মালীক মনখ আফগান, মালীক কাফুর মোহরদারের ন্যায় প্রবীণ মালীকদের নিকট গিয়া বলিল, সুলতান মুহম্মদ আপনাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করে; এইজন্য আপনাদের নাম নিধন-যোগ্য মালীকদের তালিকায় লিখিয়া রাখিয়াছে এবং দরকার মত সে একদিনেই আপনাদের চারিজনের গর্দান উড়াইয়া দিবে। মালীকরা এই প্রতারকদ্বয়কে সুলতান মুহম্মদের আশে-পাশে অত্যধিক ঘোরাফিরা করিতে দেখিতেন। এই-জন্য শুনিবামাত্রই তাহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন এবং সকলে একমত হইয়া নিজ নিজ সৈন্যসহ সৈন্যদল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সৈন্যদল হইতে তাহারা পৃথক হইয়া যাওয়ায় সর্বত্র হৈ চৈ ও গোলযোগের সৃষ্টি হইল; কাহারও সহিত কাহারও যোগাযোগ রহিল না।

দুর্গ অবরুদ্ধ হিন্দুরাও জানিতে পারিল যে, মুসলমান সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। ইহাতে তাহারা মুক্তির স্বাদ লাভ করিল এবং দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া বেপরোয়াভাবে অবরোধের সকল ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে লাগিল। নিরুপায় সুলতান মুহম্মদ তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গীদল সহ দেবগিরির দিকে যাত্রা

করিলেন। তাঁহার গমনের ফলে সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তাহারা বিশৃঙ্খল ভাবে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ইতোমধ্যে সুলতান মুহম্মদের নিকট দিল্লী হইতে সংবাদবাহকরা আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা বাদশাহের কুশল সংবাদ ও নির্দেশ জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদের ফলে যে সকল মালীক একতাবদ্ধ হইয়া সৈন্যদল ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং তাহারা নিজ নিজ পথ ধরিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল ও তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র হিন্দুদের আয়ত্তে চলিয়া আসিল। অবশিষ্ট সৈন্যসহ সুলতান মুহম্মদ শান্তির সহিত দেবগিরি পৌঁছিলেন। সেখানে সৈন্যদল পুনরায় একত্র হইল। কিন্তু ইতোমধ্যে মালীক তমর কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ হিন্দুদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন; তিনি সেখানেই নিহত হইলেন। অযোধ্যার আমীর মালীক তকীনকেও হিন্দুরা হত্যা করিয়াছিল তাহারা তাহার চামড়াও দেবগিরিতে সুলতান মুহম্মদের নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহারা মালীক মলখ আফগান, আবিদ শায়ের ও অন্যান্য গোলযোগ সৃষ্টিকারীকেও বাঁধিয়া দেবগিরিতে পাঠাইল এবং সুলতান মুহম্মদ তাহাদের সকলকেই পিতা সুলতান তুগলক শাহের নিকট দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন।

অবশ্য তাহাদের দিল্লীতে আসিবার পূর্বেই তাহাদের পুত্র-পরিজনদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সুলতান গিয়াস উদ্দিন উহারা দিল্লীতে পৌঁছিলে সিরিতে দরবারে আম ডাকিলেন। আবিদ শায়ের, কাফুর মোহরদার ও অন্যান্য গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে জীবিত লটকাইয়া দিলেন এবং অন্য কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ও তাহাদের বালবাচ্চাকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। এই দিন সিরির ময়দানে যেরূপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল, উহার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত দর্শকদের অন্তরে জাগরূক ছিল। সুলতান গিয়াস উদ্দিন যেভাবে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া ইহাদের পুত্র-পরিজনকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, উহার ফলে শহরের সমস্ত লোকজনের মধ্যে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল।

অরণ্যকুল অভিযানে সুলতান মুহম্মদকে দ্বিতীয়বার পাঠাইবার বিবরণ

পুনরায় চারি মাস পরে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ সুলতান মুহম্মদকে নতুনভাবে সজ্জিত করিয়া আরও বেশী সংখ্যক সৈন্য দিয়া অরণ্যকুল অভিযানে পাঠাইলেন। সুলতান মুহম্মদ পুনরায় সসৈন্যে তেলেঙ্গানা রাজ্যে আসিলেন। তথাকার বদোরা দুর্গ জয় করিয়া উহার মুকদ্দিমদিগকে নিজ আয়ত্তে আনিলেন

এবং সেখান হইতে অরণ্যকূলে পৌঁছিলেন। এইবার মাটির দুর্গ অবরোধ করিয়া অবিরত কয়েক দিন তীর ও মাগরেবী পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে দুর্গের সকল পথ উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। লদ্দর দেব ও অন্যান্য মুকদ্দিমদিগকে তাহাদের পুত্র-পরিজন, ধন-রত্ন ও হাতী-ঘোড়াসহ বন্দী করিলেন। তিনি দুর্গজয়ের সংবাদ যথাসম্ভব শীঘ্র দিল্লীতে পাঠাইলেন। এই উপলক্ষে দিল্লী, সিরি ও তুগলকাবাদে গম্বুজ তৈরী করিয়া উৎসব পালন করা হইল এবং সর্বত্র আনন্দবাদ্য বাজান হইল। সুলতান মুহম্মদ তেলেঙ্গানার রাজা লদ্দর দেবকে তাঁহার লোকজন, ধনরত্ন ও হাতী-ঘোড়াসহ কদর খান উপাধিধারী মালীক বেদার ও নায়েব মুমালেক খাজা হাজীর মাধ্যমে দিল্লীতে সুলতানের খেদমতে প্রেরণ করিলেন। অরণ্যকূলের নাম পরিবর্তন করিয়া সুলতানপুর রাখিলেন। তেলেঙ্গানার সমুদয় অঞ্চল যথারীতি সুলতানী শাসনাধীনে আনিলেন। সেখানে কেতাদার ও ওয়ালী নিযুক্ত করিলেন। যথা নিয়মে মুতসর্রিফ ও আমলা নিযুক্ত করিয়া উক্ত অঞ্চল হইতে এক বৎসরের খেরাজ আদায় করিলেন।

পরে অরণ্যকূল হইতে সুলতান মুহম্মদ যথারীতি জাজনগরের দিকে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। উহা অধিকার করিতে তাঁহাকে খুব বেগ পাইতে হইল না। সেখান হইতে চল্লিশটি হাতী হস্তগত করিয়া বিজয়ীর বেশে পুনরায় তেলেঙ্গানায় ফিরিয়া আসিলেন। বিজিত ধনরত্নসহ হাতীগুলি যথানিয়মে সুলতানের খেদমতে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহের লক্ষণাবতী, সোনারগাঁও ও সপ্তগ্রামে সসৈন্যে অভিযান পরিচালনা এবং উক্ত অঞ্চলগুলিকে জয়করণ ও লক্ষণাবতীকে শাসনাধীনে আনয়নের বর্ণনা

যে সময়ে অরণ্যকূল বিজিত হইল ও জাজনগর হইতে হাতীর দল আসিয়া দিল্লীতে পৌঁছিল, তখন মোগলরা রাজ্য সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। মুসলমান সৈন্যরা প্রচণ্ড আক্রমণে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া অনেককে বন্দী করিল এবং দুইজন সেনাপতিসহ তাহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া আসিল।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলকাবাদকেই রাজধানী করিয়াছিলেন এবং মালীক আমীর ও পুত্রপরিজন সহ সেখানেই বসবাস করিতেছিলেন। এই সময়ে লক্ষণাবতীর কিছু সংখ্যক আমীর সুলতানের খেদমতে তথাকার শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। তাহাদের অত্যাচারে ও অন্যায় জবরদস্তির ফলে সেখানকার

মুসলমানরা কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহার করুণ বিবরণ তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। সুলতান এইরূপ দুরবস্থার কথা শুনিয়া লক্ষণাবতীতে যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি যথাশীঘ্র সুলতান মুহম্মদকে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে প্রতিনিধি করিয়া এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজ্যের সকল দায়িত্ব পরিচালনার ভার দিয়া সুলতান সৈনিকদল সহ লক্ষণাবতী যাত্রা করিলেন। তিনি এই পানি কাদার পথে নদনদী ও খালবিল পার করাইয়া এমনভাবে সৈন্যদলকে লইয়া আসিলেন যে, উহার ফলে কাহারও মনে কোনপ্রকার অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হইল না।

সুলতান তুগলক শাহের প্রভাব প্রতিপত্তি তখন সমগ্র হিন্দুস্তান ও খোরাসানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার নাম শোনামাত্র সকলের মনে ভয়ের সঞ্চার হইত। এই জন্যই সুলতানী পতাকার ছায়া ত্রিহুতে পড়িবামাত্র লক্ষণাবতীর শাসক সুলতান নাসির উদ্দিন যথাযোগ্য বিনয়ের সহিত অগ্রসর হইয়া সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং ভূমি চুম্বন করিলেন। তুগলকী তরবারি চমকিত হইবার পূর্বেই উক্ত অঞ্চলের সমস্ত রাজা ও রায়গণ সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। সুলতানের পোষ্যপুত্র তাতার খান, যিনি জাফরাবাদের কেতাদার ছিলেন, সুলতান তাঁহাকে প্রচুর সৈন্যসহ উক্ত অঞ্চলকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। তিনি যথারীতি অগ্রসর হইয়া সোনার গাঁয়ের বিদ্রোহী শাসক বাহাদুর শাহকে বন্দী করিয়া সুলতানের খেদমতে উপস্থিত করিলেন। ঐ অঞ্চলের সমস্ত হাতী-ঘোড়া সুলতানী সৈন্যদলে আনিয়া যোগ করা হইল। ঐ অঞ্চলে মুসলমান সৈন্যরা চতুর্দিক লুট করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিল। সুলতান নাসির উদ্দিনকে তাহার সুখেদমতের জন্য প্রতিদানস্বরূপ সুলতান তুগলক শাহ পুনরায় তাঁহার হাতে লক্ষণাবতীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে সসম্মানে লক্ষণাবতীতে ফেরৎ পাঠাইলেন। সোনারগাঁও ও সপ্তগ্রামের সকল অঞ্চল যথারীতি আয়ত্তাধীনে আনা হইল। সোনারগাঁয়ের বিদ্রোহী শাসক বাহাদুর শাহকে গলায় জিঞ্জির বাঁধিয়া শহরের দিকে পাঠাইলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বিজয়ীর বেশে তুগলকাবাদে ফিরিতে মনস্থ করিলেন। দিল্লীতে বাঙ্গালাদেশ জয়ের সংবাদ মিম্বরগুলি হইতে পাঠ করা হইল এবং সর্বত্র গম্বুজ তৈরী করিয়া নানাবিধ আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করা হইল। ফিরিবার পথে সুলতান তুগলকের সৈন্যদলেও আমোদ-স্ফূর্তি দেখা দিল। তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে নিজ ইচ্ছামত অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহার ফলে এক দিনে তাহারা দুই দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিল।

সুলতান গিয়াস উদ্দিনের রাজধানী তুগলকাবাদের নিকটে আসিয়া কওশক মজিলের নবনির্মিত ছাদের নীচে অবতরণ করা ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া এবং এইরূপে একজন মহান বাদশাহের মৃত্যুতে রাজ্যর অবস্থা শোচনীয় হওয়ার বিবরণ

সুলতান মুহম্মদ যখন শুনিলেন যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন সৈন্যদল হইতে পৃথক অবস্থায় রাজধানী তুগলকাবাদে ফিরিবেন, তখন তিনি তুগলকাবাদ হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে আফগানপুরের নিকটে একটি ক্ষুদ্র মহল তৈয়ার করাইলেন। সুলতান রাজধানীতে ফিরিবার পথে প্রথমে এই স্থানে অবতরণ করিবেন। তুগলকাবাদ অসিবার পথেও সুলতান মুহম্মদ বিভিন্ন তোরণ ও গম্বুজ প্রস্তুত করাইলেন এবং উক্ত সমুদয় স্থানে উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন জোহরের নামাজের সময় এই নব নির্মিত মহলে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে বিশ্রাম করিলেন। সুলতান মুহম্মদ সকল মালীক ও আমীর সহ সেখানে উপস্থিত থাকিয়া ভূমি চুম্বন করিলেন এবং বাদশাহকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন ও উপস্থিত সকলের জন্য সেখানে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুলতান দস্তরখানে বসিলেন, মালীক ও আমীররা হাত ধুইবার জন্য বাহিরে আসিলেন, এমন সময় হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। সুলতান যেখানে বসিয়াছিলেন, মহলের সেই অংশের ছাদ অকস্মাৎ তাঁহার উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চারি পাঁচ জন সঙ্গীসহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এমন একজন বাদশাহ, যাহার প্রভাব প্রতিপত্তিতে সমস্ত জগৎ কম্পিত হইত, তিনি চারি গজ মাটির কবরে সমাহিত হইলেন। কবি বলেন,

হে অন্ধ আকাশ, তুমি কি দেখিতে পারিয়াছিলে, যখন
দীন-দুনিয়ার মালীক চারি গজ মাটির কবরে অন্তর্ধান করিলেন!

সুলতান তুগলক শাহের মৃত্যুতে যথার্থই রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। পয়ার—

তুমি দেখিলেত মিশরের ন্যায় রাজ্যও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে;
তুমি শুনিয়াছত নীলনদের ন্যায় বিরাট জলস্রোত মরীচিকায় পরিণত হইয়াছে!
শান্তি ও সুচিন্তার সেই প্রতিমূর্তিও দর্শকদের চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে;
গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে শোকের ছায়া পড়িয়াছে এবং সকল বস্তু অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে।

এই কারণেই যাহারা এই দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়াছেন, এই অবিচারী অত্যাচারীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন, একটি রুটি ও একটু নুনের উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছেন এবং নিজেদেরকে অপরের দর্শনীয় বস্তু হিসাবে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা যাহাদের নাই; তাহারাই বলিতে গেলে যথার্থ মানুষ। জগতের জন্য এই দৃষ্টান্তইত যথেষ্ট যে, বাদশাহ এক বিরাট দেশ জয় করিয়া বিজয়ী রাজধানীতে ফিরিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র-পরিজনের মুখ দেখিবারও সময় পাইলেন না। জাঁকজমকের শাহী তখত হইতে একেবারেই মাটির নীচের গোরে আশ্রয় লইলেন। কবি বলেন,

তুমি বলিতেছ, কোথায় গেল সেই মুকুটধারীরা;
যাহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া মাটি এমন চিরস্থায়ী গৌরবের
অধিকারী হইয়াছে।

নওশেরোয়াঁর কলিজার খুনকে হরমুজের মাথার খুলিতে
মদহিসাবে ব্যবহার করিয়া মাটি এমন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।
কায়রা কমলা-লেবুর সাথে আর পারভেজ
সোনালী রঙের ঘাসের সাথে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

সুলতান মুহম্মদ শাহ ইবনে তুগলক শাহ

সদরে জাহান—কাজী কামাল উদ্দিন : সুলতানের ভাই বাহরাম খান ; সুলতানের ভাই মাহমুদ খান ; সুলতানের ভাই মাসুদ খান ; সুলতানের ভাই মোবারক খান ; সুলতানের ভাই নসরত খান ; খাজা জাহান আহমদ আয়ায ও উজিরুল মুলক ; মালীক কবীর কবুল খলিফতী ; ইমাদুল মুলক সেরতেজ সুলতানী ; মালীক মকবুল নায়েব উজির ; মালীক আইনুল মুলক মাহরু ; তাতার খান বুজর্গ ; কদর খান—সের জানদার মায়মনা ও লক্ষণাবতীর ওয়ালী ; সুলতানের উস্তাদ কতলুগ খান—নায়েব দৌলতাবাদ ; সুলতান তুগলকের পোষ্য পুত্র তাতার মুলক ; নুসরত খান মালীক শিহাব উদ্দিন সুলতানী ; মালীক এখতিয়ার দবির ; মালীক ইউসুফ বগরা আখোর বেক মায়মনা ; মালীক আয়বা অমর খান ; মালীক জজর আবু রেজা ; মালীক সাদ মস্তেকী ; সের দোয়াত দারের পুত্র মালীক খলিল ; মালীক ফখর উদ্দিন দৌলত শাহ ও দস্তারী ; মালীক মুখতাসুল মুলক জয়নবান্দা ; শাহজাদা মুয়েজ উদ্দিন নায়েব গুজরাট ; মালীক মনজুর করক ; মালীক সফদর মুলক সুলতানী আখোর বেক মায়মরা ; মালীক উমদাতুল মুলক শরফ উদ্দিন দবির ; মালীক গজনীন ; আফগানের ভাই মালীক মুখ আফগান ; মালীক আজিজ হেমার বদ আসল ; মালীক সাহু লোদী আফগান ; মালীক করণফল সেবাক ; মালীক ফিরুজ অর্থাৎ সুলতান ফিরুজ শাহ—বারবেক মুলক ; নেকপী সের দোয়াতদার ; খোদাওন্দ জাদা কেওয়াম উদ্দিন—নায়েব উকিলেদর আজম ; মালীক খাজা হাজী দাওর ; মালীক খাহর-জাদা সুলতান ; মালীক শরফুল মুলক আলপ খান—ওয়ালী গুজরাট ; বুরহানুল ইসলাম ; মালীক এখতিয়ার উদ্দিন বাওয়াকের বেগ ; মালীক দীনার কেতাদার বোনপুর ; মালীক জাহিরুল জুয়ুশ ; মালীকুন্‌নুদামা নাসির খানী ; মালীকুল মুলক ইমাদ উদ্দিন ; মালীক রাজিউল মুলক উজির মুতাবর ; মালীকুল হকামা ; মালীক খাস কেতাদার কোড়া ; মালীক কাফুর লঙ্গ ; নিজামুল মুলক জুনা—বাহাদুর তুর্ক—নায়েব গুজরাট ; মালীক ইজ্জ উদ্দিন হাজী দীনী ; মালীক আজী সের জামদার সরগদী ; নাসিরুল মুলক কবজী ; মালীক হিসাম উদ্দিন আবু রেজা ; মালীক আশরাফ উজিরে তেলেঙ্গানা।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওস্‌সালাতু আলা রসুলিহি মুহম্মদিও ও আলিহি আজমাঈন ও সল্লম তসলীমান কাসীরান কাসীরা।

সমগ্র মুসলমান সমাজের দোয়াপ্রার্থী জিয়া বারানী বলিতেছি যে, ৭২৫ হিজরীতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহের নির্ধারিত উত্তরাধিকারী সুলতান মুহম্মদ রাজধানী তুগলকাবাদের তখতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বের সূচনাতেই সমগ্র মুসলিম রাজ্য সুব্যবস্থিত হইয়া উঠিল। সুলতান শাহী তখতে উপবেশন করিবার চল্লিশ দিন পর দিল্লী শহরের অভ্যন্তরে গমন করিলেন এবং পূর্ববর্তী বহু সুলতান যে স্থানে বসিয়া গিয়াছেন, সেই তখতে শুভ চিহ্ন ও বরকত লাভের জন্য উপবেশন করিলেন। সুলতান মুহম্মদ দিল্লী আসিবার পূর্বাহ্নে বহু তোরণ তৈরী করা হইল এবং আনন্দবাদ্য বাজাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

রাস্তা-ঘাট ও অলিগলি সুন্দর নকসা করা রঙ্গীন কাপড়ে সজ্জিত করা হইল। সুলতানী ছত্র শহরের রাস্তা অতিক্রম করিবার সময় সুলতান মুহম্মদ মুদ্রা বৃষ্টি করিতে হুকুম দিলেন। মুঠি মুঠি সোনা-রূপার তঙ্কা অলিগলিতে বিতরণ করিতে বলিলেন এবং ছাদের উপর ও দর্শকদের আঁচলে নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিলেন।

যে সময় সুলতান মুহম্মদ শাহী জাঁকজমকের সহিত শহরের বাদাউনী দরজায় উপস্থিত হইলেন এবং দৌলতখানায় অবতরণ করিলেন, তখন মালীক আমীররা হাতীর পৃষ্ঠে বসিয়া থালাভরা সোনা-রূপার মুদ্রা হইতে মুঠি মুঠি করিয়া অলি-গলি ও ছাদের উপর দর্শকদের মধ্যে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। দর্শকরা সকল স্থান হইতে মুদ্রা আহরণ করিতে গিয়া শোরগোলের সৃষ্টি করিল। সর্বত্র তাহাদের উপর সোনা-রূপার তঙ্কা ঝরিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবণিতা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর লোক এই তঙ্কা দুই হাতে সংগ্রহ করিয়া সুলতান মুহম্মদের জন্য উচ্চস্বরে দোয়া ও তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। সোনা-রূপার তঙ্কায় পাগড়ীর কোণা, থলি, টুপি ও হাতের মুঠি পূর্ণ হইয়া উঠিল।

দিল্লীতে প্রচুর ফুলের আবাদ হইত। নানাপ্রকার ফুলের মালা, ফুলের পাপড়ি ও কলি পাতাসহ লোকজনের উপর ছড়াইয়া ছিটাইয়া দেওয়া হইল। শাহী জাঁক-জমকের সহিত এইরূপ মুদ্রা ও ফুল বৃষ্টি অন্য কোন সময়ে কোন বাদশাহের বেলায় দেখা যায় নাই। ইহার ফলে গরীব ও নিঃস্বদের অভাব পূরণ হইয়া গিয়াছিল। ইহার চাকচিক্য দেখিয়া বৃদ্ধদের মনেও যৌবনের হাওয়া বহিতে লাগিল এবং ধনাসক্তদের অন্তর ভরিয়া উঠিল। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আকাশের ঘূর্ণন বাড়িয়া গেল এবং সময়ের গতি সাবলীল হইয়া উঠিল। সুলতানের শুভ আগমনের আনন্দে প্রতিটি ঘরে দফ ও ঢোলকের আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল। সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোক আনন্দের আতিশয্যে গান গাহিয়া উঠিল।

আল্লাহ্তালা মহান সুলতান মুহম্মদকে এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টির নিদর্শনরূপে এই দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে শক্তি ও সাহস দিয়াছিলেন, দুনিয়া ও আসমানে উহার কোন তুলনা ছিল না। রাজ্যশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের সর্বপ্রকার গুণ যেন তাঁহার সহজাত ছিল। তাঁহার শিরায় শিরায় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জমশেদী ও কায়খসরুবী গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। যে বীরত্ব সমস্ত জগৎ অধিকার করিয়াও শান্ত হইতে চাহে না এবং যে আকাঙ্ক্ষা সমগ্র জিন ইনসানের শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না, তাঁহার অন্তরে সেই বীরত্ব ও আকাঙ্ক্ষার একটি পরিপূর্ণ রূপ বিরাজমান ছিল।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার মনে সোলায়মান ও সঞ্জরের মত হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সূক্ষ্ম বোধশক্তি, আশ্চর্য ইচ্ছা, বিরাট কল্পনা ও সদ্‌গুণাবলী যেন তাঁহার সহজাত হইয়াই আসিয়াছিল। সেই বাল্যকাল ও কৈশোরেই তাঁহার মধ্যে মাহমুদের ধরণ-ধারণ, সঞ্জরের রীতিনীতি, কায়কোবাদের চালচলন ও কায়খসরুর মতিগতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়েই একক বৈশিষ্ট্য ও নেতৃত্বের ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে জন্ম লইয়াছিল। পরবর্তীকালে উহাই জমশেদ, ফরিদুন, সোলায়মান ও সেকান্দারের গুণাবলী রূপে তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সোবাহানাল্লাহ্! আল্লাহ্‌তালা যেন বাদশাহের পোশাক পরাইয়াই তাঁহাকে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন অথবা এমত বোধ হয় যে, তাঁহার বসিবার জন্য শাহী তখতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহের মধ্যে সহজাত হিসাবে যে অপরিসীম সাহসিকতা বিদ্যমান ছিল, তাহাতে যদি সমস্ত জগৎ তাঁহার বান্দাদের দখলে আসিত; যদি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের সর্বশ্রেণীর লোক তাঁহার খেরাজ আদায় করিত; যদি সকল স্থানে তাঁহার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইত তাঁহার নামে খোতবা ও মুদ্রা প্রচলিত হইত; তথাপি কেহ আসিয়া যদি বলিত যে, তাঁহার শাসনাধীন অমুক দ্বীপ বা মরুস্থলে এখনও অরাজকতা রহিয়াছে, তবে তিনি উক্ত অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত স্থির হইয়া বসিতে পারিতেন না। তাঁহার এই প্রকার অপরিসীম সাহসিকতা, উচ্চকাঙ্ক্ষা, বিরাটত্ব ও উদারতার দরুনই তিনি এই দুনিয়ায় কিউমরচ ও ফরিদুনের শাসন, জমসেদ ও কায়খসরুর জাঁকজমক, সেকান্দরের মর্যাদা ও সোলায়মানের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে চাহিতেন এবং সকল ইনসান ও জিনের উপর তাঁহার শাসনব্যবস্থা যাহাতে স্থায়ী হয়, সেই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, রাজ্যশাসন ও নবুয়তের আদেশ নিষেধ সমভাবে তাঁহার রাজধানী হইতে সর্বত্র প্রচারিত হউক, বাদশাহী ও পয়গম্বরীকে তিনি একসূত্রে গ্রথিত করুন এবং সমগ্র জগৎ তাঁহার অধীনে আসুক। এই জগতে সর্ববিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, এই কথা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন।

আমি তাঁহার অপূর্ব সাহসিকতা, যাহা বস্তুতঃই এক অতিশয় আশ্চর্য বিষয় ছিল, যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে যদি তাঁহার সেইগুণকে ফেরআউন ও নমরুদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত তুলনা করি তবে মোটেই অযৌক্তিক হইবে না। অবশ্য ফেরআউন ও নমরুদরা তাহাদের সাহসিকতাকে খোদাই দাবীর দ্বারা এবং মানুষকে নিজেদের দাসদাসীতে পরিণত করার অন্যায়ের মাধ্যমে এমন

ভাবে কলুষিত করিয়া ছিল যে, উহা তাহাদের গুণ না হইয়া দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সুলতান মুহম্মদের মধ্যে তাহা ছিল না। কারণ তাঁহার পাঁচ অক্ত নামাজ আদায়, শরা-শরিয়তের অন্যান্য বিধান পালনের অভ্যাস এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁহার জন্য খোদাই দাবী করার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অন্যদিকে সুলতান মুহম্মদের এই অপূর্ব সাহসিকতাকে যদি বায়জীদ বস্তামী ও মনসুর হাল্লাজের উন্নত অবস্থার সহিত তুলনা করি, তবুও খুবই অসুবিধায় পড়িব। কারণ তাঁহাদের একজন নিজ অবস্থার বিরাটত্বে নিজেই অভিভূত হইয়া বলিয়াছেন, 'খোদার কসম, আমি কি উন্নত অবস্থারইনা অধিকারী।' অন্যজন খোদার অস্তিত্বে নিজকে বিলাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, 'আনাল হক' অর্থাৎ আমিই খোদা। সুতরাং তাঁহাদের এই অবস্থার সহিত সুলতানের গুণকে তুলনা করিলে মুসলমানদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার এবং শায়খ, সুফী, আলেম সুন্নী মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককে নির্বিচারে হত্যা আমার এইরূপ ধারণার পথে বাধার সৃষ্টি করিবে। বস্তুত: সুলতান মুহম্মদ অগণিত মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিলেন।

এইজন্য আমি শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, খোদাতালা সুলতান মুহম্মদকে এক অপূর্ব ও আশ্চর্য সৃষ্টিরূপে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বোধশক্তির সহিত এমন সব বিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল যে, তাহা জ্ঞানী ও গুণীদের ধারণায় কুলাইত না এবং তাহাদের বোধশক্তিকে অসাড় করিয়া দিত। আর আশ্চর্য বা অবাক না হইয়া পারা যায় কি করিয়া। এমন এক ব্যক্তি, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে মুসলমান, পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন, কোনরূপ নেশা করেন না, ব্যভিচারে লিপ্ত হন না, অন্যায় তসরুপ ও অপব্যয়ে হাত দেন না, জুয়া খেলা এবং অন্য কোন অকাজ-কুকাজের প্রতি যাহার কোন আসক্তি নাই; অথচ তিনি নির্বিচারে তাঁহার দরজার সম্মুখে মুসলমানদের রক্তের নদী প্রবাহিত করিতেছেন। মুসলমানদের রক্ত, যাহা আল্লাহ্‌র নিকট অতিশয় প্রিয়বস্তু, সেই রক্তপাত করিতে গিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ ভয়েরও সঞ্চার হয় নাই।

ইহা অপেক্ষা ভয়ানক ও সাংঘাতিক আর কি হইতে পারে যে, মুসলমানদিগকে হত্যা করিতে গিয়া তিনি কোরান হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর তাঁহাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাদিতে যে বিষয়টিকে অতীব গর্হিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তিনি নির্বিচারে করিয়াছেন। অথচ ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া, জুম্মা ও জামাতে শামিল হওয়া, কোনপ্রকার

সেবা না করা, অন্যবিধ পাপ হইতে বিরত থাকা এবং আব্বাসী খলীফাদের অনুগত দাস হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করা ইত্যাকার গুণাবলীও তাঁহার মধ্যে ছিল। এইভাবে তাঁহার মধ্যে পরস্পর বিরোধী বহুগুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। কাজেই যে কোন লোকের পক্ষে, সে যতই কেননা বাদশাহের অন্তরঙ্গ হউক, তাঁহার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা বা তাঁহার গুণের সমজদার হওয়া সহজ ছিল না।

মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে, যদি সুলতান মুহম্মদের দানধ্যান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদারতা সম্পর্কে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা যায়, তথাপি উহা যথাযথভাবে বর্ণনা করা যাইবে না। দানধ্যান সম্পর্কে তাঁহার যে সহজাত প্রবৃত্তি ছিল, বাস্তবিক পক্ষেই তাহা কল্পনার অতীত। কারণ এই বিরাট দানশীলতার অধিকারী বাদশাহ এমনই ক্ষমতা রাখিতেন যে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে যে কোন ব্যক্তিকে কারুনের ধনভাণ্ডার দিয়া দিতেন এবং একেবারেই কায়ানীর রত্ন ভাণ্ডার একজনকে দান করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার অপরিসীম দানশীলতার দৃষ্টিতে যোগ্য-অযোগ্য, পরিচিত-অপরিচিত, ধনী-গরীব ও দেশী-বিদেশী এক সমান মর্যাদা লাভ করিত এবং তাঁহার অযাচিত করুণা সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদনকে ছাড়াইয়া যাইত। যাহা কখনও কল্পনা করা যায় না, কখনও ধারণায় আসে না, তিনি সেই পরিমাণ যে কোন ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনেই দান করিয়া বসিতেন এবং এমনভাবে দিতেন যে, প্রার্থক হতবাক হইয়া পড়িত, তাহার সকল অভাব দূর হইত; এমনকি তাহার সন্তান-সন্ততির অভাবও দূর হইয়া যাইত। তাঁহার দানে বহু গরীব কারুণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং বহু নিঃস্ব ব্যক্তি ধন-দৌলতের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হাতেম তাই, বরমকী, মুইন যায়দা ও অন্যান্য দানশীল ব্যক্তিরা সারা জীবন ভরিয়া দান করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সুলতান মুহম্মদ তাহা একবারে দিয়া দিতেন। অন্য বাদশাহরা ধনভাণ্ডার হইতে কিছু ধন ও রত্নভাণ্ডার হইতে কিছু রত্ন দান করিতেন; কিন্তু সুলতান মুহম্মদ ভাণ্ডার ও খাজানাখানা শুদ্ধ দিয়া ফেলিতেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল না।

তিনি সুলতান বাহাদুর শাহকে সোনার গাঁয়ের শাসনক্ষমতা অর্পণ করিবার সময় একটি পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার সঙ্গে দিয়াছিলেন। মালীক সঞ্জর বদখশানীকে আশি লাখ তঙ্কা, মালীকুল মুলক ইমাদ উদ্দিনকে সত্তর লাখ তঙ্কা, সৈয়দ আসদুদ্দৌলাকে চল্লিশ লাখ তঙ্কা এবং মওলানা নাসিরউদ্দিন তবীব, কাজী কাসেনা, খোদাওন্দজাদা গিয়াসউদ্দিন, খোদাওন্দজাদা কেওয়াম উদ্দিন, মালীকুন্-নুদামা নাসির কানী প্রমুখ ব্যক্তিদিগকে বহু লাখ তঙ্কা ও প্রচুর ধনরত্ন দিয়া-

ছিলেন। মালীক বাহরাম গজনীনকে প্রতি বৎসর এক কোটি তঙ্কা দিতেন এবং কাজী গজনীনকে এত ধনরত্ন দিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনেও কখনও তাহা দেখেন নাই।

সুলতান মুহম্মদের সমগ্র রাজত্বকাল ব্যাপিয়া যে সকল গণ্যমান্য লোক, বিশেষজ্ঞ, জ্ঞানী, গুণী, সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি ও দুর্ঘটনায় পতিত অভাবগ্রস্তরা খোরাসান, ইরাক, মাওরায়ান্নাহার খোয়ারজম, সিসস্তান, রায়, মিশর, দামেশক প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহার দরবারে সাহায্য ও ধনসম্পদ লাভের আশায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যথেষ্ট পরিমাণে তাহা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে মোগলদের বহু গণ্যমান্য আমীর, লাখী ও হাজারী সর্দার, সম্মানিত মহিলা এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক সুলতানের দরবারে ধনপ্রাপ্তি ও চাকুরি লাভের আশায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাদের অনেকেই সুলতানের খেদমতে অবস্থান করিয়াছেন; আবার অনেকেই লাখ-লাখ তঙ্কা, বহু স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র, রত্নমানিক্য, জরির পোশাক ও বহুমূল্য ঘোড়া লাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। অনেককেই তিনি বিরাট বিরাট কেতা ও অঞ্চল জায়গীর হিসাবে দিয়াছেন। বস্তুতঃ সুলতান মুহম্মদের দৃষ্টিতে সোনারূপা ও রত্নমানিক পাথরের টুকরার মতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইয়াছে।

আমি পূর্বেই লিখিয়াছি যে, সুলতান মুহম্মদ খোদাতালার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই স্থলেও সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় বলিব যে, আল্লাহ্‌তালা সুলতানের মধ্যে পরিপূর্ণ দানশীলতা, অপরিসীম সাহসিকতা ও অতি সূক্ষ্ম বোধশক্তি ছাড়াও আরও বহু সদ্‌গুণ দান করিয়াছিলেন। রাজ্য পরিচালনা, শৃঙ্খলা স্থাপন ও রাজ্যজয়ের ব্যাপারে নানাবিধ পন্থা ও রীতিনীতি তিনি এমন অভিনব প্রক্রিয়ায় আবিষ্কার করিতেন যে, তাঁহার সেই অভিনবত্ব আসেফ, অ্যারিস্টটল, আহমদ হাসান, নিজামুল মুলক তুসীর ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিরা দর্শন করিলেও নিশ্চয় অবাক হইয়া পড়িতেন। নতুন নতুন পন্থা ও রীতি আবিষ্কারে তাঁহার এক অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। তিনি দরবারে কয়েকজন মন্ত্রণাদাতাও রাখিয়াছিলেন এবং পরামর্শ করিবার নিয়মও পালন করিতেন; কিন্তু রাজ্য পরিচালনার সর্ববিধ কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয় তাহাদের কোন পরামর্শ বা বিচার-বিবেচনার দ্বারা সমাধা করিতেন না। বরং তাঁহার মনে যে পন্থার উদয় হইত ও তাঁহার প্রবৃত্তি যে নতুন নিয়মের আবিষ্কার করিত, তিনি তাহাই কাজে লাগাইতেন। তাঁহার সর্বগ্রাসী মতামত ও অত্যদ্ভুত আবিষ্কারের সম্মুখে অন্য কাহারও কোন পরামর্শের স্থান ছিল না। পরামর্শদাতাদের পক্ষে তাঁহার মতামতকে সত্য বলিয়া

শাস্তি দান তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। বহু আলেম, ফাজেল, শায়খ, সুফী, দরবেশ, লেখক ও সৈন্যকে তিনি শাস্তি দিয়াছিলেন। এমন কোন দিন ও সপ্তাহ যায় নাই, যখন তাঁহার আদেশে শাহীমহলের সম্মুখে কিছু সংখ্যক মুসলমানের রক্তপাত ঘটে নাই।

সুলতান মুহম্মদের হৃদয়ে যুক্তিতর্ক যে কাঠিন্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ধর্মতত্ত্বের অভাব সেখানে যে শূন্যতার জন্ম দিয়াছিল, উহার ফলেই তিনি এমন সব খেয়ালী হুকুম জারী করিতেন, যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা ও তদানুযায়ী আমল করা সম্ভব হইত না। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহাই করিবার জন্য সকলকে বলিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যকরী হইল কিনা, তৎসম্পর্কে খোঁজ-খবর লইতেন। ইহার ফলে দেখিতে পাইতেন যে, অনেকেই তাঁহার আদেশ অনুসারে কাজ করে নাই। তিনি লোকজনের অক্ষমতাকে তাহাদের নাফরমানী ধরিয়া লইয়া শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। এমনইভাবে হাজার হাজার লোক তাঁহার কুধারণার কবলে পতিত হইয়া বিপদে পড়িয়াছে এবং অহেতুক শাস্তি পাইয়াছে। কারণ যাহা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব, উহা বাস্তবে সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য সুলতান মুহম্মদ বহু অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এমনই সব অসম্ভাব্য বাস্তবতাবর্জিত বিষয়কে সম্ভব করিয়া তুলিতে লোকজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছেন।

অথচ আমরা, যাহারা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানি, তাহারা জনসাধারণের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতার ভাব দেখাইয়াছি। আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, সুলতান যে বিষয়ে আদেশ করিতেছেন, উহার প্রকৃত স্বরূপ কি। তথাপি আমরা দুনিয়ার সম্পদ ও সুলতানের নৈকট্যলাভের জন্য কপটের ন্যায় আচরণ করিয়া একান্ত ধর্ম বিরুদ্ধ শাস্তির আদেশেও সায় দিয়া বসিতাম। যে জীবন একদিন শেষ হইবেই, যে সম্পদ একদিন বিনাশ হইবেই, সেই জীবন ও সম্পদের ভয়ে তাঁহার সম্মুখে সত্য কথা বলিতাম না। বরং উল্টা কিছু তঙ্কা ও চীতলের লোভে এবং একটু নৈকট্য ও দাক্ষিণ্য লাভের আশায় অধর্মের সাহায্য করিতাম। উহার সমর্থনে নানাবিধ বিরল দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিতাম। আমরা অপরের দুরবস্থার প্রতি ফিরিয়াও চাহিতাম না। আমাদের এই সকল দুষ্কর্মের অভিশাপেই আজ বৃদ্ধবয়সে আমরা দুরবস্থায় পড়িয়াছি এবং অন্যের নিকট অবহেলা ও অসম্মান লাভ করিতেছি। তদুপরি পরকালে আমাদের জন্য কি শাস্তি অবশিষ্ট রহিয়াছে, উহার কিছুই আমরা জানি না।

আমার এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় আমি একান্ত ভাবে সুলতান মুহম্মদের অনুগৃহীত ও প্রতিপালিত ব্যক্তি। আমি তাঁহার নিকট

হইতে যে সম্মান ও সম্পদ লাভ করিয়াছি, তাহা ইহার পূর্বে কখনও দেখি নাই এবং পরেও দেখিতে পাই নাই। সেইজন্য বলিতে চাহি যে, যদি সুলতান মুহম্মদের মধ্যে কতগুলি বিষয় না থাকিত; যেমন যুক্তিবিদ্যায় অতিরিক্ত বিশ্বাস, ধর্মতত্ত্বে অজ্ঞতা, মুসলমানদিগকে শাস্তি দানের অভ্যাস, কাল্পনিক বিষয়গুলিকে সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য অতিশয় জবরদস্তি, নতুন নতুন অযথা আদেশ, অতিরিক্ত ক্রোধ, কঠোর স্বভাব ইত্যাদি, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম যে, তাঁহার ন্যায় বাদশাহ পৃথিবীর বুকে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই এবং তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ শাসক কখনও কোন তখতে বসে নাই। এই সকল ত্রুটিই তাঁহাকে মুসলমানদিগকে অকারণ হত্যা, রাজ্যনাশের কারণ সৃষ্টি এবং সকলের মনে বিরোধিতার ভাব জন্ম দিতে সাহায্য করিয়াছিল। নতুবা সুলতান মুহম্মদ সেই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষের অন্যতম ছিলেন, যাহাদের সম্পর্কে এই পদটি রচিত হইয়াছে :

'সম্মুখে অগ্রসর হইলে সাম্রাজ্য লাভ করে,
পশ্চাতে থাকিলে জগতের আশ্রয়ে পরিণত হয় ;
দক্ষিণে গেলে জীবনের আশ্রয় হইয়া দেখা দেয়,
এবং বামে চাহিলে বার্ধক্যের অবলম্বনে প্রতিষ্ঠা পায়।

আল্লাহতালা যথার্থই সকল বাদশাহের বাদশাহ ও সকল রাজ্যের রাজাধিরাজ। তিনি সুলতান মুহম্মদকে সাতাইশ বৎসর কাল সময়ের জন্য বহু রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দুস্তানের সকল রাজ্য, গুজরাট, মালোয়া, মারাঠা, তেলেঙ্গানা, কম্পালা, ঢোল সমুদ্র, মালাবার, লক্ষণাবতী, সপ্তগ্রাম, সোনারগাঁও ও ত্রিহুতের সকল অধিবাসীকে তাঁহার অধীনস্থ ও অনুগত করিয়া দিয়াছিলেন। যদি তাঁহার রাজকার্যের প্রত্যেক বৎসরের সমুদয় বিবরণ লিখিতে চাহি, তাহা হইলে বিরাট বিরাট গ্রন্থের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং আমি এই গ্রন্থে সুলতান মুহম্মদের রাজত্বের মোটামুটি বিবরণ তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেকটি দেশ জয়ের পূর্ব-পশ্চাৎ প্রতিটি বিষয়ের আদি-অন্ত এবং প্রতিটি ঘটনার কার্যকরণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। যাহারা জ্ঞানী বুদ্ধিমান, তাঁহাদের জন্য আমার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণই যথেষ্ট; ইহাতেই তাঁহারা সকল বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইবেন। যাহারা মূর্খ ও উদাসীন; অতীতের কাহিনী ও ঘটনাবলীর প্রতি যাহাদের কোন মমতা নাই; যাহারা সকল জ্ঞানের খনি ইতিহাস হইতে শিক্ষালাভ করিতে কোনপ্রকার আগ্রহ বোধ করে না; সেই সকল অর্বাচীন অপোগণ্ডদের জন্য বিস্তারিত লিখিলেও কোন লাভ হইবে না। তাহারা ইহার সাহায্যে তাহাদের মূর্খতা দূর করিতে সচেষ্ট হইবে না। তাহারা বিরাট

বিরাট গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে, উহাদের বিষয়বস্তু লইয়া তর্ক-বিতর্কও করিতে পারে; কিন্তু পরিণামে এই সমুদয় প্রচেষ্টা তাহাদের অজ্ঞতাকেই মাত্র বাড়াইয়া তোলে।

রাজ্যশাসনের বিবরণ

সুলতান মুহম্মদ তখতে বসিবার পর প্রথম কয়েক বৎসরে যে সকল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলের অনুপাতে অন্যান্য রাজ্যের খেরাজ ও খাজনা নির্ধারণের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। শাহী মহল হাজার সতুনে বসিয়াই তিনি এইগুলি নির্দিষ্ট করেন। এই সকল রাজ্যের উজির, ওয়ালী ও মুতসরিফরা এই ব্যবস্থার ফলে সমুদয় আয়-ব্যয়ের হিসাব যথারীতি দিল্লীর দেওয়ানে উজারতে পৌছাইতেন। তখতে বসিবার পর প্রথমদিকের কয়েক বৎসর দিল্লী, গুজরাট, মালোয়া, দেবগিরি, তেলেঙ্গনা, কম্পীলা, ঢোল সমুদ্র, মালাবার, ত্রিহুত, লক্ষণাবতী, সপ্তগ্রাম, সোনারগাঁও প্রভৃতি রাজ্যের খেরাজ ব্যবস্থা এমনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্বেও দোয়াব অঞ্চলের ন্যায় উহাদের খেরাজের আয়-ব্যয় সঠিকভাবে জানা যাইত। দেওয়ানে উজারতে এইসব অঞ্চলের আয়-ব্যয়ের হিসাব পৌছিবার পর কারকুন ও মুত-সরিফরা উদ্বৃত্ত তহবিল সম্পর্কে যথারীতি অবহিত করিত এবং একটি কানাকড়িও বাদ পড়িত না। এই সকল দূরাঞ্চলের নায়েব, ওয়ালী, মুতসরিফ ও কারকুনরা সমুদয় বিষয়ের হিসাব-নিকাশ ও খেরাজ আদায়ের তাগাদা ঠিক ঠিক মত করিত এবং দূরে অবস্থিতির জন্য তাহারা কোন বিষয়ে শৈথিল্য দেখাইত না।

এই কয়েক বৎসরে সুলতান মুহম্মদের রাজত্বে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব দেখা দিয়াছিল। পর পর কয়েকটি অঞ্চল বিজিত হইল এবং বিজয়ের পর মুহূর্তেই সেইগুলি নায়েব, ওয়ালী ও আমলাদের দ্বারা সুশাসিত হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ নিকট ও দূরের রাজ্যগুলিতে এক সঙ্গে এমন সুব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা বহুযুগ দেখা যায় নাই। তদপুরি এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খেরাজ, তোহফা ও নজর হিসাবে যে পরিমাণ ধনরত্ন দিল্লীতে পৌছিয়াছিল, তাহাও বহু যুগ এমন ভাবে দিল্লীতে আসে নাই। দূর দূর বিস্তৃত রাজ্যগুলির সুশাসনের ব্যবস্থা এই ছিল যে, ইহাদের সীমান্ত পরস্পর সংযুক্ত হওয়া সত্বেও কোন খওতী, মুকদ্দিম বা ডিহিদার খেরাজ আদায় অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হইতে সাহস করিত না এবং উক্ত অঞ্চলসমূহের বাকী বকেয়াও দোয়াব অঞ্চলের ন্যায় ঠিকভাবে কারকুন ও মুতসরিফদের সাহায্যে লাঠি গুঁতার দ্বারা আদায় করিয়া লওয়া সম্ভব ছিল।

বহু সংখ্যক মালীক, আমীর, গণ্যমান্য ও বিখ্যাত প্রজা, আমলা ও মুতস-রিফ, লোকজন, খেদমতগার এবং নানা শ্রেণীর মানুষের আনুগত্য ও রায়

রাজাদের যথারীতি বাধ্যতার ফলে সুলতান মুহম্মদের দরবারে এক বিরাট জাঁক-জমক দেখা দিয়াছিল। উহার প্রভাব সর্বত্র যেভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তেমনটি অতীতে কখনও কাহারও রাজত্বকালে দেখা যায় নাই। যেহেতু চতুর্দিকের রাজ্যগুলি হইতে বিরাট পরিমাণ খেরাজ, তোহফা ও নজর ক্রমান্বয়ে দিল্লীর শাহী খাজানাখানায় আসিয়া জমা হইত, এইজন্য সুলতান মুহম্মদের পক্ষে মাহমুদ ও সঞ্জরের তুল্য খরচাদি মিটানো সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার অযাচিত দান-খয়রাত সত্ত্বেও শাহী খাজানাখানায় ধনরত্নের অভাব হইত না এবং দিল্লীর সুপ্রাচীন শাহী খাজানার মধ্যে কোনপ্রকার ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয় নাই।

আমি যদি সমস্ত বিবরণ; যেমন দূর-দূরান্তের রাজ্যগুলি কিভাবে জয় হইল, কিভাবে ও কাহার দ্বারা তথায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, কিভাবে ধনরত্ন দিল্লীতে আসিয়া পৌছিল, কিভাবে তাহা সুলতান মুহম্মদের দানখয়রাতে ব্যয় হইল; ইত্যাকার সমস্ত কথা লিখিতে যাই, তাহা হইলে বর্ণনা খুবই দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। এই কারণেই এই সকল কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য সুলতান মুহম্মদের মনে বিশ্বজয় করিবার যে আকাঙ্ক্ষা ও সমস্ত জগৎকে নিজ শাসনাধীনে আনিবার যে বাসনা শৈশবকাল হইতেই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা তাঁহার অপূর্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাহসিকতার পরিচয় হওয়া সত্ত্বেও এক অসম্ভব কল্পনা অপেক্ষা বেশী কিছু ছিল না, উহার কথা আমাকে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

সুলতান মুহম্মদের এহেন উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দূর ও নিকটের রাজ্যগুলি বিজিত ও সুশাসিত হইয়া এক অপূর্ব স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হইল। ইহার ফলে সুলতানের মনে নানারূপ অসম্ভব কল্পনার বিস্তার ঘটিল। তিনি নানাপ্রকার অন্যায্য আদেশ জারী করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। প্রতিদিন এই ধরনের এক দুই শত আদেশ 'দেওয়ানে খরিতা'য় আসিয়া পৌছিত। এই দপ্তরকে 'দেওয়ানে তলবে আহকামেতওকি'ও বলা হইত। এই সকল আদেশ যথারীতি জারী ও উহা আমলে আনিবার জন্য দূর ও নিকটের ওয়ালী, কেতাদার ও মুতসরিফ-দিগকে তাগিদ দেওয়া হইত। তাহারা এই ব্যাপারে কোনপ্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন বা অবহেলা করিলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইত। এই সকল অন্যায় আদেশ যখন কঠোর ভাষায় লিখিত ফরমানের রূপ ধারণ করিল এবং উহার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা ওয়ালী ও কেতাদারদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন সুলতানের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। কারণ তাহারা যথারীতি এই সকল আদেশ দেশ ও রাজ্যময় জারী করিত; কিন্তু মানুষের পক্ষে এই সকল আদেশের মর্মানুসারে চলা একান্তই

অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। ইহার ফলে তাহারা আদেশ অমান্য করিতে আরম্ভ করিল এবং রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ক্রমশ: কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল।

সর্বত্র এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্বেও সুলতান মুহম্মদ ভাবিতেন যে, মাত্র তিন চারিটি আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলেই তাঁহার বান্দাদের হাতে সমগ্র দুনিয়ার শাসনভার চলিয়া আসিবে। অথচ তাঁহার মনের এই ধারণা-গুলির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তিনি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করিতেন না। ফলে তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহাই সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে থাকিতেন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতেন। এইভাবে দেশে বিশৃঙ্খলার জন্ম হইল, লোকের মন বিষাইয়া উঠিল এবং শাহী খাজানা-খানা খালী হইয়া পড়িতে লাগিল। সর্বত্র এইরূপ গোলমাল ও হৈ চৈ দেখা দিল এবং মানুষ শাহী ফরমান অমান্য করিতে আরম্ভ করিল। এখানে সেখানে বিদ্রোহের ভাব মাথাচাড়া দিয়া উঠিল।

অথচ অন্যদিকে এইরূপ পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়া সুলতানের নিত্য-নতুন ধারণা অনুসারে মানুষের উপর অন্যায় আদেশের প্রকৃতি কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া চলিল। মানুষ যতই সেগুলি অমান্য করিল, ততই সুলতানের মন তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। তিনি নানাভাবে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করিলেন। দূরদূরান্তের অধিকাংশ রাজ্যের খেরাজ হাতছাড়া হইয়া গেল। শাহী লোকজনও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। সুলতান দিন দিন আরও বিরক্ত ও বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তিনি আরও নতুন শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু সকলই বিফল হইল। গুজরাট ও দেবগিরি ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ লোপ পাইল। এমনকি খাস রাজধানীর অধীন দিল্লীতেও অরাজকতা দেখা দিল।

বোধ হয় আল্লাহ্‌তা'লারই এইরূপ ইচ্ছা ছিল; নতুবা তিনি যে সকল উচ্চা-কাঙ্ক্ষা সুলতান মুহম্মদের মনে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা কয়েক বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টাতেও বাস্তবায়িত হইল না কেন! বরং যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই মানুষ সুলতানী ফরমানাদিকে খামখেয়ালী ও অসম্ভব কল্পনা বলিয়া ধারণা করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল আদেশ অনুসারে চলা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইভাবে জনসাধারণ দিন দিন ত্যক্ত-বিরক্ত হওয়ার ফলে রাজত্বের স্থায়িত্ব নষ্ট হইয়া গেল। অন্যদিকে যে সকল আদেশ পালন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, উহাও সমভাবে রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব নষ্ট করিল। ফলে মানুষ সম্পূর্ণভাবে সুলতান মুহম্মদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। সুশাসিত সকল অঞ্চলেই ইহার ফলে মাত্রাতিরিক্ত বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দেখা দিতে লাগিল।

অথচ সুলতান তাঁহার ধারণা অনুসারে সমুদয় আদেশ প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া ক্ষেপিয়া গেলেন। সুলতানের এই প্রকার রুক্ষ্ম ও কঠোর মেজাজের সম্মুখে প্রজাসাধারণ অত্যন্ত অসহায় হইয়া পড়িল। তিনি তাহাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মোমিন ও সুন্নী মুসলমানদিগকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য এমন কতকগুলি দুষ্কৃতিপরায়ণ লোক একত্র হইয়াছিল যে, হজরত আদমের সময় হইতে এই পর্যন্ত এই ধরনের লোক জন্মগ্রহণ করে নাই এবং সম্ভবতঃ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফও এমন ধরনের লোককে চাকর-নফর হিসাবে লাভ করে নাই।

যাহা হউক, জয়নবান্দা মুখতাসুল মুলক, ইউসুফ বগরা, সের দোয়াতদারের পুত্র খলিল, মুহম্মদ নজিব, দুর্ভাগা শাহজাদা নাহাওন্দী, কমনফুল সাইয়াফ, অভিশপ্ত আয়বা, মুজীর আবু রেজা (তাহার উপর খোদার শত সহস্র লানত পড়ুক), গুজরাটের কাজীর পুত্র আনসারী এবং থানেশ্বরীর দুর্ভাগা তিন তিনটি পুত্রের মুসলমানদিগকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। খোদার কসম, আমারত এইরূপ ধারণা হয় যে, যদি জয়ন নন্দা, ইউসুফ বগরা ও খলিলের হাতে বিশ জন পয়গম্বরকেও দেওয়া হইত, তাহা হইলেও উহারা এক রাত্রিও থাইতে দিত না ; বরং বিনা দ্বিধায় তাঁহাদের সকলকেই হত্যা করিত।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক, বেচারা আমি কেমন করিয়া না লিখিয়া পারি যে, সুলতান মুহম্মদ খোদাতালার এক অপূর্ব সৃষ্টি ছিলেন। কারণ তিনি দিনরাত দুষ্কৃতিকারীদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন এবং দুষ্কৃতির সন্দেহে হাজার হাজার লোককে তিনি হত্যাও করিয়াছিলেন। তদুপরি দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর প্রকৃতির এমনই সকল লোক তাঁহার অন্তরঙ্গ দরবারী বান্ধব হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং বিনা দ্বিধায় এই কথা বলা যায় যে, তাঁহার রাজত্বও এক অপূর্ব রাজত্ব ছিল।

সুলতান মুহম্মদের যে সকল অসম্ভব আদেশের ফলে রাজ্যের অবস্থা বিশৃঙ্খল ও প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, উহার প্রথমটি হইল এই যে, সুলতান দোয়াবের জমিগুলির খেরাজ দশগুণ ও বিশগুণ বেশী করিয়া আদায় করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশ কার্যকর করিবার জন্য সুলতান নানাবিধ খাতের সৃষ্টি করেন এবং এই সকল খাতে খেরাজ আদায় করিবার জন্য এমন কঠোর ফরমান জারী করিলেন, যাহাতে গরীব প্রজারা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ধনী প্রজারা ইহার চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া

প্রকাশ করা এবং শতসহস্র উদাহরণ যোগে উহাকে বিশদভাবে প্রশংসা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সুলতান মুহম্মদের সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও অপূর্ব লোক চরিত্রজ্ঞান যথার্থই অবর্ণনীয় ছিল। তিনি প্রথম সাক্ষাতেই লোকজনের দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ জানিয়া ফেলিতেন এবং তাহাদের কপালের ভাগ্য রেখা যেন পড়িতে পারিতেন। বক্তা হিসাবে তাঁহার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল। তাঁহার মধুর বচনে যাদু থাকিত। তিনি যদি ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা বলিতে বা কোন কিছু বর্ণনা করিতে থাকিতেন শ্রোতারা তথাপি বিরক্ত বা ক্লান্ত হইত না। তাহারা যতই শুনিত, ততই শুনিবার আগ্রহ বাড়িয়া যাইত।

চিঠি-পত্রাদি লিখার ব্যাপারে সুলতান মুহম্মদ অভিজ্ঞ দবিরদিগকে হতবাক করিয়া দিতেন। তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষর, প্রাঞ্জল ভাষা জ্ঞান ও উন্নত বর্ণনাভঙ্গি উস্তাদ লেখকদের হিংসা উদ্রেক করিত। নানাবিধ অলংকার ব্যবহারেও তাঁহার পূর্ণ দক্ষতা ছিল। বস্তুতঃ তিনি যেভাবে লিখিতেন, উস্তাদ লেখকদের পক্ষেও তেমনভাবে লেখা সম্ভব হইত না। ফারসী বয়েত তাঁহার প্রচুর-পরিমাণে মুখস্থ ছিল এবং উহার অর্থও ভালভাবে জানিতেন। চিঠি-পত্রে যথাস্থানে এইগুলি তিনি প্রয়োগও করিতেন। অনেক সময়েই বয়েত আওড়াইতেন। সেকান্দরনামারও অধিকাংশ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। আবু মুসায়লামনামা, তারিখে মাহমুদী ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান রাখিতেন।

অন্যান্য গুণের সঙ্গে সুলতান মুহম্মদের স্মৃতি শক্তিও ছিল অসাধারণ। তিনি যাহা কিছু শুনিতেন, সমস্তই তাঁহার স্মৃতি শক্তি ধরিয়া রাখিত। তিব্বী শাস্ত্রেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। বিভিন্ন প্রকার রোগ, উহাদের ঔষধ ও উহাদের প্রয়োগ বিধি সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞতা রাখিতেন এবং বলিতে গেলে তিনি এই বিষয় ভালই জানিতেন। তিনি বহু রোগীকে ঔষধ পত্রাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবিবদের সহিত এই সকল বিষয় লইয়া তর্ক করিতেও তিনি উস্তাদ ছিলেন। অনেক সময়েই তাহাদিগকে কোনঠাসা করিয়া ফেলিতেন।

তর্কশাস্ত্র ও দর্শনেও সুলতান মুহম্মদের যথেষ্ট আসক্তি ছিল। এই সম্পর্কে তিনি কিছু কিছু পড়া শোনাও করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার মনে এই সকল বিষয় এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, অযৌক্তিক কোন কিছু শুনিলে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। যত বড় আলেম, ফাজেল, শায়ের, দবির ও তবিব হউক না কেন, সুলতান মুহম্মদের সম্মুখে নিজ নিজ বিষয় লইয়া মুখ খুলিতে তাহারা ভয় পাইত এবং তাঁহার প্রশ্নের আঘাতে অনেক সময় তাহাদের কথা মাঝ পথেই থামিয়া যাইত।

বীরত্ব ও দুঃসাহসের ক্ষেত্রে তিনি উত্তরাধিকার ও অর্জনসূত্রে অতুলনীয় দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তীর নিক্ষেপ, নেজা বাজী, অশ্ব চালনা ও শিকার গমনে তাঁহার ন্যায় অদম্য ক্ষমতার অধিকারী সেই যুগে একান্তই বিরল ছিল। কলমবাজী ও পোশাক-আশাকেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বীরত্বের অবস্থা এই ছিল যে, তিনি একাই সৈন্যদলের সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন এবং একদল সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা, তাঁহার চাচা ও তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি খোরাসান ও হিন্দুস্তানে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

মোট কথা এই যে, সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহ যদি দানশীলতার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, তাহা হইলে শত হাতেম তাইকে পরাস্ত করিতেন। যদি শাহী জাঁক জমকের সহিত কোন অভিযান পরিচালনা করিতেন, তবে খোরাসান ও ইরাকে কম্পন দেখা দিত এবং মাওরায়ান্নাহার ও খোয়ারজিমে হৈচৈ পড়িয়া যাইত। সেইজন্যই শত সহস্র আক্ষেপ এই যে, এমন গুণ গরিমা, নেতৃত্ব, সাহসিকতা, দক্ষতা, সূক্ষ্ম বোধশক্তি, বীরত্ব, দানশীলতা, বুদ্ধি ও সৌজন্যবোধ দ্বারা সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও সুলতান মুহম্মদ শাহজাদা অবস্থায় তাঁহার যৌবন কালে অধার্মিক সাদ মন্তেকী, বুশায়খী আবিদ শায়ের, দার্শনিক নজম এন্তেশার প্রমুখ কতিপয় লোকের সংসর্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালীন দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌দের উস্তা'দ মওলানা আলিম উদ্দিন তাঁহার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। এই সকল অকাট যুক্তিবাদীর সঙ্গে সর্বদা উঠাবসা ও তর্ক-বিতর্ক করিবার ফলেই তাঁহার অন্তরে ন্যায়শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, সেখানে শরা-শরিয়ত ও ধর্মমতের কোন স্থান ছিল না।

ইসলামের সুন্নত ও জামাত, পরকালের নাজাত এবং এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের শিক্ষার বিরোধী এই যুক্তিতর্ক তাঁহাকে এমনই নীরস ও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি কোরান হাদীস ও ধর্মতত্ত্বের প্রতি অনেকখানি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যুক্তি বিরোধী কোন কথা শুনিলে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। যদি সুলতান মুহম্মদের মনে যুক্তিতর্ক এমনভাবে প্রভাব বিস্তার না করিত, তবে তাঁহার মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ ও সদাচার বিদ্যমান ছিল, ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ্ রসুল ও আলেম উলামাদের নির্দেশের বিরুদ্ধে তিনি মোমিন মুসলমানদিগকে অকাতরে হত্যা করার আদেশ দিতে পারিতেন না। যেহেতু তর্কবিদ্যা ও দর্শনের যুক্তির চাপে তাঁহার হৃদয় পাষাণ হইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য কোরান হাদীস ও ধর্মশাস্ত্রের কোমলতা তাঁহার মধ্যে কোন অনুভূতির সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার জন্যই মোমিন মুসলমানদিগকে

তঙ্কা হইয়া দাঁড়াইল। সকল স্বর্ণকার নিজগৃহে তামার তঙ্কা তৈয়ার করিতে লাগিল। ইহার ফলে তামার তঙ্কায় শাহী খাজানাখানা ভরিয়া গেল। তামার তঙ্কার অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, ইহা অপেক্ষা পাথরের টুকরা ও ইটপাটকেলকে অধিকতর মূল্যবান মনে করা হইত। পুরাতন মুদ্রার মূল্য চারি পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

যখন চতুর্দিকে গোলযোগ দেখা দিল এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হিসাবে তামার তঙ্কা মাটির ঢেলার ন্যায় মূল্যহীন হইয়া পড়িল, সুলতান মুহম্মদ নিজের প্রবর্তিত তামার মুদ্রা বাতিল ঘোষণা করিয়া আদেশ জারী করিলেন। মনে মনে অতিশয় রাগান্বিত হইয়া সমস্ত তামার মুদ্রা শাহী খাজানাখানায় ফিরাইয়া দিতে এবং উহার পরিবর্তে পুরাতন মুদ্রা লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। ইহার ফলে হাজার হাজার লোক, যাহারা নিজের ঘরে প্রচুর তামার মুদ্রা জমা করিয়া রাখিয়াছিল ও উহার মূল্যমান সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইল। ঘরের কোণায় অবহেলায় ফেলিয়া রাখা তামার মুদ্রা শাহী খাজানাখানায় পৌছাইয়া দিয়া উহার পরিবর্তে প্রচুর সোনারূপার পুরাতন মুদ্রা নিজ ঘরে লইয়া গেল। সুতরাং খাজানাখানায় এত তামার মুদ্রা জমা হইল যে, উহার দ্বারা তুগলকাবাদে পাহাড়ের ন্যায় স্তুপ গড়িয়া উঠিল। অথচ উহার পরিবর্তে খাজানাখানা হইতে প্রচুর সোনারূপার মুদ্রা বাহিরে চলিয়া গেল। এইভাবে তামার মুদ্রা বিভ্রাটে শাহী খাজনাখানায় বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হইল। সুলতান মুহম্মদ তামার মুদ্রা প্রবর্তনে তাঁহার আদেশ বিফল হইল এবং উহার ফলে শাহী খাজানাখানা হইতে প্রচুর সম্পদ বাহিরে চলিয়া গেল দেখিয়া প্রজাসাধারণের উপর ভীষণভাবে ক্ষেপিয়া গেলেন।

চতুর্থত: যে ধারণার ফলে শাহী খাজানাখানার ক্ষতি এবং তদ্দরুন রাজ্যের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছিল, উহা হইল খোরাসান ও ইরাক বিজয়ের আশা। উহার জন্য ঐ সমস্ত অঞ্চলের গণ্যমান্য ও ক্ষমতাবান লোকদিগকে সুলতান প্রচুর ধন-রত্ন দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেশের বুজর্গ ও বিখ্যাত ব্যক্তিরাও সুলতানের ধারণাকে উসকাইয়া দিয়া পরিণামে কিছু করিতে না পারিলেও দরবার হইতে ইচ্ছামত ধন সম্পদ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু আশা অনুরূপ ঐ সকল অঞ্চল বিজিত হয় নাই; এবং এই প্রকার উচ্চাশার ফলে যেগুলি বিজিত ও সুশাসিত হইয়াছিল, সেইগুলি ক্রমশ: হাতছাড়া হইয়া গেল এবং উহারই ফলশ্রুতি হিসাবে বাদশাহীর মূলভিত্তি সমৃদ্ধ খাজানাখানা শূন্য হইয়া পড়িল।

পঞ্চমত: যে ধারণা অনুসারে কাজ করিবার ফলে রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় চরম গোলযোগ দেখা দিয়াছিল, উহা হইল এই যে, সুলতান মুহম্মদ খোরাসানে

অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে সেই বৎসর অসংখ্য লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করিবার নির্দেশ দিলেন। প্রথম বৎসরে তাহাদের প্রাপ্য খাজানাখানা হইতে এবং কেতাবিলির মাধ্যমে পরিশোধ করিলেন ; কিন্তু নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির জন্য দেশ জয়ের উদ্দেশ্য সফল হইল না। দ্বিতীয় বৎসর খাজানাখানায় এত সম্পদ ছিল না, যদ্বারা লোকজনের প্রাপ্য মিটান যাইতে পারে। ইহার ফলে গড়িয়া তোলা সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে বাদশাহীর মূলধন শাহী খাজানাখানাও খালি হইয়া গেল।

যে বৎসর তিনি সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন, তখন কোনরূপ পরীক্ষা ও বাছ-বিচার না করিয়াই শুধু মাথা পিছু ঘোড়ার মূল্য, তীর কামান ইত্যাদি দেওয়ার ফলে রাজ্যের সর্বত্র বহু ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে ঐ সকল ক্ষতিপূরণের জন্য শাহী খাজানাখানা হইতে নগদ ধন-সম্পদ ব্যয় হইয়া যায়। ঐ বৎসর তিন লক্ষ সত্তর হাজার অশ্বারোহীর নাম দেওয়ানে আরজে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এক বৎসর শুধু এই সকল সৈন্য সংগ্রহ, উহাদের প্রাপ্য আদায় এবং উহাদিগকে সুসজ্জিত করিতে কাটিয়া গেল। এই সময়ে সৈন্যদিগকে কোন প্রকার যুদ্ধ বা দেশ জয়ে পাঠান সম্ভব হইল না। যদি অনুরূপ কিছু করা হইত, তাহা হইলে লুণ্ঠিত সম্পদ দিয়া তাহাদের প্রাপ্য বেতনের কিয়দংশ পূরণ করা সম্ভব হইয়া উঠিত। এইভাবে দ্বিতীয় বৎসর আসিয়া উপস্থিত হইল ; তখন খাজানাখানা খালি এবং জায়গীর দানের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। ফলে দীর্ঘদিন ধরিয়া গড়িয়া তোলা সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা নিজ নিজ পথ ধরিল ; অনেকেই নিজেদের পূর্বপেশা অবলম্বন করিল। শুধু মাঝখানে খাজানাখানা হইতে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়া গেল।

ষষ্ঠতঃ সুলতান মুহম্মদের যে ধারণা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সুগঠিত সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইল 'করাজল' পাহাড় বিজয়। সুলতান চিন্তা করিলেন যে, যেহেতু খোরাসান, মাওরায়ান্নাহার ইত্যাদি দেশ জয় করিতে হইবে, সেই জন্য সৈন্যদলের গমন পথে অবস্থিত চীন ও হিন্দুস্তানের মধ্যকার প্রাচীর স্বরূপ এই পাহাড়টি জয় করিয়া উহা সুলতানের শাসনাধীনে আনা দরকার। যাহাতে সৈন্যদলের যাতায়াত পথ নির্বিঘ্ন হইতে পারে। এই ধারণা কার্যকরী করিবার জন্য বৎসরের পর বৎসর বহু সৈন্যসহ বড় বড় আমীরগণ এই পাহাড় বিজয়ে নিযুক্ত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত বাহিনী করাজলে গিয়া তথায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল জয় করিয়া লইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও মুসলমান সেনারা ঐসকল অঞ্চলে সাফল্যলাভ করিতে পারিল না। হিন্দুরা সমুদয় ঘাঁটি

নিজেদের আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইল। ফলে সেখানে প্রচুর সৈন্য-সামন্ত নষ্ট হইল এবং অবশিষ্ট কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী মাত্র ফিরিয়া আসিল। এই ব্যর্থতার ফলে দিল্লীর সৈন্যদলে এমন বিরাট ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল যে, উহা দূর করিবার জন্য পরবর্তীকালে গৃহীত আর কোন কৌশলই কাজে লাগিল না।

এমনিভাবে এই সকল ধারণা কার্যকরী করিতে গিয়া সুলতান মুহম্মদ তাঁহার রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং খাজানাখানার সমস্ত সম্পদ এই প্রকার অসম্ভব সম্ভব করিবার জন্য ব্যয় হইল। সুলতান তাঁহার অসমসাহসিকতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুনই এই প্রকার কাল্পনিক আদেশ জারী করিয়া উহা কার্যকর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ কোন ফলই লাভ করিতে পারিলেন না। বরং প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার চরম গোলযোগ দেখা দিল এবং শাহী খাজানাখানা শূন্য হইয়া পড়িল।

সুলতান মুহম্মদের রাজত্বকালে চতুর্দিকে যে সকল গোলযোগ ও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেভাবে সু-ব্যবস্থিত রাজ্য হস্তচ্যুত হইয়াছিল, উহার বিবরণ

যদিও সুলতান মুহম্মদের রাজত্বকালের গোলযোগ ও দুর্ঘটনার সমুদয় বিবরণ ধারাবাহিক ও সন-তারিখ অনুযায়ী লিখিত হয় নাই, তথাপি পাঠকদের সুবিধার জন্য আমি তাহা সংক্ষেপে উপস্থিত করিয়াছি। সুলতানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে যে সকল আদেশ রাজ্যের সর্বশ্রেণীর মানুষের উপর জারী হইয়াছিল, উহা কার্যকরী করিবার জন্য তিনি অতিশয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চাপে মানুষের মন তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করে।

বাহরাম আয়বা মুলতানে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুলতান ঐসময়ে দেবগিরিতে ছিলেন। তিনি বিদ্রোহের সংবাদ শুনিবামাত্র দেবগিরি হইতে শহরে ফিরিয়া আসিলেন এবং মুলতানের দিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বাহরাম আয়বা সৈন্যদল সহ সম্মুখীন হইবার পর অতি সহজেই সুলতানী সৈন্যদের হাতে পরাজিত হইল এবং তাহার কর্তিত শির যথারীতি সুলতানের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। আয়বার সৈন্যদলের বহু লোক হতাহত হইয়াছিল এবং বহু লোক পলায়ন করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে সুলতানের সৈন্যদল তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হইয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিল না এবং পরিণামে সুলতান মুহম্মদই বিজয়ী হইলেন।

ইহার ফলে তিনি বাহরাম আয়বার সহায়ক মুলতানীদিগকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শায়খুল ইসলাম রুক্‌ন উদ্দিন আসিয়া মুলতানীদের ব্যাপারে সুপারিশ করায় উহা আর কার্যকরী হইল না। তিনি শায়খের সুপারিশ কবুল করিয়া মুলতানীদিগকে রেহাই দিলেন। সুলতান বিজয়ীর বেশে মুলতান হইতে শহরে ফিরিয়া আসিলেন এবং এই স্থলেই বসবাস করিতে লাগিলেন। শহরের লোকজনের বালবাচ্চা দেবগিরিতে ছিল, তিনি সেখানে গেলেন না। যে দুই বৎসর তিনি এইভাবে দিল্লীতে ছিলেন, তাঁহার লোকজনেরা তখন নিজেদের বালবাচ্চা দেবগিরিতে ফেলিয়া রাখিয়া ও সুলতানের সঙ্গে তথায় অবস্থান করিয়াছিল।

এই সময় দোয়াব অঞ্চল অত্যধিক খেরাজ ও নানাপ্রকার তলবের জন্য খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুরা নিজেদের উপার্জিত শস্যে আগুন লাগাইয়া দিত এবং গবাদিপশু লইয়া পলাইয়া যাইত। সুলতান শিকদার ও ফৌজদার-দিগকে লুটতরাজ করিতে আদেশ দিলেন। ইহার ফলে বহু খওতী ও মুকদিম নিহত ও অন্ধ হইল। যাহারা মুক্তি পাইল, লোকজন জমা করিয়া বিদ্রোহী হইয়া বন-জঙ্গলে লুকাইয়া পড়িল। এইভাবে সমস্ত অঞ্চলটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। এই সময় সুলতান মুহম্মদ শিকার করিবার উদ্দেশ্যে বরণ অঞ্চলে গেলেন এবং সমগ্র অঞ্চলটি লুটতরাজ করিতে আদেশ দিলেন। ফলে বহু হিন্দুর কর্তিত শির আনিয়া বরণের দুর্গের খিলানে খিলানে লটকাইয়া দেওয়া হইল।

এই সময় দ্বিতীয় গোলযোগটি বাঙ্গালা দেশে দেখা দিল। বাহরাম খানের মৃত্যুর ফলে 'ফখরা' বাঙ্গালার সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে কদর খান, তাহার লোকজন ও পুত্র-পরিজনকে নির্বিচারে হত্যা করিল এবং তাহার প্ররোচনায় লক্ষণাবতীর ধনভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল। লক্ষণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সোনার-গাঁও দিল্লীর শাসন অস্বীকার করিয়া ফখরা ও তাহার সঙ্গীদের হাতে চলিয়া গেল। ইহার পর তাহা আর ফিরিয়া আসে নাই। এই সময় হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল লুটতরাজ করিবার জন্য সুলতান সৈন্যদল পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা কনৌজ হইতে 'দলমু' পর্যন্ত লুটতরাজ ও যাহাকে সম্মুখে পাইল হত্যা করিয়াছিল। বহু লোক পলাইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল কিন্তু সৈন্যরা সেখানে ঢুকিয়াও অনেককে হত্যা করিল।

এইভাবে সুলতান যখন কনৌজ হইতে দলমু পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলগুলি লুটতরাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন মালাবারে তৃতীয় গোলযোগটি দেখা দিল। ইব্রাহিম খরিতাদারের পিতা সৈয়দ আহসান সেখানে ছিলেন, তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উক্ত অঞ্চলের ক্ষমতা হস্তগত করিলেন এবং তথাকার বহু আমীরকে

হত্যা করিলেন। সুলতান শহরে পৌঁছিবার পূর্বেই মালাবার পুনরাধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং তাহারা যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইল। সুলতানের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবার পর ইব্রাহিম খরিতাদার ও তাহার আত্মীয়-স্বজনকে গ্রেপ্তার করা হইল। সুলতান শহরে আসিয়া সৈন্যদল সুসজ্জিত করিলেন এবং মালাবার যাইবার জন্য দেবগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি সৈন্যদল সহ তিন চারি মঞ্জিল যাইতে না যাইতেই দিল্লীতে খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। চতুর্দিকে ডাকাতি আরম্ভ হইল। সুলতান দেবগিরি পৌঁছিয়া মারাঠার আমীর, কেতাদার ও আমলাদের উপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করার হুকুম দিলেন। ফলে তাঁহার কঠোর আদেশের সম্মুখে বহুলোক প্রাণ দিল। তিনি মারাঠার খেরাজের ব্যাপারেও নানাবিধ খাত সৃষ্টি করিয়া দরবার হইতে তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে আহমদ আয়াযকে দিল্লীতে পাঠাইয়া সুলতান তেলেঙ্গানার দিকে যাত্রা করিলেন। আহমদ আয়ায দিল্লীতে আসিলে লাহোরে গোলযোগ দেখা দিল এবং তাহা এই আয়াযের সাহায্যেই দূরীভূত হইল। সুলতান সসৈন্যে অরণ্যকূলে পৌঁছিলেন। সেখানে মহামারী দেখা দিয়াছিল। বহুলোক উহাতে আক্রান্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িল এবং অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সুলতানও মহামারীতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে মালীক কবুল নায়েব উজিরকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া অতি শীঘ্র পীড়ার দুর্বলতাসহ দেবগিরিতে পৌঁছিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া নিজের চিকিৎসা করাইলেন। শিহাব সুলতানীকে নসরত খান উপাধি দিয়া ঐ অঞ্চলের ক্ষমতা দান করিলেন। শিহাব সুলতানী একলাখ তঙ্কার বিনিময়ে ঐ অঞ্চলকে কেতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবগিরি ও মারাঠা অঞ্চল কতলুগ খানের হাতে সমর্পণ করিয়া সুলতান অসুস্থ অবস্থা লইয়াই দিল্লীতে ফিরিতে মনস্থ করিলেন।

সুলতান তেলেঙ্গানা যাত্রা করিবার কালেই দেবগিরিতে অবস্থানরত দিল্লীর সমুদয় লোককে নিজ শহরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তখনও যে দুই তিন দল লোক সেখানে ছিল, তাহাদিগকে দিল্লীর দিকে যাত্রা করিতে বলিলেন। যাহারা মারাঠা অঞ্চলে থাকিতে চাহিল, তাহারা বালবাচ্চা সহ সেখানে থাকিবার অনুমতি পাইল।

দেবগিরি হইতে সুলতান মুহম্মদের দিল্লীতে ফিরিয়া আসা এবং রাস্তায় রাস্তায় দেশের দুরবস্থা দেখার বর্ণনা

সুলতান মুহম্মদ অসুস্থ শরীর লইয়া দেবগিরি হইতে দিল্লীতে ফিরিবার পথে ধার অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান

করিলেন। সেখান হইতে পুনরায় দিল্লীর পথে রওয়ানা হইলেন। মালোয়াতেও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছিল। সমস্ত পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এবং পথের দুই পার্শ্বের শহর ও গ্রামের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান দিল্লীতে পৌঁছিয়া তথায় পূর্বের হাজার ভাগের এক ভাগ সমৃদ্ধিও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, সমস্ত অঞ্চল ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছে, সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং শস্যাদির দুর্মূল্যের অবস্থা অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কিয়ৎ পরিমাণে পুনর্বাসন এবং কৃষি ব্যবস্থাদি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু এই বৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ বিশেষ কিছুই করা গেল না। কোথাও গরু ঘোড়া মহিষ ছিল না এবং এক সের শস্যের দাম সতের আঠার চীতল পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মানুষের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতান মুহম্মদ কৃষি কার্যের সুব্যবস্থার জন্য শাহী খাজানাখানা হইতে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু লোকজনের দুর্বলতা ও অনাবৃষ্টির জন্য তেমন কোন উন্নতি সম্ভবপর হইল না। ফলে হাজার হাজার মানুষ মরিতে বাধ্য হইল। অবশ্য সুলতান দিল্লীতে ফিরিবার পর খুব শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন।

মুলতানে শাহু আফগানের বিদ্রোহ ও সুলতান মুহম্মদের তথায় গমনের বর্ণনা

সুলতান মুহম্মদ কৃষিকার্য পুনরুদ্ধার ও অর্থ সাহায্য দানের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকাকালে সংবাদ আসিল যে, মুলতানে শাহু আফগান বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তথাকার নায়েব বাহজাদকে হত্যা করিয়াছে। মালীক নাওয়া মুলতান হইতে পলাইয়া শহরের দিকে চলিয়া আসিয়াছে এবং শাহু সকল আফগানকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মুলতানের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে। সুলতান দিল্লীতে সৈন্যদল সুসজ্জিত করিয়া যথাসময়ে শাহু আফগানের বিরুদ্ধে মুলতান যাত্রা করিলেন।

কিন্তু সুলতান মুহম্মদ কয়েক মঞ্জিল যাইতে না যাইতেই শহরে তাঁহার মাতা মখদুমায়ে জাহান মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ইহার ফলে সুলতান তুগলক শাহের হারেম নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হইল। হারেমের শৃঙ্খলা বিধান ও দান-ধ্যানের যে মহৎ গুণ এই পুণ্যবতী মহিলার মধ্যে ছিল, তাহা আর কোথাও পাওয়া গেল না। শহরে মখদুমায়ে জাহানের রূহের মাগফেরাত কামনার জন্য বহু লোকের খানাপিনার ব্যবস্থা ও বহু লোককে দান-খয়রাত করা হইল। সুলতান মধ্য পথে মখদুমায়ে জাহানের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া খুবই দুঃখিত হইলেন।

দিল্লীর বহু পরিবার মধ্যদুয়ারে তাহাদের সাহায্যে প্রতিপালিত হইতেছিল এবং এই পুণ্যবতী মহিলার কল্যাণে বহুলোক সুখ-শান্তির মুখ দেখিয়াছিল।

সুলতান মুহম্মদ অগ্রসর হইয়া মুলতান হইতে কয়েক মঞ্জিল দূরে থাকিতেই শাহ আফগান আনুগত্য স্বীকারের সংবাদ পাঠাইল। সে বিদ্রোহ হইতে তৌবা করিয়া মুলতান ছাড়িয়া আফগানদের সহিত আফগানিস্তানে চলিয়া গেল। সুলতান মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া সান্নামে পৌঁছিলেন। সান্নাম হইতে আগ্রায় আসিলেন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করিলেন। ইহার পর ধীরে ধীরে তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। শহরে দুর্ভিক্ষ তখন চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। মানুষ মানুষকে খাইয়া ফেলিতে চাহে, এমনই অবস্থা। সুলতান মুহম্মদ যথাসম্ভব কৃষিকার্য পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি কূপ খনন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু মানুষের অবস্থা তখন একান্তই শোচনীয়। তাহারা ধৈর্যহারা হইয়া নানাপ্রকার কুকথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং ইহার ফলে অধিকাংশের ভাগ্যেই যথাযোগ্য শাস্তিও জুটিয়াছিল।

সুলতান মুহম্মদের সসৈন্যে সান্নাম, সামানা কৈঠল ও খুর্রাম গমন এবং এই সকল বিদ্রোহী অঞ্চল লুটতরাজ করা। তথা হইতে কুহেপায়া গমন এবং তথাকার রাজাদের আনুগত্য স্বীকার। মুকদিম, সর্দার, বিরা, মান্দার, জিউ, ভাট ও মুনিদেরকে শহরে আনিয়া মুসলমান করা এবং তাহাদিগকে রাজকার্য দান ও আমীর-মালীক বানাইয়া শহরে স্থান দেওয়ার বিবরণ

সুলতান মুহম্মদ পুনরায় সান্নাম ও সামানায় সৈন্য পরিচালনা করিলেন। তথাকার বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকেরা বহু 'মণ্ডল' তৈরী করিয়া খেরাজ না দেওয়া, নানাবিধ কুকার্য করা ও ডাকাতি লুটতরাজে লিপ্ত হইয়াছিল। সুলতান মুহম্মদ তাহাদের মণ্ডলগুলি আক্রমণ করিয়া তাহাদের জনবল বিছিন্ন করিয়া দিলেন। তাহাদের মুকদিম ও সর্দারদিগকে বাঁধিয়া শহরে লইয়া আসিলেন। তাহাদের অনেকেই মুসলমান হইল এবং আমীরদের মধ্যে স্থান লাভ করিল। তাহারা পুত্র-পরিজন সহ শহরে বসবাস করিতে লাগিল। তাহাদিগকে তাহাদের জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার ফলে ঐ সকল অঞ্চলের দুষ্কৃতি লোপ পাইল এবং যাতায়াতকারীরা ডাকাতির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিল।

সুলতান মুহম্মদ তখন দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় অরণ্যকূলের হিন্দুরা গোলযোগ আরম্ভ করিল। কনিয়া নায়ক সেখানে খুবই

প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। মালীক কবুল নায়েব উজির পলাইয়া নিরাপদে দিল্লীতে পৌঁছিলেন। অরণ্যকুল হিন্দুদের দখলে চলিয়া গেল এবং সেখানে দিল্লীর শাসনের কোন চিহ্ন রহিল না। এই সময়ে কনিয়া নায়কের জনৈক আত্মীয় যাহাকে সুলতান মুহম্মদ কম্পালা পাঠাইয়াছিলেন, সে ইসলাম ধর্মত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহার ফলে কম্পালাও হস্তচ্যুত হইয়া হিন্দুদের দখলে চলিয়া গেল। এই সকল অঞ্চলের সমুদয়ই বিধর্মীদের কবলে পড়িল। শুধু দেবগিরি ও গুজরাট সুলতানের অধীনে ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্য সমুদয় অঞ্চলেই গোলাযোগ দেখা দিয়াছিল।

এইভাবে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই সুলতানের মন প্রজাদের প্রতি বিষাইয়া উঠিল এবং তিনি অধিক পরিমাণে শাস্তির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে চতুর্দিকে যতই তাঁহার কঠোর শাস্তিদানের সংবাদ পৌঁছিল, ততই মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিরোধীতা দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিল এবং সর্বত্র বিরাট অরাজকতার সৃষ্টি হইল। ইহার মধ্যে সুলতান যে কিছু কাল দিল্লীতে স্থির হইয়া বসিতে পারিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি কৃষি-কার্য পুনরুদ্ধার ও অর্থ সাহায্যের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অনাবৃষ্টির জন্য প্রজাদের মধ্যে কোনপ্রকার সাড়া জাগিল না। শহরে খাদ্যশস্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইল এবং প্রচুর লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সুলতান মুহম্মদ কয়েকবার বেড়াইবার ছলে দেশের অবস্থা দেখিবার জন্য বাদাউন, কন্যাহার প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন সুব্যবস্থা হইল না। দুর্ভিক্ষের জন্য সুলতানের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল।

সুলতান মুহম্মদের সরগ দোয়ারীতে গমন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিবার বর্ণনা

যখন সুলতান মুহম্মদ দেখিলেন যে, কোন উপায়েই শহরের খাদ্যশস্য ও ঘাস-পাতার অভাব দূর হইতেছে না, অনাবৃষ্টির দরুন কোনপ্রকারেই কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না এবং ইহার ফলে শহরের লোকজনের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি শহরবাসীদিগকে বাহিরে যাইবার সুযোগ দিয়া ঢালাও আদেশ জারী করিলেন। শহরের চৌকি ও দরজায় যাহাতে শহর-বাসীরা নিজ বাল-বাচ্চা লইয়া হিন্দুস্তানের দিকে যাইবারকালে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। ইহার ফলে শহরের লোকজন হিন্দুস্তানের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইল এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে কিছুটা মুক্তি লাভ করিল।

খাদ্যশস্যের অভাব ও দুর্মূল্যের জন্য শহরের অধিকাংশ লোকই হিন্দুস্তানের দিকে চলিয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। এই সুযোগে তাহারা পুত্র পরিজনসহ প্রাণ বাঁচাইবার তাগিদে শহরের বাহিরে চলিয়া গেল। সুলতান মুহম্মদ নিজেও শহর ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলেন। তিনি পাতিয়ালা, কম্পালা ও 'কুহুদে'র বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চল অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে পৌঁছিলেন এবং সেখানে লোকলস্কর সহ অবস্থান করিলেন। লোকজন সেখানে কুপড়ী তৈরী করিয়া শহরের ন্যায় বাস করিতে লাগিল। এই স্থানের নাম দেওয়া হইল 'সরগ দোয়ারী' (স্বর্গদ্বারী ?) কোড়া ও অযোধ্যা হইতে এই স্থানে শস্যাদি পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাতে এই স্থলে শহর অপেক্ষা শস্যাদির মূল্য অনেকখানি সুলভ হইয়া উঠিয়াছিল।

মালীক আইনুল মুলক ও তাঁহার ভাইয়েরা এই ব্যাপারে সুলতানকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা অযোধ্যা ও জাফরাবাদের কেতাদার ছিলেন। উক্ত অঞ্চলে তাহারা নানাবিধ কাজ করিয়াছিলেন এবং সকল প্রকার বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করিয়া সমুদয় অঞ্চলটি সুশাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইজন্যই সুলতান সরগ দোয়ারীতে অবস্থানকালে তাঁহারা শস্যাদি পাঠাইয়া অবস্থার পরিবর্তন করিতে সাহায্য করেন এবং তদুপরি সত্তর আশি লাখ তঙ্কা ও অন্যান্য আসবাবপত্রও সরগ দোয়ারী ও শহরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে সুলতান আইনুল মুলকের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই প্রকার সাহায্য সহানুভূতিকে বিশ্বস্ততার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ের পূর্ব হইতেই সুলতানের নিকট ক্রমাগত সংবাদ পৌঁছিতেছিল যে, দেবগিরিতে কতলুগ খানের লোকজনেরা স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কাজ করিতেছে এবং তাহারা খেরাজের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে। এই কারণে সুলতান মনে মনে আইনুল মুলককে দেবগিরির উক্তারত দানের পরিকল্পনা করিলেন। এই অনুসারে তাঁহাকে ও তাঁহার ভাইদিগকে দেবগিরি যাইবার আদেশ দিয়া বালবাচ্চা ও লোকজন সহ কতলুগ খানকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইবেন বলিয়া চিন্তা করিলেন। সুলতানের এইরূপ ধারণার সংবাদ যথাসময়ে আইনুল মুলক ও তাঁহার ভাইদের নিকট পৌঁছিল এবং ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহারা ইহাকে সুলতানের প্রতারণা বলিয়া ধরিয়া লইলেন। কারণ অযোধ্যা ও জাফররাবাদে তাহারা বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া লেখকগণ, যাহারা সুলতানের শাস্তির ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই শস্যাদির দুর্মূল্যের অজুহাতে আইনুল মুলকের নিকট আসিয়াও আশ্রয় লইয়াছিলেন।

অনেকে যেখানে আইনুল মুলক ও তাঁহার ভাইদের সহিত সম্পর্কও স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের দেওয়া জায়গীর ইত্যাদি ভোগ করিতেছিলেন। এইভাবে তাহাদিগকে আশ্রয় দানের সংবাদ বহুবার সুলতানের কানে পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে দুঃখিত হইলেও কোন কিছু করিতে পারেন নাই। বরং মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

সুলতান সরগ দোয়ারীতে যাইবার পর যে সকল গণ্যমান্য লোক দিল্লী ত্যাগ করিয়া আইনুল মুলকের নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং আইনুল মুলকও সুলতানের ভয়ে তাহাদের অযোধ্যা ও জাফরাবাদ যাইবার কথা জানিতেন, সুলতান তাহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনুল মুলকের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, আইনুল মুলক ও তাঁহার ভাইয়েরা এই সকল লোককে বাঁধিয়া দিল্লীতে পৌঁছাইবেন এবং ছলে-বলে কলে-কৌশলে তাহাদিগকে সুলতানের হাতে তুলিয়া দিবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। এই কারণে সুলতানের পূর্বোক্ত ধারণার কথা জানিতে পারিয়া তাহারা আরও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদিগকে দেবগিরি পাঠাইবার ব্যাপারটি সুলতানের প্রতারণা ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া তাহারা ভাবিতে পারিলেন না। তাহাদের মনে হইল, এইভাবে অন্যত্র সরাইয়া নিয়া সুলতান তাহাদিগকে ধোঁকায় ফেলিয়া ধ্বংস করিয়া দিতে চাহেন। এইরূপ ধারণার ফলে তাহারাও সুলতানের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন।

সুলতান মুহম্মদের সরগ দোয়ারীতে গমন ও তথায় অবস্থান কালের মধ্যে চারিটি গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং যথাসময়ে তাহা প্রশমিতও হয়। সর্বত্রই সুলতান জয়লাভ করেন।

প্রথম গোলযোগটি নেজাম মাইনের নেতৃত্বে কোড়ায় দেখা দেয়। এই লোকটি একান্তই বাজে ধরনের ও ভাঙ্গখোর ছিল। সে নিতান্ত খাম-খেয়ালীর বশে কয়েক লাখ তঙ্কার পরিবর্তে কোড়া অঞ্চলটিকে কেতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। সেখানে সে খেরাজ আদায়ের জন্য খুবই কসরত করিল; কিন্তু তাহার যেহেতু কোনপ্রকার সামর্থ, লোকজন ও প্রতিপত্তি ছিল না, সেইজন্য দশ ভাগের একভাগ শস্য আদায়ের যে খত সে লিখাইয়া লইয়াছিল, উহা কোন মতেই উসুল করিতে পারিল না। ফলে সে কিছু সংখ্যক গোলাম কিনিয়াও কতিপয় ভাঙ্গখোরকে নিজের সঙ্গী বানাইয়া একটি দল গড়িয়া তুলিল এবং কোনপ্রকার যোগ্যতা ও সামর্থ ছাড়াই বিদ্রোহ করিয়া বসিল। সে নিজেই নিজের শিরে ছত্র ধারণ করিয়া নিজেকে সুলতান আলাউদ্দিন বলিয়া ঘোষণা করিল।

সুলতান এই সংবাদ শুনিয়া নেজামে মাইনের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার পূর্বেই আইনুল মুলক ও তাঁহার ভাইয়েরা সসৈন্যে কোড়ায় উপস্থিত হইয়া গোলযোগ দমন করিলেন এবং নেজামে মাইনের চামড়া তুলিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। সুলতান কোনপ্রকার নির্দেশ দিবার পূর্বেই এমন একটি গোলযোগ আইনুল মুলকের দ্বারা দমিত হইল। দিল্লী হইতে সুলতান মুহম্মদ তাঁহার ভগ্নিপতিকে কোড়ায় পাঠাইলেন এবং কোড়ার কেল্লা তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। নূতন কেল্লাদার শাহ্‌যাদা বস্তামী সেখানে পৌঁছিয়া নেজাম মাইনকে বিদ্রোহ ঘোষণার ব্যাপারে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল, তেমন সকলকে ধরিয়া কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন।

ইহার পর পরই দ্বিতীয় গোলযোগটি শিহাব সুলতানীর নেতৃত্বে 'বদর'-এ দেখা দিল। তাহার উপাধি ছিল নসরত খান। তিনি বদরের কেল্লাসহ উক্ত অঞ্চলটিকে তিন বৎসরের জন্য এক কোটি তঙ্কার বিনিময়ে জায়গীর হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'কবুলী খত'ও সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনিও বহু চেষ্টা সত্ত্বেও উক্ত পরিমাণ তঙ্কার তিন চারি ভাগের এক ভাগও আদায় করিতে পারিলেন না। অন্যদিকে বদরে অনবরত সুলতানের কঠোর শাস্তির কথা পৌঁছিতেছিল। এই বেচারা আসলে তরকারী বিক্রেতা, দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির বিধায় অনুরূপ কঠোর শাস্তির ভয়ে বিদ্রোহ করিয়া বসিলেন এবং নিজ লোকজন সহ বদরের দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য দেবগিরি হইতে কতলুগ খানকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। দিল্লীর কিছু সংখ্যক আমীর-মালীক ও লোকজনও বদরে গিয়া কতলুগ খানের সাহায্যে দুর্গ অধিকার করিলেন এবং শিহাব সুলতানীকে বাঁধিয়া সুলতানের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে উক্ত অঞ্চলের গোলযোগ দূর হইয়া উহা পুনরায় সুলতানের শাসনাধীনে আসিল।

কয়েক মাস পরে পুনরায় ঐ অঞ্চলে আলাই মালীক জাফর খানের ভাগিনেয় ও কতলুগ খানের সদী আমীর আলীশার নেতৃত্বে তৃতীয় গোলযোগটি দেখা দিল। আলীশা খেরাজ আদায়ের জন্য দেবগিরি হইতে 'গুলবরগা' গিয়াছিলেন। তিনি উক্ত অঞ্চলে কোন সৈন্য, ওয়ালী বা কেল্লাদার না দেখিয়া তাঁহার ভাইদিগকে একত্র করিলেন এবং গুলবরগার মুতসরিফ ভীরনকে হত্যা করিয়া সমস্ত মালমাত্তা লুটিয়া লইলেন। পরে বদরে উপস্থিত হইয়া বদরের নায়েবকে হত্যা করিলেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিলেন।

সুলতান মুহম্মদ পুনরায় কতলুগ খানকে উক্ত অঞ্চলে পাঠাইলেন। তাহার সহিত ধারের কিছু সংখ্যক মালীক আমীর ও লোকজনকেও যোগ দিতে

বলিলেন। কৎলুগ খান উক্ত অঞ্চলে পৌঁছিলে আলীশার সহিত যুদ্ধ হইল এবং আলীশা পরাজিত হইয়া বদরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কতলুগ খান বদরের দুর্গ অবরোধ করিয়া আলীশা ও তাহার ভাইদিগকে বন্দী করিলেন এবং কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়া সুলতানের নিকট সরগ দোয়ারীতে পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে উক্ত অঞ্চলের মানুষ উক্ত গোলযোগ দমনের ফলে শান্তি ফিরিয়া পাইল। সুলতান মুহম্মদ আলীশা ও তাহার ভাইদিগকে গজনীতে পাঠাইলেন এবং তাহারা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে শাহী মহলের সম্মুখে উভয় ভাইকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিলেন।

চতুর্থ গোলযোগটি আইনুল মুলক ও তাহার ভাইদের নেতৃত্বে সেই সময়েই সরগ দোয়ারীতে দেখা দেয়। আইনুল মুলক যেহেতু সুলতানের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও সভাসদদের একজন ছিলেন, সেইজন্য সুলতানের কঠোর মেজাজ, অস্থির মতামত ও শাস্তিদানের প্রথাকে খুবই ভয় করিতেন এবং নানাবিধ সন্দেহের জন্য নিজেকে সর্বদা বিপদের সম্মুখীন বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফলে তিনি অযোধ্যা ও জাফরাবাদ হইতে সসৈন্যে তাহার ভাইদিগকে আনিবার জন্য বিদায় চাহিলেন এবং মধ্যরাত্রে সরগ দোয়ারী হইতে কিছু সংখ্যক অনুগত লোক লইয়া রাতারাতি তাহার ভাইদের নিকট পৌঁছিলেন। তাহার ভাইয়েরা তিন চারি শত অশ্বারোহী সহ গঙ্গার গোদাড়া ঘাটে উপস্থিত হইয়া তথায় সুলতানী সৈন্যদলের যে সকল হাতী-ঘোড়া ছিল, সেগুলিকে বাঁধিয়া লইয়া নিজেদের সৈন্যদলে ফিরিয়া গেল। ইহার ফলে সরগ দোয়ারীতে বিরাট গোলযোগের সৃষ্টি হইল। সুলতান মুহম্মদ সামানা, আমরুহা, বরণ ও কোলের সৈন্যদলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আহমদাবাদের সৈন্যরাও তখন সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুলতান মুহম্মদ সরগ দোয়ারীতে কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া ও সৈন্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার সুযোগ দিয়া সসৈন্যে কনৌজের দিকে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া শহরাঞ্চলে শিবির স্থাপন করিলেন।

আইনুল মুলক ও তাহার ভাইদের যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে তেমন কোন দক্ষতা ছিল না এবং এই সম্পর্কে তাহাদের অভিজ্ঞতাও ছিল খুবই অল্পদিনের। এই জন্যই তাহারা সুলতান মুহম্মদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিলেন। অথচ সুলতান নিজে, তাঁহার পিতা ও চাচা সমগ্র মোগলস্তান ও খোরাসানে বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কমপক্ষে বিশটি যুদ্ধে তাঁহারা মোগলদের উপর জয়ী হন। তরবারির জোরেই তাঁহারা ধলরু খান, হিন্দু ও বর্বরদের হাত হইতে দিল্লীর

সিংহাসন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল দিকে লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, আইনুল মুলক ও তাহার ভাইয়েরা নিতান্ত বোকার মত বনগড় মুখের নিম্নাঞ্চলে 'বতলা', 'সাশহী' ও 'মিজরাবা'র দিক দিয়া গঙ্গানদী পার হইয়া সুলতানী সৈন্যের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আইনুল মুলক ও তাহার ভাইদের ধারণা ছিল যে, সুলতান মুহম্মদ যেভাবে লোকজনকে শাস্তি দিতেছেন, তাহাতে তাহারা সকলেই তাহাদের প্রতিপালক তুল্য সুলতানের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে এবং তাহাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন, কেরানী ও তরকারী বিক্রেতাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিবে। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা সুলতানী সৈন্যের সম্মুখীন হইল এবং শেষ রাত্রে যুদ্ধের আরম্ভ স্বরূপ তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভোর হইতে না হইতেই একদল সুলতানী সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং প্রথম আক্রমণেই তাহারা পরাজিত হইয়া ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া পড়িল। আইনুল মুলককে জীবিত বন্দী করা হইল। বার তের ক্রোশ দূর পর্যন্ত সুলতানী সৈন্যরা পরাজিত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং ইহার ফলে বহু সৈন্য নিহত হইল। সেনাপতি হইয়া আইনুল মুলকের যে দুই ভাই যুদ্ধে নামিয়াছিল, তাহারা উভয়েই মারা পড়িল। তাহাদের সৈন্যরা উপায়ান্তর না দেখিয়া গঙ্গানদীতে ঝাঁপ দিল এবং অধিকাংশই ডুবিয়া মরিল। যাহারা পরাজিত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল তাহারা এত গণিমতের মাল পাইল যে, উহার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। তাহাদের মধ্যে যে সকল পদাতিক ও অশ্বারোহী গঙ্গার স্রোত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা হিন্দুদের হাতে পড়িল এবং অস্ত্রশস্ত্র হারাইয়া নিঃস্ব হইল।

আইনুল মুলকের ব্যাপারে সুলতান কোনপ্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, আসলে তাহার মনে বিদ্রোহের কোন পরিকল্পনা ছিল না। তিনি নেহাতই ভুল করিয়া এই দুর্ঘটনায় আপতিত হইয়াছেন। তিনি যথার্থই কুশলী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সুলতান তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং কিছুকাল পরে তাহাকে নিজ দরবারে ডাকিয়া আনিয়া সম্মানিত করিলেন ও পোশাক দান করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিলেন এবং যথাযোগ্য পুরস্কারাদি প্রদান করিলেন। আইনুল মুলকের পুত্র-পরিজন ও অন্যান্য লোকদিগকে তাঁহার সহিত বসবাস করিতে আদেশ দিলেন।

সুলতান মুহম্মদ এইভাবে আইনুল মুলকের বিদ্রোহ দমন করিয়া বনগড় মুখ হইতে হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করিয়া 'ভরাইচ'-এ পৌঁছিলেন। তিনি এখানে সুলতান মুহম্মদ সবুক্তগীনের সময়কার গাজী সিপাহসালার মাসউদ শহীদের মাজার জিয়ারত করিলেন এবং মাজারের হেফাজতকারীদিগকে অনেক কিছু

দান-ধ্যান করিলেন। ভরাইচে তিনি আহমদ আয়াযকে সৈন্যদল সহ অগ্রসর হইয়া লক্ষণাবতীর পথে শিবির স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন। যাহাতে আইনুল মুলকের পরাজিত সৈন্যরা এবং যাহারা অযোধ্যা ও জাফরাবাদে থাকিয়া তাহার সহায়তা করিয়াছিল, তাহারা পলাইয়া লক্ষণাবতীতে যাইতে না পারে। তদুপরি যে সকল লোক দুর্ভিক্ষ ও সুলতানের শাস্তির ভয়ে পলাইয়া অযোধ্যা ও জাফরাবাদে আশ্রয় লইয়াছিল, সুলতান তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ববর্তী বাসস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেও আহম্মদ আয়াযকে নির্দেশ দিলেন। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া সুলতান মুহম্মদ ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং যথারীতি রাজকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। আহমদ আয়াযও যথা নিয়মে তাহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য পালন করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

সুলতান মুহম্মদ যখন দিল্লী হইতে সরগ দোয়ারীতে যান, তখন তাহার মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, বাদশাহী অথবা আমীরী কোন কিছুই আব্বাসী কোন খলিফার অনুমতি ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না। যে সকল বাদশাহ এই প্রকার অনুমতি লাভ ব্যতীত বাদশাহী করিয়াছেন বা করিবেন, তাহারা সকলেই অন্যায়কারী মাত্র। ইহার ফলে সকল শ্রেণীর মুসাফিরের নিকট হইতে সুলতান আব্বাসী খলিফাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ খোঁজাখুঁজির ফলে জানা গেল যে, একজন আব্বাসী খলিফা মিশরে বর্তমান আছেন। সুলতান তাঁহার আমীর মালীক ও লোকজন সহ উক্ত মিশরীয় আব্বাসী খলিফার বয়েত গ্রহণ করিলেন এবং তিন মাসের মধ্যে তাঁহার নিকট একটি দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। সরগ দোয়ারী হইতে প্রেরিত এই দরখাস্তে তিনি তাঁহার সকল বিষয় লিখিয়া জানাইলেন। পরে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া জুম্মা ও ঈদের নামাজ মুলতবী করিয়া রাখিলেন এবং মুদ্রা হইতে নিজের নাম দূর করিয়া আব্বাসী খলিফার নাম ব্যবহার করিতে আদেশ দিলেন। ইহা ছাড়াও খলিফার আনুগত্যের নামে এমন সব কাণ্ড-কারখানা আরম্ভ করিলেন, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

৭৪৪ হিজরীতে হাজী সাইদ সরসরী মিশর হইতে দিল্লীতে আসিলেন। তিনি খলিফার তরফ হইতে সুলতানের জন্য ফরমান ও খেলাত আনিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহার সকল আমীর, মালীক, সর্দার, শায়খ, উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত হাজী সাইদকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং যতদূর সম্ভব খলিফা প্রেরিত ফরমান ও খেলাতকে সম্মান দেখাইলেন। সুলতান কিছু দূর খালি পায়ে গমন ফরমান ও খেলাতকে শিরে ধারণ করিলেন এবং হাজী সাইদের পদ চুম্বন করিলেন। শহরে বড় বড় তোরণ নির্মাণ করা হইল এবং ফরমান ও খেলাতপ্রাপ্তি উপলক্ষে

দান খয়রাত করা হইল। যেদিন প্রথম জুম্মার খোতবায় খলিফার নাম পাঠ করা হইয়াছিল, সেইদিন সুলতান মুহম্মদ বহু থালি সোনারূপা বিলাইয়া ছিলেন।

সেইদিন হইতে সুলতান জুম্মা ও ঈদের নামাজ পড়িতে অনুমতি দিলেন। তিনি খোতবায় পঠিত খলিফার নামের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য শাহী মহল হইতে আমীর মালীক ও গণ্যমান্য লোকজন সহ খালি পায়ে সিরির জুম্মা মসজিদে গমন করিলেন। খোতবায় তিনি সেই সকল বাদশাহের নাম উল্লেখ করিতে বলিলেন, যাহারা আব্বাসী খলিফার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহারা তাহা করেন নাই, তাহাদের নাম বাদ দিতে বলিলেন। কারণ তাঁহার মতে তাহারা অন্যায়ভাবে বাদশাহী করিয়াছেন। তিনি মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদে ও দালান কোঠার উচ্চস্থানে খলিফার নাম লিখিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন এবং তথাকার অন্য সকল নাম মুছিয়া ফেলিতে বলিলেন।

হাজী সাইদ সরাসরি দিল্লীতে আসিবার পর সুলতান মুহম্মদ যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত এক দীর্ঘ দরখাস্ত বহু অমূল্য ও দুর্লভ মণিমাণিক্য সহ হাজী রজব বরকেয়ীর হাতে খলিফার খেদমতে মিশরে পাঠাইলেন। খলিফার প্রতি সুলতানের যে প্রকার অপূর্ব শ্রদ্ধাবোধ উথলিয়া উঠিয়াছিল, যদি পথে চুরি ডাকাতির ভয় না থাকিত, তবে তিনি বোধহয় দিল্লীর সমগ্র খাজানাখানা মিশরে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ দশা হইয়াছিল যে, তিনি যেন খলিফার অনুমতি ছাড়া পানিটুকও পান করিতে সক্ষম নন।

সুলতানের খলিফার প্রতি এই প্রকার অতিরিক্ত শ্রদ্ধার ফলেই তিনি মালীক কবীর সেরজামদারকে খলিফার মালীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত: সুলতানের দরবারে মালীক কবীর অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সুলতান একটি অঙ্গীকারনামায় আজীবন তাঁহাকে 'কবুল খলিফা' বলিয়া ডাকিতে আদেশ দিলেন। যথার্থই এই কবুল খলিফা উপাধিধারী মালীক কবীর চরিত্র গুণ, অভিজ্ঞতা, সুপরামর্শ, পবিত্রতা, ধার্মিকতা, দানশীলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে সুসজ্জিত এমনই একজন গোলাম ছিলেন, তেমন গোলাম দিল্লীর অন্য কোন বাদশাহের ভাগ্যে জুটে নাই। মান-মর্যাদার দিক হইতে সুলতানের পরেই তাহার স্থান ছিল। যদি কেহ বলে যে, সুলতানের যোগ্য প্রতিনিধি কে ছিলেন, তাহা হইলে এক কথায় বলা যায়, মালীক কবীর (আল্লাহ্ তাহাকে শান্তি দিউন)। সুলতান এইরূপ একজন রাজকর্ম কুশলী গোলামকে খলিফার প্রতি তাঁহার আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে খলিফার মালীক করিয়া লইলেন এবং তাহাকে খলিফার খেদমতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন। তিনি মালীক কবীরকে হাজী রজব

বরকেয়ীর হাতে নিজ দাসত্বের খত খলিফার দরবারে পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

দরখাস্ত সহ হাজী রজব বরকেয়ীকে মিশরে পাঠাইবার দুই বৎসর পরে মিশরের শায়খুশ-শুয়ুখ আমীরুল মোমেনীনের প্রতিনিধি হিসাবে সুলতানের নামে ফরমান, খাস খেলাত ও পতাকা লইয়া দিল্লীতে আসিলেন। সুলতান মুহম্মদ সকল আমীর, মালীক, সর্দার ও গণ্যমান্য লোকজন সহ দূর হইতে পায়ে হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া খলিফার ফরমান বহনকারী 'শায়খুশ্‌শুয়ুখ' ও হাজী রজব বরকেয়ীকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাহাদিগকে এমনভাবে সম্মান দেখাইলেন যে, দর্শকরা অবাক হইয়া পড়িল।

আমি যদি সুলতান মুহম্মদের খলিফার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি ও রাজকার্যের বিভিন্ন স্তরে তাঁহাদের প্রতি আনুগত্যের সকল বিবরণ লিখিতে যাই, তবে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলিতে হইবে এবং তাহাতেও সবকিছুর বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইবে না। বস্তুত: উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, দেওয়া-লওয়া ও আদেশ নিষেধের সর্বক্ষণে সুলতানের মুখে খলিফার নাম ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। শায়খুশ্‌শুয়ুখ ও হাজী রজব বরকেয়ীর আগমন উপলক্ষে শহরে বড় বড় তোরণ নির্মাণ করা হইল এবং সুলতান শহরের দরজা হইতে খলিফার ফরমান ও পতাকা মাথায় ধরিয়া পায়ে হাঁটিয়া শাহীমহলে আসিলেন। উহার প্রতি যতদূর সম্ভব সম্মান দেখাইলেন।

সুলতান তাঁহার নিজস্ব আমীর এবং খোরাসান ও মোগলস্তানের যে সকল আমীর তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল, সকলকে আমীরুল মোমেনীনের ফরমানের বয়েত গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। কোরান হাদীস ও আমীরুল মোমেনীনের ফরমান একত্রে সম্মুখে রাখিয়া তাহারা বয়েত করিত এবং তাঁহার নামে অঙ্গীকারনামা লিখিয়া দিত। মোগলদের যে সকল আগলী, হাজারী আমীর, শতী আমীর, গণ্যমান্য লোক ও সম্ভ্রান্ত মহিলারা সুলতানের দরবারে আসিয়া পৌঁছিত, প্রথমেই সকলের নিকট হইতে বয়েত গ্রহণ করা হইত এবং আমীরুল মোমেনীনের প্রতি এই বয়েত উপলক্ষে তাহাদিগকে লাখ লাখ কোটি কোটি তঙ্কা দান হিসাবে দেওয়া হইত। ইহার কিছুদিন পরে মিশরের শায়খুশ-শুয়ুখ ও যাহারা তাঁহার সহিত এখানে আসিয়াছিলেন, সুলতান তাঁহাদের সকলকে প্রচুর দান-ধ্যান করিলেন এবং খলিফার খেদমতের জন্য প্রচুর ধনরত্ন তাঁহাদের সঙ্গে দিয়া নহর ওয়াল ও কন্যায়েতের পথে তাঁহাদিগকে মিশরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

অন্য একবারও আমীরুল মোমেনীনের ফরমান ভরুজ ও কন্যায়েতে পৌঁছিলে সুলতান অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রতিবারই খলিফার ফরমানের প্রতি সুলতান যেইরূপ আতিশয্যের সহিত সম্মান দেখাইয়াছিলেন, তাহা যেন তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী বাদশাহের যোগ্য ছিল না। তিনি যে ভাবে বিনয় প্রদর্শন করিতেন, কোন দাসও তাহার প্রভুর সম্মুখে তেমন বিনয় প্রদর্শন করে না। তিনি বিনয়ের পরাকাষ্ঠ দেখাইয়া খলিফার ফরমানবাহক হাজী সাইদ সরসরী, হাজী রজব বরকেয়ী ও শায়খুশশুয়ুখ মিশরীর পদ চুম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পায়ের উপর মাথা নত করিয়া মুখ ঘষিয়াছিলেন।

যিনি সর্দারী ও নেতৃত্বের মধ্যে জন্ম লইয়াছেন ও প্রতিপালিত হইয়াছেন; বাল্যকাল হইতে মালীক, মালীক হইতে খান ও খান হইতে বাদশাহী লাভ করা পর্যন্ত সর্বদা মানুষের নিকট হইতে খেদমত ও বিনয়, সম্মান ও প্রতিপত্তি পাইয়া আসিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী বাদশাহের নিকট হইতে এহেন অতি বিনয়ের বহর দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া পড়িল। যাহারা সুলতানের এই প্রকার বিনয় প্রদর্শনের দৃশ্য দেখিল; তাহাদের মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানরা পরস্পর বলিতে লাগিল যে, সুলতানের এই যুগের খলিফার প্রতি কি অপরূপ ভালবাসারই না সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি যেভাবে তাঁহার প্রজাদের সম্মুখে খলিফার প্রতি ও তাঁহার ফরমানের প্রতি সম্মান দেখাইলেন, তাহা কোন চাকর-নফরও তাহার মালীকের সম্মুখে বা কোন গোলাম-বাঁদীও তাহার প্রভুর সম্মুখে দেখাইতে সক্ষম হইবে না। যদি কখনও সুলতানের সঙ্গে খলিফার সাক্ষাত হয়, তাহা হইলে একমাত্র খোদাই ভাল বলিতে পারেন, কি বিচিত্র দৃশ্যেরই না সৃষ্টি হইবে! সুলতান কি প্রকার বিনয় প্রদর্শন এবং খলিফার কেমন খেদমতই না করিবেন।

আব্বাসী খলিফাদের প্রতি সুলতানের এইরূপ অপূর্ব ভক্তি ও বিনয়ের প্রকাশ আরও একবার দেখা গিয়াছিল। খলিফাজাদা বাগদাদ হইতে দিল্লীতে আসিলে সুলতান পালাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন। তাঁহার প্রতি সম্ভাব্য সকলপ্রকার সম্মান ও তাজিম দেখাইয়া তাঁহাকে লাখলাখ তঙ্কা তোহফা দেন। সুলতান তাঁহার উপাধি দেন 'মখদুমজাদা'। মখদুমজাদা দরবারে উপস্থিত হইলে সুলতান নিজে তখত হইতে নামিয়া আসিয়া অন্য সকল লোকজনের ন্যায় জোড় হাতে মাটিতে মাথা ঠেকাইলেন এবং এমন ভক্তি দেখাইলেন যে, মানুষ তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। আম দরবার ও ঈদ উৎসবে তিনি মখদুমজাদাকে তাঁহার সহিত তখতের একাংশে বসিতে দিতেন এবং নিজে যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহার সম্মুখে বসিতেন।

মখদুমজাদা দরবার হইতে ফিরিবার সময়ও অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতেন। খলিফার প্রতি এই প্রকার অপূর্ব ভক্তির জন্যই তিনি মখদুমজাদাকে দশ লাখ তঙ্কা, কনৌজ অঞ্চল, সিরির শাহী মহল, সিরি দুর্গের সমস্ত আয়, বহু জমি, পুকুর ও বাগান ইত্যাদি উপহার হিসাবে প্রদান করিয়াছিলেন।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি সুলতান মুহম্মদের মধ্যে এই প্রকার পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর প্রকাশ দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া থাকিতাম। একদিকে শাহান-শাহীয়াতের মহাপরাক্রম, অন্যদিকে দাসানুদাসের অবর্ণনীয় বিনয় —ইহার কোনটি আমি বিশ্বাস করিব, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। ইহাকে আমি ইসলামের প্রতি তাঁহার আনুগত্য ও ভক্তি ছাড়া অন্য কি বিষয় দিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি! কারণ আমি সুলতানকে তাঁহার সমগ্র রাজত্বকাল-ব্যাপী শুধু 'সুলতান মুহম্মদ' নাম গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে দেখিয়াছি। হজরত মুহম্মদের নাম, যাহা সকল নাম ও উপাধির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, উহাকেই তিনি তাঁহার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং অতীতের বাদশাহদের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার গালভরা উপাধি গ্রহণ করিতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও লজ্জা পাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ভক্তির পরিচয়ই বিদ্যমান।

আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে মৃত ও জীবিত নির্বিশেষে সকলের প্রতিই তাঁহার অপূর্ব ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাদের আত্মীয় হিসাবে কেহ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলেও তিনি এমনভাবে খেদমত করিয়াছেন ও সম্মান দেখাইয়াছেন যে, কোন বান্দাও তাহার মালীকের জন্য তদ্রূপ করিতে সক্ষম হইবে না। সুলতানের এই প্রকার ভক্তি ও বিনয় আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং অবাক হইয়াছি।

অন্যদিকে ইহাও দেখিয়াছি যে, প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার মহলের সম্মুখে তিনি সুন্নী মুসলমানদিগকে তরমুজের ন্যায় দুই টুকরা করিয়া তাহাদের রক্তে মাঠ-ঘাট লাল করিয়া দিয়াছেন। তিনি শাস্তি দানের জন্য একটি পৃথক দপ্তরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহাতে এমন কতিপয় অধর্মী ও নিষ্ঠুর লোককে মুফতী ও বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এমন কিছু সংখ্যক বেদীন ও নালায়েককে শাস্তিদানের হর্তাকর্তা বানাইয়া দিয়াছিলেন, যাহাদের অপকর্মের ফলে এই দপ্তরের কার্যকলাপ দেখিয়া আকাশ-পাতালের সকল জীবজন্তু সুলতানের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমার ন্যায় অধর্মী ও অক্ষম ব্যক্তিও বহু বৎসর সুলতানের দরবারে কাটাইয়াছি। কাজেই আমার পক্ষে তাঁহার এই প্রকার পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর যে কোনটিই তাঁহার প্রকৃত গুণ বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। সুলতানের এই

প্রকার উল্টা-পাল্টা কাজের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমি শুধু এইটুক বলিতে পারি যে, সুলতান মুহম্মদ যথার্থই আল্লাহ্তাআলার এক অপূর্ব সৃষ্টি ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার গুণাবলীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া উঠা জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত বলিয়া মনে হয়।

সুলতান সরগ দোয়ারী হইতে আসিবার পর যে তিন চারি বৎসর দিল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সময় রাজ্যশাসনের নানাবিধ ব্যবস্থা করিতে ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম বিষয়টি ছিল এই যে, কয় বৎসর সুলতান বাহিরে কোথাও সৈন্য পরিচালনা করেন নাই। এই সময়ে তিনি কৃষি কাজ বৃদ্ধি ও দালান কোঠা নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কৃষি ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি কতিপয় নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে সুলতানের মনে যে সকল ধারণার উদ্ভব হইত, উহাকেই তিনি 'উসলুব' বা নিয়ম বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। অবশ্য সুলতানের এই প্রকার কাল্পনিক নিয়মাবলী অনুসারে যদি কাজ করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে অবশ্যই লোকজনের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইত এবং দেশে খাদ্যের অভাব মোটেও থাকিত না। আর এইরূপ একটি সমৃদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হইলে সুলতান ইচ্ছামত সৈন্যদল গঠন করিয়া পৃথিবী জয়ে বাহির হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই।

সুলতান কৃষি বিষয়ে একটি দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই দেওয়ানের নাম দেওয়া হইল 'দেওয়ানে আমীর কূহী' এবং উহাতে যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করা হইল। ত্রিশ ক্রোশ দীর্ঘ ও ত্রিশ ক্রোশ প্রস্থ একটি অঞ্চল গ্রহণ করিয়া উহার অভ্যন্তরে এক বিঘত জমিও যাহাতে অনাবাদী না থাকে, সেই বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হইল। তদুপরি প্রত্যেক ফসলের পর অন্য ফসল বুনিবার আদেশ দেওয়া হইল। যেমন গম করিবার পর যব বা ইক্ষু এবং ইক্ষু করিবার পর আঙ্গুর বা অন্যান্য ফসলের চাষ করিতে বলা হয়।

সুলতান কর্তৃক এই নির্দিষ্ট জমিতে প্রায় একশত জন শিকদার নিযুক্ত করা হইল এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানে সকলপ্রকার লোভী, অকর্মঠ ও উদাসীন লোক আসিয়া সেখানে সমবেত হইল। তিন বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা ও হাজার ঘোড়সোয়ার পাঠাইবার লাখ বিঘা অনাবাদী জমি চাষ করিবার কথা স্থানীয় লোকেরা কবুল করিল এবং সেই অনুসারে খত লিখিয়া দিল। ইহার ফলে এই বিরাট অনাবাদী জমির চাষের দায়িত্ব গ্রহণকারীরা পুরস্কার হিসাবে ভাল ঘোড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ও নগদ টাকা পাইল। তাহারা ছিল অকেজো ও লোভী, এইজন্য দায়িত্ব পালন করিবার পরিবর্তে তাহারা সুলতানের নিকট

হইতে অধিক পরিমাণ মালমাত্তা পুরস্কার, দয়া ও কর্জ হিসাবে হাতাইয়া লইতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করিল। এইভাবে কর্জ হিসাবে তাহারা তিন লাখ তঙ্কার উপরে আরও পঞ্চাশ হাজার তঙ্কা আদায় করিয়া লইল। তাহারা নিজে-দের রক্তের বিনিময়ে যেন এই সকল তঙ্কা লাভ করিয়া নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিতে লাগিল। শুধু তাহারা অনাবাদী জমি চাষ করিতে কোনপ্রকার চেষ্টাই করিল না। বস্তুতঃ তাহা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না এবং সেইজন্য এই বিরাট অঞ্চল অনাবাদীই পড়িয়া রহিল।

দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় সত্তর লাখ তঙ্কা ইজারাদারদের জিম্মায় বর্তাইল। ইহার ফলে তাহারা প্রতি মুহূর্তে সুলতানের শাস্তির ভয় করিতে আরম্ভ করিল। অথচ এই দীর্ঘ তিন বৎসরে তাহারা গৃহীত সম্পদের এক হাজার ভাগের এক ভাগও ফিরাইয়া দিতে সক্ষম হইল না। সুলতান মুহম্মদ যদি থাট্টার অভিযান হইতে জীবিত অবস্থায় দিল্লীতে ফিরিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই সকল ইজারাদার ও কর্জগ্রহণকারী একটি লোকও জীবিত থাকিত না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইল এই যে, সুলতান এই কয়টি বৎসর দিল্লীতে থাকিয়া মোগলদিগকে দান-খয়রাত করিয়াছেন। প্রতি বৎসর শীতকাল আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু মোগল আমীরতমন, হাজারা আগদী, খাতুন প্রভৃতি সুলতানের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং কোটি কোটি লাখ লাখ তঙ্কা, বেশ কিম্মতী সুসজ্জিত ঘোড়া ও অমূল্য মণিমাণিক্য দান হিসাবে লাভ করিত। তাহারা আসিলেই দরবারে ও বাহিরের উৎসবের আয়োজন এবং খানাপিনার ধুম পড়িয়া যাইত। দুই তিন মাস মোগল আমীরদিগকে আদর যত্ন এবং তাহাদিগকে দান-খয়রাত করা ছাড়া সুলতানের অন্য কোন কাজ থাকিত না।

তৃতীয় বিষয়টি এই যে, সুলতান এই কয়েক বৎসরে অধিক ধনদৌলত ও লোকজন সংগ্রহ এবং ফসলাদি উৎপাদন করিবার ব্যাপারে নানাবিধ নিয়ম-কানুন তৈরী করিতে ব্যস্ত ছিলেন। এই সকল নিয়মকে 'উসলুব' বলা হইত এবং এইগুলি লিখিয়া কখনও কোমলভাবে আবার কখনও কঠোরভাবে লোক-জনের মধ্যে জারী করা হইত। তাহাদের নিকট এই সকল নিয়ম অনুসারে কাজের আশাই তিনি করিতেন। তিনি এই ব্যাপারে দিনরাত চিন্তা করিতেন এবং নতুন নতুন নিয়ম সৃষ্টি করিতে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন।

চতুর্থ বিষয়টি হইল, এই কয়েক বৎসর দিল্লীতে থাকিয়া শাস্তি প্রদানের মাত্রা খুবই বাড়াইয়া দেন। ইহার ফলে যে সকল রাজ্য সুশাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও হাতছাড়া হইয়া যাইতে থাকে এবং সর্বত্র গোলযোগ ও

বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে আরম্ভ করে। যতই এই সকল বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সংবাদ সুলতানের নিকট পৌঁছিত, ততই তিনি দিল্লীতে শাস্তিদানের মাত্রা বাড়াইয়া দিতেন। মিথ্যা, শত্রুতা ও ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া যদি কেহ কাহারও সম্পর্কে কিছু বলিত, তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করা হইত। বহু লোককে গরম লোহা ও আগুনের সেঁকা দিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিবার যোগ্য কথা বা স্বীকারোক্তি তাহাদের মুখ হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইত। কয়েক জন বিশিষ্ট মুসলমান এই সকল ব্যাপারে খোঁজ-খবর লইতে এবং মানুষকে হত্যা করিতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকিতেন। এইভাবে শহরে শাস্তির সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, চতুর্দিকে ততই গোলযোগ ও আইন অমান্যের ঘটনা বাড়িয়া চলিল। রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা ও নানাবিধ বিশৃঙ্খলা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহাকেই শাস্তি দেওয়া হইত, তাহার নামে দুষ্কৃতির অভিযোগ থাকিত এবং ইহাদের অধিকাংশই ছিল মিথ্যা ও বানোয়াট।

খোদাতা'লা সুলতান মুহম্মদকে যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহাকে এমন এক বাদশাহী ও নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। এই সব সত্বেও যে সকল কাজের দ্বারা নিজের লোকজন ও প্রজা সাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, তেমন সকল কাজই তাঁহার নিজের দ্বারা সংঘটিত হইল; তাঁহার রাজ্যের ভিত্তি মূলে তিনি নিজেই কুঠারাঘাত করিলেন। তাঁহার রাজত্বে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, উহার মূলে প্রথমতঃ এই মাত্রাহীন শাস্তি দানের ব্যবস্থাই কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি এমন সব কাল্পনিক আদেশ ও নিয়ম-কানুন জারী করিয়াছেন যাহা বাস্তবে পরিণত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাহারা এই সকল মানিতে চাহিত না অথবা ভয়ে ভীতিতে মানিয়া লইয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিত না, তাহারা সকলেই সুলতানের কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হইয়া নিহত হইত। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িতেন এবং খোদার ইচ্ছা কখন কিভাবে কার্যকরী হয়, উহা বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।

পঞ্চম বিষয়টি এই যে, এই কয়েক বৎসর সুলতান মুহম্মদ দেবগিরি ও মারাঠার কেতাদার ও আমলা নিযুক্ত করায় ব্যাপৃত ছিলেন। সুলতান মুহম্মদ নিজে এবং তাঁহার কপট অনুসারী অন্যান্য সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, দেবগিরিতে কতলুগ খানের আমলা ও কর্মচারীদের চুরির ফলে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। খেরাজের অংক কোটি ও লাখ হইতে হাজারের কোঠায় নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং ইহার যথাযোগ্য প্রতিকার হওয়া দরকার। আসলে

সুলতানের সঙ্গীদের অন্তরে বিষ ছিল; তাহারা কতলুগ খানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াই এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন।

ইহার ফলে সুলতান ষাইট সত্তর কোটি তঙ্কা আয়ের সমুদয় দেবগিরি অঞ্চলটিকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। ইহার এক ভাগে মালীক সের দোয়াওদার, দ্বিতীয় ভাগে মালীক মুখলিসুল মুলক, তৃতীয় ভাগে ইউসুফ বগরা এবং চতুর্থ ভাগে ধূর্ত পাজি হীনচেতা আজিজ হেমারকে নিযুক্ত করিলেন। ইমাদুল মুলক সরির সুলতানীকে দেবগিরির উজারতের পদ দান করিলেন এবং নায়েব উজিরের পদ 'ধারা' অঞ্চল সহ, যাহারা সুলতানী উসলুব অনুসারে কাজ করিবে, তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট রাখিলেন। তাহারা সকলেই সুলতানী উসলুব অনুসারে খেরাজের হার বাঁধিয়া দিতে এবং যাহাতে উহা সঠিকভাবে কার্যকরী হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে বেশ কিছুকাল নিয়োজিত রহিলেন।

দেবগিরিতে নিযুক্ত সকলের প্রতি আদেশ দেওয়া হইল যে, ঐ অঞ্চলের যে সকল আমীর, কেতাদার ও গণ্যমান্য লোক, যাহারা গোলযোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং তখনও সেখানে বহাল তবিয়তে ছিল, তাহাদের কাহাকেও যেন জীবিত রাখা না হয়। কারণ তাহারা সকলেই রাজ্যের দুশমন। তাহাদের সহায় সম্পদ এমন লোককে দিতে হইবে, যাহারা সুলতানী উসলুব অনুসারে কাজ করিতে সক্ষম এবং উহা কার্যকরী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে উৎসাহী। এইভাবে দরবারে দেবগিরি ও মারাঠা অঞ্চল সম্পর্কে যে সকল নতুন ব্যবস্থা গৃহীত হইল, উহার সংবাদ যথা সময়ে দেবগিরি পৌঁছিল এবং ইহার ফলে তথাকার ছোট বড় সকলেই বিরক্ত ও ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

এই বৎসরেরই শেষের দিকে দেবগিরি ও মারাঠা অঞ্চলের ওয়ালী, কেতাদার, তহশীলদার প্রভৃতি পদে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করিল এবং ইহার ফলে সুলতান মুহম্মদের রাজত্বেরও শেষ দিন ঘনাইয়া আসিল। সুলতান কতলুগ খানকে সমুদয় লোকজন সহ দেবগিরি হইতে শহরে লইয়া আসিলেন। নির্বোধ আজিজ হেমারকে ধারাসহ মালোয়ার সমস্ত অঞ্চল দান করিলেন এবং শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। দেবগিরি হইতে কতলুগখানকে উচ্ছেদ করিবার ফলে তথাকার জন-সাধারণ ভয়ে দিশাহারা হইয়া পড়িল এবং নিজদিগকে সমূহ বিপদের মধ্যে কল্পনা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমানদের নিকট এই কথা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, দেবগিরির লোকজন যে এতদিন স্থির হইয়াছিল, তাহা শুধু কতলুগ খানের ধার্মিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও অনুকম্পার গুণেই।

যেখানকার হিন্দু-মুসলমান সকলেই দিল্লীতে সুলতানের অতিরিক্ত শাস্তি দানের সংবাদ শুনিতে পাইত এবং মনে মনে গোলযোগ সৃষ্টি ও বিদ্রোহ করিতে ছটফট করিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতলুগ খানের দিকে চাহিয়া তাহারা সান্ত্বনা লাভ করিত এবং ভাবিত যে, যাহারা কতলুগ খানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সুলতানী শাস্তি ও কঠোরতা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কতলুগ খান ও তাহার লোকজনকে দেবগিরি হইতে উচ্ছেদ করিবার পর সুলতান তাহার ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী অন্য কাহাকেও তথায় নিযুক্ত করেন নাই। শুধু কতলুগ খানের সাদাসিধা ও অনভিজ্ঞ ভাই মওলানা নিজাম উদ্দিনকে সুলতান 'ভরুজ' হইতে দেবগিরি যাইতে আদেশ দিলেন। নব নিযুক্ত উজির, ওয়ালী, কেতাদার প্রভৃতি দেবগিরি পৌঁছিলে, তিনি সেখানে গিয়া রাজ্য ও লোকজনের 'কারফরমা' হিসাবে কাজ করিবেন।

কতলুগ খানের আমলা ও লোকজনেরা যে ধনসম্পদ দেবগিরিতে জমা করিয়াছিল তাহা রাস্তার অসুবিধা, মালোয়ার গোলযোগ ও মুকদিমদের বিদ্রোহের জন্য দিল্লীতে আনা সম্ভব হইল না। মওলানা নিজামকে আদেশ দেওয়া হইল, তিনি যেন ধারাগিরির উচ্চস্থানে যে মজবুত কেল্লা আছে, তথায় সেই সকল ধনসম্পদ রাখিয়া দেন। ইহার ফলে কতলুগ খানের অনুপস্থিতি সত্বেও দেবগিরিতে কোনপ্রকার গোলযোগ ঘটিবে না। কিন্তু এইরূপ সতর্কতা সত্বেও যেদিন কতলুগ খানকে দেবগিরি হইতে দিল্লীতে ফিরাইয়া আনা হইল, সেইদিনিই বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিলেন যে, আজ হইতে দেবগিরি হাত ছাড়া হইয়া গেল। যদি বাদশাহ স্বয়ং সেখানে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়া গোলযোগের সম্ভাবনার কারণ দূর না করেন, তাহা হইলে দেবগিরি আর ফিরিয়া আসিবে না।

দুর্বৃত্ত আজিজ হেমারের হস্তে ধারা ও মালোয়ার শাসনক্ষমতা পতিত হওয়া এবং এই হীনচেতার তথায় গমন ও নানাবিধ দুষ্কর্মের ফলে সাধারণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার সূচনা হওয়ার বিবরণ

যে বৎসর কতলুগ খানকে দেবগিরি হইতে দিল্লীতে ফিরাইয়া আনা হইল সেই বৎসরের শেষের দিকে সুলতান মুহম্মদ আজিজ হেমারকে ধারা রাজ্য সহ সমগ্র মালোয়া অঞ্চল প্রদান করিলেন। সে যাহাতে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে তজ্জন্য তাহাকে কয়েক লক্ষ তঙ্কাও দিলেন। এই বিরাট অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা লাভ করিবার পর সেই উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে সুলতান আজিজ হেমরাকে আরও অনেক ক্ষমতা দিলেন এবং বলিলেন, হে আজিজ,

চতুর্দিকে কেমন বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তুমি নিজেই দেখিয়াছ। আমি শুনিয়াছি, যাহারা বিদ্রোহ করে, শতী আমীরদের সাহায্যেই তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে এবং আমীর শতীরাও লুটতরাজের লোভে তাহাদের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে বিদ্রোহীদের পথ সহজ হইয়া যায়। কাজেই ধারার যে সকল আমীর শতীকে তুমি এইরূপ মনে করিবে, তাহাদিগকে যথাসম্ভব দমন করিতে চেষ্টা করিও। যাহাতে ঐ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় কোনপ্রকার গোলযোগ দেখা না দেয় এবং তুমিও নিশ্চিন্ত মনে তোমার কর্তব্য সমাপন করিতে পার।

সুলতানের এই প্রকার উপদেশ মগজে লইয়া অকর্মণ্য আজিজ হেমার তাহার সকল ক্ষমতা ও দুর্বৃত্ত সঙ্গীসাথী সহ ধারা অঞ্চলে পৌঁছিল এবং সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয় দিয়া তথাকার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করিল। সেই দিনই এই জারজ সন্তান অজ্ঞাত কুলশীলের মনে এই কথা উদয় হইল যে, আমীর শতীদের ব্যবস্থা আগে করা দরকার। সে তাহার ধারণা অনুসারে প্রায় আশি জন আমীর শতী ও ধারা অঞ্চলের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাইল। তাহাদিগকে বলিল যে, রাজ্যের সমুদয় গোলযোগ আমীর শতীদের জন্যই হইতেছে, যেমন দেবগিরিতে হইয়াছে। এইভাবে দেবগিরির আমীর শতীদের অজুহাত দেখাইয়া সে মহলের সম্মুখে একসঙ্গে গ্রেপ্তারকৃত সকল লোকের গর্দান উড়াইয়া দিল। এই কমিন কমজাতের একবারও মনে হইল না যে, শুধু আমীর শতী হওয়াই যদি অপরাধের কারণ হয়, তাহা হইলে দেবগিরি, গুজরাট ও অন্যান্য অঞ্চলে যে সকল আমীর শতী আছে, সকলেই এই শাস্তির সংবাদ শুনিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে এবং এইভাবে সকলেই যদি বিদ্রোহ করিয়া বসে, তাহা হইলে রাজ্যের জনবল ও স্থায়িত্ব রক্ষা পাইবে কেমন করিয়া?

আমীর শতী হওয়ার অপরাধে ধারার এই সকল লোকের নিহত হওয়ার সংবাদ যথা সময়ে গুজরাট ও দেবগিরিতে পৌঁছিল। এই দুই রাজ্যে ও অন্যান্য অঞ্চলে যত আমীর শতী ছিল, ইহার ফলে সকলেই সতর্ক হইয়া মনে মনে বিদ্রোহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই অর্বাচীনের দুষ্কর্মের ফলে বাদশাহী নিয়মের মধ্যে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হইল। অন্যদিকে আজিজ হেমার যখন তাহার এইরূপ একবারে আমীর শতীদিগকে শায়েস্তা করিবার কাহিনী লিখিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইল, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিশেষ খেলাত দিয়া পাঠাবার ফরমান জারী করিলেন। রাজত্বের অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছিল বলিয়াই সুলতান তাঁহার দরবারের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আজিজ হেমারের

কুকার্যের প্রশংসা করিয়া তাহার নিকট পত্র পাঠাইতে বলিলেন। সকলকেই তাহার জন্য যথাসাধ্য উত্তম পোশাক ও অশ্ব পাঠাইবার নিমিত্ত উৎসাহিত করিলেন।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি সতের বৎসর তিন মাস সুলতান মুহম্মদের দরবারে চাকুরি করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে পুরস্কার ও দয়া-দাক্ষিণ্য হিসাবে আমিও বহু সম্পদ পাইয়াছি। কিন্তু আমি এই বাদশাহের মধ্যে যে সকল পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ দেখিয়াছি তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। তাঁহার সমগ্র রাজত্বকাল ব্যাপিয়া তাঁহার মুখ হইতে কমিন কমজাত হীনচেতাদের অসম্মান ও বেইজ্জতীর বহু কাহিনী শুনিয়াছি। যেহেতু স্বভাবতঃই এই শ্রেণীর লোক অকৃতজ্ঞ, বেইমান ও নাফরমান হইয়া থাকে, সেইজন্য সুলতান উহাদের হীন কার্যকলাপ সম্পর্কে যুক্তি দিয়া এমনভাবে কথা বলিতেন যে, তাহা শুনিয়া মনে হইত, তিনি যেন উহাদিগকে তাঁহার জাতশত্রু বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু কার্যতঃ উহার বিপরীত বহু কিছু দেখিতে পাইয়াছি।

তিনি 'নজবা' বাজনাদারের বাচ্চাকে এমনভাবে উচ্চে তুলিয়া ধরিলেন যে, তাহার মর্যাদা বহু গণ্যমান্য আমীরের মর্যাদাকেও ছাড়াইয়া গেল। তাহাকে গুজরাট, মুলতান ও বাদাউনের শাসনক্ষমতা দান করিলেন। এইভাবে আজিজ হেমার, তাহার ভাই, ফিরুজ হাজ্জাম, মনকা পাচক, শুঁড়ী মাসউদ, লাধা মালী এবং অন্যান্য বহু কুখ্যাত দুর্বৃত্তকে উচ্চ মর্যাদা দান করিলেন। তাহাদিগকে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও জায়গীর দিলেন। জোলার পুত্র শেখ বাবু নায়ককে অন্তরঙ্গ করিয়া তাহার মর্যাদা বহু আমীর মালীকের মর্যাদা হইতেও বহুগুণ বাড়াইয়া দিলেন। সমগ্র হিন্দুস্তানের মধ্যে সর্বপেক্ষা অধিক হীনচেতা ও দুর্বৃত্ত পিরা মালীকে দেওয়ানে উজারতের দায়িত্ব দান করিলেন। তাহাকে মালীক, আমীর, ওয়ালী ও কেতাদারদের উপর ক্ষমতার অধিকারী করিয়া দিলেন। কিষাণ বাজরান ইন্দিরীর ন্যায় অধম দুর্বৃত্তকে অযোধ্যার জায়গীর দান করিলেন। আহমদ আয়াযের গোলাম মুকবেল ছিল চেহারা ও স্বভাবে সমস্ত গোলামদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; তাহাকে বড় বড় খান ও উজিরদের দেশ গুজরাটের নায়েব উজিরের পদে উন্নীত করেন।

তিনি কিভাবে এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও বড় বড় পদ হীনচেতা অযোগ্য লোকদিগকে অর্পণ করিতেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। যিনি স্বীয় শৌর্যবীর্য ও বুদ্ধিমত্তার জন্য নিজেকে জমশেদ ও কায়খসরুর সমতুল্য ভাবিতেন; যিনি তাঁহার দরবারে মোগলস্তান ও বাঙালার শাসকদিগকে স্থান

দিতে লজ্জা বোধ করিতেন এবং যিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা বোধের জন্য বুজুর্চ মেহেরের ন্যায় গুণী ও উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদিগকেও যোগ্য বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন ; সেই রূপ একজন উন্নতমনা বাদশাহ কিভাবে উচ্চপদ ও জায়গীর অতি জঘন্য লোকদের হাতে তুলিয়া দিতেন। জগতের পালক ও আশ্রয়তুল্য এই মহান বাদশাহের এইরূপ পরস্পর বিরোধী গুণাবলী দেখিয়া আমি বেচারা একান্তই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতাম।

যদি এই ভাবে উচ্চপদ ও বড় বড় জায়গীর হীনচেতা নীচ বংশীয়দের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী করিয়া সকলকে তাহাদের দয়ার প্রত্যাশী ও সাহায্যের ভিখারী করা সুলতান মুহম্মদের খোদাই দাবীর লক্ষণ বলিয়া ভাবা যাইত, তবে না হয় সুলতানের এইরূপ আচরণের ব্যাখ্যা সম্ভব হইত। কেননা খোদা যেহেতু সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী, সেইজন্য তিনি অনেক সময় বহু অযোগ্য লোক, এমনকি তাঁহার শত্রুদিগকেও দুনিয়ার শাসনক্ষমতা ও সম্পদ দান করিয়া বসেন এবং তাহাদের এইরূপ শাসনক্ষমতা ও সম্পদ লাভকে তিনি কিছুই মনে করেন না। এই কারণে দুনিয়ায় বহু ফেরাউন, বহু নমরুদ এবং কাফের ও মুশরিকও বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হইয়া সুখ-ভোগ করিয়া গিয়াছে। সুলতান মুহম্মদও সেইরূপ অযোগ্য লোকদের ক্ষমতালাভকে কিছুই মনে করেন নাই এবং গুরুত্ব দেন নাই।

কিন্তু ইহার সহিত যখন তাঁহার অতি মাত্রায় বন্দেগীর দৃশ্য দেখি, তখন তাঁহার ন্যায় বাদশাহের জন্য আর খোদাই দাবী সম্ভাবনাকে স্বীকার করা যায় না। তিনি নামাজের আজান শোনা মাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং আজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতেন। ফজরের নামাজ পড়িবার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাবিধ অজিফা পাঠ করিতেন। হারেমে যাইবার পূর্বে একজন খোজাকে ভিতরে পাঠাইয়া দিতেন, যাহাতে কোন বেগানা আওরত তাঁহার দৃষ্টিতে না পড়ে।

কতলুগ খানের নিকট বাল্যকালে তিনি কিছু পড়িয়াছিলেন, সেই কারণে তাহার প্রতি সুলতান এমনভাবে সম্মান দেখাইতেন যে, তাহা অন্য কোন উস্তাদ অন্য কোন শাগরিদের নিকট হইতে লাভ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না। মখদুমায়ে জাহানের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার কখনও একচুল তারতম্য হইত না।

আমি সুলতানের এই সকল আচরণকে অবশ্যই তাঁহার বিনয় ও বন্দেগীর নিদর্শন হিসাবে ধরিয়াছি এবং ধরিয়াছি বলিয়াই তাঁহার গুণাবলীর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বরং আমি লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে,

আল্লাহ্ তা'লা সুলতান মুহম্মদকে তাঁহার এক অদ্ভুত সৃষ্টি হিসাবে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন ।

যে সময়ে দুর্বৃত্ত আজিজ হেমার এইভাবে আমীর শতী হওয়ার অপরাধে ধারা অঞ্চলের উননব্বই জন আমীরকে হত্যা করিল, তখন গুজরাটের নায়েব উজির মুকবেল সেখানকার খাজানাখানা ও হাতী-ঘোড়াসহ দিল্লী আসিবার জন্য রওয়ানা হইয়াছিল । সে ধোই ও বরোদার পথে আসিবার কালে তথাকার আমীর শতীরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত ধন-সম্পদ ও হাতী-ঘোড়া তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইল । মুকবেলের সহিত গুজরাটের বহু সওদাগর পণ্যদ্রব্য সহ এই পথে আসিতেছিল, তাহারাও এই আমীরদের হাতে লুণ্ঠিত হইল । মুকবেলের সহিত এই সকল লোক কোনপ্রকারে নহরওয়াল গিয়া পৌঁছিল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ।

ধোই ও বরোদার আমীর শতীরা ধারার আমীরদের পরিণামের কথা শুনিয়া খুবই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিদ্রোহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল । মুকবেলের নিকট হইতে এইভাবে প্রচুর সম্পদ তাহাদের হাতে পড়ায় তাহারা বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং একটি বড় দল জুটাইয়া বিদ্রোহীর বেশে কন্যায়েতের পথ ধরিল । ধোই ও বরোদার শতী আমীরদের এইরূপ বিদ্রোহের ফলে গুজরাটের সর্বত্র গোলযোগের সৃষ্টি হইল এবং অরাজকতা দেখা দিতে আরম্ভ করিল ।

৭৪৫ হিজরীর রমজান মাসের শেষ দিকে ধোই ও বরোদার আমীরদের বিদ্রোহ, গুজরাটের নায়েব উজির মুকবেলের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ এবং মুকবেলের পরাজিত হওয়ার সংবাদ সুলতানের নিকট আসিয়া পৌঁছিল । সুলতান মুহম্মদ এইরূপ একটি বিরাট গোলযোগের সংবাদে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । তিনি নিজে এই গোলযোগ দূর করিবার জন্য সসৈন্যে গুজরাট যাইতে মনস্থ করিলেন । এই সময় সুলতানের উস্তাদ আমীর কতলুগ খান তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর এই লেখক অর্থাৎ জিয়া বারানীর মারফত সুলতানের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া আরজ করিলেন, ধোই ও বরোদার আমীররা এমন কি মর্যাদাসম্পন্ন লোক যে তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য স্বয়ং সুলতান সৈন্য পরিচালনা করিবেন ! যেহেতু আজিজ হেমারের আচরণের জন্য এই সকল আমীর এইরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই তাহারা যদি শুনে যে, স্বয়ং সুলতান তাহাদের বিরুদ্ধে আসিতেছেন, তাহা হইলে তাহারা আরও বেশী ভীত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া হিন্দুদের সাথে গিয়া মিশিবে এবং সম্পূর্ণ নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে । তদুপরি অন্যান্য অঞ্চলের শতী আমীররাও এই

সংবাদে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। সেইজন্য সুলতান যদি আমার ন্যায় প্রবীণ হিতাকাঙ্ক্ষী বান্দাকে এই ব্যাপারে অনুমতি দেন, তবে তাঁহার দয়ায় আমার যাহা কিছু ধন সম্পদ আছে, সমস্ত দিয়া আমি একটি সৈন্যদল সজ্জিত করিয়া ধোই ও বরোদার এই গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিতে পারিব। যেমনভাবে আমি কোড়ার আলীশা ও জাফর খান আলাইর ভাতিজা শিহাব সুলতানীকে গলায় শিকল পরাইয়া সুলতানের খেদমতে হাজির করিয়াছিলাম, তেমনি ইহাদিগকেও বন্দী করিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে পারিব। এইভাবে আমি উক্ত অঞ্চলকে সম্পূর্ণ বাধ্য করিয়া দিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।

এই গ্রন্থের লেখক কতলুগ খানের এই আবেদন যথারীতি সুলতানের খেদমতে পৌঁছাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই প্রকার সুপরামর্শ ও রাজ্যের কল্যাণমূলক আবেদন সুলতানের মনঃপূত হইল না এবং তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং তিনি অতিশীঘ্র সৈন্য পরিচালনা ও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন।

এই বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছিবার পূর্বে সুলতান শায়খ আলাউদ্দিন অযোধ্যায়ীর পুত্র শায়খ মুইয উদ্দিনকে গুজরাটের নায়েব হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ দমনে সুলতানের স্বয়ং যাইবার ইচ্ছা দূর হওয়ার পর তিনি শায়খ মুইয উদ্দিনকে তিন লাখ তঙ্কা নগদ দিবার আদেশ দিলেন; যাহাতে শায়খ দুই তিন দিনে এক হাজার অশ্বারোহী সজ্জিত করিয়া সুলতানী ছত্রের সহিত আসিয়া মিলিত হইতে পারেন। সুলতান তাঁহার অনুপস্থিতিতে তখতের দায়িত্ব বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহ, মালীক কবীর ও আহমদ আয়াযকে দিয়া গেলেন। তিনি সসৈন্যে শাহী মহল হইতে বাহির হইয়া পনের ক্রোশ দূরে সুলতানপুরে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। রমজানের তিন চারি দিন বাকী ছিল; ঐ সময় সুলতান এই স্থানেই অবস্থান করিলেন।

এইখানে ধারা হইতে আজিজ হেমারের পত্র আসিয়া সুলতানের খেদমতে পৌঁছিল। উহাতে লেখা ছিল যে, ধোই ও বরোদার আমীর শতীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে শুনিয়া সে খুব বিচলিত হইয়াছে। যেহেতু সে তাহাদের খুব নিকটে রহিয়াছে, সেইজন্য ধারা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই নিজেই তাহাদের বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আজিজ হেমারের এই প্রকার ব্যবস্থা সুলতানের খুব পছন্দ হইল না। তিনি চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন, আজিজ যুদ্ধের কিছুই জানে না; কাজেই এই সকল বিদ্রোহীর হাতে তাহার নিহত হওয়াও বিচিত্র নহে। বাস্তবিক ইহার পর পরই সংবাদ আসিল যে,

আজিজ বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হওয়ার প্রথম আক্রমণেই ঘাবড়াইয়া গিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া বেহুশ হইয়া যায়। বিদ্রোহীরা তাহাকে বন্দী করিয়া খুবই বেইজ্জতীর সাথে হত্যা করিয়াছে।

সুলতান মুহম্মদ রমজানের শেষ চারি পাঁচ দিন সুলতানপুরে অবস্থান করিবার কালে একদিন শেষরাত্রে এই বেচারা জিয়া বারানীকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি দেখিতেছ যে, কেমন সর্বত্র গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি ইহার জন্য পরোয়া করি না। মানুষ হয়তো বলিবে যে, এই সকল গোলযোগ সুলতানের অতিরিক্ত শাস্তিদানের ফলেই সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু আমি মানুষের কথার জন্য শাস্তির মাত্রা কমাইতে রাজী নহি। ইহার পর সুলতান এই বান্দাকে বলিলেন, তুমি অনেক ইতিহাস পড়িয়াছ; কোথাও কি এই সব পড়িয়াছ যে, বাদশাহগণ কি ধরনের অন্যায়ে শাস্তি দিয়াছেন? আমি বলিলাম, বান্দা খসরুর ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, কোন বাদশাহের পক্ষেই শাস্তিদান ব্যতীত বাদশাহী করা সম্ভব হয় নাই। যদি বাদশাহ এই পন্থা অবলম্বন না করেন, তবে খোদা জানেন, রাজ্যে কি সব বিদ্রোহের উৎপত্তি হইবে এবং অনুগতরাও কেমন ধরনের অন্যায় আচরণে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।

জমশেদ বাদশাহের অনৈক সভাসদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাদশাহের পক্ষে কি কি অন্যায়ে শাস্তি দান করা উচিত? উত্তরে জমশেদ বলিলেন, সাত প্রকারের শাস্তি দান করা শোভন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহার বাহিরে কেহ যদি শাস্তি দিতে যায়, তবে গোলযোগ দেখা দিবে এবং রাজ্যের অকল্যাণ হইবে।

প্রথম—যদি কেহ সত্য ধর্ম ত্যাগ করে এবং ধর্মহীনতার উপর জোর দিয়া চলে, তবে তাহাকে শাস্তি দিবে। দ্বিতীয়—যদি কেহ অপরকে স্বেচ্ছায় বিনা দোষে হত্যা করে, তবে তাহাকে শাস্তি দিবে। তৃতীয়—যদি কেহ নিজের স্ত্রী থাকা সত্বেও অপরের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে শাস্তি দিবে। চতুর্থ—যদি কেহ বাদশাহকে প্রতারণা করিতে চাহে এবং তাহার প্রতারণা প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে শাস্তি দিবে। পঞ্চম—যদি কেহ বিদ্রোহের সর্দার হয় এবং বিদ্রোহীদের সাথে মেলামেশা করে, তবে তাহাকে শাস্তি দিবে। ষষ্ঠ—যদি বাদশাহের কোন রায়ত তাঁহার শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্রসস্ত্র ও সংবাদ আদান-প্রদানে সাহায্য করে এবং তাহার এই কার্য প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে শাস্তি দিবে। সপ্তম—যদি কেহ বাদশাহের অবাধ্যতা করে, এমন অবাধ্যতা, যাহাতে রাজ্যের অকল্যাণ হয়, তবে তাহাকে শাস্তি দিবে।

এই স্থলে রাজ্যের অকল্যাণ শাস্তির জন্য শর্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। অন্য প্রকার অবাধ্যতার জন্য এই শাস্তি নহে। কারণ মানুষ খোদার নাফরমানীও অনেক সময় করিয়া থাকে, কাজেই খোদার প্রতিনিধি বাদশাহের নাফরমানী করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি। সুতরাং খোদার ন্যায় বাদশাহও এই সকল অন্যায় উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু যে সকল অন্যায় রাজ্যের বিপদ ঘটে, তাহাতে শাস্তি দানের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে রাজত্ব নষ্ট হইবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

ইহার পর সুলতান মুহম্মদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল শাস্তির মধ্যে কোনগুলি সম্পর্কে হাদীসে নির্দেশ আসিয়াছে এবং কোনগুলি বাদশাহগণ জারী করিয়াছেন? আমি নিবেদন করিলাম, এই সাত প্রকার শাসনের মধ্যে চারিটি বাদশাহ রাজ্যের কুশলের জন্য নিজেরা প্রবর্তন করিয়াছেন এবং বাকী তিনটি সম্পর্কে হাদীসে নির্দেশ রহিয়াছে অর্থাৎ ধর্ম ত্যাগ, সুলতানকে হত্যা ও ব্যভিচার সম্পর্কে তাহারা হাদীসের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন।

এই সকল উপকারী কথার পর জমশেদ আরও বলিয়াছেন, বাদশাহরা যে বড় বড় জ্ঞানীকে নিজেদের উজির হিসাবে গ্রহণ করিয়া প্রচুর সম্মান ও সম্পদ সহ তাঁহাদের হাতে নিজ রাজ্যভার অর্পণ করেন, উহার কারণ এই যে, উজিরগণ নানাবিধ নিয়ম-কানুন সৃষ্টি করিয়া তদনুসারে রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ফলে অহেতুক কাহারও রক্তপাতের সম্ভাবনা খুব কমই দেখা দেয়।

সুলতান মুহম্মদ বলিলেন, জমশেদ বাদশাহ যে শক্ত শাস্তির কথা বলিয়াছেন, উহা আগের জামানার লোকদের জন্য উপযুক্ত ছিল। কিন্তু এই জামানায় মানুষ অত্যন্ত দুর্দান্ত ও দুষ্কার্যপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই আমি প্রতারণা, বিদ্রোহ, গোলযোগ ও অন্যায় সন্দেহে উহাদিগকে শাস্তি দিতে বাধ্য হইতেছি এবং সামান্য অন্যায় করিলেও উহাদিগকে হত্যা করিতেছি। আমি এই ভাবেই আমার শাস্তিদানের মাত্রা বাড়াইয়া যাইব। ইহাতে হয় আমি শেষ হইয়া যাইব, নতুবা মানুষ সোজা পথে আসিয়া বিদ্রোহ গোলযোগ ত্যাগ করিবে।

আমার এমন কোন যোগ্য উজির নাই, যে আমার জন্য রাজ্য পরিচালনার নিয়ম-কানুন তৈরী করিয়া দিতে পারে; যাহাতে কাহারও রক্তে আমার হাত রঞ্জিত না হয়। আমি আরও এই কারণে মানুষকে শাস্তি দেই যে, উহারা একসঙ্গে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি উহাদিগকে এত ধনসম্পদ দান করিলাম, তথাপি কেহ আমার কল্যাণ কামনা করিতে অগ্রসর হইল না। মানুষের চরিত্র আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া ধরা পড়িয়াছে; উহারা স্বভাবতঃই বিদ্রোহী ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী।

সুলতানপুর হইতে সুলতান মুহম্মদ সসৈন্যে গুজরাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। নহরওয়ালের নিকট পেঁৗছিয়া তিনি সেখানে শায়খ মুইয উদ্দিনকে কিছু সংখ্যক কর্মচারীসহ পাঠাইয়া দিলেন। সুলতান স্বয়ং নহরওয়ালকে বামে রাখিয়া আবু পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে ধোই ও বরোদা খুবই নিকটে। সুলতান কিছু সংখ্যক সেনাপতিকে সসৈন্যে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ চালাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা যথারীতি ধোই ও বরোদায় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইল। কিন্তু বিদ্রোহীরা টিকিতে পারিল না। তাহাদের অধিকাংশ অশ্বারোহী নিহত হইল। অবশিষ্ট সকলে বাল-বাচ্চা সহ দেবগিরির দিকে পলায়ন করিল।

সুলতান মুহম্মদ আবু পাহাড় হইতে ভরোচ গমন করিলেন। সেখান হইতে মালীক মকবুল নায়েব উজির মুমালেককে ধোই ও বরোদার পলাতক বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ দিলেন। মালীক নায়েব দিল্লীর কিছু সংখ্যক লোকজন, ভরোচের আমীর শতী ও সৈন্যদল সহ নর্মদা নদীর তীরে পলাতকদিগকে আক্রমণ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই নিহত হইল এবং তাহাদের বাল-বাচ্চা ও মালপত্র মালীক মকবুলের হাতে পড়িল।

পলাতকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লোক খালি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া কোনপ্রকারে মালীর ও সালির পাহাড়ের মুকদ্দিম মানদেবের নিকট আশ্রয় লাভের জন্য উপস্থিত হইল। মানদেব ইহাদের সকলকে বন্দী করিয়া তাহাদের নিকট যাহা কিছু ধনরত্ন ছিল, সমুদয় ছিনাইয়া লইল। এইভাবে গুজরাট হইতে বিদ্রোহীরা সমূলে উৎপাটিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

মালীক মকবুল কিছু দিন নর্মদার তীরে অবস্থান করিলেন এবং সুলতানের আদেশ অনুসারে ও ভরোচের আমীর শতীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া হত্যা করিলেন। যাহারা মালীক মকবুলের তরবারি হইতে বাঁচিতে পারিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই দেবগিরিতে পলায়ন করিল এবং অনেকে গুজরাটের মুকদ্দিমদের নিকট আশ্রয় লইল।

সুলতান মুহম্মদ ভরোচে কিছুকাল অবস্থান করিলেন এবং ভরোচ, কন্যায়েত ও গুজরাটের যে খেরাজ বহুদিন যাবৎ লোকজনের নিকট অনাদায়ী অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহা আদায় করিবার ব্যাপারে নানাবিধ অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালাইলেন। কড়া মেজাজী তহসিলদার ও পেয়াদারা নানাপ্রকার কঠোর ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক সম্পদ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে

সুলতান মুহম্মদ মানুষের উপর খুবই ক্ষেপিয়াছিলেন এবং নানাভাবে তাহা-দিগকে শাস্তি দানের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং ভরোচ ও কন্যায়েতে যাহারা নায়েবকে কোনপ্রকার কটু কথা বলিয়াছিল কিংবা বিদ্রোহীদিগকে কোনপ্রকার সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই পাকড়াও করা হইল। সুলতান তাহাদিগকে নানাবিধ কঠোর শাস্তি দিলেন এবং বহু সংখ্যক লোক এই শাস্তি লাভ করিল।

সুলতান ভরোচ থাকা কালেই সকল শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী ও দুর্বৃত্তের সর্দার জয়েন বান্দা ও রুকন থানেশ্বরীর মধ্যম পুত্র দেবগিরির দুর্বৃত্তদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। থানেশ্বরীর পুত্র দুর্বৃত্তের শিরোমণি দেবগিরিতে পৌঁছিয়াছে এবং মুর্বতাসুল মুলক উপাধিধারী অধর্মী জয়েন বান্দা তখন পথে রহিয়াছে, এমন সময় দেবগিরির মুসলমানরা শুনিতে পাইল যে, তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য দুর্বৃত্তকে এখানে পাঠান হইয়াছে। তাহারা একজনকে চাক্ষুষ দেখিতে পাইল এবং অন্যজন সম্পর্কে শুনিতে পাইল যে, সে ধারায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এইরূপ অবস্থায়, খোদার কি ইচ্ছা, সুলতান মুহম্মদ উহাদের পিছনে পিছনে দুইজন বিশিষ্ট আমীরকে দেবগিরিতে পাঠাইয়া কতলুগ খানের ভাইকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন হাজার দেড়েক অশ্বারোহী সুসজ্জিত করিয়া তথাকার বিশিষ্ট আমীর শতীদের সঙ্গে ভরোচে পাঠাইয়া দেন। কতলুগ খানের ভাই মওলানা নিজাম উদ্দিনও দেড় হাজার অশ্বারোহীকে সুসজ্জিত করিয়া যথারীতি খরচপত্র দিয়া বিশিষ্ট আমীর শতীদের সহ পূর্বোক্ত দুই জন আমীরের সঙ্গে ভরোচে পাঠাইয়া দিলেন।

দেবগিরির আমীর শতীরা তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যসহ ভরোচের পথে এক মঞ্জিল অতিক্রম করিবার পর তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহারা পরস্পর আলোচনা করিল যে, দরবারে আমাদের এইরূপ তলব হইবার আসল উদ্দেশ্য হইল আমাদিগকে হত্যা করা। আমাদের মধ্যকার আমীর শতীদের একজনও সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবে না। সকলের ভাগ্যেই আমীর শতীদের অনুরূপ শাস্তিলাভ ঘটিবে।

এইভাবে তাহারা পরামর্শ করিয়া বিদ্রোহ করিয়া বসিল এবং প্রথম মঞ্জিলেই সুলতানের প্রেরিত দুইজন আমীরকে হত্যা করিল। সেখান হইতে মহা হৈ চৈ করিয়া তাহারা দেবগিরির শাহী মহলে উপস্থিত হইল এবং মওলানা নিজাম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। যে সকল কর্মচারী সুলতানী দরবার হইতে

দেবগিরিতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের সকলকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিল। খানেশ্বরীর পুত্রকে ধরিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

এই সকল বিদ্রোহীরা ধারা গিরি হইতে সমস্ত শাহী খাজানা লুট করিয়া মালীক ইল আফগানের ভাই মখ আফগানকে তাহাদের সর্দার বানাইল। মখ আফগান দেবগিরির আমীর শতীদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল। তাহারা তাহাকে তখতে বসাইল এবং সমস্ত খাজানাখানা উপস্থিত অশ্বারোহী ও পদাতিকদের মধ্যে বাঁটিয়া দিল। সমস্ত মারাঠা অঞ্চল আমীর শতীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। বহু বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিপরায়ণ লোক এই আফগানদের দলে আসিয়া ভিড়িল। মান দেবের নিকট হইতে পলাতক ধোই ও বরোদার আমীররাও দেবগিরিতে আসিয়া জুটিল। ফলে সেখানে এক বিরাট গোলযোগের সৃষ্টি হইল। স্থানীয় বহুলোক এই সকল বিদ্রোহীর সহায়তার জন্য তৎপর হইয়া উঠিল।

দেবগিরির আমীরদের এইরূপ বিদ্রোহের সংবাদ সুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি একটি বিরাট সৈন্যদল সজ্জিত করিয়া ভরোচ হইতে দেবগিরি যাত্রা করিলেন। অনবরত চলিয়া শাহী ফৌজ দেবগিরি পৌঁছিলে সেই নিমকহারাম বিদ্রোহীরা উহার সম্মুখীন হইল। কিন্তু সুলতান মুহম্মদের তরবারির আঘাত উহারা সহ্য করিতে পারিল না। উহাদের অধিকাংশ অশ্বারোহীই যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিল। উহাদের সর্দার মখ আফগান, যে নিজ শিরে ছত্র ধারণ করিয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল, সে তাহার সঙ্গী সাথী সহ ধারাগিরির উপরে পলায়ন করিল। যে সকল আমীর বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিতেছিল, তাহারাও বাল-বাচ্চাসহ উক্ত কেল্লায় আশ্রয় লইল। হাসান কাঙ্কু, বদরের গোলযোগকারীরা ও মখ আফগানের ভাইয়েরা সকলে সুলতানী ফৌজের সম্মুখ হইতে পলাইয়া নিজেদের দেশে গিয়া পৌঁছিল। দেবগিরির সকল শ্রেণীর বাসিন্দা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সুলতানী সৈন্যের দ্বারা লুন্ঠিত হইল।

সুলতান ইমাদুল মুলক সেরতেজ সুলতানীকে কিছু সংখ্যক আমীর ও সৈন্যদল সহ গুলবরগা যাইতে এবং সেখানে থাকিয়া উক্ত অঞ্চলকে সুসংহত করিতে আদেশ দিলেন। যে সকল বিদ্রোহী শাহী ফৌজের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যথাযোগ্য শাস্তিদানের মাধ্যমে তাহাদের মুলোৎপাটনের জন্যও সুলতান নির্দেশ দিলেন। সুলতান দেবগিরিতে কিছুদিন থাকিবার মানসে খাস মহলে অবতরণ করিলেন। দেবগিরির সকল মুসলমান এই মহান সুলতানকে দেখিবার জন্য চতুর্দিক হইতে শহরে আসিয়া ভীড় জমাইল।

সুলতান মুহম্মদ বর্তমান সুলতান, মালীক কবীর ও আহমদ আয়াযের নিকট দিল্লীতে দেবগিরির বিজয়বার্তা লিখিয়া পাঠাইলেন। সর্বত্র আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল। সুলতানের অনুপস্থিতিতে এই তিনজন রাজ্যের সমুদয় ব্যাপার চালাইতে ছিলেন। এই কারণে শহরের লোকজনের চলাফেরা অনেকখানি সহজ হইয়া উঠিয়াছিল।

সুলতান দেবগিরিতে থাকিয়া সমগ্র মারাঠা অঞ্চলের বিলি ব্যবস্থা এবং আমীরদিগকে জায়গীর দান কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় গুজরাট হইতে অন্য এক নিমক হারামের বিদ্রোহের কথা শুনিতে পাইলেন। সফদর মুলক সুলতানীর এক গোলাম দাস্তানা তৈরী করিত। তগী নামক সেই গোলাম গুজরাটের আমীর শতীদিগকে নিজের দোস্ত বানাইয়া গোলমাল পাকাইয়া তুলিল। গুজরাটের কিছু সংখ্যক মুকদিমও তাহাদের সহায়ক হইয়া দাঁড়াইল। এই নিমকহারাম উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নহরওয়ালে আসিল এবং শায়খ মুইয উদ্দিনের সহায়ক মালীক মুজাফ্ফরকে হত্যা করিল। শায়খ মুইয উদ্দিনকেও তাঁহার কর্মচারীগণ সহ বন্দী করিয়া রাখিল। সেখান হইতে অগ্রসর হইয়া এই নিমকহারাম কন্যায়েতে আসিয়া সমস্ত কিছু তছনছ করিয়া ফেলিল এবং সেখান হইতে যথাসম্ভব শীঘ্র দলবল লইয়া ভরোচের দুর্গের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ভরোচের দুর্গও ইহাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং প্রতিদিন দুর্গবাসীদের সহিত ইহাদের যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

সুলতান মুহম্মদ ইহাদের এই প্রকার গোলযোগের সংবাদ শুনিবার পর খোদাওন্দজাদা কেওয়াম উদ্দিন, মালীক জওহর, শায়খ বুরহান বালারামী ও জাহরুল জুয়ুশকে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ দেবগিরিতে রাখিয়া এবং মারাঠা অঞ্চলের বিলিব্যবস্থার কাজ অর্ধসমাপ্ত ছাড়িয়া দিয়া যথাসম্ভব শীঘ্রই ভরোচের দিকে রওয়ানা হইলেন। দেবগিরিতে তখনও যে সকল মুসলমান পরিবার ছিল, তাহাদিগকে সৈন্যদলের সঙ্গে ভরোচে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে খাদ্যদ্রব্য খুবই দুর্মূল্য হইয়া উঠিল এবং ইহার ফলে সৈন্যদলের লোকজনেরা নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইল।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি জিয়া বারানী এই সময়ে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হই। দেবগিরির কুঠিসাকুন হইতে সুলতান তখন ভরোচের পথে দুই এক মঞ্জিল অতিক্রম করিয়াছেন। আমি দিল্লী হইতে বর্তমান সুলতান, মালীক কবীর ও আহমদ আয়াযের দেওয়া মোবারকবাদ লিপি লইয়া আসিয়া সুলতান মুহম্মদকে প্রদান করি। দেবগিরির যুদ্ধ জয়ের সংবাদে তাঁহাদের

দেওয়া এই মোবারকবাদ লিপি পাইয়া সুলতান খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে নানাবিধ সমাদর ও উপহার দিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

একদিন আমি সুলতানের পার্শে পাশে চলিতে ছিলাম এবং তিনি আমার সহিত নানাপ্রকার কথা বলিতেছিলেন। ইহার মধ্যে বিদ্রোহীদের কথা আসিয়া পড়িল। আমাকে সুলতান বলিলেন, দেখিতেছ, নিমকহারাম আমীর শতীরা কেমন গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছে। আমি যদি একদিকে কোনপ্রকারে ইহাদের দুষ্কৃতি দূর করি, অমনই অন্যদিকে ইহারা গোলমাল সৃষ্টি করে। আমি প্রথমেই যেমন বলিয়াছিলাম, ঠিক তেমনভাবে যদি এক সঙ্গে দেবগিরি, গুজরাট ও ভরোচের সমুদয় আমীর শতীকে শায়েস্তা করিয়া ফেলিতাম, তাহা হইলে এখন আর এইরূপ দুর্ভোগ পোহাইতে হইত না। তেমনই আমার এই নিমকহারাম গোলামকে যদি পূর্বেই শায়েস্তা করিতাম কিংবা উহাকে যদি স্মারক হিসাবে এডেনের বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিতাম, তাহা হইলে আজ এই ধরনের একটি গোলমাল দেখা দিত না।

কিন্তু আমি সেই সময়ে সুলতানের খেদমতে এই কথা বলিতে সাহস পাইলাম না যে, চতুর্দিকে যে সকল বিদ্রোহ ও গোলযোগ দেখা দিয়াছে, ইহার সমুদয়ই সুলতানের অতিরিক্ত শাস্তিদানের ফল। তিনি যদি কিছুকাল শাস্তি প্রদান বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, এই সকল গোলযোগ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের মন হইতে অহেতুক আশঙ্কার ভাবও দূর হইয়া গিয়াছে। আমি সুলতানের মেজাজকে ভয় করিয়া আমার মনের এই সকল কথা আমার মনেই চাপিয়া রাখিলাম। মনে মনে আরও বলিলাম, কি এমন রহস্য আছে যে, দেশ ও রাজ্যের এই প্রকার দুরবস্থার প্রকৃত কারণ এবং দূর করিবার যথার্থ উপায় সুলতানের মনে পড়িতেছে না।

সুলতান মুহম্মদ সসৈন্যে অনবরত পথ চলিয়া ভরোচের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত নর্মদা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। নিমকহারাম তগী যখন শুনিল যে, সুলতানী সৈন্যদল ভরোচের নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন সে প্রায় তিন শত অশ্বারোহী সহ ভরোচ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুলতান নর্মদার তীর হইতেই মালীক ইউসুফ বগরাকে দুই হাজার অশ্বারোহী ও কিছু সংখ্যক আমীর সহ কন্যায়েতের দিকে পাঠাইলেন। সেখানে তগীর সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ হইল এবং খোদার ইচ্ছায় মালীক ইউসুফ নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া ভরোচে ফিরিয়া আসিল।

মালীক ইউসুফের শহীদ হওয়া ও সৈন্যদের পরাজয়ের সংবাদ সুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি নদী পার হইয়া দুইতিন দিনে ভরোচের শৃঙ্খলা স্থাপনের

কাজ শেষ করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র কন্যায়েতের দিকে যাত্রা করিলেন। তগী যখন শুনিল যে, সুলতানী সৈন্য কন্যায়েতেও আসিতেছে, তখন সে সেখান হইতে পালাইয়া আসাওলে পৌছিল। সুলতানও কন্যায়েতের রাস্তা ছাড়িয়া আসাওল-এর দিকে চলিলেন। নিমকহারাম তগী যখন শুনিতে পাইল যে, সুলতান আসাওলের দিকে আসিতেছেন, তখন সে আসাওল ত্যাগ করিয়া নহরওয়ালে উপস্থিত হইল।

সুলতান ভরোচ হইতে সসৈন্যে তগীর পশ্চাদ্ধাবন করিবার পূর্বেই এই নিমকহারাম তাহার সহিত বন্দী শায়খ মুইয উদ্দিন ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে হত্যা করিয়াছিল। তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি নিরুপায় হইয়া এমন এক নীচ ও হেয় লোকের কথা লিখিতেছি। নতুবা যে ইতিহাসে মহান সম্রাট ও জ্ঞানী-গুণীদের কথা রহিয়াছে, সেখানে তগীর ন্যায় নিমকহারামের কথা লিখা খুব সহজ বা শোভন নহে। অথচ এই তগীই কিছু সংখ্যক লোক লইয়া বার বার সুলতানী ফৌজের সম্মুখীন হইতে লাগিল। আবার সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিয়া নির্লজ্জের মত এখানে-সেখানে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। সুলতানী ফৌজের সঙ্গে উহার তুলনা করিলে এই পদটির কথা মনে পড়ে,

মাছিকে কি তরবারি দিয়া কাটা যায় ;
আর মশাকে কি সিংহ থাবড়া মারিতে পারে ?

সুলতান আসাওলে পৌছিলে সৈন্যদলের অশ্বাদির দুর্বলতা ও বৃষ্টির জন্য তাঁহাকে সেখানে প্রায় একমাস অবস্থান করিতে হইল। কিছুদিন পরে অনবরত বৃষ্টিপাতের মধ্যেই সংবাদ আসিল যে, তগী নিমকহারাম তাহার কিছু সংখ্যক সঙ্গী লইয়া নহরওয়াল হইতে আসাওলের দিকে আসিতেছে এবং পথে কাড়া কসবায় আসিয়া পৌছিয়াছে। সুলতান মুহম্মদ এই অবিরাম বৃষ্টির মধ্যেই আসাওল হইতে বাহিরে আসিয়া তিন চারি দিনে কাড়াবতী কসবার নিকট গিয়া পৌছিলেন। সেখানে তগী নিমকহারাম তাহার সঙ্গীসহ অবস্থান করিতে-ছিল। দ্বিতীয় দিন সুলতান উহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিলেন।

হারামখোররা সুলতানী সৈন্যদল দেখিয়া মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া উঠিল এবং শতী অশ্বারোহীরা নিজেদের প্রাণ হাতের মুঠায় ধরিয়া বেপরোয়া ভাবে খোলা তরবারি সহ খাস সুলতানী সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু হাতীর চাপ এই দুর্ভাগা মাতালেরা সহ্য করিতে পারিল না। ইহারা সুলতানী সৈন্যদলের অগ্র-পশ্চাতে ছত্রভঙ্গ হইয়া ঘন জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল এবং নহরওয়ালের দিকে পলায়ন করিল। কিছু সংখ্যক নাফরমান ও উহাদের

আসবাবপত্র সুলতানী সৈন্যদলের হাতে আসিল। প্রায় চারিপাঁচ শত লোক উহাদের রসদগাহ হইতে সুলতানী সৈন্যদের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। তাহাদের সকলকে তরবারির সাহায্যে দুই টুকরা করিয়া ফেলা হইল।

সুলতান মুহম্মদ ইউসুফ বগরার পুত্রকে পলাতক বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য নহরওয়ালের দিকে পাঠাইলেন। কিন্তু রাত্রি হওয়ায় ও অস্থানে যাওয়ার ফলে মালীক ইউসুফের পুত্র পথেই শিবির স্থাপন করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিল। অন্যদিকে তগী তাহার কতিপয় সঙ্গীসহ নহরওয়াল আসিল এবং সেখান হইতে বিদ্রোহীদের অবশিষ্ট ধনজন লইয়া 'কান্ত বরাহী' গিয়া পৌছিল। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া কর্নালের রাজা মহারূপের নিকট হইতে অনুমতিপত্র আদায় করিয়া তথায় গমন করিল। সেখান হইতে 'তহিলা' ও 'দমরীলা' গিয়া পৌছিল এবং সেখানে আশ্রয় পাইল।

সুলতান দুই তিন দিন পরে নহরওয়াল আসিলেন। তিনি 'শশীলং' পুকুরের নিকটস্থ চবুতরায় অবতরণ করিলেন। এখানে থাকিয়া গুজরাটের রাজ্যগুলির শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপনে রত হইলেন। ঐ অঞ্চলের মুকদিম, রানা ও মোহান্তগণ আসিয়া সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং নানাভাবে সুলতানের সাহায্য করিয়া বহু পুরস্কার ও সম্পদ লাভ করিল। সুতরাং ঐ অঞ্চলে খুব অল্প দিনেই মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখা দিল এবং মানুষ বিদ্রোহীদের হাতে ধনে-জনে বিনাশ হওয়া হইতে বাঁচিতে পারিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী তগীর সঙ্গ ছাড়িয়া 'মন্দল' ও 'তিরী'র রানার নিকট আশ্রয় লইয়াছিল এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিল। কিন্তু মন্দল ও তিরীর রানা উহাদিগকে হত্যা করিয়া উহাদের শিরগুলি সুলতানের খেদমতে পাঠাইয়া দিল এবং উহাদের ধনসম্পদ ও বাল-বাচ্চাকে নিজ সম্পত্তিতে পরিণত করিল। ইহার ফলে রানাকে সুলতানের তরফ হইতে পোশাক ও সোনা-রূপা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল এবং রানাও অনুমতি লইয়া সুলতানের খেদমতে আসিয়াছিল।

সুলতান মুহম্মদ নহরওয়ালে শশীলঙ্গের চবুতরায় অবস্থান করিয়া গুজরাট অঞ্চলের শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় দেবগিরি হইতে গোলযোগের সংবাদ আসিয়া পৌছিল। যে হাসান কাঙ্গু যুদ্ধের দিন সঙ্গীসহ পলাইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া ইমাদুল মুলককে হত্যা করিয়াছে। তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। খোদাওন্দজাদা কেওয়াম উদ্দিন,

মালীক জওহর ও আহরুল জয়ুণ দেবগিরি ছাড়িয়া ধারের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। হাসান কাঙ্কু দেবগিরিতে আসিয়া, নিজ শিরে ছত্র ধারণ করিয়াছে। যাহারা সুলতানী ফৌজের ভয়ে ধারা গিরিতে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও আসিয়া উহার সহিত মিশিয়াছে। ইহার ফলে সেখানে এক বিরাট গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

সুলতান মুহম্মদ এই বিদ্রোহের সংবাদ শুনিয়া খুবই চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, মানুষ একান্তই বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগকে সংশোধন করা সহজ ব্যাপার নহে। রাজ্যে যেভাবে অরাজকতা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, উহাতে রাজ্যের পতন খুব দূরে নহে। সম্ভবত এইজন্যই তিনি যে কয় মাস নহরওয়ালে ছিলেন, কাহাকেও শাস্তি দেন নাই।

সুলতান দেবগিরিতে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী হইতে আহমদ আয়ায, মালীক বাহরাম গজনীন ও আমীর মেহমান আমীর কবতআকে সৈন্যসহ ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারাও সকলে সুসজ্জিত হইয়া সুলতানের খেদমতে আসিয়া পৌছিলেন। কিন্তু পরে সংবাদ আসিল যে, হাসান কাঙ্কুর পার্শ্বে বহু সংখ্যক লোক আসিয়া ভীড় জমাইয়াছে। ইহার ফলে সুলতান আহমদ আয়ায, মালীক বাহরাম ও আমীর কবতআকে দেবগিরিতে পাঠান খুব যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। আপাততঃ দেবগিরির ব্যাপার ত্যাগ করিয়া তিনি গুজরাটের সুব্যবস্থা ও কর্নালকে অধিকারে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে মনস্থ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, কর্নাল জয় করিয়া হারামখোর তগীকে শায়েস্তা করা আমার জন্য একান্তই দরকারী হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য দেবগিরিতে লোক পাঠাইলেও পশ্চাতের দিকে আমার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং এই কাজ শেষ করিতে পারিলে পরে আমি এক সঙ্গে দেবগিরির বিদ্রোহীদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিব। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সুলতান কর্নাল ও কম্যায়েত জয় করাকেই অগ্রাধিকার দান করিলেন।

দেবগিরি হইতে যে সকল আমীর শতী আসিয়াছিল, ইতোমধ্যে তাহারা একে একে ক্রমে ক্রমে দেবগিরিতে পলাইয়া গিয়া বিদ্রোহীর সহিত মিশিয়া গেল। এইভাবে দেবগিরি সম্পূর্ণরূপে সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করিল।

সুলতান যখন দেবগিরিতে সৈন্য পাঠাইবেন কিনা সেই ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত ছিলেন, তখন এই তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক বেচারাকে একদিন কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমার রাজ্য রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন ঔষধই আমি দেইনা কেন উহার আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। যদি মাথা

বিষের ঔষধ দেই, তবে জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বরের ঔষধ করিলে সর্দি দেখা দেয়। এইভাবে একটির পর একটি রোগ আসিয়া দেখা দিতেছে। আমি একদিকে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলে, অন্যদিকে গোলযোগ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। একদিকে সুব্যবস্থা করিতে না করিতেই অন্য দিক বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। তুমি আমাকে বল, পূর্ববর্তী বাদশাহগণ রাজ্যের এইরূপ অবস্থায় কি পথ অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন ?

বান্দা আমি জোড় হাতে সুলতানের খেদমতে আরজ করিলাম, পূর্ববর্তী বাদশাহগণ এই প্রকার রোগগ্রস্ত রাজ্যের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যখন দেখিয়াছেন যে, রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং সর্ব শ্রেণীর লোকের মন তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহারা রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের কোন যোগ্য পুত্রকে উহার ভার অর্পণ করিয়াছেন। নিজে রাজধানীর কোথায়ও নির্জনে এমন কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন, যাহাতে দোষত্রুটি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কম। তাহারা কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবসহ জীবনের বাকী অংশ কাটাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজকার্যের জটিলতা হইতে সাগ্রহে নিজদিগকে দূরে রাখিয়াছেন।

অনেকে রাজ্যের লোকজনের এইরূপ বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য একেবারে সব কিছু ত্যাগ করিয়া শুধু মদ, গান আর শিকারে নিজদিগকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন এবং রাজ্যের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিজ উজির, দরবারী ও সহায়কদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, এই ব্যাপারে তাহারা কোন খোঁজ-খবর রাখেন নাই। ইহা এই ধরনের এক ঔষধ, যাহাতে বাদশাহ রাজ্যের লোকজনের উপকারও করেন না এবং তাহাদিগকে খুব শাস্তিও দেন না। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ চিনিবার একটা ইচ্ছা জাগরিত হয় এবং তাহারা ঔষধ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে। বস্তুতঃ রাজ্যের বিশৃঙ্খলারূপী রোগগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রোগ হইল সামগ্রিক অরাজকতা এবং শাসকের প্রতি প্রজার বিরূপ মনোভাব।

সুলতান ইহার উত্তরে বলিলেন, যদি রাজ্যের অবস্থা আমার ইচ্ছা অনুরূপ শোধরাইয়া যায়, তবে আমি দিল্লীর এই রাজ্য এই তিন জন অর্থাৎ বর্তমান বাদশাহ সুলতান ফিরুজ শাহ, মালীক কবির ও আহমদ আয়াযের মধ্যে এক-জনের হাতে তুলিয়া দিব এবং আমি কাবা শরীফ জিয়ারতে যাইব। কিন্তু বর্তমানে আমি মানুষের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছি এবং মানুষও আমার

ব্যবহারে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া গিয়াছে। আমি যেমন মানুষের চরিত্র বুঝিয়া ফেলিয়াছি, মানুষও ঠিক তেমনি আমার মেজাজ বুঝিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্যই আমি যত ঔষধই প্রয়োগ করি না কেন, তাহা ফলপ্রসূ হইতেছে না। দুর্বৃত্ত, গোলযোগকারী ও বিদ্রোহীদের জন্য আমার ঔষধ হইল তরবারি। আমি শাস্তির ধারা অব্যাহত রাখিব; তরবারির দ্বারা আঘাত করিতেই থাকিব। হয় উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, না হয় উহারা সোজা পথে আসিবে। মানুষ যতই আমার বিরোধিতা করিবে, আমিও সেই পরিমাণে শাস্তির মাত্রা বাড়াইয়া দিব।

যাহা হউক সুলতান মুহম্মদ দেবগিরির অভিযান পরিত্যাগ, গুজরাটের শৃঙ্খলা স্থাপনে নিয়োজিত রহিলেন। তিনি এখানে পর পর তিনটি বর্ষাকাল কাটাইলেন। তাঁহার একটি বর্ষাকাল মন্দল ও তিরীতে অতিবাহিত হইল। এই সময় গুজরাটের সুব্যবস্থা ও লোকজন সংগ্রহে ব্যয় করিলেন। দ্বিতীয় বর্ষা-কাল সুলতান কর্নাল দুর্গের নিকট কাটাইলেন। যখন কর্নালের মুকদিম সৈন্যের প্রাচুর্য ও শাহী জাঁকজমক স্বচক্ষে দর্শন করিল, যে তগীকে জীবিত বন্দী করিয়া সুলতানের হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু তগী এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল এবং থাট্টায় আসিয়া থাট্টার জামের নিকট আশ্রয় লইল।

বর্ষাকাল যাওয়ার পর সুলতান কর্নাল অধিকার করিলেন। উহার সহিত পার্শ্বের সমুদ্র তীর ও দ্বীপগুলিও সুলতানের অধিকারে চলিয়া আসিল। উক্ত অঞ্চলের রানা ও মুকদিমরাও সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আনুগত্য স্বীকার করিল এবং যথাযোগ্য পোশাক ও ইনাম লাভ করিল। কর্নালে দরবার হইতে একজন 'মহাত্মা' নিয়োগ করা হইল এবং 'কহনকার' ও কর্নালের রানা বন্দী হইয়া দরবারে রহিল। এই অঞ্চল খুব শীঘ্র সুব্যবস্থিত ও সবিন্যস্ত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় বর্ষাকাল সুলতান 'কন্দলে' কাটাইলেন। কান্দল থাট্টার সমরকান ও মবিলাদের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। এইস্থলে সুলতান রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং কয়েকদিন জ্বরে অচেতন হইয়া রহিলেন। সুলতানের কন্দলে আসিবার পূর্বে দিল্লী হইতে মালীক কবীরের মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুলতান এই সংবাদে খুবই দুঃখিত হইয়া পড়েন। তিনি সৈন্য দল হইতে মকবুল নায়েব উজির মুমালেক ও আহমদ আয়াযকে দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা দেখিবার জন্য দিল্লীতে পাঠাইলেন। দিল্লী হইতে সুলতান খোদাওন্দ জাদা, মখদুমজাদা ও অন্যান্য গণ্যমান্য শায়খ, আলেম এবং মালীক, আমীর, সোয়ার ও পেয়াদা প্রভৃতির সঙ্গে হারেমকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সকলেই

যথারীতি জাঁকজমকের সহিত কন্দলে আসিয়া সুলতানের সহিত মিলিত হইল। ফলে কন্দলে সুলতানের নিকট বহু লোকজনের ভীড় জমিয়া উঠিল। সৈন্যদল সুসজ্জিত হইল এবং দেবপালপুর, মুলতান, উচ্, সিসস্তান ইত্যাদি হইতে সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল।

সুলতান মুহম্মদ রোগমুক্ত হইয়া সমুদয় সৈন্যসহ কন্দল হইতে সিন্ধু নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে তিনি সমুদয় সৈন্য ও হাতী-ঘোড়া সহ সিন্ধু নদী পার হইলেন। এই সময়ে আমীর করগণ প্রেরিত চারি পাঁচ হাজার মোগল অশ্বারোহী সহ আলতুন বাহাদুর সুলতানের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। সুলতান আলতুন বাহাদুর ও অন্যান্য গণ্যমান্য মোগল সৈন্যদিগকে যথাযোগ্য ও প্রচুর উপহারাদি প্রদান করিলেন। ইহার পর সুলতান এই পঙ্গপাল তুল্য অগণিত সৈন্যসহ সিন্ধু নদীর তীরে তীরে থাট্টার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে তিনি সমরকান ও তাহাদের আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া পলাতক তগীকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন।

সুলতান মুহম্মদের পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়া এবং সেই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার বর্ণনা

সুলতান মুহম্মদ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া থাট্টার ত্রিশ ক্রোশ দূরে উপনীত হইলেন। সে ছিল আশুরা। সুলতান রোজা রাখিয়াছিলেন। ইফতারের সময় মাছ আহার করিলেন। কিন্তু উহা তাঁহার সহ্য হইল না। পুনরায় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্বর বৃদ্ধি পাইল। এই জ্বর লইয়াও সুলতান নৌকাযোগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং আশুরার দু তিন দিন পরে থাট্টা হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া সুলতানের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার আদেশ হইলে তাহারা থাট্টা, সমরকান ও তগী নিমকহারামকে আক্রমণ করিয়া ছিন্নভিন্ন ও নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু খোদার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ :

বাদশাহ সেই চেষ্টায় ছিলেন, তিনি খোদার ইচ্ছার কথা জানিতেন না ;
সেই জন্য তাঁহার ইচ্ছা খোদার ইচ্ছার কাছে পরাজিত হইল।

থাট্টা হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দূরে যে দুই একদিন সুলতান শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। সুলতানের শরীরের এই দুরবস্থা দেখিয়া সৈন্যদল দিশাহারা হইয়া পড়িল। লোকজনের মধ্যে ত্রাসের ভাব দেখা দিল। স্ত্রীপুত্র-পরিজন হইতে হাজার ক্রোশ দূরে অজস্র

ও মরদানের মধ্যে যেভাবে তাহারা শিবির স্থাপন করিয়াছে এবং যেভাবে শত্রুর আওতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সুলতানের কোন কিছু হইলে নিজেদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা মনে করিতে লাগিল। সেই বিপদই দেখা দিল। হিজরী ৭৫২ সনের ২১শে মোহররম তারিখে সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহ থাট্টা হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দূরে সিন্ধু নদীর তীরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহকালের পাট চুকাইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্যে গিয়া পৌঁছিলেন। শাহী তখত হইতে চারিগজ মাটির গোরে প্রবেশ করিলেন। পদ —

আলপ আরসালানের সমুন্নত শির দেখিয়াছ, যাহা আকাশ ভেদ করিয়াছিল;
এখন মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহটি কবরে গিয়া দেখিও।
যে আমীরের মহলে সর্বদা হাজার হাজার রক্ষী প্রহরায় থাকিত;
এখন তাঁহার কবরের গম্বুজে কাকেরা পাহারা দিতেছে।
খসরুর সিংহাসনে মাকড়সা জাল বুনিতেছে এবং
আফ্রিসিয়াবের দুর্গে পেচকের কণ্ঠস্বরের নহবত বাজিতেছে।

অকৃতজ্ঞ আকাশের জন্য আক্ষেপ এবং নিষ্ঠুর কাল চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, উহারা পৃথিবীর আশ্রয় ও নিয়ামক বাদশাহদিগকে হীনতার চারি গজ মাটির গোরে স্থান দিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমের এই স্থান সম্রাটকে উহারা এক হেয় অবস্থায় উপনীত হইতে বাধ্য করিয়াছে। পদ—

পৃথিবীর ভোগের পরিণতি বিষক্রিয়ায়
এবং জীবন রূপ বীজের পরিণাম মৃত্যু-ফল।
হে নশ্বর মানুষ, স্থির হও;
এই অকিঞ্চিৎকর জগতের সহিত অধিক মিশিও না।
হাশরের ভোর দেখা দিয়াছে, অথচ আমরা ঘুমাইয়া রহিয়াছি;
পৃথিবীর ঘুমন্ত সকলকে জাগাইয়া দাও।
ধ্বংসের শয্যা তোমাদের জন্য সজ্জিত হইতেছে;
এই ভোগের শয্যা এখনও ত্যাগ কর।
ভোর হইয়াছে, উঠ, তোমার বালাখানার দ্বার খোল;
মুহম্মদ শাহ মাটির শয্যায় শায়িত।
তোমরা শোকের সুনীল বসন পরিধান কর;
তোমার তুচ্ছ হাতে পৃথিবীর এই বিরাট পরিত্যক্ত মজ্জার উপর
মাটি নিক্ষেপ কর।

সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহের ইন্তেকালের পর তাঁহার সৈনাদল ও লোকজনেরা বিদ্রোহী শত্রু, মোগল অশ্বারোহী ও সমরকামীদের মধ্যে পড়িয়া ভয়ে ভাবনায় অর্ধমৃত হইয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া নামাজ ও দোয়া জিকিরে মশগুল হইল এবং দুই হাত তুলিয়া খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল—

হে পথভ্রষ্টদের পথপ্রদর্শক।
হে অসহায়ের সহায়!
আমাদিগকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার কর।

সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলক

সদরে সদুরে জাহান সৈয়দ জালাল উদ্দিন কিরমানী; শাহজাদা ফিরুজ বাহবেক; শাহজাদা মোবারক খান; শাহজাদা জাফর খান; তাঁহার চারি পুত্র—মহলে যাঁহারা শাহজাদা রূপে ছিলেন; ফিরুজ খান অর্থাৎ সুলতান মুহম্মাদের পুত্র ফতেহ খান; সুলতানের ভাই মালীক ইব্রাহিম নায়েব বারবেক; মহম্মদ খান শাহজাদা; খান জাহান উজিরে মুমালেক; তাতার খান মরহুম ও মগফুর; সুলতানের ভাই মালীক কতুব উদ্দিন; মালীক শরফুল মুলক; সাইফুল মুলক আমীর শিকার মায়মনা; শের খান মালীক মাহমুদ বেক; মালীক ইতে মাদুল মুলক বশীর সুলতানী; মালীক দহলান আমীর শিকার মায়সরা; সুলতান মুহম্মাদের ভাগিনের দাওর মুলক; মালীক আমীর মুয়াজ্জম আমীর আহম্মদ ইকবাল; তাতার খানের পুত্র মালীক কামরান; আমীর কবচআ আমীর মেহমান; মালীক নিজামুল মুলক নায়েব উজির মুমালেক; মালীক মুইনুল মুলক আইন উদ্দিন উমর নায়েব সুলতান ও নায়েব আরাজ বন্দেগান; আমীর আহমদ ইকবালের পুত্র আমীর হুসাইন আনিস সুলতানী; মালীক কবুল কোরান খান আমীর মজলিস; মালীক কমর সের ছত্রদার সুলতান; মালীক সরক সের সেলাহদার মায়সরা; মালীক তাজ ইখতিয়ার সের সেলাহদার মায়মনা; জাফর খান নায়েব উজির গুজরাট; মালীক ফখরু উদ্দিন দৌলতিয়ার সের জামদার মায়সরা; মালীক মুহম্মদ দমলান সের জামদার—মায়মনা; মালীক দৌলত শাহের পুত্র মালীক বদর উদ্দিন—আখোর বেক; মালীক ফখরু উদ্দিন আর মেনায়ে জঙ্গ; মালীক জালাল উদ্দিন দুধিরতৌকীর বেগ; কতলুগ খান মরহুমের পুত্র আলপ খান; মালীক বুরহান উদ্দিন কাজী শাহ খাস হাজেব কেতাদার দেবপালপুর; মালীক সৈয়দ আল হুজ্জাব খাজা মারুফ; মালীক খালদ নায়েব সৈয়দ আল হুজ্জাব; সৈয়দ রসুলদার; সৈয়দ মুইয উদ্দিন মরহুম; মালীক ইজ্জ উদ্দিন হাজী দবীর; তাতার খানের পুত্র মালীক ইব্রাহিম—সম্বাজ্ঞের পর মুলতানের কেতাদার হন; মালীক আইনুল মুলক নায়েব মুলতান; মালীক দাউদ দবীর ওয়ালী জালুর; যে সকল গোলাম গণ্যমান্য হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন মালীক শাহীন, মালীক কবুল, তোরাবান্দা প্রমুখ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওস্‌সালাতু আলা
রসুলিহি মুহম্মদিও আলিহি আজমাঈন ও সাল্লামা
তসলীমান কাসীরান কাসীরা।

মুসলমানদের দোয়া প্রার্থী আমি জিয়া বারানী বলিতেছি যে, হিজরী ৭৫২ সনের ২৪শে মোহাররম তারিখে বর্তমান সুলতান আবুল মুজাফ্‌ফর ফিরুজ শাহ (আল্লাহ্ তাঁহার রাজত্ব স্থায়ী ও মর্যাদা সমুন্নত করুন) সর্ব সম্মতিক্রমে এবং সর্বপ্রকার যোগ্যতা সহকারে থাট্টার সীমান্তে সিন্ধু নদীর তীরে সৈন্যদলের ফিরিয়া আসিবার কালে শাহী তখতে আরোহণ করেন। ইহার ফলে ভয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ মানুষের মনে স্বস্তি এবং সৈন্যদলে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। মোগল ও থাট্টার ডাকাত ও চোরদের অত্যাচার হইতে সর্বসাধারণ মুক্তি পাইয়া সুলতানী পতাকার তলে সকলে আসিয়া সমবেত হইল।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের ছয় বৎসর কালীন রাজত্বের যে সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বাদশাহের জ্ঞান, গুণ ও সদাচারের যে পরিচয় পাইয়াছি এবং রাজ্যের শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনে বাদশাহ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এগারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া লিখিয়াছি। যদি ভবিষ্যতে জীবিত থাকি, তাহা হইলে সুলতান ফিরুজ শাহের জীবন ও কীর্তি কাহিনীর উপর আরও নব্বইটি, মোট একশত একটি পরিচ্ছেদ লিখিবার ইচ্ছা আছে। আর যদি আমার সে সৌভাগ্য না হয়, তাহা হইলে যাহার সৌভাগ্য হয়, তিনিই এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিবেন।

বিষয়সূচী

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে সুলতান ফিরুজ শাহের তখতে বসার সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা ও কীর্তির বর্ণনা নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে এগারটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের তখতে আরোহণ এবং মোগল ও থাট্টার দুর্বৃত্তদের কবল হইতে মুসলমানদের মুক্তি লাভ

সুলতানের এই তখতে আরোহণ হিন্দুস্তান ও সিন্দুর সকল শ্রেণীর গণ্যমান্য লোক এবং শাহী মালীক আমীরদের সম্মতিক্রমে হইয়াছিল। মরহুম সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহ তাঁহার জীবদ্দশায় তিন জনকে সকল মালীক আমীরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার দরবারেও তাহাদের স্থান সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট। মরহুম সুলতান এই তিন জনের মধ্যে যে কোন একজনকে যে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিবেন, তাহাও সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল। আমীরুল মোমেনীনের নিকট প্রেরিত তাঁহার আবেদন-পত্রেও তিনি বারবার এই তিনজনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবেও তিনি আমীরুল মোমেনীনকে জানাইয়াছিলেন।

এই তিন জনের মধ্যে একজন হইলেন মালীক কবুল খলিফতী। তিনি সুলতানের জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বিতীয় জন হইলেন আহমদ আয়াম। তাঁহার সম্পর্কে এই তারিখ-ইর লেখক আমি ও অন্য আরও মালীকগণ বহুবার সুলতানকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আহমদ আয়াযের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার বয়স সত্তর পার হইয়া আশি হইতে চলিয়াছে। তিনি খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। চলাফেরা ও অশ্বে আরোহণ করাও তাঁহার জন্য কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার এই প্রকার বার্ধক্যের জন্যই দেওয়ানে উজারতে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। বস্তুত: তাঁহার কাজ করিবার শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি যদি এই সকল ঝামেলা ছাড়িয়া এখন শায়খ নিজাম উদ্দিনের খানকায় বসিয়া আখেরাতের চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে লোকের নিকট তাঁহার মর্যাদা বজায় থাকিত। অবশ্য আমি তাঁহাকে এই উপদেশ দিতে লজ্জা বোধ করি। তিনি যদি স্বেচ্ছায় ইহা করিতেন তবে ভাল হইত। তাহা হইলে আমি দেওয়ানে উজারতের কাজ এমন এক ব্যক্তিকে দিতে পারিতাম, যাহার মাধ্যমে উহার সকল অব্যবস্থা দূর হইতে পারে।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে তৃতীয় জন হইলেন বর্তমান সুলতান ফিরোজ শাহ (আল্লাহ তাঁহার রাজ্য স্থায়ী ও তাঁহার মর্যাদা সমুন্নত করুন)। তিনি সুলতান মুহম্মদের চাচাত ভাই হন। মরহুম সুলতান তাঁহাকে রাজ্যের

উত্তরাধিকারী করিবার কথাও ভাবিয়াছিলেন। সৈন্যদলে যে সময়ে সুলতান রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন জাঁহাপনা তাঁহার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা ও তাহার আরোগ্যের জন্য বহু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উত্তরাধিকারীর যোগ্য কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। মরহুম সুলতান খোদাওন্দ আলমের এই প্রকার সেবায় যারপরনাই সুখী হইয়াছিলেন। ইহার ফলে ইতোপূর্বে খোদাওন্দ আলমের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ও দরদ ছিল, তাহা আরও হাজার গুণ বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি নিজ উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহাকে মনোনীত করিলেন। মরহুম সুলতানের অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর খারাপ হইয়া দাঁড়াইলে তিনি জাঁহাপনাকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তাঁহার নাম ঘোষণা করিলেন।

যে দিন থাট্টার অনতিদূরে সিন্দু নদীর তীরে সুলতান মুহম্মদ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সেদিন সৈন্যদলে শোকের ঝড় বহিয়া গেল। লোকজন এই প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল এবং একে অন্যেকে লুট করিয়া নিজের শক্তি সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। সুলতানের মৃত্যুর দরুন সৈন্যদল সেইদিন সেখানেই অবস্থান করিল। কিন্তু নবাগত মোগল সৈন্য ও থাট্টার অধিবাসীদের আক্রমণের ভয়ে তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহারা সকলেই সৈন্যদলের ধনসম্পদ ও জন পরিজন অপহৃত হওয়ায় চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহার ফলে সর্বত্র হৈচৈ ও গোলযোগের সৃষ্টি হইল। এমন অবস্থায় ফিরিবার পথে নদীতে দুই তিনটি হাতী ডুবিয়া গেলে লোকজন আরও ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। নিজেদের ধনজন ও সহায় সম্পদ হারাইবার ভয়ে এই দুই তিন দিন কাহারও মুখে আহার উঠিল না। অন্যদিকে সুলতানের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে সৈন্যদলের এই প্রকার বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখিয়া মোগল সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

পরিস্থিতির এইরূপ অবনতি দেখিয়া বর্তমান সুলতান সকল মালিক আমীরের সম্মতিক্রমে যে সকল মোগল সৈন্য মরহুম সুলতানের সাহায্যের জন্য আলতুন বাহাদুরের সহিত সৈন্য দলে আসিয়া মিশিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার ও খেলাত দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। সুলতানী সৈন্যদল যাত্রা করিবার পূর্বে তাহারা যাহাতে দূরে সরিয়া গিয়া আলাদা হইয়া যায়, সেই মত নির্দেশ দিলেন। মোগল সৈন্যরাও সেই নির্দেশ মত সৈন্যদল হইতে পৃথক হইয়া দূরে সরিয়া গেল।

কিন্তু সৈন্যদলের এই প্রকার ভীত সন্ত্রস্ত দেখিয়া তরমী শিরীনের দামাদ নওরোজ কুরগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিল। যে বহু বৎসর মরহুম সুলতানের

নিকটে থাকিয়া নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ও ধনসম্পদ ভোগ করিয়াছিল। এই বিপদের দিনে সে সব কিছু ভুলিয়া নিজ সৈন্য সহ সুলতানী সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া মোগলদের সঙ্গে গিয়া মিশিল। সে তাহাদিগকে বলিল, সুলতানের মৃত্যুতে সৈন্যদলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। একদিকে তাহারা যেমন সহায় সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছে, অন্যদিকে তেমনি রাজধানী হইতে বহু দূরে অবস্থান করিবার ফলে সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। দুই দিন হইতে চলিল কেহ তখতে আরোহণ করে নাই। ইহার ফলে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আমি এই সকল লোকের মেজাজ মর্জি ভাল করিয়া জানি। আজ হইতে আমি তোমাদের বন্ধু। আগামী কাল সৈন্যদল যাত্রা করিবে। যেহেতু বর্তমানে কোন বাদশাহ নাই, সেই জন্য তাহারা বিশৃঙ্খল ভাবেই পথ চলিবে। এই সময়ে যদি আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করি, তাহা হইলে অতি সহজেই তাহাদের ধনসম্পদ ও পুত্র-পরিজন ছিনাইয়া লইতে পারিব। খোদাওন্দজাদা ও সুলতান মুহম্মদের বড় ভগ্নি একসঙ্গে মালীকদের হারেমের সহিত যাইবে; তাহাদিগকেও আমরা আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই কাবু করিয়া ফেলিতে পারিব।

এইভাবে বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ নওরোজ কুরগণ মোগলদিগকে উত্তেজিত করিল এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া আরও বলিল, এত প্রচুর ধনরত্ন ও পুত্র-পরিজন সহ এমন একটি বিশৃঙ্খল সৈন্যদল, যাহারা বাদশাহের অভাবে অস্থির ও রাজধানী হইতে বহুদূর মাঠে ময়দানে সন্ত্রস্ত অবস্থায় রহিয়াছে; ইহাদের ন্যায় এমন একটি সহজ শিকার আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। মোগলরাও নওরোজের কথায় বিশ্বাস করিল এবং সকলে একমত হইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সুলতানের মৃত্যুর তৃতীয় দিনে শাহী ফৌজ থাট্টার চৌদ্দ ক্রোশ দূর হইতে সিসস্তানের দিকে যাত্রা করিল। প্রত্যেক দল নিজ ইচ্ছামত বিশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেহ কাহারও কথা শুনিল না এবং কেহ কাহাকেও সাহায্য করিল না। সওদাগরী কাফেলার ন্যায় অসতর্কভাবে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহারা পথ চলিতে লাগিল। এই ভাবে এক দুই ক্রোশ দূর অগ্রসর হইবার পর মোগলরা লুট করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্যদলের সম্মুখ দিক হইতে আক্রমণ করিল এবং পিছন দিকে থাট্টার দুর্বৃত্তরাও আসিয়া জুটিল। ইহার ফলে লোকজন সর্বত্র আরও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল এবং সকলের মুখে 'হায় হায় গেল গেল' রব উঠিল। মোগলরা সুযোগ পাইয়া সম্মুখের দিক হইতে যাহা পারিল লুটিয়া লইল। যে সকল সৈন্য ফৌজের বেশী আগে চলিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে সহজে মারিয়া কাটিয়া মোগলরা তাহাদের মালমাত্তা ও বালবাচ্চা ছিনাইয়া লইয়া গেল।

অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল যে, শাহী খাজানা ও হারেম লুট হইয়া যাইবার সমূহ আশংকা দেখা দিল। সৈন্যদলের মধ্যকার দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকেরাও তৎপর হইয়া উঠিল এবং ডাইনে বামে যে সকল মালমাত্তা ছিল, উহার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। পিছন দিকে থাট্টার চোর ডাকাতরা আসিয়া শাহী খাজানাখানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে সৈন্যদলের লোকজন মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইল। কারণ তাহারা অগ্রসর হইলে মোগলদের হাতে পড়ে এবং পিছনে পড়িলে থাট্টা-বাসীদের কবলে যাইতে হয়।

এইভাবে দাঁড়াইয়া চলিয়া কোন প্রকারে 'খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ' বলিতে সৈন্যদল প্রথম মঞ্জিল অতিক্রম করিল। যাহারা মালমাত্তা ও বালবাচ্চা আগে পাঠাইয়া দিয়াছিল, তাহারা উহা আর ফিরিয়া পাইল না। যাহা হউক এই বিশৃঙ্খল সৈন্যদল কোন প্রকারে নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিল। জান-মাল ও বালবাচ্চা হারাইবার ভয়ে সেই রাতে সৈন্যদলের একটি লোকেরও নিদ্রা হইল না। সকলেই নানাবিধ আশংকায় সারারাত ছটফট করিয়া কাটাইল।

দ্বিতীয় দিনও পূর্বদিনের ন্যায় একদিকে মোগলদের আক্রমণ, অন্যদিকে থাট্টাবাসীদের অন্যায় আচরণ কলেকৌশলে প্রতিহত করিয়া কোনপ্রকারে সৈন্যদল দ্বিতীয় মঞ্জিল অতিক্রম করিল। রাত্রে নদীর তীরে শিবির স্থাপন করা হইল। কিন্তু তখন সৈন্যদলের লোকজনের অবস্থা একান্তই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই নিজ নিজ ধন-জন সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় মাখদুম জাদা আব্বাসী, শায়খুল শুয়ুখ মিশরী, শায়খ নাসির উদ্দিন মাহমুদ আওধী, উলামা, মাশায়েখ, মালীক, আমীর গণ্যমান্য অন্যান্য লোকও প্রত্যেক দলের সর্দারগণ একত্র হইয়া সুলতান ফিরুজ শাহের নিকট আসিয়া এক-বাক্যে বলিলেন, আপনি সুলতান মুহম্মদের নির্বাচিত উত্তরাধিকারী এবং সুলতান তুগলক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তদুপরি সুলতান মুহম্মদের কোন পুত্র সন্তান নাই। সৈন্যদলে বা শহরেও এমন কেহ নাই, যিনি যোগ্যতার দিক দিয়া বাদশাহ হওয়ার দাবী করিতে পারে না। কাজেই আপনার উচিত শাহী তখতে বসিয়া এই দুঃস্থ লোকদিগকে সাহায্য করা। আপনি শাহী তখতে বসিলে আমরা মোগলদের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আমাদের ধনজন ও মালমাত্তা রক্ষা পাইতে পারে এবং আপনিও এই দুই লক্ষ লোকের দোয়া লাভ করিতে পারেন।

সুলতান ফিরুজশাহ তাঁহাদের এই প্রকার আবেদনে সাড়া দিতে গিয়া খুবই অজুহাত দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার এই অজুহাত কেহ শুনিল না। শায়খ,

আলেম, মালীক, আমীর, বিশিষ্ট ও সাধারণ, সৈন্য ও বাজারী, ছোট ও বড়, মুসলমান ও হিন্দু, সোয়ার ও পেয়াদা এবং আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে মিলিয়া একবাক্যে বলিল, সৈন্যদল ও রাজধানী দিল্লীতে বাদশাহ হওয়ার যোগ্য ফিরুজ শাহের ন্যায় আর কেহ নাই। যদি আজ তিনি তখতে না বসেন, তবে মোগল সৈন্য ও থাট্টাবাসীরা একান্তই বেপরোয়া হইয়া উঠিবে এবং আমাদের মধ্যে এক জনও উহাদের হাত হইতে বাঁচিয়া রাজধানীতে পৌঁছিতে পারিবে না।

এইরূপ বারংবার আবেদন ও অনুরোধ ফলে সকলের সম্মতিক্রমে ৭৫২ হিজরীর ২৪শে মোহাররম তারিখে সুলতান ফিরুজ শাহ দিল্লীর তখতে আরোহণ করিলেন (আল্লাহ তাঁহার রাজ্য স্থায়ী ও মর্যাদা সমুন্নত করুন) ।

খোদাওন্দ আলম তখতে বসিবার দ্বিতীয় দিনেই সৈন্যদলের শৃঙ্খলা স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার নির্দেশে এইবার সতর্কতার সঙ্গে সৈন্যদল অগ্রসর হইল। ফলে মোগলদের যে সকল সৈন্য আক্রমণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা অতি সহজেই নিহত ও বন্দী হইতে বাধ্য হইল। সেই দিনই খোদাওন্দ আলম কিছু সংখ্যক আমীরকে সৈন্যদলের পিছন দিকে নিয়োগ করিলেন। তাহাদের চেষ্টার ফলে থাট্টার যে সকল দুর্বৃত্ত খাজানাখানায় আসিতে সাহস করিয়াছিল, তাহারা নিহত হইল। ইহার ফলে থাট্টাবাসী গোলযোগকারীরা ভয়ে আর অগ্রসর হইল না। সৈন্যদলকে উত্যক্ত করার সাধ তাহাদের মিটিয়া গেল।

তখতে বসিবার তৃতীয় দিনে সুলতান কিছু সংখ্যক আমীরকে মোগলদের উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। তাহারা অতি সহজেই কতিপয় হাজারী ও শতী মোগল আমীরকে বন্দী করিয়া শাহী তখতের সম্মুখে উপস্থিত করিল। এইভাবে ধৃত হওয়ার ফলে মোগল সৈন্যরা শাহী সৈন্য দলের আশা ত্যাগ করিয়া ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া গেল এবং তাহাদের স্বদেশে গিয়া পৌঁছিল। থাট্টার দুর্বৃত্তরাও পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিল। এইরূপভাবে সুলতান ফিরুজ শাহের তৎপরতায় মুসলমানরা মোগল ও থাট্টার দুর্বৃত্তদের কবল হইতে মুক্তি পাইল এবং সুলতানও তখতে বসিবার প্রথম দিনেই মানুষের জানমাল রক্ষা করিবার দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার এই প্রকার কর্মক্ষমতা ও দয়া প্রদর্শনে আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সুলতানের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

এইভাবে মোগল ও থাট্টাবাসীদের আক্রমণের ভীতি হইতে মুক্ত হইয়া সৈন্যদল বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের আশ্রয় ও পরিচালনায় অনবরত অগ্রসর

হইয়া সিসস্তানে পৌছিল। এখানে সুলতান হাতী-ঘোড়া ও লোকজনকে বিশ্রাম দিবার জন্য কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। সমস্ত সৈন্যদলকে নানাবিধ দান-ধ্যানে আপ্যায়িত করিলেন। মালীক আমীর ও গণ্যমান্য সকলে বহুতর খেলাত লাভ করিলেন। শায়খ ও আলেমগণ পোশাক ও অজিফা পাইলেন এবং গরীবদের মধ্যে দান খয়রাত করা হইল। শাহী লোকজনেরাও নানাপ্রকার পুরস্কার লাভ করিল। সুলতান ফিরুজ শাহের দৌলতে এই প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া সমস্ত সৈন্যদল সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। হাতী-ঘোড়াও 'কাল মচ্চর' নামী চারণ ভূমিতে এক সপ্তাহ চরিতে পাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিল।

সুলতান সিসস্তান বাসীদিগকেও অনেক কিছু দান করিলেন। তাহাদের সর্বপ্রকার জায়গীর নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং খাস হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতান অতীতের বাদশাহদের নিয়ম অনুসারে পুনরায় সমস্ত জায়গীর নতুন করিয়া তাহাদিগকে দান করিলেন। যাহা এককালে বাপদাদারা ভোগ করিত, তাহা পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে ফিরাইয়া দিলেন। ইহার উপরেও নতুন নতুন জায়গীর দান করিলেন। জাঁহাপনা ফিরুজ শাহ সিসস্তানের মাজারগুলি জিয়ারত করিলেন এবং ফকির, গরীব ও মিসকীনদিগকে অনেক কিছু দান খয়রাত করিলেন।

যে সকল লোক হরিয়া, সিসস্তান, এডেন, মিশর, কন্দার ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে মরহুম সুলতান মুহম্মদের দরবারে আসিয়া বহুদিন যাবৎ অবস্থান করিতেছিল, সুলতান ফিরুজ শাহ তাহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য খরচ-পত্রাদি সহ নিজ নিজ দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং তাহারাও সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খোদাওন্দ আলম ফিরুজ শাহের সিসস্তান হইতে দিল্লীর দিকে যাত্রা। পথের সকল গ্রাম ও শহরের শায়খ, আলেম ও গরীব-দুঃখীদিগকে প্রচুর দান-খয়রাত করা। আহমদ আয়াযের বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া এবং উহা দমন করা। শাহী লোকজনকের সহিত রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ ও তখতে উপবেশন করা। নতুনভাবে রাজকার্য পরিচালনায় রত হওয়া

সকলের মনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়া আসিবার পর সুলতান ফিরুজ শাহ সিসস্তান হইতে যাত্রা করিয়া অনবরত পথ চলিবার পর 'ভকর'-এ আসিয়া উপনীত হইলেন। ভকরবাসীদিগকেও তিনি দান খয়রাত করিলেন। সমস্ত মাজার জিয়ারত করিলেন এবং ভকরবাসীদের অতীতের জায়গীর ও অজিফা যথারীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার ফলে তাহাদের মনে পুনরায় আস্থার ভাব জাগিয়া উঠিল।

ভকর হইতে ভোরে রওয়ানা হইয়া 'উছ'-এ আসিলেন। তাহাদিগকেও বহুবিধ দান-খয়রাত করিলেন। উছবাসীদের যে সকল অজিফা ও জায়গীর বহুদিন যাবৎ বন্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনরায় জারী করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের সকল প্রকার দাবী-দাওয়া তিনি পূরণ করিলেন। যাহারা একেবারে নিঃস্ব ছিল, তাহারা রুটি ও অজিফার মালীক হইল। শায়ক জামাল উদ্দিনের খানকাহ, যাহা প্রায় ধ্বংস হইতে বসিয়াছিল। সুলতান পুনরায় তাহা গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। যে সকল বাগবাগিচা খাস হইয়া শাহী দপ্তরের অধীনে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা পুনরায় শায়খ জামাল উদ্দিনের ছেলেদের নামে বিলির ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ছাড়াও তাহাদিগকে প্রচুর ধনরত্ন দিলেন। এইভাবে তিনি একটি প্রাচীন ঘরকে পুনরায় আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

সুলতান ভকর হইতে উছে আসিবার মধ্যবর্তী সময়ে সুলতানের শায়খ, আলেম, গণ্যমান্য লোক, মুকদিম, জমিদার ও বড়বড় গৃহস্থরা শাহী খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খোদাওন্দ আলম তাহাদের সমুদয় আবেদন মনোযোগের সহিত শুনিলেন এবং প্রত্যেকের ব্যাপারেই নতুন নতুন আদেশ দিলেন। সকলেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে ফরমান লাভ করিয়া সুলতানের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন।

সুসজ্জিত সৈন্যদল সহ খোদাওন্দ আলম ভকর হইতে রওয়ানা হইবার পর পথে দিল্লী হইতে আহমদ আয়াযের বিদ্রোহের সংবাদ আসিয়া পৌছিল। লোকজনকে ধোকা দিবার জন্য তাহার সঙ্গীরা ছয় সাত বৎসরের এক অজ্ঞাত কুলশীল ছেলেকে বাহির করিয়া সুলতান মুহম্মদের পুত্র হিসাবে পুতুলের ন্যায় তখতে বসাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শহরের বাসিন্দাদিগকে দুর্ভোগের সম্মুখীন করিয়াছে। আহমদ আয়ায কয়েক দিনের বাদশাহীর জন্য নিজের জানমাল ও লোকজনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

শহরের মালীক ও অন্যান্য গণ্যমান্য সকলে আহমদ আয়াযের এই প্রকার বিদ্রোহে খুবই অবাক হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ইহাকে অন্যায় ভাবিয়া দূরে

থাকিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা একে অন্যেকে বলিতে লাগিলেন, সুলতান মুহম্মদের মৃত্যুর পর যদি দিল্লীর তখত জনসাধারণের হাতেও চলিয়া আসিত, তথাপি একটি অজ্ঞাত কুলশীল ছেলেকে লইয়া এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদের বিদ্রোহ করা শোভা পাইত না। সুলতান ফিরুজ শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবারও কোন যুক্তি নাই। কারণ তিনি এই তখতের যথার্থ উত্তরাধিকারী। সুলতান মুহম্মদ তাঁহাকে উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তদুপরি তিনি তুগলক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মরহুম সুলতানের চাচাত ভাই। যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁহার বীরত্ব অপরিসীম। তিনি একাই সৈন্যদলের সম্মুখীন হইতে সাহস করেন। তাঁহার তীব্র আক্রমণের মুখে সব কিছু ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। এমন এক মহাবীর, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের পরোয়া করেন না, আহমদ আয়ায কোন দুঃসাহসে তাঁহার বিরোধিতা করিতে গেল। কারণ সুলতান ফিরুজ শাহ এই শৌর্য-বীর্যের গুণ যতটুক উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে; ততটুকু অর্জনও করিয়াছেন। তাঁহার বীরত্বকে বুঝাইবার জন্য নিম্নের পদগুলি আবৃত্তি করিলে তাহা যথার্থ ও যোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

যিনি একাই একটি সশস্ত্র সৈন্যদলকে পরাজিত করেন;
তিনি যথার্থই যুদ্ধক্ষেত্রের মুকুটমণি।
যাহার সৈন্যদলের কোন প্রয়োজন নাই;
অথচ নিজ সম্পদ ব্যয়ে সমগ্র জগৎকে তাঁহার সৈন্য করিয়া রাখিয়াছেন।

বিজয়ে রুস্তম, জাঁকজমকে করামুর্জ,
মহত্বে জমশেদ আর বুদ্ধিতে কিউমরচ।
আলীর ন্যায় পরাক্রমশালী সিংহ;
যদিও তিনি বদখশানের শাহ নহেন কিংবা আব্বাসীদের বংশধর নহেন।

জমশেদের বৈভব সহকারে শাহান শাহীর তখতে আসীন;
যেন ইদ্রিস নবীর পোশাক পরিহিত বেহেশতের গেলমান।

সুলতান ফিরুজ শাহের সৈন্যদলের সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্য সকলেই আহমদ আয়াযের বিদ্রোহের কথা শুনিয়া এই ধারণা পোষণ করিতে লাগিল যে, সে যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা তাহার এই প্রকার যোগ্যতারই নিদর্শন। দেওয়ানে উজারতের পদে থাকা কালে সে যেভাবে মানুষের নিকট হইতে জোর জুলুম করিয়া খাজনাপাতি আদায় করিয়াছে, তাহাতে এইরূপ কিছু করাই

তাহার পক্ষে সম্ভব। সৈন্যদলের সকলেই একবাক্যে বলিল, হয় আহমদ আয়াযের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে; নয়ত বার্ধক্যের কারণে তাহার চিন্তাশক্তিতে ত্রুটি দেখা দিয়াছে। কিংবা কোন মজলুমের দোয়া খোদার দরবারে কবুল হইয়াছে এবং তাহার শেষ দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। কাজেই সে এইভাবে নিজেকে কলঙ্কিত করিয়া শত্রুতার সাহায্যে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারিতে উদ্যত হইয়াছে।

তখনই সৈন্যদলের মধ্যে এই কথা স্থির হইল যে, যখন সুলতান ফিরুজ শাহের মহান ছত্র দিল্লীর বিশ ত্রিশ ক্রোশের মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে এবং বিরাট সৈন্যদলের তরবারিগুলি চমকিত হইবে, তখনই আহমদ আয়ায বুঝিতে পারিবে যে, রুস্তমের ন্যায় বীর কেশরীরা তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়াছে। বারবার একটি বিরাট সৈন্যদল যখন তাহাদের তরবারি কোষমুক্ত করিতে এবং বর্শাফলকগুলি পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিবে, তখন উহার শব্দ শুনিয়া আহমদ আয়াযের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিবে। সে বুঝিতে পারিবে যে, মাঠে ময়দানে লোকে যেরূপভাবে জংলী গাধা ও নীল গাই শিকার করে, তেমনি ভাবে শাহী সৈন্যরা তাহার সৈন্যদিগকে হত্যা করিবে এবং বাঁধিয়া আনিবে। এইরূপ ধারণা তাহার মনে উদয় হওয়া মাত্রই এই বৃদ্ধের শরীর কম্প দিয়া জ্বর আসিবে; ইহার পর হয় তাহার মৃত্যু হইবে, নয়ত সে নিজের গলায় দড়ি বাঁধিয়া মাথা মুড়াইয়া সুলতানী দরবারের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

যে সকল মাতব্বর তাহার চতুর্দিকে এখন লম্ফঝম্ফ করিতেছে, এই বৃদ্ধের সম্মুখে নিজদিগকে রুস্তম ও ইস্ফেন্দিয়ারের সমতুল্য বলিয়া ব্যাখান দিতেছে, তাহারা নিজেদের হাত পাও পেটে ঢুকাইয়া যথাসময়ে সুরুৎ করিয়া সরিয়া পড়িবে। জ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে, বীরের বীর্য যুদ্ধের ময়দানে পরীক্ষা করিতে হয়। যাহারা খালি ময়দানে আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, তাহাদের সকল বীরত্বই দেওলালে অঙ্কিত বীরমূর্তির বীরত্বের মতই অসার ও অলীক। কবি বলেন—

> বীরের বীরত্ব যুদ্ধের ময়দানে যাচাই কর:
> দেওয়ালে অংকিত রুস্তম ও ইস্ফেন্দিয়ারের ছবি লইয়া তুমি কি করিবে।

সৈন্যদলের সকলেই শুনিতে পাইল যে, নায়ক পুত্র নাথু সুধর খাস হাজেব আহমদ আয়াযের সম্মুখে খুবই বীরত্ব দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যেহেতু সে অযোধ্যার তীরন্দাজদের মধ্যে নিজেদেরকে অসামান্য বলিয়া ভাবিত, সেইজন্য তাহার গর্বের অবধি ছিল না। কিন্তু শাহী সৈন্যদলের তীরন্দাজরা তাহাকে

দুধের বাচ্চা বলিয়াই মনে করিত। এইজন্যই তাহার এই প্রকার আস্ফালনের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া বলিল :

এমন দুধের বাচ্চা যে সাত বাটি দুধও খায় নাই ;
বাপ তাহার নাম রাখিয়াছে ইস্কেন্দিয়ার।

আহমদ আয়াযের এই গোলমালের সময় খোদাওন্দ আলম বহুবার দরবারের মালীক ও আমীরদের নিকট বলিয়াছেন, আহমদ তরবারি চালনার লোক নহে। যে জীবনে কোনদিন ধনুক হাতে লয় নাই ; কোন দ্রুতগামী ঘোড়ার উপর সোয়ার হয় নাই ; সে কেমন করিয়া সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনা করিবে। এই বৃদ্ধ লোকটির জন্য আমার লজ্জা হয়। এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া নিজেকে এই বিপদের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, সে নিজেই মজলুম। উহার ধ্বংসের জন্য অন্য মজলুমের দোয়ার কি প্রয়োজন। সে ইচ্ছা করিয়াই এই রক্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে এবং যে কাজ তাহার বা তাহার বাপদাদার যোগ্য নহে, তাহাই সে করিতে বসিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে আমার কি করিবার আছে। সে এমন কি বীরবর মহাযোদ্ধা যে, আমি সৈন্য সহ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিব। তাহাকে পরাজিত করিলেই বা আমার কী গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। আমি দিল্লীর সন্নিকটে পৌঁছিলেই সে শুষ্ক মুখে দিল্লী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। কিছু সংখ্যক পাখী শিকারীকে আমি হুকুম করিলেই তাহারা আহমদ সহ তাহার পালকী আমার দরবারে আনিয়া হাজির করিবে। কাজেই তাহার বিদ্রোহ লইয়া খুব বেশী চিন্তিত হইবার কিছু নাই।

কিন্তু আমি আশ্চর্য হই এই ভাবিয়া যে, এই অথর্ব বৃদ্ধ ও তাহার সঙ্গী গোলামদের কিঞ্চিৎ মাত্রও লজ্জা নাই। উহারা কেমন করিয়া নিমকহারামী করিল। কেমন করিয়া বহু যুগ সঞ্চিত বয়তুলমালকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। তাহাকে উহার আমানতদার হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল, এই কথা সে কেমন করিয়া ভুলিতে পারিল। তদুপরি তাহার এক মুরুব্বী পুত্র যখন সর্বসম্মতিক্রমে তখতে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যে তাহার কতিপয় অপদার্থ সঙ্গী-সাথীর মধ্যে বয়তুল মালের ধনরত্ন বিতরণ করিতেছে। মিথ্যুক প্রতারক কিছু সংখ্যক লোক তাহার নিকট আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। উহাদের মধ্যে বড়জোর বিশ ত্রিরিশটি যোদ্ধা বিদ্যমান। তথাপি উহারা এমন কোন পদ মর্যাদার লোক নহে, যাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতে হইবে।

আসল কথা এই যে, আমরা সরস্বতী ও হাঁসী সীমান্তে পৌছিতেই আহমদের সমস্ত লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। যখন আহমদ এই বিরাট সৈন্যদলের কথা শুনিবে, তখন তাহার অন্তরাত্মা এমনই কাঁপিয়া উঠিবে যে, উহাতে তাহার শেষ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। কারণ আমি কয়েক বৎসর যাবৎ তাহার বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা দেখিয়া আসিতেছি। হাজার সতুন শাহী মহলে আসিতেই তাহার যে পরিমাণ পরিশ্রম হইত, তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছি। কাজেই তাহার মধ্যে এমন সামর্থ ও শক্তি কোথায় যে, সে শাহী সৈন্যদলের আগমন বার্তা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে বা উহার সম্মুখীন হইতে পারে।

খোদাওন্দ আলম ধসৈন্যে দিল্লী আগমনের পথে কিছুদিন বিখ্যাত শহর দেবপালপুরে অবস্থান করিলেন। এইখানে বিরাট সৈন্যদলের মধ্যে যাহারা তখনও সুসজ্জিত ছিল না, তাহাদিগকে সুসজ্জিত করিলেন। ইহার পর শাহে ইসলাম শান্তি ও স্বস্তির সহিত দিল্লীর দিকে রওয়ানা হইলেন। খোদাওন্দ আলম শায়খুল ইসলাম ফরিদ উদ্দিনের মাজার জিয়ারত করিতে অযোধ্যা গমন করিলেন। বহু দিন যাবৎ এই পুণ্য পরিবারের বহু কিছু অব্যবস্থিত ও বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, তিনি সবকিছুই পুনরায় ঠিক করিবার জন্য আদেশ দিলেন। শায়খ আলাউদ্দিনের নাতিদিগকে নানাবিধ তোহফা ও খেলাত দান করিলেন এবং জায়গীর ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। অযোধ্যাবাসীদের জন্যও তাঁহার দানধ্যান অবারিত হইল। যে সকল লোক অজিফা ও রুটির অভাবী ছিল, তাহাদের জন্যও যথাযোগ্য দান খয়রাতের ব্যবস্থা করিলেন। দেবপালপুর হইতে দিল্লী আসিবার পথে যত গ্রাম পড়িল, সেই সমুদয়ের অধিবাসীদের প্রবীণ ও নবীন জায়গীর দিবার এবং গরীব লোকদিগকে দান খয়রাত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সৈন্যদল যে কয়দিন দেবপালপুরে অবস্থান করিয়াছিল, তখনও দিল্লী হইতে সংবাদ পৌছিতেছিল যে, আহমদ আয়ায মহা গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। তাহার নিজের গোলামদিগকে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ সুলতানী পদ দান করিয়াছে। খায়খজাদা বুস্তামী, নাথু সুধন ও অন্যান্য কয়েকজন সর্দার শ্রেণীর লোককে নিজের সভাসদ নিযুক্ত করিয়াছে এবং মানুষকে নানাভাবে ধোকা দিবার চেষ্টা করিতেছে। অজ্ঞাত কুলশীল জারজ ছেলেটিকে খেলার পুতুল হিসাবে তখতে বসাইয়া বোকাদিগকে ধোকা দিবার জন্য তাহার সম্মুখে দরবার ডাকিয়া নানাবিধ খেদমত আঞ্জাম দিতেছে। দূরের গ্রাম ও শহর হইতে পলাতক ও দুর্বৃত্ত

৫ শ্রেণীর লোকদিগকে দিল্লীতে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে নিজের লোকজন হিসাবে স্থান দিতেছে এবং তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য শাহী খাজানাখানার সম্পদ নষ্ট করিতেছে। এই সুযোগে শহরের সকল শ্রেণীর লোক তাহার নিকট হইতে ধনসম্পদ হাতাইয়া নিতেছে এবং আড়ালে তাহার বাদশাহীকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে। তাহার এই দুই দিনের বাদশাহী অচিরেই লোপ পাইবে, এইরূপ আশাই সকলে পোষণ করিতেছে। সকলেই খোদাওন্দ আলমের জন্য খোদার দরগায় দোয়া করিতেছে এবং তাঁহার দিল্লী আগমন অপেক্ষায় সাগ্রহে দিন গুণিতেছে।

যেহেতু আহমদ আয়াযের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সেইজন্য তাহার মধ্যে সুবুদ্ধির চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। তাহার পার্শ্বে এমন কেহও ছিল না, যে তাহাকে সুপরামর্শ ও সৎপন্থার কোন কথা বলিতে পারে। শহরের শিক্ষিত মূর্খ, বুদ্ধিমান, নির্বোধ, সাধারণ বিশিষ্ট, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড়, শহরী ও গাঁইয়া নির্বিশেষে সকলেই তাহার এই প্রকার বোকামি দেখিয়া একবাক্যে বলিতেছিল :

যখন মানুষের ভাগ্য বিরূপ হইয়া উঠে,
তখন সে যাহা কিছু করে, সকলই বিফলে যায়।

যেদিন বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহ সৈন্যদল সহ ফতেহাবাদ আসিয়া পৌছিলেন, সেইদিনই মালীক মকবুল তাঁহার পুত্র ও জামাতাগণ এবং মালীক কবতআ আমীর মেহমান ও অন্যান্য আমীরগণ সহ সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তৎকালে খান জাহান ও উজিরে মুমালেক ছিলেন। আহমদ আয়ায ও তাহার পুত্রদিগকে অভিশাপ দিতে দিতে তথা হইতে আসিয়া সুলতানের খেদমতে ভূমি চুম্বন করিলেন। তিনি জরির পোশাক ও খেলাত পাইলেন। এই ছয় বৎসর পরেও বর্তমান সময়ে তিনি অত্যন্ত সম্মান ও সম্পদ সহকারে জীবন কাটাইতেছেন। খান জাহানের পুত্র ও জামাতাগণ এবং অন্যান্য আমীররাও বহু পুরস্কার ও খেলাত লাভ করিলেন। তাহাদের এই প্রকার আচরণ তাহাদের নিমক হালালীর চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইল এবং সমগ্র সৈন্যদল তাহাদের খুব প্রশংসা করিল। খান জাহানের আসিবার দুই তিন দিন পরে মালীক মাহমুদ বেগ শের খান সান্নাম ও সামানার সৈন্যদল সহ সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হইল।

ফতেহাবাদ হইতে সুলতান (আল্লাহ্ তাঁহার রাজত্ব স্থায়ী ও মর্যাদা সমুন্নত করুন) হাঁসীতে আসিলেন এবং হাঁসী ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির অধিবাসী-

দের মধ্যে প্রচুর দান খয়রাত করিলেন। শাহে ইসলাম খোদাওন্দ আলম হাঁসীর পীরদের মাজার জিয়ারত করিলেন এবং গরীবদের মধ্যে দান-খ্যান করিলেন।

ইহার পর শাহী পতাকা হাঁসী হইতে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হইল। শায়খজাদা বুস্তামী নাথু সুধল, হাসান বদরোজ, হাস্‌সাম আধঙ্গ ও অন্যান্য মাতব্বর, যাহারা আহমদ আয়াযের সভাসদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা সকলেই মাথা খালি করিয়া এবং গলায় পাগড়ী বাঁধিয়া দরবারে উপস্থিত হইল; পথের মধ্যেই সুলতানী খেদমতে ভূমি চুম্বন করিল। এইভাবে আহমদ আয়াযের সমুদয় সৈন্য ও লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং একে একে সুলতানী দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

অবশেষে আহমদ আয়াযের অন্তরাত্মাও কাঁপিয়া উঠিল এবং সমস্ত শক্তি সামর্থ লোভ পাইল। সেও গলায় পাগড়ী বাঁধিয়া মাথা খালি করিয়া সুলতানের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। শাহী ফরমান অনুসারে সে আম দরবারে সকলের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিল। তাহার ভূমি চুম্বন রত অবস্থায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তুমি যে কার্যের উপযুক্ত নহ, উহা কেন করিতে গেলে এবং কোন প্রয়োজনে শাহী দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে? আহমদ আয়ায উত্তরে বলিল, যতদিন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, ততদিন আমি মুরুব্বীদের নির্দেশ অনুসারে সকল কাজ করিয়াছি। কিন্তু যখন আমার দুর্ভাগ্য দেখা দিল, তখন আমি এমন কাজ করিলাম, যাহাতে দুনিয়াতে অখ্যাতি এবং আখেরাতে জবাবদিহীর সম্মুখীন ও শাস্তির যোগ্য হইলাম। সুলতানের সম্মুখেও আমার অপরাধের সীমা রহিল না। তখত হইতে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, তাহাকে যেন দরবার হইতে সরাইয়া লইয়া বিশেষ স্থানে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

সুলতানী পতাকা যখন দিল্লী হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে পৌঁছিল, তখন যুগ যুগ সঞ্চিত ভক্তি ও ভালবাসার টানে রাজধানীর সর্বশ্রেণীর লোক; শায়খ, আলেম, সুফী, কলন্দরী, হায়দরী, বাজারী, সওদাগর, মেহতর, সাহা, সার্রাফ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দলে দলে দরবারে উপস্থিত হইয়া ভূমি চুম্বন করিল এবং যথাযোগ্য পুরস্কার ও পোশাকাদি লাভ করিল।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি বহু গণ্যমান্য বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, যে কয় মাস দিল্লীতে আহমদ আয়াযের গোলমাল চলিয়াছিল, তখন শহরবাসীরা আহমদের নিকট হইতে প্রচুর জামা-কাপড় ও তঙ্কা-চীতল

পাইয়াছে এবং শাহী মহল হইতে বাহির হইয়াই তাহার উপর অভিসম্পাৎ করিয়াছে। তাহার আসু বিনাশ কামনা করিয়া সকলেই মনেপ্রাণে সুলতান ফিরুজ শাহের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছে। প্রকাশ্যেও সকলেই খোদাওন্দ আলমের জন্য দোয়া করিয়াছে। আহমদ আয়াযের নিকট তাহারা যাহা কিছু শুনিয়াছে, উহার কোন কথাই তাহাদের মনে দাগ কাটে নাই।

জমাদিউল উখরা মাসের শেষ দিকে শাহী পতাকা মহা জাঁকজমকের সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিল এবং শুভক্ষণে পৃথিবীর অধীশ্বর, জলস্থলের অধিপতি, খোদার প্রিয় পাত্র, শত্রুর মহাত্রাস, বর্তমান যুগের সোলায়মান, খোদার সাহায্যের যোগ্যপাত্র আবুল মুজাফফর ফিরুজ শাহ (আল্লাহ তাঁহার রাজত্ব স্থায়ী ও মর্যাদা সমুন্নত করুন) জমশেদ ও খসরুর যোগ্য শাহী তখতে শাহী মহলে উপবেশন করিলেন। রাজধানী উহার যোগ্য বাদশাহ পাইয়া এক নতুন সৌন্দর্য ও আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সর্বশ্রেণীর লোকের মন আশ্বস্ত এবং সর্বপ্রকার অস্থিরতা দূরীভূত হইল।

নির্বোধ আহমদ আয়াযের হস্তক্ষেপের ফলে শাহী কার্যে যে সকল অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাহা সুব্যবস্থা ও সুশাসনের স্পর্শে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। শাহী পতাকার দিল্লীতে প্রবেশের প্রথম দিনেই সর্বপ্রকার গোলযোগ, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দূর দূর হইয়া সকলের মধ্যে মিল-মহব্বত দেখা দিল। কাহারও রক্তে হস্তরঞ্জিত বা কাহারও গৃহ বিনাশ করিতে হইল না। সাধারণতঃ গোলযোগ ও বিদ্রোহ দমন করিতে যে পরিমাণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয়, উহার কিছুই এখানে দেখা গেল না। বিনা শাস্তি ও বিনা তাড়নায় রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল এবং সকল কার্য সুব্যবস্থিত হইয়া উঠিল। সকল শ্রেণীর মানুষের মনে স্বস্তি ফিরিয়া আসিল এবং সকলে নিজ নিজ কার্যে মনোনিবেশ করিল।

প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ দিল্লীর সিংহাসন তুগলক বংশের অধীনে রহিয়াছে। সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ হইতে যাহার শুরু, বর্তমানে তাহা তাঁহার পুত্রের মাধ্যমে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে পৌঁছিয়াছে। বর্তমান সুলতান উত্তরাধিকারসূত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে এই তখতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার চাচার সময় এবং চাচাত ভাইয়ের সময়েও তিনি রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার তখতে বসায় কোন বংশ নষ্ট হয় নাই, কোনপ্রকার হত্যাকাণ্ড বা বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয় নাই, ভিতরে-বাহিরে ঘরে-পরে কোন পরিবর্তন আসে নাই এবং শাহী হারেমেও

কোনপ্রকার অনুস্তব তাও ঘটে নাই। প্রাচীন মালীক ও আমীরদের সকল অবস্থাই পূর্ববৎ অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।

কিন্তু চারি পাঁচ জন লোকের বেলায় তাহা সত্য হয় নাই। যাহারা আহমদ আয়াযের গোলযোগের সময় নিজেদেরকে মাতব্বর হিসাবে প্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রয়োজনের সময় তাহাকে অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অবশ্য তাহাদের বালবাচ্চা ও আত্মীয় স্বজনের উপর কোনপ্রকার বিপদপাত হয় নাই। শুধু আহমদ আয়ায, নাথু সুধল, হাসান, হাস্‌সাম আধজ ও আয়াযের দুই পুত্র ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর জীবন নাশ হয় নাই। এই পাঁচ-ছয় জন লোকের অন্য বংশধর ও আত্মীয়স্বজন বা ধন-সম্পদের কোন ক্ষতি হয় নাই। সকলেই তাহাদের পূর্বাবস্থায় নিজ নিজ সংস্থানে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করিতেছে। কোন বিদ্রোহী ও তাহার অনুচরদের ধনজন খোদাওন্দ আলমের রাজত্বের প্রথমদিকে যেভাবে রক্ষা পাইল, উহার সমতুল্য অন্য কোন ঘটনা আর কেহ কখনও দেখে নাই বা কেহ দেখিয়াছে বলিয়াও শুনে নাই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের উন্নত চরিত্র ও সদগুণাবলী, যদ্দরুন রাজ্যের সর্বপ্রকার কাজ সুব্যবস্থিত এবং হিন্দুস্তান ও হিন্দের সকল রাজ্য সুশৃঙ্খল ও সুশাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, উহার বর্ণনা

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক কোনপ্রকার তোষামোদীর জন্য নহে, বরং ন্যায়ের খাতিরে যে সকল লোক বাদশাহের জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাহাদের খেদমতে আরজ করিতেছে যে, যতদিন যাবৎ দিল্লী বিজিত হইয়া এখানে ইসলাম ও মুসলমানের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে, এক সুলতান মুইয উদ্দিন মুহম্মদ ছাড়া অধিক ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল, দয়াশীল, গুণগ্রাহী কৃতজ্ঞ এবং ইসলাম ও মুসলমানীতে পবিত্র বিশ্বাসের অধিকারী বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের ন্যায় অন্য কেহ দিল্লীর তখতে উপবেশন করেন নাই।

আমার এই কথা আমি কোনপ্রকার অতিরঞ্জন, তোষামোদ, দুনিয়াবী সম্পদের লোভ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করি নাই। আমি এই গ্রন্থের প্রথম দিকেই

সত্যকে শর্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানেও আমি তাহা হইতে বিচ্যুত হই নাই। সুলতান ফিরুজ শাহের মহান রাজত্বে আমি এমন কোন ভোগ-সম্ভোগ ও ধন-সম্পদের অধিকারী নহি যে, উহার জন্য আমি এই কথা লিখিতে প্ররোচিত হইব। এই বিষয়ে আমি এই রাজ্যের সমুদয় অধিবাসী হইতে সম্পূর্ণ একক ও বিশিষ্ট। এই জন্য নিম্নলিখিত এই কাব্যাংশটি একমাত্র আমার জন্য সত্য বলিয়া মনে হয়।

'পশুপাখী মাছ সকলেই নিজ স্থানে তৃপ্তিতে আছে এক আমি ছাড়া।'

তদুপরি আমি সুলতানের প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট যাহাই হই না কেন, ইতিহাসে তাঁহার সম্পর্কে যাহা লিখিব, তাহা সত্য ও ঠিক ঠিক লিখিতে হইবে এবং যাহা কিছু উল্লেখ করিব, তাহা যোগ্য প্রমাণাদির দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবে। নতুবা যে সকল লোক অতীতের বাদশাহদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে না, তাহারা আমার এই বর্ণনা পড়িয়া বলিবে যে, জিয়া বারানী ছিল একজন তোষামুদে কবি; সেই জন্যই সে লিখিতে পারিয়াছে যে, সুলতান ফিরুজ শাহের ন্যায় গুণী ও যোগ্য আর কোন বাদশাহই এযাবৎ দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই।

যদি কখনও এমন কোন পাঠকের অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে আমি তাহাকে দিল্লীর অতীতের বাদশাহদের কীর্তিকাহিনী পাঠ করিয়া দেখিতে বলিব। তাহা হইলে সে জানিতে পারিবে, বহু যুগ হইতেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে যে, বাদশাহের পরিবর্তনের সময় রক্তপাত হয় এবং বহু ঘর ও ধনসম্পদ ধ্বংস হইয়া যায়। পুরাতন গাছ ও উহার শিকড় উপড়াইয়া ফেলিয়া না দিলে যেমন নতুন গাছ ডালপালা মেলিয়া বাড়িতে পারে না; ঠিক তেমনি ভাবে পুরাতন ঘরের বিলোপ সাধন করা হয়, যাহাতে নতুন ঘর আবাদ হইতে পারে। প্রাচীন বাদশাহের মালীক ও লোকজন নতুন বাদশাহের বন্ধু হয় না। যদি কখনও সেইরূপ কিছু ঘটে; তবে লোকে উহাকে আশ্চর্য ঘটনা বলিয়া মনে করে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইরূপ ঘটনা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাদশাহীতেই দেখিয়াছেন। কাজেই সেখানে বাদশাহী জবর-দখলের ব্যাপার, সেখানে এমন নিষ্ঠুর হত্যা কাণ্ড হয় যে, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

যাহার বাপদাদা ও আত্মীয় স্বজন কোনদিন বাদশাহ ছিলেন না, তিনি যদি জবরদস্তি করিয়া শাহী তখতে বসিতে চাহেন, তবে পূর্ববর্তী বাদশাহের অনুচর ও সহায়কদিগকে তিনি কি চক্ষে দেখিবেন? যতক্ষণ তাহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ নিজেকে বাদশাহ বলিয়া জাহির করিবেন কি

রূপে ; তদুপরি এই প্রথাও প্রচলিত আছে যে, বিনা শাসন-ত্রাসনে মানুষের মনে বাদশাহের প্রতি ভক্তি জন্মে না, রাজ্যের কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় না এবং দুষ্ট ও দুর্বৃত্তদিগকে দমন না করিলে মানুষের মন হইতে বিদ্রোহ ও অন্যায়ের ভাব দূরীভূত হয় না।

এই জন্যই সুলতান মুইয উদ্দিন মুহম্মদ শাহের পরে যখন সুলতান শামস উদ্দিন ইলতুতমিশ দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, তখন কাজী সাদ, কাজী ইমাদ, কাজী হুসাম, কাজী নিজাম প্রমুখ শামসুল আয়েম্মা কুদিজীর ভাগিনেয়দিগকে এবং অন্য কতিপয় আমীর, যাহারা সুলতান মুইয উদ্দিনের তরফ হইতে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে জায়গীর ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে হত্যা করা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর রহিল না। সুলতান মুইয উদ্দিনের পোষ্যপুত্র সুলতান তাজ উদ্দিন ইলদোজ এবং সুলতান মুইয উদ্দিনের সিলাহদার সুলতান নাসির উদ্দিন কোবাচাকে তাহাদের লোকজন ও সহায় সম্পদ সহ বিনাশ না করা পর্যন্ত সুলতান ইলতুতমিশের পক্ষে দিল্লীর তখতে স্থির হইয়া বসা সম্ভব হইল না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, এতগুলি বিশেষ লোককে বিনাশ করিতে কি পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়াছিল এবং কি পরিমাণ খান্দান ও সহায় সম্বল ধ্বংস হইয়াছিল।

এমনইভাবে সুলতান শামসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের ত্রিশ বৎসর কালীন রাজত্বে যখন তুর্কী গোলামের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, তখন কত বড় বড় মালীক ও গণ্যমান্য লোক, যাহারা সুলতান শামস উদ্দিনের দরবারে সম্মানিত ছিলেন, তাঁহারা উহাদের হাতে বিনাশ হন। উহারা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের সমুদয় সম্পদ হস্তগত করিয়াছিল। এইভাবে বহু রক্তপাত ঘটিয়াছে এবং বহু প্রাচীন খান্দান নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

অনুরূপভাবে সুলতান বলবন ও মালীক থাকা অবস্থায় বহু রক্তপাত করিয়াছেন। খান হওয়ার পরও নিজ খাজা তাশদিগকে বহু কৌশলে নিপাত করিয়াছেন এবং ইহাদের বংশ বুনিয়াদ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন। যাহাদের ইতিহাস পাঠ করিবার অভ্যাস আছে, তাহারা অবশ্যই জানেন যে, সুলতান বলবনের শাস্তি দানের ব্যবস্থা খুবই বিখ্যাত ছিল। তিনি যেভাবে তুগরিলের বিদ্রোহদমন করিয়াছিলেন ; যে নিষ্ঠুরভাবে তিনি তাহার বংশধর ও তাহার সহায়কদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন ; যেভাবে দুই সারিতে ফাঁসির কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া উহাতে বিদ্রোহীদিগকে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন এবং যেভাবে উহাদের সমুদয় সহায়-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সকলেরই খুব ভাল

করিয়া জানা আছে। সুলতান মুইয উদ্দিন কায়কোবাদের সময় যে রক্তপাত হইয়াছে এবং যেভাবে বহু প্রাচীন খান্দান ও পরিবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রাচীন ব্যক্তিরা অবশ্যই দেখিয়াছেন।

সুলতান জালাল উদ্দিনের ন্যায় পাকা মুসলমান বাদশাহের সময়েও তখতে বসিবার কালে মুইয উদ্দিন ও তাঁহার সঙ্গী বহু মালীক আমীরের রক্তপাত ঘটিয়াছে। রাজত্বের শেষদিকে তিনি মগলতিকে তাহার লোকজন ও সহায় সম্পদসহ বিনাশ করিয়াছেন, সৈয়দী মওলাকে তাহার গোলাম সহ হত্যা করিয়াছেন এবং মালীক সজুর বিদ্রোহে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা না করিলেন, ততক্ষণ তাঁহার রাজ্য স্থিতিশীলতা ও সুব্যবস্থিত হইয়া উঠে নাই।

সুলতান আলাউদ্দিনের কঠোর শাস্তি ও রক্তপাতের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এই সকল ঘটনা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাদের অনেকেই এখনও জীবিত রহিয়াছেন। সুলতান কুতুব উদ্দিন ও সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহের সময় আলাই যুগের তুলনায় রক্তপাত ও শাস্তির বহর অনেক কম ছিল এবং তবুও যাহা ছিল, তাহাতে কাহারও কোনপ্রকার সন্দেহ থাকিবার কথা নহে। সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলকের সময় যে পরিমাণ প্রাচীন খান্দান ধ্বংস হইয়াছে, যে কঠোর শাস্তি তিনি লোকজনকে দিয়াছেন এবং নির্বিকার চিত্তে যে পরিমাণ রক্তপাত করিয়াছেন, তাহার যথাযথ বর্ণনাও সাধ্যের অতীত।

দিল্লীর তখতধারীদের এই প্রকার রক্তপাত বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তথায় এমন কোন বাদশাহ ছিলেন না, যিনি রাজ্য ও রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য রক্তপাত করেন নাই। কিংবা বিনা রক্তপাতে কাহারও পক্ষে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করা সম্ভব হইয়াছে। শুধু বর্তমান বাদশাহ আবুল মুজাফ্‌ফর ফিরুজ শাহ (আল্লাহ্ তাহার রাজ্য স্থায়ী ও তাহার মর্যাদা সমুন্নত করুন), যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল সুলতানদিগের মধ্যে এই বিষয়ে একক বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন যে, তিনি মুসলমানদের রক্তপাত এবং তাহাদের সহায় সম্পদ ও বংশ বুনিয়াদ ধ্বংস করা ব্যতীতই অতি সহজে দিল্লীর তখতে বসিতে পারিয়াছেন।

ইহার পর ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে, তিনি সসম্মানে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন (তিনি আরও হাজার বৎসর দিল্লীর তখত অলংকৃত করিয়া বিরাজ করুন), কিন্তু পাঁচ ছয় জন ব্যতীত আর কেহ তাঁহার হস্তে প্রাণদণ্ড লাভ করে নাই। এই পাঁচ ছয় জনও নিতান্ত বেপরোয়াভাবে রাজ্য ও দেশের সকল শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়াছিল। সুতরাং তখতে বসিবার পর

একান্ত প্রয়োজনেই তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইয়াছিল। তথাপি তাহাদের সহায়-সম্পদ, আত্মীয়স্বজন ও পুত্র-কন্যাদের কোনপ্রকার ক্ষতি করা হয় নাই। অবশ্য বাবুর্চিখানার কিছু সংখ্যক গোলামকেও তাহাদের প্রকাশ্য প্রতারণার জন্য শাস্তি দিয়াছিলেন। ইহারা কয়েক দিন অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে প্রতারণা কার্যে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহা সত্বেও প্রথম দল ও দ্বিতীয় দল মিলাইয়া পনের ষোল জনের বেশী হইবে না।

ইহাদের বাহিরেও আরও বহু পাপী ছিল; কিন্তু তাহাদের কেহই সুলতানের হাতে শাস্তি লাভ করে নাই এবং কোন মুসলমান তাহার দরবারে কখনও প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই। রাজ্য ও সম্পদের দুশমন অনেকেই ছিল; কিন্তু বাদশাহ ফিরুজ শাহ কাহাকেও শাস্তি দেন নাই এবং কোন খান্দান ও ধনজন ধ্বংস করেন নাই। ইহা খোদার তরফ হইতে একপ্রকার দয়াই বলিতে হইবে যে, কোন মুসলমানকে হত্যা করিবার কোন ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগরুক হয় নাই এবং কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ও মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ' পাঠকারী কাহারও রক্ত-পাত করা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি জিয়া বারানী লিখিতেছি যে, সুলতান মুইয উদ্দিন মুহম্মদের পরে দিল্লী তখতে সুলতান ফিরুজ শাহের সমতুল্য অন্য কোন বাদশাহ উপবেশন করেন নাই। যেহেতু খোদাতালা এই বাদশাহকে কোন মুসলমানের রক্তপাত করিতে দেন নাই এবং পূর্ববর্তী বাদশাহের দ্বারা অনুষ্ঠিত কঠোর শাস্তি প্রদানের কোন ব্যবস্থা তাঁহার দ্বারা প্রচলিত হয় নাই; সেই জন্য আমি ইহাকে তাঁহার দয়া ও খোদাভীরুতার লক্ষণ হিসাবে উপস্থিত করিব। আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা যে শুধু সত্যের খাতিরে ও ন্যায়ের অনুরোধে লিখিয়াছি, তাহা আবার স্মরণ করাইয়া দিব। আমি আরও বলিব ও লিখিব যে, প্রজাসাধারণ ও শাহী লোকজনের ব্যাপারে সুলতান ফিরুজ শাহের নিকট হইতে যে ধরনের ব্যবহার আমি দেখিয়াছি এবং লোকেরাও দেখি-য়াছে, তাহা বহু বৎসর ধরিয়া দিল্লীর অন্য কোন বাদশাহের নিকট হইতে দেখা যায় নাই ও কেহ দেখিয়াছে বলিয়াও স্মরণ করিতে পারে না।

শাহী লোকজনের রসদের জন্য 'হুলিয়া' ছিল সর্বাপেক্ষা মুশকিলের ব্যাপার; তাহা তিনি মাফ করিয়া দিয়াছেন। যাহাদিগকে বেতনের পরিবর্তে জমি দেওয়া হইয়াছে, তাহারাও নিজেদের গোলাম ও আত্মীয়-স্বজনের নাম দেওয়ানে আরজের তালিকায় উঠাইয়া দিয়া তাহাদের অজিফা নিজেরা গ্রহণ করিতেছে। এই প্রকার ভোগ-সম্ভোগ ও আরাম-আয়েশ লাভের কথা সকলেরই জানা আছে।

শাহী লোকজনের নিকট হইতে সুলতান যে পরিমাণ একবারে পাইতে পারেন, তাহাও কয়েকবারে, কখনও নিজে কখনও পরের দ্বারা করাইলেও তিনি কিছু মনে করেন না এবং কখনও বেগার অথবা শিকারের জন্য লোকজনকে খাটাইতে তিনি আদেশ দেন না। ক্ষতিপূরণের কথা কাহারও মুখে শোনা যায় না।

সুলতান আরও কিছু সংখ্যক সুবিধা দিয়াছেন ; অনেকের বেতন তাহারা বাড়িতে বসিয়াও পাইতে পারে। বেতনের ব্যাপারে 'ইতলাকী' আমীর ও হিসাবনবিশরা যাহাতে কোনপ্রকার লোভ করিতে না পারে, তজ্জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাঁহাপনার তরফ হইতে লোকজনের সমস্ত বেতন সুলতানী খরচে লিখিয়া লইবার নির্দেশ রহিয়াছে এবং আমীররা শুধু তাহা হিসাব করিয়া অনুমতি দিবার অধিকারই পাইয়াছেন।

যতদিন যাবৎ বাদশাহ সালামত দিল্লীর তখতে সমাসীন আছেন, তিনি লোকজনকে কোনপ্রকার কঠিন যুদ্ধাভিযানে অথবা সেখান হইতে ফিরিয়া আসা সহজ নহে, এমন দূরদেশে পাঠাইবার আদেশ দেন নাই। এইভাবে প্রতিপালন করাকে আসলে সম্পূর্ণ দয়া প্রদর্শন করাই বলা যাইতে পারে ; যদি মানুষ ইহার মর্যাদা বুঝে ও মূল্য চিনে।

অন্যদিকে প্রজাদের ভোগ-সম্ভোগ ও আরাম-আয়েশের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। বাজারী, সওদাগর, কাফেলাদার, সিপাহী, সার্রাফ, মুরুব্বী ও মজুতদারের ধনসম্পদ লাখের কোঠা ছাড়াইয়া কোটিতে পৌঁছিয়াছে। খওতী, মুকদিম প্রভৃতির ঘর ঘোড়া, গরু, শস্য ও আসবাবপত্রে ভরিয়া গিয়াছে। প্রজা-দের মধ্যে অভাবের কোন নামনিশানা নাই এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থা-নুযায়ী সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান তারিখ-ই-র লেখক আমি জিয়া বারানী এক সময়ে ভাটনীর দুর্গে ছিলাম। তখন এক শীতকালে হঠাৎ কিছু গোলযোগ দেখা দেয়। মানুষ ইহার ফলে দলে দলে দুর্গে আসিতে থাকে। মানুষের সঙ্গে আনীত অশ্ব-গবাদির ক্ষুরের ধূলিতে আকাশ অন্ধকার হইয়া যায় ; লোকজন একে অপরকে দেখিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার ফলে আগত লোকজনের মধ্যে মাত্র হাজার ভাগের একভাগ লোক তাহাদের পশু ও মালমাত্তা সহ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইতে সক্ষম হইয়াছিল ; বাকী সকলেই বাহিরে থাকিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে আমি হাজ্জাম ইখতিয়ার উদ্দিনের আস্তাবলে উপস্থিত ছিলাম ; সেখানে হাজার দুই হাজার তঙ্কা দামের তেরটি ঘোড়া বাঁধা দেখিয়াছিলাম।

ইহা ছাড়াও বাজারীরা যে পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে এবং নানাবিধ কাজকর্মে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে, তাহা সুলতান ফিরুজ শাহ ভিন্ন অন্য কোন সুলতানের সময় সম্ভব হয় নাই। হাকিম কালাই একজন বাজারী; সে যখন যাহা ইচ্ছা খায় ও যখন যাহা ইচ্ছা পরে। সে কোনপ্রকার খেরাজ দেয় না এবং কোনপ্রকার বেগার খাটা বা পাহারার কাজ করিতে যায় না। প্রতিদিন এক শত দুই শত তঙ্কা তাহার ঘরে আসে। কিন্তু তন্মধ্য হইতে কোন একটি তঙ্কাও বিনা কারণে বাহিরে যায় না।

ইহার পরও যদি বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের প্রজাপালন ও প্রজা-তোষণের কথা আমি জিয়া বারানী তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে না লিখি এবং না বলি যে, দিল্লী বিজয়ের পর হইতে আজ পর্যন্ত সুলতান ফিরুজ শাহের ন্যায় কোন সুলতান দিল্লীর তখতে বসেন নাই, তাহা হইলে ন্যায় ও সত্যের দিক হইতে তাহা কোন মতেই ঠিক হইবে না।

এমন করিয়া সুলতান ফিরুজ শাহের (আল্লাহ তাঁহার রাজ্য স্থায়ী ও মর্যাদা সমুন্নত করুন) চরিত্রগুণকে যে আমি সকলের উপরে তুলিয়া ধরিয়াছি, তাহাও বিনা প্রমাণে লিখি নাই। খান, মালীক, আমীর, সভাসদ, অনুগামী, সহায়ক, কর্মচারী ও দরবারীদের বেলায় সুলতান ফিরুজ শাহ (তাঁহার জীবন, সম্পদ, তখত ও রাজ্য স্থায়ী হউক) যেভাবে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইয়াছেন, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; তাহা অন্য কোন সময়ে অন্য কোন সুলতানের বেলায় দেখি নাই। তিনি এই সকল লোকের বেতনের জন্য লাখ লাখ কোটি কোটি তঙ্কা নির্ধারিত করিয়াছেন। তাহাদের পুত্র, জামাতা, প্রবীণ গোলাম ও যাহারা তাহাদের উপর নির্ভরশীল, তাহাদিগকেও পৃথক ভাবে বেতন, তোহফা, খেলাত, জায়গীর ও জমি জিরতে দিয়াছেন। এই প্রকার বর্ণনার অতীত দান-খ্যান করা সত্ত্বেও দরবারী ও শাহী লোকজনকে কষ্টকর বাধ্যবাধকতা ও সর্বকালীন খেদ-মতের নিগড় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই সুলতান ফিরুজ শাহের প্রচুর দান খ্যানের কল্যাণে অফুরন্ত সুখভোগ ও আরাম-আয়েশের মধ্যে আছেন। তাঁহারা ধনমান ও সুখ শান্তির জন্য বড় বড় কাজ করিতেছেন। তাহাদের মনে এই শাহে ইসলামের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার সন্দেহ বা উদ্বেগ নাই; উহার স্থলে ভক্তি ও ভালবাসাই পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে।

যেদিন হইতে সুলতান ফিরুজ শাহ দিল্লীর শাহী তখতে বসিয়াছেন, সেইদিন হইতেই সুলতান প্রতিদিন তাঁহার পোষ্যদের মর্যাদা বাড়াইয়া চলিয়া-ছেন। তাহাদের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা চালু রাখেন নাই, যাহাতে তাহারা

অসম্মানিত হইতে পারে বা অত্যধিক শাসন শোষণে সহায়হীন অবস্থায় পতিত হয়। তাহারা বিরূপ হইতে পারে বা অসন্তুষ্ট হইতে বাধ্য হয়, এই হেতু তিনি তাহাদিগকে কোনপ্রকার কঠিন কাজ করিতে আদেশ করেন নাই। এমন তম্বি তাগাদা, যাহা মানুষের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে, তিনি হইতে দেন নাই। যাহা কিছু নির্বিশেষ সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট অপছন্দনীয় হয় বা হইতে পারে, তাহা তিনি সযত্নে এড়াইয়া চলিয়াছেন।

এই সকল কারণেই আমি জিয়া বারানী ন্যায়ের খাতিরে ও সত্যের অনুরোধে লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি ও আমার ন্যায় বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যতদিন যাবৎ এই জগতে আসিয়াছি, সুলতান ফিরুজ শাহের ন্যায় এমন অতুলনীয় চরিত্রগুণের অধিকারী অন্য কোন বাদশাহকে দিল্লীর তখতে উপবেশন করিতে দেখি নাই। ইহা যথার্থই সত্য ও ন্যায্য বক্তব্য। তদুপরি এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের জন্য আরও উজ্জ্বল প্রমাণ আমি উপস্থিত করিতেছি।

আমার জীবন শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। যে সকল বাদশাহের রাজত্বকালের কথা আমার স্মরণে আছে, তাঁহাদের দেওয়ানে উজারতে শুধু একটি ব্যাপারই লক্ষ্য করিয়াছি যে, সেখানকার আমলা, খাজা, মুসরিফ ও অন্যান্য কর্মচারীরা আমীর ও ওয়ালীদিগকে অনাদায় ও তসরুপের ব্যাপারে অভিযুক্ত করিয়া কয়েদ করিয়াছে। লাখি গুঁতা ও অন্যবিধ অত্যাচারে তাহাদের অসম্মানের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। যাহারা এইভাবে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহারাও নিজদিগকে বিপন্ন ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারে নাই। অথচ ফিরুজশাহী রাজত্বে যখন আমি সেই সমস্ত দুর্ব্যবহারের শতাংশ বরং সহস্রাংশের এক অংশও দেখিতে পাই না, তখন ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ আমি বলিতে পারি যে, সুলতান ফিরুজ শাহের ন্যায় বাদশাহ আমি দেখি নাই। অবশ্য আমি এই প্রকার যুক্তি প্রমাণ সহ এই কথা লিখিলেও এমন মূর্খ ও অজ্ঞ লোকের অভাব নাই, যাহারা আমার এই সকল কথাকে অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে দ্বিধা করিবে না। বস্তুতঃ তাহাদের এই প্রকার ধারণা তাহাদের অজ্ঞতারই ফলশ্রুতি মাত্র।

আমি ও আমার সমসাময়িক যাহারা জীবিত আছে, তাহারা সকলেই ইহা স্মরণ রাখিয়াছে যে, অতীতে শাহীচরদের অতিরিক্ত খোঁজ-খবর লওয়ার ও অনুসন্ধানের ধাক্কায় মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পর্যন্ত পারিত না। আল্লাহ্ জানেন, চর ও পেয়াদাদের লাঠির ভয়ে কত

লোক কত লোকের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াছে এবং উহার ফলে কত ঘর ধবংস হইয়া গিয়াছে ও কত লোক অকালে প্রাণ দিয়াছে। কিন্তু বর্তমানের পুণ্যময় রাজত্বে কোনপ্রকার চর, পেয়াদা বা এই ধরনের কোন কর্মচারী আমি দেখিতে পাই না। অন্যায়ভাবে কোন লোককে ধরিয়া লাঠিগুতার সাহায্যে এই কথাও স্বীকার করাইতেও দেখি না যে, সে অমুক অমুক লোককে এমন কাজ করিতে দেখিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণভাবে বাদশাহীর পরিপন্থী। বরং আমি এই স্থলে অন্য ব্যবহারই দেখিতেছি। সুতরাং আমি যদি লিখি যে, আমার জীবন ভরিয়া বর্তমান বাদশাহ ফিরুজ শাহের ন্যায় এমন সর্বগুণবান বাদশাহ আমি আর দেখি নাই, তবে তাহা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা মিথ্যা হইবে না।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি জিয়া বারানী সুলতান মুহম্মদের মৃত্যুর পরেই খুবই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম। আমার শক্তিশালী হিংসুক শত্রুরা আমার জীবননাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তাহাদের শত্রুতার কষাঘাত আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা বর্তমান বাদশাহের কানে আমার বিরুদ্ধে এমন সব বিষাক্ত কথা ঢালিয়াছে যে, খোদা নাখাস্তা, যদি বর্তমান বাদশাহের অপার ধৈর্য ও সংযম না থাকিত এবং আমার আবেদন তাঁহার মহান দরবারে গ্রাহ্য না হইত, তাহা হইলে আমার কি অবস্থা হইত বলা যায় না। তাহাদের বিষাক্ত কথায় জর্জরিত হইয়া আমি হয়তবা আমার মায়ের কবরের পাশে স্থান লাভ করিতাম। বর্তমান দয়ালু বাদশাহের গুণের ফলেই আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি।

সুতরাং আমার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বর্তমান বাদশাহের আমার উপর যে দাবী রহিয়াছে, উহার টানে যদি আমি তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া কাব্যও করিয়া ফেলি তাহাতেও কোন অন্যায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমি তাহা করিব না বরং আমি বর্তমান বাদশাহের উন্নত জ্ঞান-গুণের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিব। এই কাজে আমি তোষামোদী বা অতিরঞ্জনকে কোথাও স্থান দেই নাই; বরং সর্বত্রই সত্য-নিষ্ঠা ও কর্তব্য পালনের পরিচয় তুলিয়া ধরিয়াছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান ফিরুজশাহের সময়ের অত্যধিক দানধ্যান এবং যে সকল জায়গীর ও লাখেরাজ জমি বিনষ্ট ও খাস হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরায় রাজ্যের সর্বসাধারণের বিলি-ব্যবস্থার বর্ণনা

বর্তমান আমলে বহু যোগ্য ব্যক্তি অজিফা, লাখেরাজ জমি ও গ্রাম লাভ করিয়াছে। দিল্লী শহরের সর্বশ্রেণীর বাসিন্দা লক্ষ্য করিয়াছে যে, সুলতান ফিরুজ শাহ তখতে বসিবার পর দুই বৎসর পর্যন্ত এমন কোন দিন যায় নাই, যে দিন দেওয়ানে রেসালত হইতে সর্দার, শায়খ, উস্তাদ, সুফী, হাফেজ, মসজিদের খাদেম, কলন্দরী, হায়দরী দরবেশ, আস্তানাদার, মালেকী, ফকির, বিকলাঙ্গ, অক্ষম ও এতিমদের দরখাস্ত বাদশাহের সম্মুখে পেশ করা হয় নাই। সুলতানের অপার দয়ায় এই সকল লোকের সকলেই নিজেদের দাবী অনুসারে ধন-সম্পদ লাভ করিয়াছে। সোবাহানাল্লাহ্। সুলতান ফিরুজ শাহের অপার দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিমাণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার নহে।

পূর্ববর্তী সুলতানদের সত্তর—একশত বৎসরের রাজত্বকালে সৈয়দ, আলেম, শায়খ ও অন্যান্য যোগ্য লোকদের জন্য যে পরিমাণ জমি ও অজিফা দেওয়া হইয়াছিল এবং কালক্রমে যাহা খাস হইয়া শাহী দপ্তরে ফিরিয়া আসিয়াছিল, বর্তমান সময়ে সেই সমস্ত জমি ও অজিফা পুনরায় তাহাদের বংশধরদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য নতুনভাবে শাহী ফরমান জারী করা হইয়াছে। অন্য যাহারা এইরূপ কোন সুযোগের অধিকারী নহে, অথচ তাহাদের অভাব আছে; এই শ্রেণীর লোকেরাও যথেষ্ট পরিমাণে অজিফা ও লাখেরাজ জমি লাভ করিয়াছে। বয়তুলমাল হইতে যাহারা দান-খয়রাত পাইবার যোগ্য, তাহারাও যথেষ্ট পরিমাণে তাহা পাইয়াছে এবং বর্তমান সুলতানের গুণকীর্তন ও তাঁহার জন্য দোয়া করিতে করিতে নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। আলেম, শায়খ, উস্তাদ, মুফতী, ওয়ায়েজ, তালেব এলেম, হাফেজ, কারী, মসজিদের খাদেম, আস্তানাদার, হায়দরী ও কলন্দরী দরবেশ, ফকির, মিসকিন প্রভৃতির জন্য বয়তুল মাল হইতে নির্দিষ্ট অজিফা যেখানে হাজার তঙ্কা ছিল, তাহা বাড়িয়া লক্ষ তঙ্কায় পৌঁছিয়াছে।

যে সকল নতুন পুরাতন মসজিদ ও মাদ্রাসা উজাড় হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরায় উস্তাদ, ছাত্র ও ওয়ায়েজদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দীনী

শিক্ষা-দীক্ষা আবার নতুন করিয়া জীবন লাভ করিয়াছে। হাজার হাজার উস্তাদ দান হিসাবে বহু গ্রাম লাভ করিয়াছেন এবং সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন। যাহারা এক শত দুই শত তঙ্কা অজিফা পাইতেন এবং কালক্রমে তাহাদের অজিফা বন্ধ ও দেওয়ান হইতে তাহাদের নাম-ধাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের জন্য নতুন করিয়া চারি শত পাঁচ শত সাত শত হাজার তঙ্কা করিয়া অজিফা নির্ধারিত হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে যাহারা দশ তঙ্কার দাবীদার ছিল, তাহাদিগকে এক শত দুই শত তিন শত করিয়া অজিফা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শহরের আলেম ও তালেব এলেমদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা শতগুণে ভাল হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা অভাব-অনটন হইতে মুক্তি পাইয়াছে। এই সকল লোকের অধিকাংশই, পূর্বে যাহারা মোজায় পর্যন্ত তালি লাগাইত, তাহারা ফিরুজশাহী দান-ধ্যানের বদৌলতে ভাল জামা-কাপড় পরিতেছে ও ভাল ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের অধিকাংশই নিশ্চিন্ত মনে দীনী এলেমের শিক্ষা-দীক্ষায় নিয়োজিত রহিয়াছে। তাহাদের সকলেই বর্তমান বাদশাহ ফিরুজ শাহের দীর্ঘ জীবন ও কীর্তির জন্য অনবরত দোয়া করিতেছে।

এলমে কেরাতের যে সকল উস্তাদ, হাফেজ, ওয়ায়েজ, খতনবিস, কারী, মুয়াজ্জিন, খাদেম প্রভৃতি অজিফাহীন অবস্থায় অভাব-অনটনের সম্মুখীন ও হীনমন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সকলেই সুলতান ফিরুজ শাহের বদান্যতায় হাজার, পাঁচ শত, তিন শত, দুইশত তঙ্কা করিয়া অজিফা পাইতেছে। বস্তুতঃ তাহার রুজি রোজগারের সর্বপ্রকার ধান্দা হইতে মুক্তি পাইয়া এবং অভাব অনটনের সর্ববিধ জ্বালার ঊর্ধ্বে উঠিয়া দিনরাত দীন ইসলামের খেদমতে নিজদিগকে নিয়োজিত রাখিতে সময় পাইয়াছে। এই জন্যই তাহারা সমস্ত অন্তর দিয়া বাদশাহ ও বাদশাহজাদাদের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে।

শহরের বাহিরে চারি পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যে সকল মাজার ও খানকাহ অনাবাদী ও নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছিল, সুলতান ফিরুজ শাহের দয়ায় তাহা পুনরায় আবাদ হইয়াছে। এই সকল স্থানে পশু-পাখীরও যাতায়াত ছিল না, মুসাফিররা দানা-পানি পাইত না; দয়ালু বাদশাহের কল্যাণে সেই সমস্ত স্থানের আস্তানাদার, সুফী, আবেদ, কলন্দরী ও হায়দরী দরবেশ, মুসাফির ও ফকির মিসকিনরা সকলপ্রকার সুব্যবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। খানকাহগুলির জন্য সুলতান বহু জমি জিরাত দান করিয়াছেন এবং সুফী ও মুসাফিরদের খরচপত্রের জন্য পাঁচ দশ বিশ ত্রিশ হাজার তঙ্কা করিয়া নগদ অজিফারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শায়খ ফরিদ উদ্দিন, শায়খ বাহা উদ্দিন, শায়খ নিজাম উদ্দিন, শায়খ রুকন উদ্দিন, শায়খ জামাল উদ্দিন উছ এবং অন্যান্য বুজর্গানের বহু প্রাচীন খান্দানকে সুলতান জমি জিরাত দিয়া পুনরায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। সুলতান ফিরুজ শাহের অপার দান-খ্যানের ফলে রাজ্যের সমস্ত লোকই সুখের মুখ দেখিয়াছে এবং অজিফাখোর, সুফী ও মুসাফিরদের রুজির পথ সুগম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য তাহারা সকলে খোদাওন্দ আলমের দীর্ঘ জীবনের কামনায় কোরান খতম করিয়া নামাজের শেষে দোয়া করিতেছে এবং নিজেরা সকলে নিশ্চিন্ত মনে খোদাতালার এবাদতে মশগুল রহিয়াছে।

ইহা ছাড়াও সুলতান ফিরুজ শাহের প্রচুর দান-খয়রাত অনবরত বৃদ্ধ, অক্ষম, বেওয়া, এতিম, অন্ধ, আতুর ও সহায় সম্বলহীনরা পাইয়া আসিতেছে। এই কারণেই রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষ খোদাওন্দ আলমের জন্য (আল্লাহ্ তাঁহার রাজ্য স্থায়ী ও মর্যাদা সমুন্নত করুন) দিনরাত নেক দোয়া করিতেছে। তাহাদের কাহারও মনে কোনপ্রকার দুঃখ, খেদ, আশংকা ও অস্থিরতা নাই। রাজ্যের ধনী ব্যক্তিরা অঢেল সুখ-শান্তিতে এবং গরীবরা নিশ্চিন্তভাবে আহার্য পাইয়া খুশিতে দিন কটাইতেছে।

এই প্রকার দান খয়রাত, জমিজিরাত দান ও অজিফা ইত্যাদি প্রদান; যাহাতে বহু লাখেরাজ জমি খাস হইয়া যাইবার পরও পূর্ববর্তী মালীকদের বংশধররা পাইয়াছে, অন্যলোকের অছিয়ত মোতাবেক আরও বহু জমি বিলি বণ্টন করা হইয়াছে এবং ইহার পরও অনেক জমি নতুনভাবে মানুষকে দান করা হইয়াছে; এইভাবে দানের পর দান দেখিয়া যদি জিয়া বারানী লিখিয়া থাকে যে, মুসলমানের যথাযথ প্রাপ্য হক আদায় ও ধর্মের বিধিবিধান পালন করার ব্যাপারে বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের ন্যায় অন্য কোন সুলতানকে দেখে নাই, তবে সে যথার্থ সত্য ও একান্ত ন্যায্য কথাই লিখিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুলতান ফিরুজশাহের মহান রাজত্বকালে জগতের আশ্চর্য বস্তু হিসাবে এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নির্মিত বৃহৎ ইমারতসমূহের বর্ণনা

আল্লাহ্ তালা বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহকে সর্বকল্যাণের আধার ও সর্বগুণের খনি রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার মাধ্যমে মানুষের উপকারকে সাধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকেই এমন বিরাট ও আশ্চর্যজনক সব অট্টালিকা ও ইমারত তৈরী হইয়াছিল যে, তেমন অট্টালিকা দিল্লীতে বা অন্যদেশের কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মুসাফিররাও এই সকল ইমারত দেখিয়া হতবাক হইয়া গিয়াছে।

এই সকল ইমারতের মধ্যে একটি হইল বিরাট জুম্মা মসজিদ। ইহা খুবই বৃহৎ, উচ্চ ও আশ্চর্য ধরনের অট্টালিকা ; ইহার উচ্চ চূড়াগুলি যেন আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিতেছে। এই মসজিদ নির্মাণ যেহেতু সকল প্রকার পুণ্যকাজের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পুণ্যকাজ, এইজন্য খোদাতালা বাদশাহে ইসলামের নিকট হইতে ইহা কবুল করিয়াছেন। এইজন্যই সকল শ্রেণীর মোমিন মুসলমান, যাহারা অজিফা এবাদতে নিষ্ঠা রাখেন, তাহারা বহুদূর দূরান্ত হইতে জুম্মার দিনে এই মসজিদে আসিয়া নামাজ আদায় করেন। জুম্মার দিনে মুসল্লীদের ভীড়ের ফলে মসজিদের উপর নীচ ও আশেপাশে কোথাও তিল ধারনে ঠাঁই থাকে না। মুসল্লীরা আশে-পাশের অলিগলিতেও কাতার বাঁধিয়া দাঁড়ান। শহরে অন্য আরও মসজিদ থাকা সত্ত্বেও নামাজীগণ এই মসজিদেই নামাজ আদায় করিতে ভালবাসেন। বহু দূর দূরান্ত হইতে তাহারা দলে দলে আসেন এবং এই মসজিদের পাশের অলিগলিতে তাহারা যেভাবে নামাজ আদায় করেন, তাহা যথার্থই খোদার দয়ার নিদর্শন ; তিনি যথার্থই এই মসজিদটিকে কবুল করিয়াছেন। ইহাকে ও ইহার ন্যায় অন্য ইমারতগুলিকেও খোদাতালা বর্তমান সুলতান মহান ফিরুজশাহের জন্য স্থায়ী কীর্তি ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় স্বরূপ করুন।

এই সকল বিরাট অট্টালিকার দ্বিতীয়টি হইল সুলতান ফিরুজশাহের নির্মিত মাদ্রাসা এই বিরাট অট্টালিকাটি খালাই হাউজের তীরে অবস্থিত। ইহার গম্বুজের উচ্চতা, গঠনের সৌন্দর্য, প্রাঙ্গণের সমতা ও আসনাদির সারিবদ্ধ সুব্যবস্থা

জগতের অনুরূপ সকল অট্টালিকার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই অতি আশ্চর্য অট্টালিকা দেখিবার জন্য যে সকল স্থানীয় অধিবাসী ও মুসাফির ইহাতে প্রবেশ করে, তাহাদের সকলেরই মনে হয়, তাহারা যেন বেহেশতে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সকল চিন্তা দূর হইয়া যায়। সুলতান ফিরুজ শাহের এই বিরাট কীর্তি মানুষের দুঃখ-কষ্টকে ভুলাইয়া দেয়। বহু তাপিত ও জর্জরিত প্রাণ এখানে আসিয়া শীতল হয় এবং অনেক দিনের শোক-দুঃখ ইহার মধুর পরশে দূর হইয়া যায়।

এই বিরাট অট্টালিকাটি এমনই মনোমুগ্ধকর যে, মানুষ ইহার সুন্দর পরিবেশের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে, নিজের বাড়ীঘরের কথা ভুলিয়া যায় এবং নিজের কর্তব্য ভুলিয়া এইখানে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে। শহরের অনেক অধিবাসীই ইহার পুণ্য পরিবেশের সান্নিধ্যলাভ করিবার জন্য তাহাদের পুরাতন আবাস ত্যাগ করিয়া ইহার সন্নিকটে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া লইয়াছে এবং দিনে বিশ পঁচিশ বার এই মাদ্রাসা দর্শন না করিলে তাহাদের মন তৃপ্তি লাভ করে না। এই মাদ্রাসার জন্য শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে এবং তাহাদের অন্যবিধ জরুরী কাজ ত্যাগ করিয়া হইলেও এই মাদ্রাসার পুণ্য পরিবেশের জীবন লাভ করিবার জন্য ইহার সান্নিধ্য কামনা করিতে থাকে।

যে সকল মুসাফির দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান দেখিয়া আসিয়া এই মাদ্রাসার বিরাট ও সুন্দর ইমারত এবং ইহার আশ্চর্য পরিবেশ দর্শন করিয়াছে, তাহারাও খুব কঠোর শপথবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছে যে, তাহারা দুনিয়ার বহুস্থান দেখিয়াছে, অনেক কিছু সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছে; কিন্তু সুলতান ফিরুজ শাহের এই মাদ্রাসার ন্যায় এমন সুন্দর অট্টালিকা আর কোথা দেখে নাই। বস্তুতঃ ইহার গঠন পরিপাট্য ও সুন্দর পরিবেশ এমনই মনোমুগ্ধকর যে, যদি 'খোরনক', 'সতরা' ও খসরুর শাহী মহলের সহিত তুলনা করা যায়, তবে ইহার দাবীই অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সুলতান ফিরুজ শাহের এই মাদ্রাসা পুণ্যের খনি বিশেষ। ইহাতে ফরজ ও নফল এবাদত সর্বদা আদায় করা হয়। পাঁচ অক্ত জামাতের সহিত নামাজ হয়। সুফীরা চাশত, এশরাক, কাইযাওয়াল, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নামাজও আদায় করিয়া থাকেন। দিনরাত অজিফা পাঠ করেন এবং বাদশাহ সালামতের জন্য নেক দোয়া করিতে নিয়োজিত থাকেন। মওলানা জালাল উদ্দিন রোমীর ন্যায় বহু বিদ্যাবিশারদ আলেম এখানে সর্বদা দীনী এলেম শিক্ষাদান করেন। তালেব এলেমরা তাঁহাদের নিকট তফসীর, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের সবক নেয়।

৩০—

প্রতিদিন বহু সংখ্যক হাফেজ এখানে কোরান শরীফ মুখস্থ করে। মুসাফিরগণ অনবরত তকবীর ধ্বনিতে এই মাদ্রাসার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া রাখে। পাঁচ অক্ত নামাজের সময় মুয়াজ্জিনরা উচ্চকণ্ঠে আজান দেয় এবং নফল নামাজ অন্তে খোদাওন্দ আলেমের জন্য দোয়া করা হয়।

সুলতান ফিরুজ শাহের অযাচিত দানধ্যানের ফলে মাদ্রাসার সহিত যুক্ত এই সকল লোক তোহফা, অজিফা ও খাদ্যভর্তি খঞ্চা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাইয়া থাকে। সুলতান প্রতিদিনই তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় দানধ্যান করেন। শুধু তালেব এলেম, হাফেজ মুসল্লী ও অজিফাখোররাই নহে ; বরং উক্ত মাদ্রাসার সহিত যুক্ত সর্বশ্রেণীর লোক আরাম আয়েশে দিনরাত খোদার এবাদতে মশগুল থাকে এবং বাদশাহের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করে। এইরূপ একটি পুণ্য স্থানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার জন্য তাহাদের দোয়া খোদার নিকট কবুল হয়।

বাস্তবিক আমি যদি এইরূপ পুণ্যস্থান, যেখানে আলেম, ফাজেল ও ওলী দরবেশগণ স্থান পাইয়াছেন, উহাকে শাদ্দাদের বেহেশতের সহিত তুলনা করি এবং বলি যে, উক্ত মাদ্রাসা উহা হইতেও বহু গুণে উত্তম স্থান, তাহা হইলেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা আমার কথায় কোন খুঁত ধরিতে পারিবেন না। কারণ শাদ্দাদের বেহেশত মানুষের কোন উপকারে আসে নাই। অথচ এই মাদ্রাসা দীনী এলেমের শিক্ষাগার ও আল্লাহ্‌তালার এবাদতবন্দেগীর কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহার প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ফিরুজ শাহের মর্যাদাও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের নিকট ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ অধিক বলিয়া বোধ হইবে।

দিল্লীতে বহু বাদশাহ বাদশাহী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বহু উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া অজস্র সম্পদ ব্যয় করিয়াছেন। কালে সেইগুলি বিভিন্ন দপ্তর ও শাহী কাজকর্মের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ফিরুজশাহী মাদ্রাসার মধ্যে যে প্রকার পুণ্য পরিবেশ ও নতুন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, উহার সহিত তুলনা করিলে অতীতের নির্মিত সকল অট্টালিকাই ব্যর্থ বলিয়া মনে হইবে। বস্তুতঃ ইহার তুল্য অন্য একটি আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কবি বলেন,

এমন সুগঠিত ইমারত আর কোথাও নাই ;
থাকিলেও ইহার সৌন্দর্য উহাতে পাওয়া যাইবে না।

সুলতান ফিরুজ শাহের নির্মিত তৃতীয় ইমারতটি হইল সিরির 'বালাবন্দ' অট্টালিকা। উচ্চতায় ইহা আকাশকে স্পর্শ করিতেছে এবং সৌন্দর্যে ও গঠন

পরিপাট্যে দুনিয়ার সকল ইমারত হইতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা এমনই এক আশ্চর্য অট্টালিকা যে, ইহাকে যদি শাহী বালাখানা বলা যায়, ভুল হইবে না ; যদি খানকাহ বলা যায়, তাহা হইলেও খুব খারাপ লাগিবে না এবং যদি মাদ্রাসা বলা যায় তবুও অন্যায় হইবে না। ফিরুজশাহী মাদ্রাসার অট্টালিকার সহিত যদি কোন অট্টালিকার তুলনা সম্ভবপর হয়, তবে ইহা সিরির 'বালাবন্দ' ইমারত। ইহার অভ্যন্তরে বেহেশতী পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বের বাগানসমূহের সবুজ দৃশ্য দর্শকদের নয়ন-মন মুগ্ধ করিতেছে। বস্তুতঃ ইহার সৌন্দর্য বর্ণনা করা লেখক ও কথকদের সাধ্যের বাহিরে বলিয়াই মনে হয়।

বর্তমানে এই ইমারতে বাদশাহের দানের সাহায্যে এক বিরাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে মওলানা নজম উদ্দিন সমরকন্দীর ন্যায় বিরল প্রতিভার অধিকারী উস্তাদ শিক্ষাদান করিতেছেন। সুলতান তাঁহার জন্য কয়েকটি গ্রাম ও নগদ অজিফার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তালেব এলেমদের খোরাকীর ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিয়াছেন। তাহারা প্রতিদিন উক্ত মহামান্য উস্তাদের নিকট দীনী এলম হাসেল করিতেছে এবং সর্বদা সুলতানের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া দোয়া করিতেছে। খোদাতালা এই সকল পুণ্যকাজ ও দান-ধ্যানকে সুলতান ফিরুজশাহের দীর্ঘজীবন ও স্থায়ী কীর্তি মাধ্যম হিসাবে অক্ষয় করুন। আমীন!

সুলতান ফিরুজশাহের সমৃদ্ধিমান ধনসম্পদের সাহায্যে যমুনা নদীর তীরে ফিরুজাবাদ দুর্গ নির্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ফিরুজাবাদ শহর যেভাবে দুনিয়ার অন্যান্য শহরের ঈর্ষার পাত্র হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যদি আমি উহার গঠন ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও পবিত্র পরিবেশ সম্পর্কে কলম ধরিতে যাই, তাহা হইলে পৃথক একটি গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। হাঁসী ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী স্থানে ফতেহাবাদ নামে অন্য একটি দুর্গও তিনি নির্মাণ করাইয়াছেন। ভাটনীর সীমান্তেও অন্য একটি শক্তিশালী দুর্গের নির্মাণ কাজ শেষ হইয়াছে। সুলতান লোকজনের সুবিধার জন্য বহু দূর দূরান্ত হইতে খাল খনন করাইয়া এই সকল দুর্গের পাদদেশে পানি আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পানিতে এই সকল দুর্গের মধ্যে বহু বাগিচার সৃষ্টি হইয়াছে এবং আশেপাশের বহু অনাবাদী বালুকাময় জমি আবাদী হইয়া উঠিয়াছে। কাঁটা জঙ্গলের স্থানে মানুষের উপকারী ফসলাদি উৎপন্ন হইতেছে। আয় এলাহি! তোমার বাণী—'আর যাহা কিছু মানুষের উপকারে লাগে, তাহা জমিতে থাকিয়া যায়'—উহার

সমানুযায়ী মানুষের কল্যাণকামী সুলতান ফিরুজ শাহকে এই দুনিয়ার বুকে শাহী তখতে আরও দীর্ঘ দিন স্থায়ী করিয়া রাখ! আমীন! হে দীন ও দুনিয়ার মালিক, আমীন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মরুভূমি তুল্য অঞ্চলগুলিতে জনসাধারণ ও পশুপাখীর কল্যাণের জন্য নদী নালা খনন করিয়া পানির ব্যবস্থা করিবার বর্ণনা

সুলতান ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে গঙ্গা যমুনার ন্যায় নদীগুলি পঞ্চাশ ষাইট মাইল ক্রোশ দূর পর্যন্ত খনন করা হইয়াছে এবং যে সকল মাঠ-ময়দানে কোনপ্রকার পুকুর বা কুয়া ছিল না, তথায় এই নদীগুলি হইতে পানি নেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খনন করা নানা আকারের খালের মধ্য দিয়া পানি শস্য ক্ষেতগুলিতে বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। এমন একটি পুণ্য কাজ, যাহা মানুষের কল্যাণ তথা তৃষ্ণা দূর ও কৃষিকার্যের সহায়ক হইয়া দেশে নানাবিধ শস্য, ইক্ষু, চাউল ও ফল উৎপাদন করিতেছে, তাহা দিল্লীর অন্যান্য বাদশাহদের খোদাতালা বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের ভাগ্যেই লিখিয়া দিয়াছিলেন। সুলতানের প্রচেষ্টা ও সুব্যবস্থার ফলে মরুভূমির তুল্য অনাবাদী মাঠ-ময়দান-গুলিতে খাল-নালার সাহায্যে প্রচুর পানি আসিয়া পৌঁছিতেছে।

যে সকল স্থানে মুসাফিররা পানির কষ্টের জন্য পথ চলিতে ভয় পাইত, নিজেদের সাথে প্রয়োজনীয় মশক ভর্তি পানি ছাড়া অগ্রসর হইতে পারিত না; যে সকল জঙ্গলে শুষ্ককালে পুকুর ও কুয়া না থাকার কারণে পশুপাখী তৃষ্ণায় মারা যাইত এবং যে পাহাড়তুল্য স্থানে প্রাণ বাঁচাইবার মত এক ফোঁটা পানি পাইবার উপায় ছিল না, সেখানে সুলতান বহু ফরসংগব্যাপী গঙ্গা যমুনার ন্যায় নদী-নালা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। যদি সুলতানের আদেশে এই সকল নদী-নালার তীরে যুগ যুগ ব্যাপিয়া সৈন্যদল বাস করিতে থাকে, তথাপি তাহারা পানির অভাবে কোনপ্রকার কষ্ট পাইবে না। খোদাই ভাল জানেন, ভবিষ্যতে এই সকল নদী-নালার তীরে কত হাজার হাজার গ্রাম আবাদ হইবে ও গ্রাম-বাসীরা কত বিচিত্র ধরনের শস্য উৎপাদন করিবে এবং ইহার ফলে দেশের

চতুর্দিক ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। দেশে তখন শস্যের মূল্য কতই না সুলভ হইয়া দাঁড়াইবে। বর্তমানেও এই সকল নদী-নালার তীরে নানাপ্রকার শস্যক্ষেত্র ও বাগ-বাগিচা গড়িয়া উঠিতেছে।

যে সময় হইতে হিন্দুস্থানে জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রায় সেই সময় হইতেই অনেকস্থানে পানির অভাবে স্থায়ী গ্রাম গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মানুষ তাহাদের পালিত পশু ও শস্যের জন্য পানি তালাশ করিয়া ফিরে। যেখানে শুনে পানি আছে, সেখানে গিয়া বৎসরখানেক অবস্থান করে এবং তাহাদের পশু ও বালবাচ্ছাসহ অস্থায়ী তাঁবুতে বাস করিতে থাকে। বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের কল্যাণে হয়ত এই সকল যাযাবর শ্রেণীর মানুষ নদী-নালার তীরে আসিয়া ঘরবাড়ী বাঁধিবে এবং বালবাচ্চাসহ ঝুপড়িতে বসবাস করিবার দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি পাইবে। তাহারা যে সকল জমিতে 'মুঠি' ও তিল উৎপন্ন করিত ও মাঠে-ময়দানে উহার জন্য পরিশ্রম করিত, সেইস্থলে পানির সাহায্য পাইয়া তাহারা ইক্ষু, গম, যব ইত্যাদি উৎপাদন করিতে পারিবে এবং সুখে-শান্তিতে ঘরে বসিয়া তাহা ভোগ করিতে পারিবে। পানির অভাব দূর হওয়ার ফলে তাহাদের পশুগুলিও হাজারে হাজারে বাড়িয়া যাইবে।

সুলতান ফিরুজ শাহের অসীম দয়ার ফলে ঐ সকল অঞ্চলের প্রজারা নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদন করিবে এবং ওয়ালী ও কেতাদাররাও শস্যের প্রাচুর্যের দ্বারা দেশকে আরও ভালভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিবে। খেরাজ আদায়ের ব্যাপারেও একটা স্থায়ী ও সহজ নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব হইবে। ঐ অঞ্চলের যে সকল প্রজা কোন দিন ইক্ষু, গম, চিনা, যব ও ফল-ফলান্তির কোন চাষ চক্ষে দেখে নাই, তাহারাও ঐ সমস্ত শস্য উৎপাদন করিবে। দিল্লী ও দিল্লীর আশে-পাশের অঞ্চল হইতে সওদাগররা গম, চিনা, চিনি, মিসরী ইত্যাদি পণ্য হিসাবে ঐ সকল অঞ্চলে লইয়া যায় এবং ভাল মূল্যে বিক্রয় করে। ঐ সকল অঞ্চলের প্রজারা কখনও মিসরী ক্রয় করিত না এবং একমাত্র বিবাহ অনুরূপ পর্বাদিতেই রুটি ও গম খাইত। সুলতান ফিরুজ শাহের কৃপায় নদী-নালার পানি পাইয়া তাহারা নিজেরাই এখন চিনা, গম, ইক্ষু, মিসরী, চিনি ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া ভোগ করিতে পারিবে এবং অন্য আরও বহু খাদ্য সামগ্রীতে নিজেদের ঘরদ্বার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। ফলে বর্তমানে যেমন দিল্লী ও দিল্লীর আশ-পাশ হইতে আলু, শবজি, আখ, গম, চিনা ইত্যাদি পণ্য হিসাবে ঐ সকল অঞ্চলে যায়, তেমনই ভাবে ঐ সকল অঞ্চল হইতেও এই সকল দ্রব্য অন্যত্র দূর-দূরান্তে রপ্তানি হইবে। দুনিয়ার বহু দেশ ঐ সকল শস্য সাদরে ভোগ করিবে এবং ঐ সকল অঞ্চলের লোকেরা সচ্ছল অবস্থার মধ্যে নানাবিধ সুখ-ভোগ করিতে

থাকিবে। তাহাদের এই প্রকার সুখ-শান্তির জন্য তাহারা বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের দীর্ঘজীবন কামনায় মুখর হইয়া উঠিবে। ফলে সুলতানের কীর্তি ও প্রশংসা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

বস্তুতঃ বর্তমান সুলতানের সুকীর্তি ও সুখ্যাতি কেন চিরস্থায়ী হইবে না! তাঁহারই কল্যাণে যে সকল মাঠ ময়দানে রাখাল শশা, বাবলা গাছ ও কাটা ঝোপ ব্যতীত অন্য কিছু উৎপন্ন হইত না এবং যে সকল জমিতে বহু ফরসংগ ব্যাপী শুধু 'হিঞ্জল', 'মগিলা' ও 'বরকাক' জন্মিত, সেখানে ঐ সকল নদীনালার পানিতে নানাপ্রকার শস্য ও বাগ-বাগিচায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। গম, যব, আখ ও বাগানের সবুজ শোভা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই সকল বাগানে শুধু শস্য নহে; নানাবিধ ফুল, লালা, কর্সা, শ্বেতী ইত্যাদিরও চাষ হইবে। আঙ্গুর, সেব, তরমুজ, ডালিম, কমলা, 'ঝনির', ডুমুর, লেবু, 'কর্না', 'ঝানক', 'তগজক', শবজি, 'খশখশ' কাল আখ, পুণ্ডা ইত্যাদি ফল ও শস্য প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল বাগানে উৎপন্ন হইবে। 'খিরনি', জাম, খেজুর, 'বুধল', সম্বল, 'পিপল', 'গুলনেহাল' ইত্যাদি বৃক্ষ ও গুল্ম ঐ সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে। সুলতান ফিরুজ শাহের দৌলতে ঐ সকল অঞ্চলে অচিরেই এত প্রচুর ও বিভিন্ন প্রকার শস্য জন্মাইবে যে, উহার ফলে দিল্লীর শস্যের বাজারও সুলভ হইয়া পড়িবে।

বস্তুতঃ নদীনালা খনন করা এমনই এক আশ্চর্য পুণ্য কাজ যে, ইহার দ্বারা খোদাতালার তাবৎ সৃষ্টির বহুবিধ উপকার সাধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে ইহা আরও বহু গুণ বেশী সকলের উপকারে আসিবে। যতই দিন যাইবে, ততই ইহার উপকারের মাত্রা বাড়িতে থাকিবে। ঐ সকল অঞ্চলে মুসাফিররা পূর্বে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ আদায় করিত, বর্তমানে নদীনালার কল্যাণে প্রতি অক্তে গোসল করিয়াও নামাজ পড়িতে পারে। যাহারা ঐ সকল অঞ্চলে লু হাওয়ার ভয়ে রাত্রে পথ চলিত ও পিয়াজের থলি গলায় লটকাইয়া রাখিত, তাহারা এখন পানির কোনপ্রকার মশক বহন করা ছাড়াই নির্বিঘ্নে দিনের বেলায় পথ চলিতে পারে।

এইরূপ একটি পুণ্যকাজ করিবার জন্য খোদাওন্দ আলমকে যেমন জিন ইনসান দোয়া করিতেছে ও করিতে থাকিব, তেমনি পশুপাখী ও কীটপতঙ্গও তৃষ্ণার জ্বালা হইতে মুক্তি পাইয়া দোয়া করিতেছে ও দোয়া করিতে থাকিবে। ইহা এমনই এক পুণ্যকাজ, যাহা বহু বৎসর বহু যুগ স্থায়ী হইয়া মানুষের মহা উপকার ও সুলতানের দীর্ঘ জীবন কামনার উৎস হইয়া থাকিবে। হজরত

মুহম্মদ (সঃ) যাহাকে 'সদকায়ে জারিয়া' অর্থাৎ চিরস্থায়ী পুণ্য কাজ বলিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে এই প্রকার নদীনালা খনন করাকে বলা যাইতে পারে, যাহা স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের এই বিরাট পুণ্য কাজের মানুষের উপকার ভাষায় বর্ণনা করা সহজ ব্যাপার নহে।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি বর্তমান সুলতানের দ্বারা এমন একটি বিরাট পুণ্য কাজ হইতে দেখিতেছি, যাহা খোদার সৃষ্টি তথা মানুষ ও পশুর সর্ববিধ উপকারে ও কল্যাণে লাগিতেছে এবং ভবিষ্যতেও বহু যুগ ব্যাপিয়া যাহা স্থায়ী হইবে। আমি আমার জীবনে অন্য কোন বাদশাহের বেলায় এমনটি আর দেখি নাই। আমি এই তারিখ-ই-এ লিখিয়াছি যে, চরিত্র গুণ, জনকল্যাণ ও পুণ্য কাজের আধার স্বরূপ বর্তমান সুলতান ফিরুজশাহের ন্যায় অন্য কোন বাদশাহকে আমি দিল্লীর তখত বসিতে দেখি নাই। বস্তুতঃ খোদাতালা অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে বর্তমান সুলতানকেই এমন সব পুণ্যকাজ করিবার সৌভাগ্য অর্পণ করিয়াছেন, যাহা নানাদিক হইতে মানুষের অধিকারে আসিয়া তাহাদের উপকারে লাগিতেছে। ইহার ফলে মানুষ নানাবিধ সৌভাগ্যে অধিকারী হইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যে সকল সুব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সুলতান ফিরুজ শাহের রাজত্বে সর্ববিধ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে; রাজ্যের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত নানাবিধ অন্যায়, অবিচার ও বিদ্রোহ গোলযোগ দূরীভূত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং যাহা প্রথম বৎসর হইতেই সকল দেশ ও শহরের সর্বশ্রেণীর মানুষ দেখিয়া আসিতেছে—উহার বর্ণনা।

বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহ তখতে বসিবার পূর্বে হিন্দ ও সিন্ধের সমস্ত রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা, বিদ্রোহ, অত্যধিক শাস্তিদান ও জবরদস্তির ফলে

সর্বসাধারণ প্রজার অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল এবং বুদ্ধিমান ও মূর্খ, সংসারী ও বাজারী, দরবেশ ও ফকির, বিখ্যাত ও অখ্যাত, সওদাগর ও ও কৃষক, সম্ভ্রান্ত ও নীচ—নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। সমাজের সর্বস্তরে ও সর্ব সম্প্রদায়ে এইরূপ বিশৃঙ্খলার ফলে জীবন ও রাজ্যের প্রতি তাহারা সমভাবে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও শাস্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হইয়া বহু লোক প্রাণ দিয়াছিল। বহু লোক নিজেদের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া দূরদেশে পলাইয়া গিয়াছিল। বহু লোক শাস্তির ভয়ে অচিন দেশে, বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় লইয়াছিল।

কিন্তু সুলতান ফিরুজ শাহের (তিনি হাজার বছর দিল্লীর তখতে সমাসীন থাকুন) তখতে বসিবার এক বৎসরের মধ্যে কতকগুলি সুব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সকল রাজ্যের সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা এমন সুচারুভাবে দূরীভূত হইয়াছে যে, মনে হয় এই সকল অঞ্চলে কখনও মহামারী দুর্ভিক্ষ, শাসনত্রাসন বা অরাজকতা দেখা দেয় নাই। সাম্রাজ্যের সর্বত্র পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে, বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের সুবুদ্ধি, সৌভাগ্য ও সর্ববিধ কল্যাণের নিদর্শন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মানুষ দলে দলে আসিয়া পুনরায় ঘর বাঁধিয়াছে। বাগ-বাগিচা, নানাপ্রকার শস্য ও ফলফুলের চাষে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। সর্বত্র সুখ-শান্তি ও স্বস্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মানুষের মন পুনরায় আনন্দ ও জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রেরণা দেখা দিয়াছে। সকল কাজকর্মে কথাবার্তায় পুনরায় সহজ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলেই আবার নিজের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

বর্তমান সুলতান কর্তৃক এই সকল সুব্যবস্থার প্রথমটি হইল শাস্তির ব্যবস্থা রহিত করা। ইহার ফলে সুলতান ফিরুজ শাহের পুণ্যরাজ্যে আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান, আল্লাহ্ বিশ্বাসী, সুন্নী, জিম্মী, ধার্মিক বা অধার্মিকের জীবন-নাশ ঘটে নাই। তিনি তাঁহার শাহী মহলের প্রাঙ্গণ এখনও মানুষের রক্তে রঞ্জিত করেন নাই। ইহার ফলে যেন মাটির তল ও আকাশ হইতে দলে দলে মানুষ আসিয়া রাজধানী দিল্লীর আনাচ-কানাচ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দিকের রাজ্যগুলিও নানাশ্রেণীর মানুষের বসতিতে ভরিয়া গিয়াছে এবং সর্বত্র শান্তি ও স্বস্তির ভাব দেখা দিয়াছে।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক আমি জিয়া বারানীর বয়স চুয়াত্তর বৎসর পার হইতে চলিয়াছে। এই দীর্ঘ জীবনে আমি অনেক কিছুই দেখিয়াছি। কিন্তু বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের আমলে মসজিদে, ঈদগাহে আর যেখানেই যাই

না কেন, লোকের ভীড় ও স্বস্তির ভাব দেখিয়া অবাক না হইয়া পারি না। দলে দলে এই সকল লোকের চলাফেরা দেখিয়া ভাবি, এত কর্মী লোক কোথায় লুকাইয়াছিল এবং কোথা হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া আসিল! আলেম, শায়খ, সুফী, তালেব এলেম, খানকাহদার, নির্জনবাসী, দরবেশ, আবেদ, হায়দরী ও কলন্দরী ফকির আরও এমন অনেক লোককেই দেখি, যাহাদের একজনও আমার পরিচিত নহে। বহু আমীর, সিপাহসালার, গণ্যমান্য লোক ও বুজর্গানকে দেখিতেছি এবং এমন অনেক লেখক ও নবিশের সাক্ষাৎ পাইতেছি, যাহারা এতদিন ডুমুরের ফুলের মতই অদৃশ্য হইয়াছিল। বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের ন্যায় বিচার, দয়ামায়া ও লজ্জাশরমের পরিপূর্ণ প্রকাশের কল্যাণেই এত এত কর্মঠ লোক একত্র হইতে পারিয়াছে। পরিপূর্ণ শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি সহ এত লোকের ভীড় আমি আর কাহারও রাজত্বে দর্শন করি নাই।

আমি নিজেও জানি এবং অন্যান্য বুদ্ধিমানদের নিকটও এই কথা অজানা নহে যে, সুলতান ফিরুজ শাহের পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার, দয়াদাক্ষিণ্য ও গুণ-গ্রাহিতার ফলেই যাহারা দূরে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে এবং যাহারা লুকাইয়াছিল, তাহারা বাহির হইয়াছে। পলাতক, বিশৃঙ্খল, ভীতসন্ত্রস্ত বিদ্রোহী ও গোলযোগকারীরা নিজ নিজ অবস্থায় পরিবর্তন আনিয়াছে এবং সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে গোলযোগ ও দুষ্কর্মের ভাব দূরীভূত হইয়াছে। ইহার ফলেই মানুষের মনে শান্তি ও দেশের সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে।

সুলতান ফিরুজ শাহের আমলে হিন্দ ও সিন্ধের সকল রাজ্যের সমৃদ্ধি ঘটিবার দ্বিতীয় সুব্যবস্থাটি হইল উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অনুসারে খেরাজ ও জিজিয়া আদায়ের আদেশ দান এবং সর্বপ্রকার অতিরিক্ত খেরাজ, খাজনা ও জবরদস্তি দূর করা। চুক্তিতে কেতাগ্রহণকারী, চুক্তিভঙ্গকারী ও অতিরিক্ত আদায়কারীদিগকে কেতা ও জায়গীরের কাছে ঘেঁষিতে না দেওয়া এবং প্রজারা স্বেচ্ছায় ও সচ্ছন্দে যে পরিমাণ খেরাজ দিতে পারে, তাহা আদায় করিবার আদেশ দেওয়া। যাহাতে বয়তুলমালের প্রকৃতরক্ষী চাষীদের কোনপ্রকার অসন্তোষ ও অসদ্ভাবের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।

এই ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে সমস্ত রাজ্য চাষাবাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ফরসংগের পর ফরসংগব্যাপী মাঠে ময়দানে চাষের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। বাগের পর বাগ ও গ্রামের পর গ্রাম সবুজ শস্যে ভরিয়া গিয়াছে এবং প্রজাসাধারণের মন হইতে সকলপ্রকার দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দূরীভূত হইয়া স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোনপ্রকার জবরদস্তি ও অতিরিক্ত আদায়ের

রেওয়াজ না থাকার ও সাধ্যমত খেরাজ আদায় করার সুবিধার ফলে প্রজা, মুতসরিফ, আমলা ও কেতাদার—কাহারও নিকট বকেয়া খাজনা পড়িয়া নাই। ইহার ফলে কাহাকেও আর দেওয়ানে উজারতের সম্মুখীন হইয়া হিসাব-নিকাশ দিতে ও শাস্তি গ্রহণ করিতে হয় না। কোন মুসলমানকে আর লাথিগুঁতা খাইয়া ও কয়েদ জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকিয়া অসম্মানিত হইতে হয় না। এইরূপ একটি অবস্থা সুলতান ফিরুজ শাহের রাজত্বকাল ছাড়া অন্য সময় দেখা যায় নাই।

সুলতান ফিরুজ শাহের দ্বারা প্রবর্তিত যে তৃতীয় সুব্যবস্থাটির ফলে অত্যাচার অবিচারে জর্জরিত সমুদয় রাজ্যের ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইল সকল রাজ্যে যোগ্য, ন্যায়-নিষ্ঠ ও সুবিচারক ওয়ালী, কেতাদার, কর্মচারী এবং তাহাদের সঙ্গী-সাথী নিযুক্ত করা। ইহার ফলে কোথাও কোন পদে কোন-প্রকার দুর্বৃত্ত, অধার্মিক ও অত্যাচারী স্থান পায় নাই। যেহেতু খোদাতালা বর্তমান সুলতান আবুল মুজাফ্ফর ফিরুজ শাহকে সর্ববিধ সৎগুণ, ন্যায়, দয়া, ধৈর্য, লজ্জা প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন, সেইজন্য, 'মানুষ শাসকদের নীতি অনুসরণ করে'—এই প্রবাদ বাক্যের মর্মানুসারে দরবারেও সকল রাজ্যে যোগ্য, ন্যায়-নিষ্ঠ ও সুবিচারক লোকের সৃষ্টি হইয়াছে। দরবার, সৈন্যদল, কেতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাদশাহের যোগ্য প্রতিনিধিরা স্থান লাভ করিয়াছেন। এই ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠার ফলে কোথাও কোন দুষ্ট, অধার্মিক ও অত্যাচারীকে মুসলমান বা জিম্মীদের উপর শাসনক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এইজন্যই পুণ্যবান ও সত্যবাদীরা বদলোক ও দুর্বৃত্তদের দ্বারা কোথাও উৎপীড়িত হইতেছে না। এইরূপ সুবিচারের ফলে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ সুলতান ফিরুজ শাহের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোক সুলতান ফিরুজ শাহের (আল্লাহ্ তাঁহার রাজ্য স্থায়ী ও মর্যাদা সমুন্নত করুন) প্রতি এমনই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহার প্রয়োজনে নিজেদের বালবাচ্ছা ও ধনদৌলত উৎসর্গ করিতেও তাহারা দ্বিধা করিবে না।

তারিখ-ই-এর লেখক আমি যদি সুলতানের সকল অন্তরঙ্গ সাথী, ওয়ালী, কেতাদার, সেনাপতি ও অন্যান্য সুযোগ্য লোকদের কথা এই তারিখ-ই-এ বিস্তারিতভাবে লিখিতে যাই, তাহা হইলে যেহেতু তাঁহাদের সংখ্যা অধিক এবং তাঁহাদের জ্ঞান-গুণ অপরিমেয়, সেইজন্য আমি তাহা করিতে সক্ষম হইব না। তথাপি যে সকল গুণী ব্যক্তির চরিত্র গুণ ও সুকীর্তির কথা এই ইতিহাসে উল্লেখ না করিলেই নহে, আমি শুধু তাঁহাদের কথাই লিখিব।

শাহাজাদাদের মধ্যে সকলের বড় শাদী খান (আল্লাহ তাঁহাকে দীর্ঘজীবন ও যোগ্য ক্ষমতা দান করুন) সকল প্রকার জ্ঞান ও গুণ দ্বারা সুসজ্জিত। খোদাওন্দ আলম এই শাহজাদার আনুগত্য ও খেদমতে অতিশয় সন্তুষ্ট। দরবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণপদ উকিলে দর নানাবিধ দয়া-দাক্ষিণ্যসহ তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। এই শাহজাদা এমনই বিশিষ্ট মার্জিত, অনুগত ও বাধ্য যে, প্রতিদিনই সুলতানী দয়ার পরিমাণ তাঁহার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে। খোদাতালা বড় শাহজাদাশাদী খানকে দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ জীবন দান করুন।

অন্যান্য শাহজাদা, যাহাদিগকে খান খেতাব ও বড় বড় অঞ্চল জায়গীর দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই এখনও কোরান পাঠ ও খতকিতাবত শিক্ষায় নিয়োজিত রহিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের পৃথক দরবারের বন্দোবস্ত হয় নাই এবং কোনপ্রকার হুকুম দেওয়ার ক্ষমতাও তাহারা পান নাই। তাঁহাদের পক্ষ হইতে নায়েবগণ তাঁহাদের জায়গীর শাসন করিয়া থাকেন। খোদাতালা খোদা-ওন্দ আলমের সম্মুখেই এই সকল শাহজাদাকে পরিপূর্ণ সুখী জীবনের অধিকারী করুন; আমীন, হে রাব্বিল আলামীন! যেহেতু তাঁহারা সকলেই খোদাওন্দ আলমের পুণ্যময় তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিতেছেন, সেইজন্য ভবিষ্যতে তাহারা সকলেই যে, শৌর্যে-বীর্যে ও ধর্মে-কর্মে সুখ্যাতি অর্জন করিবেন, এইরূপ আশা করা যায়। বয়েত—

একজন সেকান্দরের ন্যায় মহা পরাক্রমশালী, পৃথিবী জয় করিবেন :
অন্যজন খিজিরের ন্যায় মহা ধার্মিক, দীর্ঘ জীবন লাভ করিবেন ;
অন্যজন ইরাক ও খোরাসানকে নিজের আয়ত্তে আনিবেন ;
অন্যজন পিতার ন্যায় আকাশচুম্বী সুকীর্তি অর্জন করিবেন।

বিশেষ করিয়া শাহান শাহে দৌলতের নয়নমণি ছয় বৎসর বয়সী শাহজাদা ফতেহ খান, তাঁহার চরিত্র গুণ, তাঁহার চাল-চলনের মহিমা ও ধ্যান-জ্ঞানের গরিমা তাঁহাকে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছে। খোদাওন্দ আলমের শুভাকাঙ্ক্ষী এই গরীবের প্রতি তাঁহার দয়ার আর সীমা নাই। খোদাতালা যেন শাহানশাহে আলমের চক্ষের সমক্ষে ফতেহ খানকে বৃদ্ধ করেন এবং তাঁহাকেও সাম্রাজ্য ও সম্মান দান করেন। আমীন!

খোদাওন্দ আলমের ভাইয়েরা সকলেই সর্বপ্রকার জ্ঞান ও গুণের আধার। বাদশাহে ইসলামের ভাই হওয়ার ন্যায় মহা সম্মান ও অসীম মর্যাদা আর কিসে হইতে পারে! সকল মর্যাদার শিরোমণি, সকল কৌলীন্যের মুকুট বাদশাহের

ভাই হওয়ার দুর্লভ সম্মানসহ তাঁহাদের মধ্যে পরিপূর্ণ জ্ঞান-গুণ, কর্তব্যপরায়ণতা, গুণ-গ্রাহিতা ও সদাচারের অফুরন্ত ঐশ্বর্য বিদ্যমান। তাঁহারা দয়ার ভাণ্ডার, ন্যায়ের খনি ও ক্ষমতার মহান অধীশ্বর।

খোদাওন্দ আলমের ভাইদের অন্যতম মালীকুল মুলক ও আমীরুল উমারা কুতুব উদ্দিন। তাঁহার চরিত্র ফেরেশতার ন্যায় এবং দরবারের বিশিষ্ট মালীকদের তিনি অন্যতম। তাঁহার মধ্যে সদ্‌গুণ, সদাচার ও দয়ামায়ার অফুরন্ত ঐশ্বর্য রহিয়াছে। জীবনে তিনি কখনও কোন অন্যায় অবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। একটি পিপীলিকাও তাঁহার আচরণে কষ্ট পায় নাই। বাদশাহে ইসলামের তরফ হইতে দান-ধ্যান করাই তাঁহার অধিকাংশ সময়ের কাজ। ধর্মের ব্যাপারেও তিনি সকলের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এইজন্যই অসহায়ের সহায় ও অক্ষমের সাহায্যকারী হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই ফেরেশতা সুলভ চরিত্রের অধিকারী মালীকের নিকট হইতে কেহ কখনও কোন অধর্মের কাজ দেখে নাই।

খোদাওন্দ আলমের দ্বিতীয় ভাই মালীকুশশরক ফখরুদ্দৌলত ওয়াদ্দিন, মুইনুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন, ফেরেশতা সিফত মালীক ইব্রাহিম নায়েব বারবেক (আল্লাহ তাঁহাকে রাজ্যের অধীশ্বর করুন)। রাজ্য ও সম্পদের উপর তাঁহার অতুলনীয় ক্ষমতা জাঁহাপনার সদয় দৃষ্টি লাভ করিয়াছে এবং উহা সকলের নিকটেই মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রকট। এইরূপ দয়া লাভের ফলেই তিনি নায়েব বারবেক হইয়া তাঁহার পদমর্যাদাকে বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তিনিই বাদশাহে ইসলামের নিকট সকলের আর্জি পেশ করেন। ইহা যথার্থই জিব্রাইল (আঃ)-এর কাজের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। উহারই অনুকরণে তিনি সকলের কাতর আবেদন শাহান শাহে ইসলামের দরগাহে পৌঁছাইয়া নানাবিধ হুকুম সংগ্রহ করেন। বয়েত—

তিনিও জিব্রাইলের ন্যায় মহৎ কাজে রহিয়াছেন—
এই দুনিয়ার খোদার দরবারে।

এই ফেরেশতা চরিত্র মালীকের আচার-আচরণে কেহ কখনও কোন অধর্মের প্রকাশ দেখিতে পায় নাই।

মালীকদের মধ্যে যাহাদিগকে খোদাওন্দ আলম সম্মানিত করিয়া খান খেতাব, ছত্র ও 'দূরবাস' দান করিয়াছেন এবং নানাবিধ দান-ধ্যানে বিশিষ্ট করিয়া

রাখিয়াছেন, তাঁহার আনুগত্য ও আন্তরিকতা ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে। তাঁহাদের অন্যতম উলুগ কতলুগ খান উজিরে মুমালেক (আল্লাহ তাঁহার মর্যাদা সমুন্নত করুন)। ছয় বৎসর যাবৎ তিনি উজিরে মুমালেকের পদ অলংকৃত করিয়া রাজ্যের সমুদয় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। এই সকল বিষয়ে সুলতান তাঁহাকে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। সুলতান তাঁহাকে সর্ব-প্রকার দয়া-দাক্ষিণ্যে এমনভাবে আপ্যায়িত করিয়াছেন, যাহা আর কোন সুলতানের উজিরের প্রতি করা হয় নাই। দরবারে তাঁহার মর্যাদা ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে। এই খান জাহানের মধ্যে গুণগ্রাহিতা ও কর্তব্য জ্ঞানের এমন মিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, তিনি নিজেকে সুলতানের অতি দীনাতিদীন দাস হিসাবেই মনে করেন। আর সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের এমনই আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তাঁহার ধনজন পরিবার-পরিজনকে সুলতানের জন্য উৎসর্গ করিতে দ্বিধা করিবেন না। তিনি দেওয়ানে উজারত এমন সুচারু-ভাবে পরিচালনা করিতেছেন যে, উহার মাধ্যমে সংগৃহীত সমুদয় সম্পদ যথা-রীতি বয়তুলমালে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আদায়ের ব্যাপারে জোরজবরদস্তির দ্বারা তিনি কাহারও অন্তরেই বিরক্তি উৎপাদন করেন নাই।

মালীকদের মধ্যে দ্বিতীয় যে জন সুলতান ফিরুজ শাহের নিকট হইতে এই প্রকার দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি আমীরুল মোমেনীনের বান্দা তাতার খান বাহাদুর (আল্লাহ তাঁহার শৌর্য বৃদ্ধি করুন)। দরবারের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততায় তিনি অন্যান্য সকল আমীর মালীককে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বাদশাহ আলমপানার দয়াদাক্ষিণ্যে তিনি অতি উচ্চ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সুখেদমত ও সুবিচারের গুণে তিনি অন্য সকল দরবারীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। খান হওয়ার দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্বেও তিনি ধর্মকর্ম, সচ্চরিত্র, হাদীস ফেকাহ্‌র জ্ঞান, সুবিচারের ক্ষমতা, খোশ মেজাজ প্রভৃতি গুণের দ্বারা পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল আমীর মালীকের মধ্যে এক অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে দীনের সহিত মিশাইয়া সুন্দরভাবে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই মহান তাতার খান।

তৃতীয় যে বুজর্গকে সুলতান অত্যধিক দান ধ্যানের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তিনি মালীকুস্‌সাদাত, সদরু সুদুরে জাহান জালাল উদ্দিন কিরমানী (আল্লাহ তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি করুন)। তিনি সৈয়দ বংশীয়, হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও হজরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর। জ্ঞানেগুণে তিনি এই যুগের ইমাম

গাজ্জালী ও ইমাম রাযী তুল্য। খোদাওন্দ আলমের অসীম দয়ায় তিনি সদরে জাহানের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বস্তুত: তাঁহার জ্ঞান ও গুণের জন্য অতীতের সকল কাজীর মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাদশাহে ইসলামও তাঁহাকে শরিয়তের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। সমগ্র রাজ্যের আলেম ও শায়খদের অজিফা ও জায়গীর দানের সম্পূর্ণ দায়িত্বও সুলতান তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার 'দারুভ কাজা'য় এই সকল বিষয়ের বিলি ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

যেহেতু বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহ (আল্লাহ তাঁহার দ্বারা মুসলমানদিগকে উপকৃত করুন) খোদার রসুল হজরত মুহম্মদ মোস্তফা (স:)-এর বংশধরদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা যত্নশীল, সেইজন্য শুধু সদরে জাহানকে নহে, অন্যান্য ফাতেমী সৈয়দদিগকেও প্রচুর দান ধ্যান দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। সৈয়দ খান্দানের প্রতি এই প্রকার ভক্তির জন্যই তিনি খোদাওন্দ জাদা কেওয়াম উদ্দিন তিরমিজী মরহুমকে ছত্র, দূরবাস ও আমীরের পদ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাই সাইফুল মুলক, সৈয়দ বংশের অন্য একজন যোগ্য সন্তান বর্তমানে সুলতানের আমীর শিকার-এর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। হজরত আলী (রাঃ)-এর অন্য এক বংশধর আশরাফুল মুলক বর্তমান বাদশাহে ইসলামের বদৌলতে অত্যন্ত সম্মানিত হইয়াছেন ও নায়েব উকিলেদরের পদে রহিয়াছেন। দিন দিন সুলতানের দয়া দাক্ষিণ্যে তাঁহার সম্মান উত্তারোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সৈয়দ আলাউদ্দিনও একজন বিশিষ্ট দরবারী। তিনিও সুলতানের দানধ্যানে সম্মানিত ও প্রচুর ধনসম্পদে আপ্যায়িত হইয়াছেন। সুলতানের দয়া ও দানে দিল্লী ও অন্যান্য রাজ্যের সৈয়দ বংশীয়েরাও যথেষ্ট সম্মানের সহিত অজিফা ও জায়গীর ভোগ করিতেছেন। ইহার ফলে সৈয়দ বংশীয়রা নতুন জীবন লাভ করিয়া বর্তমান সুলতানের জন্য খোদার দরগাহে অবিরত দোয়ায় নিরত আছেন।

যাহারা সুলতান ফিরুজ শাহের দরবারে পুরাতন খেদমতের ফলে অনেক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন ও বড় বড় মালীকদের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং সুলতান ও রাজ্যের সহায়ক হিসাবে উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারীও হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নেহায়েৎ কম নহে। তাঁহারা সকলেই গুণী ব্যক্তি এবং সুবিচার ও সদাচারের পোষক। দান ধ্যানেও তাঁহাদের তুলনা নাই। খোদাওন্দ আলমের এই সকল পুরাতন বান্দা বর্তমানে সর্বপ্রকার সুখ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিলেও তাঁহাদের আচার-আচরণে কোনপ্রকার অপ্রশংসনীয় কিছু দেখা যায় না।

তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে মালীক ইমাদুল মুলক বশীর সুলতানীর (আল্লাহ তাঁহার মর্যাদা চিরস্থায়ী করুন) কথা বলা যায়। তিনি শৌর্যবীর্য ও দয়া দাক্ষিণে সমান মর্যাদার অধিকারী। ইসলামী সৈন্যদল ও মুসলিম প্রজা-সাধারণেরর খোরাক পোশাকের উৎস 'দেওয়ানে আরজে মুমালেকে'র দপ্তরটি এই প্রকার একজন সর্বগুণান্বিত মালীকের হস্তে ন্যস্ত হওয়ার ফলে তাহা পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ আমি নিজেও দেশের অন্যান লোকেরাও দেখিয়া আসিতেছে যে, দেওয়ানে আরজের মালীক ইমাদুল মুলক সৈন্য ও প্রজাদের ব্যাপারে পিতামাতা অপেক্ষাও অধিকতর দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তিনি সুলতানের প্রাচীন খেদমতগারদের অন্যতম ও অন্তরঙ্গ বলিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে তিনি যে সকল আবেদন সুলতানের খেদমতে পেশ করেন, তাহা কবুল না হইয়া যায় না জাঁহাপনার পুণ্য দৌলতেই বহু যুগ পরে এমন একজন দয়ালু লোক ইমাদুল মুলক হিসাবে জনসাধারণের শাসনভার হাতে লইয়াছেন।

সুলতানের খাস বান্দা ও অন্তরঙ্গ দরবারীদের মধ্যে অন্য একজন মালীক শিকার বেক মিলান সুলতানীও জাঁহাপনার প্রাচীন খেদমতগারদের অন্যতম। তিনিও সুলতানের একান্তভক্ত, অনুরক্ত ও সর্বগুণে গুণবান। দরবারে সুলতানের নৈকট্য লাভের ফলেই তিনি গরীব দুঃখীদের জন্য দান খয়রাতের অধিকাংশ দরখাস্ত সুলতানের নিকট পেশ করিয়া থাকেন। যাহার কোন সহায় নাই, তাহার পক্ষে তিনি কথা বলেন। বাদশাহের প্রবীণ বান্দা ও অন্তরঙ্গ হওয়ার ফলে তাঁহার আবেদন সুলতান মনোযোগ দিয়া শুনেন। বহু লোক তাঁহার সুপারিশে ক্ষমা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ মালীক শিকার বেক ও মিলান সুলতানী দিনে দিনে সুলতানের আরও অন্তরঙ্গ ও অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর লেখক, আমাকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমার সম্পর্কে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা তিনি সুলতানের খেদমতে খুব ভাল ভাবেই বলিয়াছেন। সুলতান মালীক শিকার বেককে বহু লোকজন ও বিরাট জায়গীরের মালীক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সুশাসন ও তাঁহার কর্মচারীদের সুবিচারের ফলে তাঁহার অধীনস্থ প্রজারা খুবই সুখে শান্তিতে সচ্ছল অবস্থায় রহিয়াছে এবং সর্বদা দীন দুনিয়ার মালীক খোদাওন্দ আলমের জন্য নেক দোয়া করিতেছে।

খোদাওন্দ আলমের দরবারের অন্যান্য সম্মানী প্রাচীন খেদমতগার ও খাস বান্দাদের মধ্যে মালীক মোস্তাওকী ইফতেখারুল মুলক নায়েব গুজরাটের

নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি বহু বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত সুলতান ফিরুজ শাহের খেদমত করিয়া আসিতেছেন। কর্তব্য পালন, বিচক্ষণতা, সুবিচার ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি এই যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হয়, সুলতানের দয়া লাভ করিয়া তিনি গুজরাটের নায়েব হইয়াছেন। তাঁহার কর্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও দয়াশীলতার জন্য এমন একটি বিরাট অঞ্চল সুচারুরূপে শাসিত হইতেছে। এই অঞ্চলে সর্বদা বিদ্রোহ ও গোলযোগ লাগিয়া থাকিত ; কিন্তু তাঁহার সুবিচার ও সুবিবেচনার ফলে বর্তমানে তৎসমুদয় দূর হইয়া সর্বত্র এমনভাবে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে যে, উহার অধিক কিছু কল্পনাও করা যায় না। ঐ অঞ্চলের খেরাজ আদায়ের ব্যাপারটিও তিনি এমন ভাবে সুব্যবস্থিত করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ মুদ্রা শাহী খাজনায় নিয়মিত পেঁৗছিতেছে।

সুলতানের দরবারের অন্যান্য সম্মানিত লোকদের মধ্যে মালীক মাহমুদ বেগ অন্যতম। তাঁহাকে শেরখান খেতাব দেওয়া হইয়াছে। সুলতানের নিকট তিনি বহু ধনসম্পদ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। শেরখান সুলতানের প্রবীণ মালীকদের মধ্যে একজন। তাঁহার বয়স নব্বই অতিক্রম করিয়া শতাব্দী পূর্ণ হইবার পথে। তিনি ও তাঁহার পিতা আমীর হিসাবেও খুব সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারা সর্বদাই সুলতান ও তাঁহার রাজ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ রহিয়াছেন। কখনও কোন গোলযোগ বা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন নাই। মালীক ও আমীরদের মধ্যে এই গুণটি একান্তই দুর্লভ এবং ইহার ফলে তাঁহাদের বংশধররা খুবই উপকৃত হইয়াছে। সুলতানের নিকটও এইরূপ অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ থাকার গুণটি একান্ত পছন্দনীয়। কি আশ্চর্য ধরনের লোক তাঁহারা ! সিপাহসালার, আমীর, মালীক ও খান হিসাবে তাঁহার বয়স শত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, অথচ কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন নাই। সর্বদা নিমকহালাল হিসাবে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইয়াছে।

সুলতানের দরবারের অন্য একজন সম্মানিত ব্যক্তি হইলেন জাফর খান। উজারতের পরেই বিশিষ্ট সম্মানের পদ নায়েব উজারত দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করা হইয়াছে। খোদাতালা জাফর খানকে দীনী ও দুনিয়ারী সকল প্রকার গুণ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন। তিনি কোরান শরীফের হাফেজ ; কারী হিসাবেও অতুলনীয়। তিনি নামাজে ও অন্য সময় এমন মধুর কণ্ঠে কোরান-শরীফ পাঠ করেন যে, শ্রোতাদের মন গলিয়া গিয়া দুই চোখ দিয়া পানি পড়িতে থাকে। এইদিক হইতে আমীর মালীক খানদের মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং বীরত্ব, ধৈর্য ও কর্মকুশলতাতেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তি, যাহাদিগকে সুলতান নিজ দান-ধ্যান দ্বারা মর্যাদাশালী করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মালীক আইনুল মূলক মাহরু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাকে মূলতানের কেতাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে। নানাবিধ গুণ ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তিনি। পরিমাণ বোধ ও বিচক্ষণতাও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান এবং জ্ঞানী হিসাবেও তিনি সুপরিচিত, সদাচার ও অমায়িকতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। এইজন্য সুলতান তাহাকে যেভাবে দান-ধ্যান দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, একান্তই যোগ্য পাত্রে অর্পিত হইয়াছে। বংশ-মর্যাদায়ও তিনি বিশিষ্ট এবং দরবারেও তাঁহার স্থান উচ্চে। নায়েব-সুলতানের পদ ছাড়াও সুলতান তাঁহাকে এমনভাবে ধনসম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

দরবারে আরও দুইজন আমীরজাদা রহিয়াছেন। তাঁহাদের বাপদাদারা চেঙ্গিজ খানের বিশিষ্ট আমীর ছিলেন। তাঁহারা সর্বদাই সম্মান ও সুখের জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র ও পৌত্র এই আমীরজাদারাও সুলতানের দরবারে অন্তরঙ্গ ও বিশিষ্ট হিসাবে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পর্কে সুলতানের দয়া-দাক্ষিণ্য অপরিসীম। দিনরাত্রি তাঁহারা দরবারে খেদমতে নিয়োজিত রহিয়াছেন। সুলতানের খাস দরবারেও তাঁহাদের স্থান আছে। বস্তুত: সুলতানের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতার কথা ভাষায় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাইবে না। যেহেতু তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সম্মান ও নেতৃত্বের মধ্যে রহিয়াছেন, সেইজন্য দিন দিন তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই বিশিষ্ট দুইজন আমীরজাদার মধ্যে একজন আমীর কবতখা আমীর মেহমান। মরহুম সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক শাহ তাঁহাকে খুবই সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকে আমীর মেহমান বলিয়া ডাকিতেন। তিনি অনেক-বারই বলিয়াছেন যে, আমীর কবতখা বিশিষ্ট আমীর তমরের পৌত্র। খান শহীদকে তিনিই পরাজিত করেন। সমগ্র মোগলস্তানে তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট আমীরজাদা আর নাই। তিনি মুসলমান হইয়া একান্তভাবে শান্তির পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার যোগ্যতার জন্যই সর্বদা তিনি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কোন সময়ে তাঁহার মধ্যে কোনপ্রকার অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ দেখা যায় নাই। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস খুবই দৃঢ়। অনর্থক তিনি কখনও রক্তপাত করেন নাই। কাজেই তাঁহাকে সম্মানের মধ্যে রাখা খুবই দরকার।

এই বিশিষ্ট আমীরজাদাদের দ্বিতীয় জন হইলেন আমীর আহমদ ইকবাল। তিনি চেঙ্গিজখানী আমীর মালীকদের মধ্যে একান্ত বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত

ছিলেন। তিনিও পুরুষানুক্রমে আমীরের সন্তান। তিনি নিজেও দুর্লভ গুণের অধিকারী এবং সত্যনিষ্ঠা অনুরক্ত ও একান্তভাবে সুলতানের ভক্ত। আমাদের জাঁহাপনা তাঁহাকেও নানাবিধ দান ধ্যান দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। নেতৃত্বের যোগ্যতা তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। এই জন্য সুলতানের নিকট তাঁহার মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দরবারে তাঁহার মর্যাদার কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

এইরূপ কতিপয় বিশিষ্ট লোকের চরিত্র কীর্তি বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য আমার এই যে, সুলতান ফিরুজ শাহের ন্যায় মহান সুলতানের রাজত্বকালে গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া দরবারী, ওয়ালী ও কেতাদারগণও সর্ব গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুবিচার, দয়ামায়া, ধার্মিকতা ও খোদাভীরুতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। কোনপ্রকার দুর্বৃত্ত অসদাচারী ও অন্যায়কারী এই সুলতানের আমলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। এই কারণে বর্তমান রাজত্বের সর্ববিধ কাজ খুব সন্তোষজনকভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। বর্তমান বাদশাহ ও তাঁহার সঙ্গীসাথীরা সেইজন্যই ইতিহাসে উল্লেখিত হইবার মত যোগ্য হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কীর্তিও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের বিজয়বার্তা তথা সসৈন্যে লক্ষণাবতী গমন, বিজয়লাভ ও তথা হইতে প্রচুর সম্পদ ও হস্তী আনা এবং লক্ষণাবতীর শাসকের দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করার বর্ণনা

জাঁহাপনা সুলতান ফিরুজ শাহ তখতে বসিবার কয়েক বৎসরের মধ্যে সুবিচার, দয়া ও ক্ষমতার বলে সকল রাজ্য সুশৃঙ্খল ও সুশাসিত করিয়া তুলিলেন। এমন সময় তাঁহার খেদমতে সংবাদ পৌছিল যে, লক্ষণাবতীকে অন্যায়ভাবে অধিকারকারী ইলিয়াস নিজের অধীনে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী পাইকা ও ধানুকী সৈন্য একত্র করিয়া ত্রিহুতের সীমান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং তথাকার মুসলমান ও জিম্মীদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। লক্ষণাবতী তাহার

অধীনে থাকায় সে নিজ শক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া কিছুটা অহংকারের বশেই এই সীমান্ত অঞ্চলের রায়ত মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে কষ্ট দিতেছে এবং নির্বিচারে গ্রাম ও শহর লুট করিয়া ফিরিতেছে।

এই সংবাদ শুনিবার পর বাদশাহের ইসলামের মধ্যে ধর্ম ও মুসলমানদের জন্য যে সদিচ্ছা বিদ্যমান ছিল, তাহা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। সুলতান তাঁহার সহজাত বিশ্বজয়ী ক্ষমতার বলে উক্ত অঞ্চলের মুসলমানদিগকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই ব্যাপারে তিনি হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) এর চাচাত ভাইয়ের বংশধর আমীরুল মোমেনীনের নিকট হইতে যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাজে লাগাইলেন। ৭৫৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের দশ তারিখে সুলতান এক বিরাট সৈন্যদল সহ দিল্লীর বাহিরে আসিলেন এবং লক্ষণাবতী ও পাণ্ডুয়ার দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি অনবরত পথ চলিয়া অযোধ্যায় পৌঁছিলেন। উক্ত অঞ্চলের সমস্ত রাজা ও রাজপুত্র, যাহারা ইতোপূর্বে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্রোহ ও গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, তাহারা সকলেই নিজ নিজ সৈন্য সহ সুলতানী সৈন্যদলের পিছনে পিছনে লক্ষণাবতী যাইবার জন্য আসিয়া একত্র হইল। এইভাবে সুলতানী সৈন্যদলে প্রচুর লোকের সমাবেশ ঘটিল। সুলতান সসৈন্যে সরযু নদী পার হইলেন। লক্ষণাবতীর শাসক ইলিয়াস সুলতানী সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া সীমান্ত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া ত্রিহুতে ফিরিয়া আসিল। সে ইতোপূর্বে সুলতানী সৈন্য দলের সম্মুখীন হইবার জন্য যেভাবে আস্ফালন করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া পলায়নে তৎপর হইয়া উঠিল। সুলতানী সৈন্য সরযু নদী পার হইয়া খরোসা ও গোরখপুরে পৌঁছিলে ইলিয়াস জেলখানা হইতে পলাতক কয়েদীর ন্যায় ত্রিহুত হইতে পাণ্ডুয়ায় পলায়ন করিল এবং নিজেকে সুরক্ষিত করিবার কাজে ব্যাপৃত হইল।

সুলতানী সৈন্যদল খরোসা ও গোরখপুরে আসিলে তথাকার রাজারা যথাযোগ্য তোহফা ও খেদমত সহ সুলতানী দরবারে আসিয়া ভূমি চুম্বন করিলেন। গোরখপুরের রাজার খুব খ্যাতি ছিল। একসময়ে তিনি অযোধ্যার খেরাজদাতাও ছিলেন। পরে তিনি এবং খরোসার রাজাও গোলযোগে জড়াইয়া পড়িয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। বর্তমান সুলতানের খেদমতে তাঁহারা কয়েকটি হাতী লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ শাহী খেলাত, পোশাক, ছত্র ও সুসজ্জিত ঘোড়া লাভ করিলেন। তাঁহাদের অধীনস্থ আরও বহু রায় ও রানা যথাযোগ্য তোহফা সহ সুলতানী দরবারে আসিয়াছিল। খরোসার রাজাও নানাবিধ তোহফা আনিয়াছিলেন এবং আনুগত্যের চিহ্ন হিসাবে খেলাত ও পোশাক পাইয়াছিলেন।

এইভাবে এই অঞ্চলের সমস্ত রাজা ও রায়গণ সম্পূর্ণভাবে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং পূর্ববর্তী বৎসরগুলির খেরাজ স্বরূপ যে কয়েক লক্ষ তঙ্কা তাহাদের নিকট জমা হইয়াছিল, উহার সমুদয় সুলতানী সৈন্যদলে পৌঁছাইয়া দিলেন। আগামী বৎসরগুলিতে যথা নিয়মে খেরাজ আদায়ের অঙ্গীকার করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে দরবার হইতে তহসিলদারও নিযুক্ত করা হইল। এই সকল রাজা ও রায়রাও নিজ নিজ সৈন্য সহ সুলতানী সৈন্যদলের অনুগমন করিলেন।

সুলতান কয়েক দিন সসৈন্যে রাজাদের এই অঞ্চলে অবস্থান করিলেন। এই অঞ্চলের রাজারাও যতদূর সম্ভব সুলতানের প্রতি আনুগত্য দেখাইলেন এবং নানাভাবে তাঁহার খেদমত করিলেন। ইহার ফলে সুলতান সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ দিলেন যে, সৈন্যদল যেন উক্ত রাজাদের অধীনস্থ কোন অঞ্চল লুট না করে। যদি এই আদেশের পূর্বে কেহ এমন কিছু করিয়া থাকে, তবে তাহা যেন যথাস্থানে ফিরাইয়া দেয়।

ইহার পর সুলতান রাজাদের সৈন্য সহ লক্ষ্ণাবতী ও পাণ্ডুয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইলিয়াস সুলতানের আগমন সংবাদ শুনিয়া পূর্বেই ত্রিহুত হইতে পাণ্ডুয়ায় পৌঁছিয়াছিল। এখন সেখানেও স্থির থাকিতে পারিল না। পাণ্ডুয়ার পার্শ্বেই 'একডালা' নামে একটি দুর্গ আছে; উহার একদিকে নদী ও অন্যদিকে গহীন বন। সে আত্মরক্ষার জন্য সেই দুর্গে প্রবেশ করিল। পাণ্ডুয়া হইতে সকল কর্মঠ স্ত্রী-পুরুষকে এই স্থানে আনিয়া একত্র করিয়া আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হইল। বাদশাহে ইসলামের অধীনস্থ বিরাট সৈন্যদলের ভয়ে তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অধীনস্থ সোয়ারী ও পাইকরাও নিজেদের নিশ্চিত মৃত্যুর কল্পনা করিতে লাগিল। এমনইভাবে একডালা দুর্গে দিন দিন তাহাদের অবস্থা একান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল।

সুলতানী সৈন্যদল গোরখপুর হইতে 'তকত'-এ আসিয়া পৌঁছিল। তকত হইতে ত্রিহুতে আসার পর সেখানকার রাজ-রাজড়ারা সুলতানের দরবারে হাজির হইয়া যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং দরবার হইতে নানাবিধ খেলাত লাভ করিলেন। এই ত্রিহুত অঞ্চলটিও সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া পূর্বের ন্যায় খেরাজ দিতে অঙ্গীকার করিল। সুলতানী সৈন্যদের দ্বারা ত্রিহুত অঞ্চলের কাহারও কোনপ্রকার অনিষ্ট হইল না। দরবার হইতে সেখানে যথারীতি কারকুন ও আমলা নিযুক্ত করা হইল। এইভাবে সুলতান এই অঞ্চলটির শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন।

সুলতানী সৈন্যদল ত্রিহুত হইতে অনবরত চলিয়া পাণ্ডুয়ার দিকে অগ্রসর হইল। ইহার পূর্বে ইলিয়াস তাহার সঙ্গী-সাথীসহ একদিকে নদী ও অন্যদিকে জঙ্গলের মধ্যবর্তী একডালা দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। সে তাহার অনুচরদের সহিত পরামর্শ করিল যে, বর্ষাকাল খুবই নিকটে। এই নিম্নাঞ্চলটি বর্ষার পানিতে সম্পূর্ণ ডুবিয়া যায় এবং সেখানে প্রচুর মশা জন্মায়। কাজেই সুলতানী সৈন্যদল যেমন এখানে বেশীদিন অবস্থান করিতে পারিবে না, তেমনই সৈন্য-দলের ঘোড়াগুলিও মশার কামড় সহ্য করিতে সক্ষম হইবে না। সুলতানী সৈন্য দল এখানে পৌছিলেই বর্ষা আরম্ভ হইবে এবং খোদাওন্দ আলম অসুবিধায় পড়িয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া ইলিয়াস এক-ডালা দুর্গকে নিজের অনুচরদের একমাত্র আশ্রয় স্থল বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিল।

ইসলামী সৈন্যদল পাণ্ডুয়ায় পৌছিলে সুলতান আদেশ দিলেন যে, যাহারা তখনও পাণ্ডুয়ায় বিদ্যমান ছিল, তাহাদের প্রতি যেন কোনপ্রকার দুর্ব্যবহার না করা হয়; ইলিয়াসের ঘর বাড়ী ও বাগবাগিচা যেন জ্বালাইয়া দেওয়া না হয়। এবং সর্বোপরি পাণ্ডুয়ায় যেন কাহারও প্রতি কোনপ্রকার অসম্মানজনক কিছু করা না হয়। এই আদেশ অনুসারে কিছু সংখ্যক সৈন্য পাণ্ডুয়া গমন করিল এবং সাধারণ লোককে বাদ দিয়া ইলিয়াসের গৃহে যে কয়জন বিদ্রোহী লুকাইয়া ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ছিনাইয়া লইল। সুলতানী সৈন্যদল একডালা দুর্গের বিপরীত দিকে নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিল এবং পার্শ্ববর্তী সমস্ত মাঠ-ময়দান লোকজনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সুলতান নদী পার হইবার জন্য সৈন্যদলকে 'কংখর' তৈরী করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা 'মেজরাব', পুল ও অন্যান্য উপায়ে নদী পার হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। খোদাওন্দ আলম বলিলেন, যখন নদী পার হইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইবে, তখন একযোগে সকল সৈন্যকে নদী অতিক্রম করিয়া দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ দিব এবং তাহারা একযোগে হাতীর সাহায্যে দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা তছনছ করিয়া দিবে।

লোকজন যথা আদেশ কংখর তৈরী এবং অতিশীঘ্র নদী পার হইবার বন্দো-বস্ত করায় নিযুক্ত হইবার পর সুলতানের মনে হইল যে, সুলতানী সৈন্য যদি এক-ডালা দুর্গ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইলে দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে অনেকেরই প্রাণহানি ঘটিবে। ইলিয়াসের অবাধ্যতায় নির্দোষ বহু মুসলমান প্রাণ হারাইবে এবং মুসলমানের সব পাইকা, ধানুকী ও অন্যান্য বিধর্মী সৈন্যদের হাতে অসম্মানিত হইবে। চতুর্দিকে বেপরোয়া রক্তপাত ঘটিবে এবং বহু সৈয়দ, আলেম, সুফী,

দরবেশ, তালেব এলেম, গরীব ও মুসাফির ধ্বংস হইয়া যাইবে। নির্দোষ, গরীব দুঃখী ও চাষীদের ধন-সম্পদ সৈন্যরা লুটিয়া লইবে। অথচ বিদ্রোহীরা যেভাবে নদী ও জঙ্গলের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছে, সুলতানী হস্তীদলের ব্যাপক আক্রমণ ছাড়া তাহা নষ্ট করা সম্ভব নহে।

ইমানের দৃঢ়তার ফলেই এইরূপ একটি ধারণা ক্রমশ সুলতানকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। তিনি নামাজের পর খোদার দরগাহে কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন; যাহাতে তিনি ইলিয়াসের মনে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সুলতানী সৈন্যদলের সম্মুখীন হইবার ইচ্ছা জাগরিত করিয়া দেন। ফজরের নামাজের সময় সুলতানের এইরূপ কান্নাকাটি খোদার দরগাহে কবুল হইল।

ইতোমধ্যে সুলতান একদিন সৈন্যদলকে হুকুম দিলেন যে, তাহারা যেন বর্তমান শিবিরের স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র শিবির নির্মাণ করে। কারণ এই স্থানটি কয়েক দিনের অবস্থানের ফলে দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ আদেশ পাইয়া সৈন্যদল খুবই সন্তুষ্ট হইল। বাজারী ও সাধারণ লোকজন হৈ-হুল্লোড় করিয়া কংখর হইতে বাহিরে আসিয়া শিবিরের জন্য নির্বাচিত নতুন স্থানের দিকে রওয়ানা হইল। আশেপাশের জনসাধারণের হৈচৈ শুনিয়া ইলিয়াস মনে করিল যে, সুলতান সৈন্যদল সহ শহরে ফিরিয়া গিয়াছেন। যেহেতু খোদার গজব তাহার উপর পড়িয়াছিল, সেইজন্য সে সুলতানের ফিরিয়া যাইবার সংবাদটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল না এবং নিজের খামখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া হাতী-ঘোড়া ও ধন-জন সহ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে তাহারা ময়দানে হাতী-ঘোড়া সহ কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একান্তই বেহুদা খেয়ালের বশবর্তী হইয়া উহারা বিরাট সুলতানী সৈন্যদলের সম্মুখীন হইতে আশা করিল এবং যুদ্ধ শুরু করিয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের ময়দানে উহাদের দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

বাদশাহে ইসলাম এইভাবে দোষীরা নির্দোষ হইতে পৃথক হইয়া বাহিরে আসায় ও ময়দানে সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ায় খোদার দরগাহে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করিলেন, এবং খোদার প্রশংসা করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার উপর সোয়ার হইলেন। ইসলামী সৈন্যদলের বীর পুরুষদের দৃষ্টি যখন এই কাপুরুষদের উপর পড়িল, তাহারা খুবই আনন্দিত হইলেন। তাহাদের মনে হইল, মাঠে ময়দানে 'গুঞ্জন' ও 'কুতাই' ফুল তুলিতে যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহা অপেক্ষাও সহজে তাহারা এই বিদ্রোহীদিগকে নিজেদের ঘোড়ার পায়ের নীচে ফেলিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিবেন। ইলিয়াসকে

বিধ্বস্ত করিতে তাহাদের কোনপ্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। তদুপরি তাহারা নিজেদের পক্ষের সত্য ও ন্যায় এবং শত্রুদের পক্ষের মিথ্যা ও অন্যায়ের কথা খুব ভালভাবেই জানিতেন। এই কারণে খোদার রহমত যে, তাহাদের উপর বর্ষিত হইবে, ইহাও তাহারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন।

ইহার ফলে ঐসকল দুর্ভাগা সুলতানী সৈন্যদলের সম্মুখে কিছুদূর অগ্রসর হইলে শাহী ফরমান জারী হইল যে, উহাদের উপর সম্ভাব্য সকল দিক হইতে যেন আক্রমণ করা হয়। এই আদেশ শুনিবামাত্র মুসলিম সৈন্যরা আজদাহার ন্যায় ফুসিয়া উঠিয়া 'নারায়ে তকবীর' ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল এবং তরবারি কোষমুক্ত করিয়া মার মার শব্দে উহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রথম হামলাতেই ইলিয়াস তাহার লোকজনসহ পরাজয় বরণ করিল। সুলতানী সৈন্যরা উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। বহু লোক হতাহত হইল; বিদ্রোহীরা তাহাদের পাপ অনুসারে সমুচিত শাস্তিই পাইল। লক্ষ্মণাবতীর শাসক ইলিয়াসের ছত্র, দূরবাস ও পতাকা সহ চৌচল্লিশটি হাতী সুলতানী সৈন্যদলের হাতে পড়িল।

ইলিয়াস ধনদৌলত ও বাদশাহীর আশা ত্যাগ করিয়া এমনভাবে পলায়নপর হইল যে, তাহার অগ্র পশ্চাৎ ও দক্ষিণ বামের কোন জ্ঞান রহিল না। ইসলামী সৈন্যদলের গাজীরা ইলিয়াসের সঙ্গী সাথীদিগকে এমনভাবে কচুকাটা করিল, যেমনভাবে শস্য পাকিলে চাষীরা কাস্তের সাহায্যে কাটিয়া থাকে। ইসলামী সৈন্যদলের গাজীদের ভয় ও তাহাদের তরবারির চাকচিক্য এই সকল ভীরুকে এমনই হতভম্ব করিয়া ফেলিয়াছিল যে, উহারাও ডাহিন বাম ও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারিল না। উহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাজীদের হাতে নিজেদেরকে নিহত করাইল এবং দোজখের দারোগার নিকট নিজেদের আত্মাগুলিকে জমা করাইতে তৎপর হইল।

বাঙালী পাইকা সৈন্য, যাহারা বহু বৎসর যাবৎ নিজদিগকে বাঙলার শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া ভাবিত এবং ইলিয়াস বাঙালীর সামনে আস্ফালন করিয়া বেড়াইত, ইসলামী সৈন্যদলের সম্মুখে তাহারা একান্তই হাস্যাস্পদ আচরণ করিল। যুদ্ধের ময়দানে তাহারা তীর ও তলোয়ার চালাইবার পরিবর্তে সবকিছু ছাড়িয়া বোকার মত দিশাহারা হইয়া পড়িল এবং সুলতানী সৈন্যদলের গাজীদের তরবারির আঘাতে নিহত হইল। এক প্রহর বেলা যাইতে না যাইতেই উহাদের কর্তিত শবে যুদ্ধের ময়দানে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং চতুর্দিকে স্তূপ দেখা যাইতে লাগিল। ইসলামী সৈন্যদল বিনা আঘাতে বিরাট জয়লাভ করিল।

কাহারও একটি চুল কাটা যাওয়া ব্যতীতই তাহারা প্রচুর গণিমতের মাল সংগ্রহ করিয়া সসম্মানে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে সক্ষম হইল।

সন্ধ্যার সময় এই যুদ্ধ জয়ের সমুদয় কাজ শেষ হইল এবং সর্বত্র উহার সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। তখন খোদাওন্দ আলম আম দরবার ডাকিয়া সমস্ত সৈন্য দলকে যথাস্থানে একত্র হইতে আদেশ দিলেন। লক্ষণাবতীর শাসক ইলিয়াসের পক্ষের যে সকল খান ও আমীর বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছত্র ও দুরবাস সহ এবং চৌচল্লিশটি হাতী ও বহু ধৃত ঘোড়াকে জিনপোষ সহ ও খালি পিঠে সুলতানের সম্মুখে হাজির করা হইল। দর্শকরা এই সকল বিরাট হাতী দেখিয়া খুবই চমৎকৃত হইল। শাহী পীলখানার প্রাচীন মাহুতরা একবাক্যে এইকথা স্বীকার করিল যে, কোন সময়ে কোন যুদ্ধ জয় করিয়া এমন বিরাট বিরাট হাতী দিল্লীতে আনা হয় নাই। সম্মুখে এইরূপ বিরাট হাতীর দল দেখিয়া সুলতান নিজ পার্শ্বস্থ আমীর ও মালীকদিগকে বলিলেন, এই হাতীগুলিই ইলিয়াসকে এমন বিপদের সম্মুখীন করিয়াছে। এই গুলি যেমন তাহার মাথায় বাদশাহীর খেয়াল চাপাইয়াছে, তেমনই দিল্লীর সৈন্যদলের সম্মুখে আসিতে তাহাকে উৎসাহ দিয়াছে। যদি সে এইরূপ বিরাট বিরাট হাতীর অধিকারী না হইত, তবে আন্তরিকতার সহিত সুলতানী দরবারে উপস্থিত হইতে পারিত এবং দিল্লীর খাজানাখানায় যথারীতি খেরাজ ও তোহফা পাঠাইতে তাহার কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু এই প্রকার বিরাট হাতীর দল তাহার হাতে পড়িবার ফলে তাহার মাথায় কুখেয়াল দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। কোন এক জ্ঞানী বাদশাহ বলিয়াছিলেন, হাতী একমাত্র শাহী পীলখানাতেই শোভা পায়; অবশ্য বাদশাহ যদি ইহার যোগ্য হন। অন্যথায় কোন অযোগ্যের হাতে পড়িলে ইহাতে তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিবে এবং ইহার মধ্য দিয়াই সে তাহার ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে।

এই অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর সুলতান হাতীগুলিকে শাহী পীলখানায় এবং ঘোড়াগুলিকে খাস আস্তাবলে দাখিল করিতে আদেশ দিলেন। যে সকল গণ্যমান্য লোক ও আমীর বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে সেনাপতিদের হাতে সোপর্দ করিলেন। এই রাত্রে সুলতানের অধিকাংশ সময় জাগরিত ছিলেন। তিনি দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করিয়া খোদার দরগাহে তাঁহার, অপরিসীম দয়ার জন্য দোয়া করিলেন ও শুকরিয়া জানাইলেন।

পরদিন সমস্ত বিজয়ী সৈন্যদল, সাধারণ পেয়াদা ও সোয়ারী এবং মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর লোক আসিয়া দরবারে ভীড় করিল। তাহারা

সুলতানের নিকট দরখাস্ত করিল যে, তিনি আদেশ দিলে তাহারা একডালা দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইলিয়াস পক্ষীয়দের অবশিষ্ট শক্তিও তছনছ করিয়া তাহাদের বাদশাহী করিবার স্বাদ সম্পূর্ণ মিটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু খোদাওন্দ আলম একডালা আক্রমণের আদেশ দেন নাই। বরং তিনি বলিলেন, যে সকল লোক বিদ্রোহী হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল, যুদ্ধের ময়দানে তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। যে সকল হাতী ইলিয়াসের মাথায় বাদশাহীর স্বপ্ন চাপাইয়া দিয়াছিল, উহারাও সম্পূর্ণভাবে সৈন্যদলের হাতে আসিয়াছে। আল্লাহ্‌তালা আমাদিগকে জয়ী করিয়াছেন। তাঁহার রহমত স্বরূপ বর্ষাকালও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ইচ্ছা এই যে, ইসলামী সৈন্য দল যেভাবে পরিপূর্ণ শান্তি ও অক্ষত অবস্থায় আছে, তেমনই অবস্থায় তাহারা যেন নিজ নিজ গৃহে পৌঁছিতে পারে। এইরূপ অনায়াসে জয়লাভ করিবার পর ইহার অপেক্ষা অধিক কিছু করিবার ইচ্ছা ভাল নহে। এই বলিয়া তিনি সমস্ত লোকজনকে বিদায় দিলেন।

সুলতানী সৈন্যদল বিজয়ীর বেশে রাজধানী দিল্লীর অভিমুখে রওয়ানা হইল। অনবরত চলিয়া তাহারা ত্রিহুত ও জকতের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। এই সময়ে ওয়ালী, কারকুন ও নায়েব নিযুক্ত করা হইল এবং আদেশ দেওয়া হইল যে, ইসলামী লশকরের মধ্যে যাহাদের হাতে বাঙালী কয়েদী আছে, তাহারা এই স্থানে যেন তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দেয়। সে স্থান হইতে বাদশাহী ছত্র সরযূ নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয়ী সৈন্যদল সম্পূর্ণ শান্তির সহিত সরযূ নদী পার হইয়া জাঁকজমক সহ জাফরাবাদে আসিয়া পৌঁছিল। হিন্দুস্তানের যে সকল ওয়ালী, আমীর ও রাজা সুলতানী সৈন্য দলের সহিত লক্ষণাবতী গিয়াছিল, সুলতান এই স্থলে তাহাদিগকে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

সুলতানী সৈন্যদল কোড়া ও মানিকপুর সীমান্তে গঙ্গানদী পার হইবার পর সুলতান উক্ত অঞ্চলদ্বয়ের লোকজনকে প্রচুর দানধ্যান করিলেন। বহু লোক কেতা, খেতাব ও ধন জন লাভ করিল। সুলতান উক্ত অঞ্চলদ্বয়ের সৈয়দ, আলেম ও শায়খদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং গরীব ও ফকিরদিগকে প্রচুর দান খয়রাত দিলেন। সেখান হইতে খোদার অপার অনুগ্রহে সুলতানী ছত্র অনবরত অগ্রসর হইয়া কোল অঞ্চলে পৌঁছিল। উক্ত অঞ্চলের গরীব মারীকদিগকেও যথাযোগ্য দান-খয়রাতে আপ্যায়িত করা হইল। কোলের গন্যমান্য লোক, আমলা ও উহদাদাররা দলে দলে এই বিরাট বিজয়ের জন্য সুলতানকে আভ্যর্থনা জানাইতে আসিল এবং যোগ্য দান ধ্যান ও খেদমত লাভ করিল।

খানজাহান আজম হুমায়ুন মালীক, আমীর, দেওয়ানে উজারতের কর্মচারী, কতোয়াল, শহর শাহনা, সর্দার, কাজী ও শায়খ আলেমদের সহ 'ঝজর' ও 'চান্দোশ' পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া বিজয়ী সুলতানকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং দরবারের ভূমি চুম্বন করিলেন। খোদার অপার অনুগ্রহে সুলতানী ছত্র কবুলপুর গোদাড়া ঘাটে উপস্থিত হইল। আজম হুমায়ুন খানজাহান কবুলপুরে নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী, সোনারূপা এবং উত্তম তাজী ও তাতারী ঘোড়া এত বেশী হাজির করিলেন যে, সমস্ত মাঠময়দান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উহা দেখিয়া দর্শকদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া পড়িল।

৭৫৫ হিজরীর শাবান মাসের ১২ তারিখে শুভক্ষণে সুলতানী ছত্র এমন এক অভাবিত বিজয় ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিল। লক্ষণাবতী ও পাণ্ডুয়া হইতে প্রাপ্ত সকল ঘোড়া ও হাতীকে শাহী কারখানায় পাঠান হইল। লক্ষণাবতীর শাসক ইলিয়াসের আমীর ও দরবারী যে সকল লোক সুলতানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে শহরের সদর রাস্তায় আনা হইল। শহরের আবালবৃদ্ধবণিতা হিন্দু মুসলমান ,বুজর্গ ও বাজারী নির্বিশেষে সকলে লক্ষণাবতী বিজয়ে প্রাপ্ত ধনসম্পদ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। শহরে পূর্ব হইতেই বড় বড় গম্বুজ ও তোরণ তৈরী করিয়া রাখা হইয়াছিল; খোদাওন্দ আলম বিজয় লাভ করিয়া ফিরিবার পর সে সকল স্থান হইতে ধন বিতরণ করা হইল। প্রত্যেক মহল্লায় খানাপিনার বন্দোবস্ত ও গান বাদ্যের ব্যবস্থা করা হইল। বাজারের অলি-গলিতেও নাচ-গানের আসর জমিল।

যেহেতু সর্বশ্রেণীর মানুষ সুলতান ফিরুজ শাহের অনুগত ও শুভাকাঙ্ক্ষী, সেই জন্য সুলতানের রাজধানীতে ফিরিয়া আসায় তাহারা আন্তরিকভাবে সুখী হইল এবং গণিমতের মালের প্রাচুর্য দর্শনে তাহাদের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তাহারা সমবেত কণ্ঠে খোদাওন্দ আলমের জন্য দোয়া ও প্রশংসা করিতে লাগিল। খোদাওন্দ আলমও (আল্লাহ্ তাঁহার রাজ্য ও মর্যাদা চিরস্থায়ী করুক) শহরের সর্বশ্রেণীর লোককে শাহী দান-খয়রাত দ্বারা সম্মানিত করিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, যেন তোড়াভর্তি ধনসম্পদ মসজিদ ও অন্যান্য জলসায় লইয়া গিয়া যোগ্য ফকির মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কারণ তাহারা রাত্রি-দিন সুলতানের বিজয় লাভের জন্য খোদার দরগাহে মোনাজাত করিতেছিল। মহামান্য বাদশাহের বদান্যতায় শহরের আলেম উলামাদের খেদমতে তোহফা, শায়খদের খেদমতে ফাতেহা ও খানকাহগুলিতে নজর-নিয়াজ পাঠান হইল। বাদশাহে ইসলাম এই বিজয়লাভের শুকরিয়া জানাইতে বুজর্গ শায়খদের মাজার

জিয়ারত করিলেন এবং তথায় যোগ্য দান খয়রাত দিলেন। সুলতানী সৈন্যদল অক্ষত অবস্থায় সসম্মানে বিজয় লাভ করিয়া রাজধানীর সর্বশ্রেণীর লোক ও রাজ্যগুলির প্রজাসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল এবং তাহাদের অন্তঃকরণ খুশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

লক্ষণাবতীর শাসক ইলিয়াস নিজের পরাজয় ও সুলতানী সৈন্যদলের জয় লাভের মধ্যেও এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছিল, যাহাতে সে পূর্বাপেক্ষা অধিক অনুগত ও বাধ্য হইয়া উঠিল। পুনরায় তাহার মধ্যে আন্তরিকতা ও সুলতানের প্রতি শুভ কামনা নতুন ভাবে জাগরিত হইল এবং পরিপূর্ণ খেদমত ও তোহফা সহ গণ্যমান্য লোকদিগকে সে সুলতানের দরবারে পাঠাইল। সে পুনরায় আমীর হিসাবে দরবারের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মহামান্য বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের কাছে আমীরুল মোমেনীন আব্বাসী খলীফার নিকট হইতে দুইবার খেলাত, ফরমান ও শাহী সনদ যথা যোগ্য সম্মানের সহিত পৌঁছিবার এবং উহার ফলে খোদাওন্দ আলমের রাজত্বের স্থায়িত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবার বর্ণনা।

খোদাতালা বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহকে সেই আদিকাল হইতেই তাঁহার করুণার ছায়ায় আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সুলতানের (আল্লাহ তাঁহার রাজ্য, সম্পদ ও বংশ-বুনিয়াদকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করুন) ছয় বৎসরকালীন রাজত্বকালে দুইবার আব্বাসী খলীফা আমীরুল মোমেনীনের নিকট হইতে খেলাত, ফরমান ও শাহী সনদ তাঁহার কাছে পৌঁছিয়াছে। ইহার বদৌলতে ধর্ম ও রাজ্যের পালক আমাদের প্রিয় সুলতানের মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আমীরুল মোমেনীনের প্রেরিত খেলাত, ফরমান ও শাহী সনদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান এবং খলীফার প্রেরিত লোকজনকে যথাযোগ্য দানধ্যান দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছেন।

তিনি খোদ খলীফার প্রতিও নানাবিধ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেন আসমান হইতে খোদার রহমতের ন্যায় খলীফার এই ফরমান তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে এবং হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (স:) এর দরগাহ হইতে উহা তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সুলতানও যথেষ্ট তোহফা সহ একটি বিনয় পরিপূর্ণ দরখাস্ত আমীরুল মোমেনীনের খেদমতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বস্তুত: খলীফার প্রেরিত এইরূপ খেলাত ও ফরমানের ফলে জুম্মা, ঈদের নামাজ ও অন্যবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খোদার রসুলের চাচাত ভাই এবং বংশধর আব্বাসী খলীফা কর্তৃক এই ইজ্জত নামাদানের জন্যই বর্তমানে রাজ্যের সর্বত্র খোদার রহমত বর্ষিত হইতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আসমানী বালা-মুসিবত ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব লোপ পাইয়াছে। বাদশাহে ইসলামের ধর্ম পালন ও পুণ্য আচরণের জন্য সর্বশ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী তৎপরতাও রাজ্যের সর্বত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র রাজ্যব্যাপী সর্বপ্রকার লোকের অন্ত:করণ সুলতানের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্র শান্তি ও স্বস্তি দেখা দিয়াছে। বিদ্রোহ, গোলযোগ ও বাদ-বিসংবাদের সকলপ্রকার চিহ্ন লোপ পাইয়াছে। অধিক বসতি, অধিক দালান-কোঠা, অধিক শস্য ও অধিক বাগ-বাগিচার দ্বারা রাজ্যের সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে এই রাজ্য যেন বেহেশতের নমুনা হইয়া উঠিয়াছে; আলহামদুলিল্লাহ্।

দশম পরিচ্ছেদ

বড় বড় বাদশাহ ও সুলতানের বিশিষ্ট নীতি অনুযায়ী শিকারের ব্যাপারে খোদাওন্দ আলম ফিরুজ শাহের আভিশয্যের বর্ণনা

সুলতানী সৈন্যদল কয়েকবার হাঁসী ও সরস্বতী এবং অন্য কয়েকবার পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে যেভাবে শিকারের জন্য গমন করিয়াছে, যদি আমি সেই জাঁকজমক, শিকারের ধারা ও আধিক্যের কথা বর্ণনা করিতে যাই, তাহা হইলে, সোবহানাল্লাহ্, আমাকে 'শিকার নামায়ে ফিরুজশাহী' নামক একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। তদুপরি বিস্তারিতভাবে সব কিছু লিখিতে

গেছে যেই গ্রন্থ কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সর্বদা শিকারে গমন ও শিকারের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আমি বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের সময় যেমন জানিয়াছি, তেমনটি দিল্লীর আর কোন বাদশাহের সময় জানি নাই বা দেখি নাই।

ইতিহাসে সুলতান শামস উদ্দিনের অধিক শিকার গমনের কথা লিখিত আছে। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের শিকারের কথা আমি নিজেই লিখিয়াছি এবং আমার দাদার কাছেও শুনিয়াছি। সুলতান আলাউদ্দিনের শিকারের ঘটনাবলী আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই বাদশাহগণ শীতকালের চারিটি মাস পাখী শিকার করিতেন, ঝুঁটি ওয়ালা ও ঝুঁটিহীন শিকরা পাখী উড়াইতেন এবং কখনও কখনও হিংস্র পশু ও অন্য পশু পাখীও শিকার করিতে যাইতেন। মোট কথা বৎসরে তাঁহারা একবারও শিকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু আলমপানা ফিরুজ শাহ যে কয়বার উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে শিকার করিতে গিয়াছেন, প্রত্যেক বারই জঙ্গলের হিংস্র পশু, নীল গাই, হরিণ ও গাছের পাখী কোন কিছুই তাঁহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। তাঁহার শিকারের পরিমাণ এত বেশী যে, জঙ্গলের পশু ও আকাশের পাখী প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে সুলতানের সৈন্যদল অধিকাংশ সময় সুলতানের শিকারের মাংস খাইয়াই কাল কাটাইতেছে। কসাইরা গরু বকরী জবেহ করিয়া গোশত বিক্রয় করিবার সুবিধা পাইতেছে না।

সুলতানের শিকারের প্রতি এইরূপ নেকনজরের ফলে আমীর শিকারদের মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা অন্য কোন সুলতানের আমলে এই প্রকার উন্নত অবস্থার অধিকারী হইতে পারে নাই। শিকরা পাখী শিকারী, শিকরা পালক ও শিকরাদারদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে এবং এইরূপ সচ্ছলতার ফলে তাহাদের সংখ্যাও বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। রাজধানী দিল্লীর সকল শিকারী শাহী শিকরাখানায় চাকুরী লাভ করিয়াছে এবং অসংখ্য শিকরা বাজের আমদানী হইয়াছে। সুলতানের শিকার সম্পর্কে নিম্নের বয়েতগুলি আবৃত্তি করা হয় :

তাঁহার তীরের সম্মুখে হরিণগুলি মাথা নত করিয়া দেয়
এবং উহার ভয়ে সিংহের বুকের রক্ত পানি হইয়া পড়ে।
তাঁহার বিরাট ধনুকের সম্মুখে আভূমি নত হওয়ার জন্য
'গুথন' বৃক্ষের শাখার ন্যায় ব্যাঘ্রগুলি মাটিতে শুইয়া পড়ে।
শুনিতে পাইলাম, জঙ্গলের সিংহদের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া
আকাশের সিংহও 'বাঁচাও' চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বর্তমান সুলতান ফিরুজ শাহের সময়ে চেঙ্গিজখানি মোগলদের আগমন পথ বন্ধ হইবার বর্ণনা।

হিন্দুস্তান ও সিন্ধুর সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই দেখিতেছেন যে, বর্তমান সুলতান ফিরুজশাহের রাজত্বকালে চেঙ্গিজখানী মোগলদের আগমন পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহারা যেমন রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে লুটতরাজের জন্য আসিতে সাহস করে না, তেমনি রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে দরবারে উপস্থিত হইয়া ছল চাতুরী করিয়া ধনসম্পদ হাতাইয়া লইবারও সুযোগ পায় না। তাহারা দুইবার কিঞ্চিৎ সাহস করিয়াছিল। একবার শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মুসলমান সৈন্যদের আক্রমণে দুর্ভা-গাদের অধিকাংশ লোক নিহত হয়। সুলতান ফিরুজ শাহের উপর খোদা তালার অপার রহমতের বলে মুসলমান সৈন্যরা জয়ী হয় এবং বহু মোগল সৈন্যকে বন্দী করিয়া গলায় দোভালা বাঁধিয়া উটের পিঠে চড়াইয়া রাজধানী দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় লইয়া ঘুরাইয়া বেড়াইত। সুলতানের সৈন্যরা তরবারির আঘাত হইতে যাহারা বাঁচিয়াছিল, উহারা ভয়ে এমনই দিশাহারা হইয়া পড়ে যে, পলা-ইয়া যাইবার পথ পায় না। অনেকে শতদ্রু নদী পার হইবার সময়ও ডুবিয়া মরে।

অন্য একবার মোগলরা গুজরাট আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিয়া চুপে চুপে উক্ত অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহাদের অনেকেই পানির অভাবে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হয় এবং অনেকে মুসলমান সৈন্যদের হাতে পড়িয়া নিহত হয়। অনেকে নিজেদের মালমাত্তাসহ গুজরাটের মুকদ্দিমদের নৈশকালীন অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের এক দশমাংশও নিজেদের সীমান্তে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। খোদাতালা তাঁহার অপার করুণার যে ধারা অনবরত বর্তমান মহামান্য সুলতান ফিরুজ শাহের (আল্লাহ তাঁহার রাজ্য স্থায়ী ও মর্যাদা সমুন্নত করুন) উপর বর্ষণ করিতেছেন, উহার ফলেই যে দিকে সুলতানী সৈন্যদল মুখ ফিরায়, বিজয় ও সাফল্য লাভ করে।

তারিখ-ই-ফিরুজ শাহীর লেখক আমি জিয়া বারানী যখন বর্তমান মহামান্য সুলতান ফিরুজ শাহের সর্ববিধ বিজয় ও সাফল্যের কথা লিখিয়া শেষ করিয়াছি, তখন স্বভাবতঃই এই কথা বলিতে পারি যে, বর্তমান সুলতানের ছয় বৎসরকালীন

রাজত্বে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি। ইনশাল্লাহ্, যদি আমি জীবিত থাকি এবং মৃত্যুর হাত এড়াইয়া আরও কিছুকাল তাঁহার রাজত্বে বসবাস করিতে পারি, তাহা হইলে সুলতান ফিরুজ শাহের যে সকল সুকীর্তি আমি স্বচক্ষে দর্শন করিব তাহাও অন্য আরও কতকগুলি পরিচ্ছেদে লিখিয়া যাইবার চেষ্টা করিব। ঐ সকল বর্ণনাও বর্তমান তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে সংযোজিত হইবে। আরও যদি ইতোমধ্যেই আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও খোদাওন্দ আলমের গুণাবলী ও সুকীর্তি অলিখিত থাকিবে না।

আমি এই ইতিহাস লিখিতে খুবই পরিশ্রম করিয়াছি। খোদাতালার নিকট এই প্রার্থনাই করি, তিনি যেন আমার এই পরিশ্রমের ফলকে বৃথা নষ্ট হইতে না দেন। তিনি কোরান শরীফে বলিয়াছেন,

'অবশ্যই আল্লাহ্‌তালা সদাচারীদের পরিশ্রমের ফল নষ্ট করেন না।'

আলহামদ লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন
ওস্‌সালাতু আলা রসুলিহি মুহম্মদিও ও
আলা আলিহি আজমাঈন।

ভয়ে সুলতানের প্রত্যাবর্তন, মোগলদের সহিত সংঘর্ষ, সুলতানী সৈন্যের জয়লাভ ও সন্ধি স্থাপন, মোগলদের ইসলাম গ্রহণ; মন্দুর ও ঝাবনে সৈন্য প্রেরণ; আলাউদ্দিনের ভীলশা আক্রমণে সাফল্যলাভ, দিল্লীতে আগমন ও সুলতানের অনুগ্রহ প্রার্থনা, আলাউদ্দিনের বিরোধিতার কারণ, তাঁহার দেবগিরি আক্রমণ ও প্রচুর সম্পদলাভ।

সুলতানের গোয়ালিয়রে সৈন্য প্রেরণ, আলাউদ্দিনের দেবগিরি বিজয় সংবাদে সুলতানের অস্থিরতা, আহম্মদ চপের পরামর্শ, ফখর উদ্দিন কুচীর মোসাহেবী, সুলতানের দিল্লী প্রত্যাবর্তন; আলাউদ্দিনের পত্র প্রাপ্তি, সুলতানের উত্তর দান, কোড়ায় ষড়যন্ত্র, আলমাস বেগের নিকট আলাউদ্দিনের পত্র, আলমাস বেগের কোড়ায় গমন, সুলতানের নদীপথে কোড়ার দিকে অগ্রসর হওয়া, আলাউদ্দিনের প্রতারণা, সুলতানের সপারিষদ নিহত হওয়া, আলাউদ্দিনের সিংহাসনে আরোহণ; দিল্লীতে মালিকা জাহানের নির্বুদ্ধিতা, আরকলি খানের বিরাগ, সুলতান আলাউদ্দিনের দিল্লী গমন, মালিকা জাহানের পলায়ন।

সুলতান আলাউদ্দিন মুহম্মদ শাহ খিলজী (৬৯৫ - ৭১৬ হিজরী)

সভাসদদের নাম, সুলতানের দিল্লীর তখতে উপবেশন; কোড়া হইতে আসিবার পথে অকাতরে অর্থ বিতরণ, জালালী মালিকদের সুলতানের পক্ষে আগমন, জালালী সৈন্য দলে ভাঙ্গন ও মালিকা জাহানের মুলতানে পলায়ন, সুলতানের সিরিতে শিবির স্থাপন, সর্বশ্রেণীর লোকের আনুগত্য, সুলতান কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ পদাদি বণ্টন।

সুলতান জালাল উদ্দিনের পুত্রদের ক্ষমতা লোপের জন্য মুলতান আক্রমণ ও জয়লাভ; নুসরত খানের উজারতি লাভ ও জালালী মালীকদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ; মোগলদের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ; জালালী মালীক আমীরদিগকে হত্যা; গুজরাট ও সোমনাথ আক্রমণ, খাম্বায়েতে অভিযান পরিচালনা, প্রত্যাবর্তনের পথে সৈন্যদলে বিদ্রোহ, বিদ্রোহীদের পুত্র-পরিজনের প্রতি অত্যাচার, জাফর খানের সিসস্তান আক্রমণ ও জয় লাভ; মোগলদের দিল্লী আক্রমণের জন্য আগমন, সুলতানের সিরিতে শিবির স্থাপন ও পরামর্শ, মোগলদের সহিত যুদ্ধ ও জয় লাভ, জাফর খানের আত্মবিসর্জন।

সুলতানের আমোদ-প্রমোদ, তাঁহার মগজে বিচিত্র ধ্যান ধারণার জন্ম, ধর্ম প্রচার ও দিগ্বিজয়ের ইচ্ছা, এতদসম্পর্কে আলাউল মুলকের পরামর্শ; রণথাম্বুর আক্রমণ; নুসরত খানের মৃত্যু, সুলতানের রণথাম্বুরে গমন,

কালাতিপাত; মালীক নিযামের চরিত্রগুণ, মালীক কেওয়াম উদ্দিন, সুলতানের নির্দেশে মালীক নিযামকে বিষ প্রদানে হত্যা; রাজ্যে বিশৃঙ্খলা; সুলতানের অসুস্থতা, সভাসদদের দ্বারা সুলতানের নাবালক পুত্রের সিংহাসনে আরোহণ, খিলজী মালীকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, মালীক জালাল উদ্দিনের নেতৃত্ব গ্রহণ, তাঁহার সদলবলে দিল্লীতে প্রবেশ, শিশু সুলতানের সিংহাসনচ্যুতি; সুলতান মুইয উদ্দিনকে হত্যা; তুর্কী আমীর মালীকদের জালাল উদ্দিনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার।

সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরুজশাহী খিলজী (৬৮৯—৬৯৫ হিজরী)

সভাসদদের নাম; সুলতানের সিংহাসনে আরোহণ, কেলুখড়ির প্রাসাদে অবস্থান, খেতাব ও পদাদি বণ্টন; সুলতানের দিল্লী শহরে আগমন, কওশকে লাল প্রাসাদে প্রবেশ; মালীক সজুর বিদ্রোহ, সসৈন্যে দিল্লীর অভিযান, আরকলি খানের সহিত তাহার যুদ্ধ ও পরাজয়বরণ, বিদ্রোহীদের প্রতি সুলতানের ক্ষমা প্রদর্শন, খিলজী আমীরদের মধ্যে তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া, সুলতানের সান্ত্বনা দান; মালীক আলাউদ্দিনকে কোড়ার শাসক পদে নিয়োগ, তথায় পুনরায় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র।

সুলতানের কোমল ব্যবহারে সভাসদদের মধ্যে অসন্তুষ্টির প্রসার, শরাবের মজলিসের কটূক্তি ও তজ্জন্য সুলতানের সহৃদয়তার পরিচয়, মওলানা সিরাজ ও মুতারী পুত্রের ঘটনা, তাহাদের প্রতি সুলতানের সদয় ব্যবহার, সুলতানের সত্যনিষ্ঠা, খোতবাতে 'মুজাহিদ ফিসাবিলিল্লাহ্' খেতাবের প্রস্তাব ও তাহা প্রত্যাখ্যান; সুলতানের গুণগ্রাহিতা, আমীর খসরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন; সুলতানের সারল্য।

সুলতানের দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, গায়ক, গায়িকা ও নর্তকী; তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার আক্ষেপ; সুলতানের বিশিষ্ট মালীকগণ, মালীক কুতুব উদ্দিন আলবী, মালীক আহমদ চপ, মালীক তাজ উদ্দিন কুচী ও তাঁহার ভাই, মালীক নসরত সাবাহ; তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার আক্ষেপ; জালালী আমরের বিশিষ্টতা, সুলতানের প্রতি সাধারণ অকৃতজ্ঞতা ও উহার যোগ্য প্রতিফল।

সৈয়দী মওলার ঘটনা, কাজী জালাল কাশানীর সহিত ষড়যন্ত্র, সৈয়দী মওলার নিহত হওয়া, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ; সুলতানের রণথাম্বুরে অভিযান পরিচালনা, ঝাবন বিজয়, রণ-থাম্বুরের দুর্গ অবরোধ করিবার পর রক্তপাতের

লক্ষণাবতীতে তুগরিলের বিদ্রোহ, আমীন খানের পরাজয়, তুগরিলের পুনরায় জয়লাভ, সুলতানের লক্ষণাবতীতে অভিযান পরিচালনা, তুগরিলের পলায়ন, সুলতানের সোনারগাঁয়ে উপস্থিতি, হাজী নগর সীমান্তে তুগরিলের সাক্ষাৎ লাভ ; তুগরিলের সপারিষদ নিহত হওয়া, লক্ষণাবতীতে সুলতানের শাস্তি প্রদান, তথায় বগরা খানকে শাসক হিসাবে নিয়োগ, বগরা খানের প্রতি সুলতানের উপদেশ ও অছিয়ত ; বিজয়ীর বেশে সুলতানের দিল্লী প্রত্যাবর্তন, লক্ষণাবতীর অবশিষ্ট বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন।

খান শহীদের দিল্লী আগমন, সুলতানের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, মোগলদের সহিত সংঘর্ষে খান শহীদের মৃত্যু, সুলতানের শোকাতুর অবস্থা : কায় খসরুর মুলতান গমন ; বলবনী রাজত্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, আলাউদ্দিন কশলী খান, ইমাদুল মুলক, ফখর উদ্দিন কতোয়াল, মালীক আমীর আলী, বলবনী রাজ্যের শেষ অবস্থা, বগরা খানের দিল্লী আগমন, সুলতানের উপদেশ, বগরা খানের লক্ষণাবতী প্রত্যাবর্তন, কায় খসরুকে সুলতানের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ, সুলতানের পরলোক গমন ; কায়কোবাদের সিংহাসনে আরোহণ, সুলতানের জন্য শোক পালন ; তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার আক্ষেপ।

সুলতান মুইয উদ্দিন কায়কোবাদ (৬৮৬—৬৮৯ হিজরী)

সভাসদদের নাম ; সুলতানের স্বভাবগত পরিবর্তন, রাজ্যে আমোদ-প্রমোদের প্রকোপ ; কেলুখড়িতে প্রাসাদ নির্মাণ, প্রমোদের আতিশয্য ; মালীক গিয়াস উদ্দিনের আধিপত্য বিস্তার, কায়খসরুকে হত্যা, খাজা খতিরের শাস্তি, নতুন মুসলমান সর্দারদের হত্যা কাণ্ড ; মালীক নিযামের অত্যাচার, তাহার প্রতি মালীকুল উমারা কতোয়ালের উপদেশ ; খিলজীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ; লক্ষণাবতীতে বগরা খানের স্বাধীনতা ঘোষণা ; পুত্রের উদ্দেশ্যে পিতার উপদেশ প্রেরণ, পিতা পুত্রের মিলনের আয়োজন, সরযূ নদীর তীরে উভয়ের সাক্ষাৎ ; পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ দান ; সুলতান নাসির উদ্দিনের লক্ষণাবতী প্রত্যাবর্তন।

সুলতান মুইয উদ্দিনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে আমোদ-প্রমোদের আতিশয্য, এক অতুলনীয় সুন্দরীর আগমন, সুলতানের শরাব ও নৃত্যগীতে আত্মসমর্পণ ; উল্লাস ও আনন্দের মধ্যে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন ; তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার আক্ষেপ, কুব্বাতুৎ-তারিখ ; প্রজাদের আমোদ-প্রমোদে

তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর
বিস্তারিত সূচী

ভূমিকা

হামদ-নাত ও দরুদ ; চারি খলীফার বিবরণ ; ইতিহাস পাঠকের পরিচয়, ইতিহাস পাঠের উপকারিতা, ঐতিহাসিকের দায়িত্ব, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ, ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠা, ইতিহাসের প্রতি অবহেলা ; তারিখ ই-ফিরুজশাহী রচনার পরিকল্পনা, তাবাকাতে নাসিরী, ইহার পরবর্তী নব্বই বৎসরের ইতিহাস, বর্তমান ইতিহাসের বিষয়সূচী, বর্তমান ইতিহাস রচনার সমাপ্তি তারিখ ।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন (৬৬৪—৬৮৬ হিজরী)

সভাসদদের নাম ; সুলতানের পূর্বাবস্থা, সুলতান শামস উদ্দিন ও তাঁহার পুত্রগণ, চল্লিশ গোলাম ; সিংহাসন আরোহণের পরবর্তী জাঁকজমকের প্রতিষ্ঠা, প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার ; ফখর বাউনী, রাজকার্যে নীচ জাতির লোক নিয়োগে অনীহা, জামাল মারজুক ; মোবারক গজনবীর বক্তব্য, ধর্মপালনে বাদশাহের কর্তব্য ; সুলতানের যোগ্য লোক নিয়োগ, ন্যায়বিচার, লস্কর ও লোকজনের প্রতি দয়া ; ব্যক্তিগত চরিত্র, শৃঙ্খলা স্থাপনে কঠোরতা, হত্যাকাণ্ড ; ইতিহাসের প্রতি অবহেলা ; সুলতানের আর্থিক সঙ্গতি, রাজ্যজয়ে অনিচ্ছার কারণ ; মোগল আক্রমণের আশংকা ; হিন্দুস্তান শাসনে হাত-ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা, বাঙলা হইতে হাতী প্রেরণ ; সুলতানের শিকার গমন, হালাকু খানের মন্তব্য ; মেউদের বিনাশ সাধন, দোয়াবে দুষ্কৃতিকারীদের উচ্ছেদ, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা বিধান, জালালীতে কেল্লা নির্মাণ, কাথিয়াড়ে দুষ্কৃতির মূলোচ্ছেদ ; জোধ পাহাড়ে অভিযান, অভিযান পরিচালনায় সাধারণ গোপনীয়তা রক্ষা ; সুলতানের লাহোর গমন, কেতাদারদের নিষ্ক্রিয়তা, তৎসম্পর্কে সুলতানের নির্দেশ, কেতাদারদের প্রতিক্রিয়া ; শের খানের মৃত্যু ; খানশহীদের ছত্রলাভ ; মুহম্মদ নামের ব্যাপ্তি ; খান শহীদের চরিত্রগুণ ; খান শহীদের প্রতি সুলতানের অছিয়ত ; বগরা খানকে সামানায় প্রেরণ ; বিপাশা অঞ্চলে মোগলদের সম্মুখে প্রতিরোধ গঠন।

ত্তিহৃপথে আতক খানের বিদ্রোহ, সুলতানকে হত্যার চেষ্টা, আতক খানের মৃত্যু, সুলতানের রণথাম্বুর উপস্থিতি ; মালীক ওমর ও মঙ্গুখানের বিদ্রোহ ; দিল্লীতে হাজী মওলার বিদ্রোহ, আমীর কুহ কর্তৃক বিদ্রোহ দমন ; এই সকল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান ; রণথাম্বুর বিজয় ; উলুগ খানের মৃত্যু।

বিদ্রোহের কারণ দূর করিবার প্রচেষ্টা, সম্পদ আহরণ, চর নিয়োগ, মাদক দ্রব্য ও জুয়া নিষিদ্ধকরণ, মালীক আমীরদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি, খেরাজ আদায়ে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ ; এতদ্বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ে কাজী মুগিসের পরামর্শ, সুলতানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা, মওলানা শামস উদ্দিন তুর্কের পুস্তিকা ; সুলতানের চিতোর আক্রমণ, মালীক জুনার অরণ্যকুল অভিযান ; মোগলদের দিল্লী আক্রমণের প্রস্তুতি, সিরির চতুর্দিকে পরিখা খনন, মোগলদের সহিত খণ্ড যুদ্ধ, মোগলদের প্রত্যাবর্তন, মোগলদের আগমন পথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ়করণ।

সৈন্যদল সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও তৎসম্পর্কীয় শাস্তির ব্যবস্থা, বাজারদর স্থিতিশীল করিবার পদ্ধতি, বাজারীদের প্রতি জবরদস্তি, সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মোগলদের বারংবার পরাজয় বরণ, এতদ্বিষয়ে গাজী মালীকের কৃতিত্ব, সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সুশাসন, রাজ্যের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি, এতদ্বিষয়ে সুলতানী প্রচেষ্টার অলৌকিকত্ব ; দেবগিরিতে অভিযান প্রেরণ, অরণ্যকুল অভিযানে মালীক নায়েব, দেবগিরিতে অবস্থান, অরণ্যকুল দুর্গ অবরোধ ও বিজয় ; শায়খ নিজাম উদ্দিনের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধাবোধ ; চোল সমুদ্র ও মেবার বিজয় ; ধনসম্পদের প্রাচুর্য, সুলতানের মেজাজের পরিবর্তন, নতুন মুসলমান আমীরদের হত্যাকাণ্ড, প্রবাহতী ও বুধদের বিনাশ সাধন।

সুলতানের মালীক আমীরগণের দক্ষতা ও মূর্খতা ; সুলতানের চরিত্র ও গুণাবলী ; সাফল্যের দশটি দিক ; শায়খদের প্রভাব, শায়খ নিজাম উদ্দিন, শায়খ আলাউদ্দিন, শায়খ রুকন উদ্দিন, সৈয়দ তাজউদ্দিন, সৈয়দ রুকন উদ্দিন, অন্যান্য সৈয়দ ও সৈয়দজাদাগণ, হামিদ উদ্দিন মুলতানী, বিশিষ্ট আলেমগণ, ওয়ায়েজ বা ধর্মীয় বক্তাগণ ; সুলতানের সভাসদগণ, কবি আমীর খসরু, কবি আমীর হাসান সঞ্জরী, অন্যান্য কবিগণ ; ইতিহাসবিদ্, আমীর আরসালান কেলাহী, কবির উদ্দিন, চিকিৎসাবিদ্ বদর উদ্দিন দামেশকী, সদর উদ্দিন তবীব, অন্যান্য চিকিৎসকগণ ; জ্যোতিষীগণ, মওলানা

শরফ উদ্দিন মুতরিয ; গণক ও হস্তরেখা বিশারদগণ ; কারী ও গজল খাগণ ; বাদকগণ ; শিল্পীগণ ; জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি সুলতানের অবহেলা।

আলাই সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণসমূহ, সুলতানের দুরারোগ্য ব্যাধি, গুজরাটে বিক্ষোভ, সুলতানের পরলোক গমন ; এই প্রসঙ্গে কায় খসরুর বক্তব্য ; সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্রের সিংহাসনে আরোহণ মালীক নায়েবের অত্যাচার, সুলতান পুত্রদিগকে অন্ধ করিবার প্রচেষ্টা, আলাই নিয়ম কানুন পূর্ববৎ বহাল রাখা, শাহী মহলে প্রতিক্রিয়া, গোলামদের হাতে মালীক নায়েবের নিহত হওয়া, তৎস্থলে মোবারক খানের অভিভাবক নিযুক্ত, পরে সকলের সম্মতিক্রমে কুতুব উদ্দিন উপাধিধারণ ও সিংহাসনে আরোহণ, গোলামদের নিহত হওয়া ; আলাই পরিবারের দুরবস্থা সম্পর্কে শায়খ বশীর দেওয়ানার মন্তব্য।

সুলতান শহীদ কুতুব উদ-দুনিয়া ওদদিন মোবারক শাহ (৭১৬—৭২০ হিজরী)

সভাসদগণ ; সুলতানের সিংহাসনে উপবেশন ; পদাদি ও দায়িত্ব বণ্টনে নির্বুদ্ধিতা, গোলামজাদার প্রতি আসক্তি ; আলাই নিয়ম কানুনের পরিবর্তন সাধন, মানুষের মধ্যে স্বস্তির ভাব, আমোদ-প্রমোদের প্রাচুর্য ; সুলতান বলবন ও সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনের তুলনা, কুতুব উদ্দিনের শাসনে তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া ; গুজরাটের বিদ্রোহ দমন ; তথায় জাফর খানের সুশাসন ; সুলতানের দেবগিরি অভিযান ও মারাঠা অঞ্চল অধিকার, খসরু খানকে মালাবার অভিযানে প্রেরণ, খসরু খানের ষড়যন্ত্র ; সুলতানের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে মালীক আসাদের ষড়যন্ত্র, শাদীকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ।

শায়খ নিজাম উদ্দিনের প্রতি সুলতানের বিরূপ মনোভাব, তাঁহার চারিত্রিক পরিবর্তন, জাফর খান ও মালীক শাহীনকে হত্যা, দরবারে অশ্লীলতা ; হিশাম উদ্দিনের গুজরাট গমন ও বিদ্রোহ ; দেবগিরিতে মালীক এক লাখীর বিদ্রোহ ; ওহিদ উদ্দিন কোরায়শীর নায়েব উজির হওয়া ; খসরু খানের মালাবারে অবস্থান ও বিদ্রোহ ঘোষণার ইচ্ছা, আলাই মালীকদের চাপে তাহার দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন, মালীকদের প্রতি সুলতানের দুর্ব্যবহার।

খসরু খানের আধিপত্য বিস্তার, তাহার জঘন্য প্রতারণার প্রস্তুতি, বাহা উদ্দিনের বন্ধুত্বলাভ, সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র, কাজী জিয়া উদ্দিনের সতর্কীকরণ, সুলতানের উদাসীনতা ও নিহত হওয়া ; শাহীমহলে

অনাচার, খসরু খানের সিংহাসনে আরোহণ, পদাদি বণ্টন, আলাই ও কুতুবী-দের বিনাশ সাধন ; গাজী মালীকের প্রতিক্রিয়া, দিল্লীর অধিবাসীদের বিচিত্র মনোভাব , মালীক জুনার দেবপালপুর গমন, সুফী খানের দেবপাল পুর অভিযান, গাজী মালীকের নিকট পরাজয়বরণ ; গাজী মালীকের দিল্লী অভিযান, খসরু খানের সৈন্যদলে ভাঙ্গন, গাজী মালীকের সহিত যুদ্ধে পরাজয় ; খসরু খানের পলায়ন ও নিহত হওয়া ; সর্ব সম্মতিক্রমে গাজী মালীকের সিংহাসনে আরোহণ।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ (৭২০—৭২৫ হিজরী)

সভাষদগণ ; সুলতানের দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন, আলাই ও কুতুবী আমীর মালীকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শৃঙ্খলা স্থাপনে মধ্য পন্থা অবলম্বন ; মুহম্মদ শাহকে ছত্র দান, অন্যান্য খেতাব ও পদাদি বন্টন, খেরাজ আদায় সম্পর্কে সুব্যবস্থা গ্রহণ ; শাহী খাজানাখানার জন্য সম্পদ সংগ্রহ, দান ধ্যানে সুবিবেচনা, সর্বশ্রেণীর প্রজার কল্যাণ কামনা ; কুলোকদের মধ্যে সুলতানের নিন্দাচর্চ্চা ; জায়গীর ও অজিফার ব্যাপারে সুবিচার, তলব আদায়ে সহজ পন্থা ; সুলতানের অন্যান্য গুণাবলী, ধার্মিকতা, বীরত্ব।

মুহম্মদ শাহের অরণ্যকুল অভিযান, দুর্গ অবরোধ, সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা, মুহম্মদ শাহের দেবগিরি প্রত্যাবর্তন ; পুনরায় অরণ্যকুল অভিযান, দুর্গজয় ও জাজনগর আক্রমণ ; মোগলদের সহিত সংঘর্ষ ও বিজয় ; সুলতানের লক্ষণাবতী অভিযান, লক্ষণাবতী ও সোনারগাঁয়ের বশ্যতা স্বীকার ; সুলতানের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন কালে আফগানপুরের নব নির্মিত মহলে অবতরণ ও দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ।

সুলতান মুহম্মদ শাহ ইবনে তুগলক শাহ (৭২৫—৭৫২ হিজরী)

সভাসদগণ ; সুলতানের তুগলকাবাদে সিংহাসনে আরোহণ, জাঁকজমকের সহিত দিল্লীতে আগমন ; সুলতানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাহসিকতা, তাঁহার চরিত্রে পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর সমাবেশ, দানশীলতা, সূক্ষ্ম বোধ শক্তি, অভিনব রীতিনীতি আবিষ্কারের নেশা, বাগ্মিতা, রচনাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, দর্শন শাস্ত্র জ্ঞান, বীরত্ব, যুক্তি নিষ্ঠার ফলে চারিত্রিক কঠোরতা।

খেরাজ আদায়ে সাফল্য, সুশৃঙ্খল শাসন, রাজকোষের সমৃদ্ধি, সুলতানের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা ও নির্দেশাবলী, প্রজাদের অক্ষমতা, বিশৃঙ্খলার

সূত্রপাত, সুলতানের ক্রমাগত কঠোরতা ও শাস্তিদান ; সুলতানের বিচিত্র নির্দেশসমূহ—অতিরিক্ত খেরাজ, দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, তামার মুদ্রা প্রবর্তন, ইরাক ও খোরাসান বিজয়ের আশা ; সৈন্যদলের অব্যবস্থা, ফরাজল পাহাড় বিজয়ের ব্যর্থ চেষ্টা ।

মুলতানে বিদ্রোহ, সুলতানের বিজয় লাভ ; দোয়াব ও বরণ অঞ্চল লুণ্ঠন, বাঙলায় বিদ্রোহ ও দিল্লীর শাসন অস্বীকার ; কনৌজ হইতে দলমু পর্যন্ত লুণ্ঠন ; মালাবারে বিদ্রোহ, সুলতানের তথায় সৈন্য পরিচালনা ; দিল্লীতে দুর্ভিক্ষ ; সুলতানের তেলেঙ্গানা অভিযান ; মহামারীতে আক্রান্ত হওয়া, অসুস্থ অবস্থায় দেবগিরি হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন ; দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ; মুলতানে শাহ আফগানের বিদ্রোহ, সুলতানের তথায় গমন ; মখদুমায়ে জাহানের মৃত্যু ; শাহ আফগানের বশ্যতা স্বীকার, সুলতানের দিল্লী প্রত্যাবর্তন ; দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থা ; সুলতানের সামানায় সৈন্য পরিচালনা ; অরণ্যকুল ও কম্পালার দিল্লীর শাসন অস্বীকার ; দুর্ভিক্ষের ফলে দিল্লীর শোচনীয় অবস্থা, সুলতানী প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, লোকজনের গ্রামাঞ্চলে গমন, সুলতানের সরগ দোয়ারীতে গমন ও অবস্থান, আইনুল মুলকের সহিত মনোমালিন্য সৃষ্টি ; কোড়ায় নেজাম মাইনের অরাজকতা ; বদরে শিহাব সুলতানীর গোলযোগ ; আলীশার বিদ্রোহ ; আইনুল মুলকের বিদ্রোহ, বিদ্রোহ দমনে সুলতানের সৈন্য পরিচালনা, বিজয় লাভের পর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন ।

আব্বাসী খলীফার অনুমতি প্রার্থনা, হাজী সাইদ সরসরীর দিল্লীতে আগমন ; খলীফার প্রতি সুলতানের আনুগত্য, মালীক কবীর, আমীরুল মোমেনীনের নামে বয়েত গ্রহণ, ভক্তি ও কঠোরতা ; শাস্তিদানের জন্য দপ্তর প্রতিষ্ঠা ; কৃষি সম্পর্কীয় দেওয়ান, অনাবাদী জমি চাষের ব্যর্থতা ; মোগলদের প্রতি অযাচিত দান ধ্যান ; উসলুব বা রীতি নীতির প্রবর্তন ; শাস্তি দানের মাত্রাধিক্য ; দেবগিরির শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ; আজিজ হেমারের ধারা ও মালোয়ায় গমন, আমীর শতীদিগকে হত্যা, গুজরাট ও দেবগিরিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ; অযোগ্য ও হীনচেতাদের হাতে ক্ষমতা দান ; ধোই ও বরোদার আমীরদের বিদ্রোহ ; সুলতানের গুজরাটে সৈন্য পরিচালনা ; সুলতানপুরে অবস্থান, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার সহিত পরামর্শ, আবু পাহাড়ে গমন, ধোই ও বরোদার বিদ্রোহ দমন ; সুলতানের সসৈন্যে ভরোচ গমন, দেবগিরির আমীর শতীদিগকে ভরোচে আহ্বান,

পথে তাহাদের বিদ্রোহ, দেবগিরিতে গোলযোগের সৃষ্টি, সুলতানের দেবগিরি গমন ও বিদ্রোহ দমন ; গুজরাটে তগীর বিদ্রোহ, সুলতানের তথায় অভিযান পরিচালনা, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার সুলতানের খেদমতে গমন, কন্যায়েতে তগীর সহিত মালীক ইউসুফের সংঘর্ষ, সুলতানের সসৈন্যে তগীর পশ্চাদ্ধাবন, আসাওল হইয়া নহরওয়ালে গমন ও অবস্থান ; দেবগিরিতে হাসান কাঙ্কুর বিদ্রোহ, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার সহিত সুলতানের পরামর্শ, সুলতানের পর্যায়ক্রমে মন্দল, তিরী ও কর্নালে অবস্থান ; তগীর খাট্টায় পলায়ন, সুলতানের কন্দলে গমন, তথায় দিল্লী হইতে সভাসদ ও হারেমের আগমন ; সুলতানের খাট্টার দিকে সৈন্য পরিচালনা, পথে রোগাক্রান্ত হওয়া ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলক (৭৫২—৭৫৮ হিজরী : আংশিক)

সভাসদগণ ; সুলতানের সিংহাসন আরোহণের তারিখ ; ছয় বৎসর কালীন রাজত্বের বিষয়সূচী ; সুলতান মুহম্মদ কর্তৃক তিন জনের মধ্যে এক জনকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ইঙ্গিত, তন্মধ্যে ফিরুজ শাহের বিশিষ্টতা ও যোগ্যতা ; সুলতান মুহম্মদের মৃত্যুর পর খাট্টা সীমান্তে সৈন্যদলের দুরবস্থা, মোগল ও খাট্টাবাসীদের অত্যাচার, সিংহাসনে আরোহণের জন্য ফিরুজ শাহকে সকলের অনুরোধ, তাঁহার সম্মতিদান ও সৈন্যদলে শৃঙ্খলা স্থাপন, সিসস্তানে অবস্থান ও দানধ্যান করা, তথা হইতে ভকর ও উচ্ছ হইয়া দিল্লীর দিকে গমন ; দিল্লীতে আহম্মদ আয়াযের বিদ্রোহ, উক্ত সংবাদ লাভে সৈন্যদলের উষ্মা ও সুলতানের নিরুদ্বেগ স্থৈর্য ; কিছুদিন দেবপাল পুরে অবস্থান, দিল্লী গমনের পথে ফতেহাবাদে উপস্থিতি, দিল্লীর আমীর মালীকদের সুলতানের দরবারে আগমন, আহম্মদ আয়ায পক্ষীয়দের সুলতানের পক্ষে যোগদান, আহম্মদ আয়াযের আত্মসমর্পণ, সুলতানের দিল্লী প্রবেশ।

কোনপ্রকার রক্তপাত ছাড়াই সর্বত্র শৃঙ্খলা স্থাপন, সুলতানের চরিত্রগুণ, রক্তপাতের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সুলতানদিগের সহিত তুলনা, প্রাণদণ্ড ও কঠোর শাস্তিদানে সুলতানের অনীহা, শাহী কর্মচারীদের জন্য সুবিধা দান, প্রজাদের মধ্যে সমৃদ্ধির নবযুগ ; তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার প্রতি সুলতানের দয়া ; সুলতানের দান ধ্যান, অজিফা ও জায়গীর বিতরণ ; মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদির উন্নয়ন ; অট্টালিকা নির্মাণ, জুম্মা মসজিদ, মাদ্রাসা ও বালাবন্দ অট্টালিকা, উহাদের পুণ্য পরিবেশ ও গঠন সৌকর্য, ফিরুজাবাদ দুর্গ ; অনাবাদী জমি ও বাগ-বাগিচার জন্য নদী-নালা খনন।

সুলতানের ব্যবস্থাসমূহ ; কঠোর শাস্তি দান ব্যবস্থা রহিতকরণ, খেরাজ আদায়ে সহজ রীতি নির্ধারণ ; সুলতানের পুত্র ও ভ্রাতাদিগের গুণাবলী ; সভাসদ কতলুগ খান, তাতার খান, জালাল উদ্দিন কিরমানী ; সৈয়দজাদাদের গুণগ্রাহিতা, অন্যান্য সম্মানিত পাত্রমিত্র, বশীর সুলতানী, মিলান সুলতানী, মালীক মোস্তাওফী, মালীক মাহমুদ বেগ, জাফর খান, মালীক আইনুল মুলক, আমীর কবতআ, আমীর আহমদ ইকবাল।

লক্ষণাবতীতে ইলিয়াসের বিদ্রোহ, সুলতানের সসৈন্যে তথায় গমন, গমন পথে গোরখপুর ও খরোসার আনুগত্য লাভ, ইলিয়াসের পাণ্ডুয়ায় পলায়ন ও একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ, সুলতানী সৈন্যদলের ত্রিহুত গমন, পাণ্ডুয়ায় একডালা দুর্গের পার্শ্বে শিবির স্থাপন, ইলিয়াসের সহিত সংঘর্ষ, সুলতানী সৈন্যদলের বিজয় ও প্রচুর হাতী-ঘোড়া লাভ ; দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে সুলতানের কোড়া ও মানিকপুরে দান-ধ্যান, বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে আগমন, দানধ্যান ও আনন্দ উৎসব ; ইলিয়াসের আনুগত্য স্বীকার।

আমীরুল মোমেনীনের নিকট হইতে ফরমান ও খেলাত লাভ ; সুলতানের অত্যধিক শিকার প্রীতি ; চেঙ্গিসখানী মোগলদের সহিত সংঘর্ষে সুলতানের বিজয় ও তাহাদের আগমন পথ রুদ্ধ হওয়া।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহী রচয়িতার শেষ বক্তব্য।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহী
জিয়াউদ্দিন বারানী